আল-কোরআন : যথাযথ বিশ্লেষণ

(প্রথম খন্ড)

Al-Quran : A True Interpretation

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৬

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এ জেড এম আলমগীর
প্রচ্ছদ ডিজাইন : নাহিয়ান নাজাহ্

মুদ্রণ : ইরানী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ৭০০ টাকা।

Al-Quran : A True Interpretation
(Understanding Quran-IV)
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
By A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 700.

ISBN : 978-984-35-9225-5

Facebook Page: https://www.facebook.com/ideasnviews

আল-কোরআন : যথাযথ বিশ্লেষণ : প্রথম খন্ড

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও’

সূচী

সূরা আল–ফাতিহা

(Sura Al-Fateha)

যথাযথ বিশ্লেষণ : সূরা আল-ফাতিহা

(আয়াত ১-৭)

সূরা আল-ফাতিহা; সূরা নং ১, আয়াত সংখ্যা-৭; মক্কায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নাম হচ্ছে 'The Opening'। বাংলায় যার অর্থ 'শুরু' বা 'সূচনা'।

পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ সূরার নামের সঙ্গে সূরার ভেতরের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা একটি সূরায় অনেক বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সূরার মধ্যে ব্যাবহৃত কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বা চুম্বক শব্দকে বেছে নিয়ে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যে নামটিকে প্রতীকী বলা যেতে পারে। অপরাপর সূরা থেকে একটি নির্দিষ্ট সূরাকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে নামটি সহায়তা করে বলা যেতে পারে। যে গুটিকয়েক সূরার নামকরণ সূরার অভ্যন্তরীণ আলোচ্য বিষয়বস্তুরও প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি একটি সূরা হচ্ছে 'আল-ফাতিহা'। এ সূরার নামকরণ কোরআনের প্রারম্ভিক সূরা হিসেবে যথার্থ।

সূরায় মহান আল্লাহর কাছে সঠিক পথে চলতে পারার মানসিক শক্তি সঞ্চারের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সমগ্র কোরআন পাঠের শুরু বা সূচনা করা হয়েছে। সূরায় অতি সংক্ষেপে আল্লাহ সম্পর্কে কিছু ধারণাও উপস্থাপন করা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে যে আল্লাহ দয়াময়, বিচার দিবসের মালিক।

কোরআনের সর্বপ্রথম এ সূরায় বিচার দিবস সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বলা যায় যে, এ সূরা সমগ্র কোরআনের মর্মার্থ সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই একটি ধারণা উপস্থাপন করে। এর ফলে মানবের কর্ম ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে শুরুতেই একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা দেয় সূরা ফাতেহা। এটি প্রথম সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমুহের মধ্যে একটি। এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ অবতীর্ণ সূরা।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)

পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে।

১	সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের অধিকর্তা।
২	তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময়
৩	বিচার দিবসের মালিক।
৪	আমরা (শুধুমাত্র) তোমারই উপাসনা করি; আমরা (কেবলমাত্র) তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি।
৫	(হে আল্লাহ) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও;
৬	তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ,
৭	তাদের পথ নয়- যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে। [In the name of Allah, The Beneficent, The Merciful]

'পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে।' প্রারম্ভিক এ আয়াতটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। এগুলি হচ্ছে, ক) আল্লাহর নামে খ) আল্লাহ এবং গ) পরম করুণাময়, দয়াময়। নিচে 'আল্লাহর নামে' কথাটির বিশ্লেষণ তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত করা হল।

ক) আল্লাহর নামে (In the name of Allah): আল্লাহর নাম উচ্চারণ বা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে কোরআন পাঠের সূচনা করা হয়েছে। ভাল, শুভ বা পবিত্র যে কোন কিছু শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে বা বলা যায়, মানবজাতিকে এ শিষ্ঠাচার মেনে চলতে অনুপ্রাণীতও করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ রীতির প্রচলন করা হল? মানুষকে কেন এভাবে শিক্ষাদান করা হল? পেছনে অবশ্যই কোন না কোন বোধ বা উপলব্ধিবোধ কাজ করেছে। সে বোধের পেছনে আছে দর্শন। সে দর্শন মানবজাতিকে ভাল ও পবিত্র কাজ আল্লাহর নামে শুরু করার শিক্ষাদান করে। সে আলোচনাই এখানে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হবে।

সত্যের জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া কোন কিছু প্রতিষ্ঠা পায় না। সত্যের জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া আল্লাহও কোন দিক-নির্দেশনা দেন না। হয়তবা সে সত্য জানা সকলের জন্য অতি প্রয়োজনীয় নয়। তবে কিছু সন্ধানী মন জানতে চাইবেই। তাদের জন্যই কোরআনের এ বিশ্লেষণ।

'আল্লাহর নামে'। ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু এর অর্থ অত্যান্ত ব্যাপক, গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

শুভ কাজের শুরুতে যারা সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করেন তারা হচ্ছেন বিশ্বাসী। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। কোরআন আগমনের পূর্বেও মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেছে। তারাও বিশ্বাসী। অতএব কোরআনের বার্তার অনুসারী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। প্রকারভেদে বিশ্বাসীদের পালনকৃত রীতি-নীতিতে ভিন্নতা আছে। তবে মূল বিষয় এক।

মূল বিষয় হচ্ছে, সবকিছুর পেছনে একজন 'স্রষ্টা'র বিদ্যমানতাকে স্বীকার করা। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শন করা। তাঁর ওপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সমর্পিত হওয়া; তাঁর পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এ যেন বিশ্বাসীদের হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দনস্বরূপ। কোরআনের বার্তা অনুসরণ করে যারা সেটি পালন করে তারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী। কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীগণ 'মুসলিম' বা 'মুসলমান' নামে পরিচিত।

কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীগণ স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে জানে বা অভিহিত করে থাকে। কারও কাছে তিনি ঈশ্বর, ভগবান বা গড। বিধাতার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ বিশ্বাসীরা তাঁর নাম নিয়ে কাজের শুভ সূচনা করে। স্রষ্টার অফুরন্ত অনুগ্রহের কারণে মানবজাতির পক্ষ থেকে এটি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। কিন্তু এখানেই এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ নয়।

কোরআন পাঠের শুরুতে 'আল্লাহর নামে' বাক্যটি এখানে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে আল্লাহর ধারণা মানব জাতির মন ও মানসে একটি

'কেন্দ্রবিন্দু'তে পরিগনিত হয়েছে। আল্লাহর নাম মানবজাতির সম্মুখে সমুন্নত ও মহিমান্বিত হয়েছে এবং একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আল্লাহকে এভাবে অর্থাৎ মানবজীবনের জন্য একটি 'কেন্দ্রবিন্দু'রূপে উপস্থাপন করা হল? কেন আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল? আল্লাহ কে?

বিষয়গুলি বোঝার সুবিধার্থে মানবজাতিকে খুব আদিম অবস্থায় অর্থাৎ এসব প্রশ্নের উত্তর যখন মানুষের জানা ছিল না সে অবস্থায় কল্পনা করে যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

'আল্লাহ কে' সে প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীতে আলোচনায় আসবে। এ পর্যায়ে কেন আল্লাহকে একটি 'কেন্দ্রবিন্দু'রূপে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করা হল সে আলোচনায় আসি?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'জ্ঞান'। জ্ঞান মানুষকে বাধ্য করেছে পরিশেষে এ ধারণায় এসে উপনীত হতে।

'আল্লাহর নামে' কথাটি এখানে এমনভাবে উঠে এসেছে যে, এটি সমস্ত জ্ঞানের উপসংহারিক সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। মানবজাতির সকল জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে একটি শব্দ– 'আল্লাহ'। জগতের সকল জ্ঞান এই একটি ধারণার কাছে এসে নিজেকে সমর্পন করে দিয়েছে। তাঁর কাছে সমর্পিত হয়েছে মানবজীবন এবং এ সমগ্র ধরিত্রী। এ জ্ঞান আজকের নয়। অজানা-অচেনা, শ্বাপদ-সংকুল জটিল এ ধরিত্রীর বুকে যুগ যুগ ধরে লালিত মানব মনের অজানা নানান সব প্রশ্নের উত্তর এখানে এসে ভীড় করেছে।

বাক্যটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রথমেই সকল চিন্তা ও কর্মে আল্লাহর ওপর ভরসা করার ইংগিত বা শিক্ষা পাওয়া যায়। অর্থাৎ জীবন ও জগত সকলের সবকিছু আল্লাহতে বিলীন– তাতেই সমর্পিত।

এভাবে উপস্থাপনার কারণে আল্লাহর অবস্থানটি মানব জ্ঞানের 'কেন্দ্রবিন্দু'তে পরিণত হয়েছে। 'কেন্দ্রবিন্দু' বলা হচ্ছে এজন্য যে, ধ্যানমগ্নতা কিংবা সকল বিচার-বিশ্লেষণ শেষে জ্ঞান অবশেষে এ জ্ঞানে এসে উপনীত হয় যে, 'সকল জ্ঞানই আল্লাহ থেকে উৎসারিত আবার আল্লাহতেই শেষ'। তিনিই 'আদি' বা উৎস আবার তিনিই 'অন্ত' বা জ্ঞানের সমাপ্তি বা 'সমাধিস্থল'। তাঁকে কেন্দ্র করেই সকল জ্ঞান আবর্তিত।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি। যেমন জন্মের পূর্বে মানবের কোন জ্ঞান ছিল না বা থাকলেও সেটি পার্থিব জীবনে স্মরণে নেই। মানবের সকল জ্ঞান তার জন্ম পরবর্তী বা সৃষ্টির পর থেকে শুরু। কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীর কাছে সৃষ্টির কারণ হচ্ছেন 'আল্লাহ'। কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসীও কিছু একটা ধরে নিয়ে আল্লাহকে ভিন্ন নামে অভিহিত করতে পারে। তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা এতটুকু সত্য সকলের জানা আছে যে এ দর্শনে অবিশ্বাসী এমনকি নাস্তিকও নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি। অন্য কেউ বা কিছু তার সৃষ্টির কারণ। অজানা-অচেনা সে উৎসকেই কোরআনে 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে!

যিনি সৃষ্টির কারণ বা স্রষ্টা তার কারণেই সকল চেতনা- সকল জ্ঞান; তার থেকেই সকল জ্ঞানের সূচনা। অতএব সকল জ্ঞানের আদি বা উৎস হচ্ছেন তিনি।

অপরদিকে পরিণত মানবসমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বিশ্লেষণোত্তর অধিকতর ও উচ্চতর জ্ঞান একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে থমকে দাড়ায়। চলার পথ খুঁজে পায় না। 'শেষ' কোথায় জানে না। তবে এতটুকু বুঝতে পারে যে এখানেই 'শেষ' নয়।

সময়ের 'সর্বোচ্চ জ্ঞান' এমন অবস্থায় এসে আর অগ্রসর হতে পারে না। কিছু সময়ের জন্য থমকে দাড়ায় বা একটি অবস্থানে এসে নোঙ্গর করে। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এ অবস্থায় পতিত হয়ে মানবজাতি সকল কিছুর কারণরূপে এক্স, ওয়াই, জেড কিছু একটাকে ধরে নেয়। ধরে নেয়া এ অবস্থানটিতেই 'আল্লাহ'র বিদ্যমানতা। যা আসে যে কোন বিবেচনায় সমসাময়িক সময়ে মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের 'সর্বোচ্চ' বা 'সর্বশেষ পর্যায়' থেকে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'অন্ত' বা 'সমাধিস্থল'ও তিনি। অতএব তিনিই 'আদি' তিনিই 'অন্ত'।

উল্লেখ্য যে, ওপরে উদ্ধৃত জ্ঞানের এ 'সমাধিস্থল' হচ্ছে 'আপাত সমাধিস্থল'। কেননা আল্লাহর ধারণা একটি অবস্থানেই সীমাবদ্ধ বা সমাধিস্ত নয়। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে কিছু সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে। তবে জ্ঞানের অগ্রসরমানতার সাথে সাথে এটি পরিবর্তীত ও অধিকতর বোধগম্য হয় বা হতে থাকে। বিষয়টি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে ঘটে,

তেমনি বৈশ্বিক বা সামগ্রীক বিবেচনাতেও হয়ে থাকে। তাই সমাধিস্থল না বলে 'আপত সমাধিস্থল' বলাই যথাযথ।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ধ্যান ও জ্ঞান মস্তিষ্কের সকল বিচার-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে পরিশেষে মানুষকে এমনটি জানান দেয় যে, জগতের সকল কিছুই 'আল্লাহতে শুরু' আবার 'আল্লাহতেই শেষ'। তাই তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তাই বলা হয়েছে,

"তিনিই আদি তিনিই অন্ত .. সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫৭:৩)

"আমিই সমস্ত জীব ও জড়ের আদি, মধ্য ও অন্ত।" (গীতা ১০:২০)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও অবস্থানে জ্ঞান আপাত থমকে দাড়ালেও সৃষ্টির কারণ বা উৎসকে 'লক্ষ্য' ধরে তার পথচলা অব্যাহত রাখে। সৃষ্টির শুরু, উৎপত্তি বা উৎসকে জানতে চায় মানুষ। যে কোন বিচারে তাই বিধাতা বা আল্লাহর অবস্থানটি ধারণাগতভাবে সকল জ্ঞানের লক্ষ্য বা 'কেন্দ্রবিন্দু'তে পরিণত হয়ে যায় । তাই বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক; তিনিই সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

"তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানের বিষয় এবং তিনিই জ্ঞানের লক্ষ্য।" (গীতা ১৩:১৮)

মানবজাতি বিচার-বিশ্লেষণ করে পরিশেষে যা গ্রহণ করবে কোরআন বা ধর্মগ্রন্থসমূহ মানবজাতিকে সে পথ পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে।

জ্ঞান যখন আর অগ্রসর হতে পারে না তখন কারণ ও সমাধানরূপে সবকিছু 'বিধাতা' তথা 'আল্লাহ'র ওপর বা 'তাঁর নামে' ছেড়ে দেয়া হয়। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অসহায় মানুষকে 'বিধাতা' বা 'আল্লাহ'তে বা এমন একটা ধারণায় সমর্পিত হতে বাধ্য করে। অথচ আল্লাহ কে বা কি কেউই জানে না।

এমনিভাবে জ্ঞানই মানুষকে কালে কালে বিভিন্ন উপস্থাপনায় এ একই ধারণায় উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, 'তিনিই উৎস, তিনিই লক্ষ্য'। তিনিই সকল কারণের কারণ। তাতেই সবকিছু বিলীন।

পরিশেষে তাই আল্লাহই সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন এবং তাঁকে ঘিরেই সবকিছু আবর্তিত হয়। সে কারণে কোরআনে বা শাস্ত্র গ্রন্থসমুহে যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে সবকিছু তাঁর নামে এবং তাঁর নাম নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বজগত ও মানবজীবন সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পিত- তাতেই বিলীন। কোরআনের শুরুতেই এ জ্ঞান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং বলা যায় যে বিচার-বিশ্লেষণ শেষে উপসংহারিক সিদ্ধান্তরূপে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করাও হয়েছে।

ওপরে প্রশ্ন রেখে আলোচনাটি শুরু করেছিলাম যে, কেন আল্লাহকে একটি 'কেন্দ্রবিন্দু'রূপে উপস্থাপন করা হল বা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করা হল? কেন আল্লাহর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হল?

উত্তর হচ্ছে, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাই মানুষকে এ ধারণায় উপনীত করেছে বা আপাতত এভাবে ধরে নিয়ে অগ্রসর হতে বা সত্যকে জানতে ও বুঝতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এটিই হচ্ছে সত্যকে জানার ক্ষেত্রে উত্তম উপায় বা পন্থা। এর ফলে সমগ্র জীবন ও জগত একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে সক্ষম হয়েছে। অন্যথায় লক্ষ্যবিহীন মানবজীবন হত উদ্ভ্রান্ত! এছাড়াও বাস্তবে তথা মানব বা সমাজ জীবনে এ ধারণার আছে বহুমাত্রিক উপকারীতা যা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় উঠে আসবে।

যারা এ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হবেন বা উপনীত হতে পারবেন, তারা সকলেই অজানা-অচেনা এক মহাশক্তির কাছে সমর্পিত হবেন বা হতে বাধ্য হবেন এবং সেটি হবেন জ্ঞানের কারণে। কেননা জ্ঞান জ্ঞানত এতটুকু জানতে বা বুঝতে শিখেছে যে, সে আজও তার উৎপত্তিস্থলকে জানে না এবং তার লক্ষ্যও সে খুঁজে পায়নি। অথচ বুঝতে পারে যে এখানেই শেষ নয়। তাই বলা হয়েছে,

"মানুষকে সেই স্থানের খোঁজ করতে হবে যে- সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় চলে যাওয়ার পর সে আর ফিরে আসে না এবং সেই ভগবানে সমর্পন করতে হবে, যার থেকে সবকিছুর শুরু এবং আদি থেকে যার মাঝে সকলের বসবাস।" (গীতা ১৫:৩-৪)

অংকের সমাধান বের করার মতো এক্স, ওয়াই, জেড কিছু একটাকে লক্ষ্য ধরে নিয়ে জ্ঞান এগিয়ে চলে। ধরে নেয়া সে একটা কিছুই হচ্ছেন 'আল্লাহ'।

জ্ঞানের অজানা বা আপাত 'শূন্যস্থান' পূরণ করা হয় 'আল্লাহ'কে হাজির করে। এটি ধারণায় বিরাজ করে। তাই তাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কিংবা যথাযথভাবে কল্পনাও করা যায় না। তাঁর বিষয়ে যথাযথভাবে মানুষ কিছুই জানে না। তাঁকে ঘিরে যে স্বপ্ন সেটি হচ্ছে একটি 'দর্শন'। আল্লাহর ধারণা সে দর্শনের 'কেন্দ্রবিন্দু'তে অবস্থান করে। কোন দর্শনে যখন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি থাকে তখন সে দর্শনই হয়ে যায় 'ধর্ম'।

স্থান-কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্নজন ও বিভিন্ন গোষ্ঠী আল্লাহকে বিভিন্নভাবে ও নামে সম্মোধন ও উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁকে ঘিরে বিভিন্ন স্বপ্ন রচনা করেছেন বা দর্শনের জন্ম দিয়েছেন। তাই বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। বস্তুত তিনি একই জন। সকল মানুষের স্রষ্টা বা প্রভূ 'এক'। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই।" (আল-কোরআন ২:১৬৩)

গীতায় বলা হয়েছে, "হে মহান! তুমি এক। তুমিই স্বর্গ-মর্ত্য ও এর মধ্যবর্তী সর্বত্র এবং সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ।" (গীতা ১১:২০)

বাইবেলের দশ নির্দেশনার প্রথমেই বলা হয়েছে, "আমিই গড (আল্লাহ)। আমি ব্যাতিত আর কোন গড নেই।"

সত্যি বলতে বা বৃহত্তর অর্থে স্রষ্টা তথা আল্লাহকে ঘিরে বা তাঁকে লক্ষ্য ধরে নিয়েই তাঁর সন্ধানে মানবজীবন যাবতীয় কর্মে রত। এভাবেই মানুষ নিজেকেও চেনে-জানে এবং আত্ম-উপলব্ধিতেও অধিষ্ঠিত হয়।

বস্তুত মানবজীবনের এটিই মূল লক্ষ্য। দৈনন্দিন অপরাপর কাজগুলি সহায়ক কাজ মাত্র। তবে সহায়ক কাজগুলিও কোন না কোনভাবে বা পরোক্ষে সে একই লক্ষ্যে ক্রিয়ারত। কিন্তু বাস্তবে বিষয়গুলিকে মানুষ সেভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পায় না। সাধারণ মানুষ সংখ্যায় বেশী এবং তারা সহায়ক কাজগুলিতে অধিক ব্যাস্ত। তাই সহায়ক কাজগুলিকেই মূখ্য বলে মনে হয়। জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্যকে সকলে স্মরণে আনতে পারে না।

ধর্মে তাই নানাবিধ নিয়ম-বিধির প্রচলন করা হয়েছে। যেন সাধারণ মানুষ পেছনের দর্শন না জানলেও নিয়ম-বিধি অনুসরণ করে স্রষ্টাকে তথা আল্লাহকে স্মরণে আনে, সুশৃংখল নিয়ম মেনে চলে এবং একটা ফল লাভ করে। অনেকটা

অংকের সূত্রের মতো। অর্থাৎ সূত্রের আগমনের কারণ জানা না থাকলেও সূত্রে ফেলে দিয়ে অংকের সমাধান বের করে আনা এবং ফল লাভ করা।

'আল্লাহর নামে' বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে তেমন স্মরণজনিত একটি রীতি প্রতিষ্ঠা বা প্রচলন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সকল কারণের কারণের প্রতি মানবজাতির কৃতজ্ঞতারও প্রকাশ ঘটান হয়েছে। বাস্তবে যার কার্যকারণজনিত অন্যান্য আরও প্রয়োজনীয়তা, সুফল ও ফল লাভ আছে। অতএব কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করার এ রীতি প্রচলনের অনেক কারণের মধ্যে এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং জ্ঞানের কারণেই মানুষ তা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

'স্বীকৃতি' প্রসঙ্গ। 'আল্লাহর নামে' কথাটির উচ্চারণ ও তার উপস্থাপনার ধরণটি এখানে এমন যে, যিনি মানবজাতির পথ-প্রদর্শকরূপে বিষয়ের গভীরতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বাণীটি সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছেন, আল্লাহর ধারণাকে তিনি তার উপলব্ধিবোধের কারণে অন্তর থেকে 'স্বীকৃতি' দিয়ে দিয়েছেন বা উল্লেখিত জ্ঞানের কারণে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ জ্ঞানই এ স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছে। পরবর্তীতে অপরাপররা তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেও অনেকে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। আল্লাহর ধারণাকে অন্তর থেকে 'স্বীকৃতি' দেয়ার বিষয়টি দ্বারা এখানে কি বোঝান হয়েছে?

সমগ্র সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ হিসেবে আল্লাহর বিদ্যমানতাকে বুঝতে পারা, মানবজীবনে এ ধারণার প্রয়োজনীয়তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং এই উপলব্ধি করতে পারার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে মন থেকে সেটি মেনে নেয়া- এটিই হচ্ছে আল্লাহর ধারণাকে 'স্বীকৃতি' দেয়া। প্রশ্ন হচ্ছে, 'স্বীকৃতি'র বিষয়টিকে কেন এভাবে গুরুত্ব দিয়ে পৃথকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে?

অন্তরের 'সম্মতি' ভিন্ন কোন ধারণাকে 'স্বীকৃতি' দেয়া যায় না। অন্তরের সম্মতি প্রাপ্তি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্মতি ব্যাতিত কোন কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারণ বা স্বীকার করলেও সত্যিকারভাবে গ্রহণ করা যায় না। অন্তরের সম্মতি প্রাপ্তি হল আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপনের মূলভিত্তি। তাই এ

স্বীকৃতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কেননা মানব মনে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে।

অন্তর তখনই কোন বিষয়ে 'সম্মতি' দেবে যখন সে উক্ত বিষয়ে 'তুষ্ট' হবে। অতএব অন্তরের তুষ্টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যথাযথ 'জ্ঞান' ভিন্ন অন্তরকে তুষ্ট করা যায় না বা সম্ভব হয় না। 'জ্ঞান' তার বিচার-বিশ্লেষণ শেষে সন্তুষ্টজনক একটি স্থানে না পৌঁছান পর্যন্ত অন্তর কোন বিষয়ে 'তুষ্ট' হয় না বা ইতিবাচকভাবে সাঁয় দেয় না। ফলে কোন ধারণায় খুব সহজেই বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া যায় না। অন্তর যখন কোন একটি বিষয়ে 'তুষ্ট' হয়ে 'সম্মতি' দেয় কেবল তখনই বিষয়টিকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

যিনি 'আল্লাহর নামে' বাক্যটি উচ্চারণ করেন বা সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছেন, সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ শেষে তার 'জ্ঞান' এতে পরিপূর্ণরূপে 'তুষ্ট' হয়েছে- এ উচ্চারণ সে বিষয়টিকে নিশ্চিত করে এবং প্রকাশও করে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক তার সকল বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শেষে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, এ সৃষ্টির পেছনে একজন কেউ বা কিছু বা একজন 'সৃষ্টিকর্তা' আছেন। তিনিই 'আল্লাহ' বা তাঁকেই 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, হর্তা-কর্তা, লালন-পালনকারী। তিনিই সবকিছুর পরিচালনাকারী ও নিয়ন্তা। তিনি সকল কারণের কারণ। বিষয়গুলি জ্ঞানত বুঝতে পারা এবং এ জ্ঞানে অন্তরের 'সন্তুষ্ট' হওয়ার ফলশ্রুতিতেই অন্তরের 'স্বীকৃতি' লাভ করা। অতএব এ 'স্বীকৃতি' জ্ঞানসম্মত পরিপূর্ণ বিশ্বাসের নির্দেশক। এ বিশ্বাস অজ্ঞতাজনিত কোন বিষয় নয়। অন্ধত্বও নয়। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার জন্যই স্বীকৃতির প্রসংগটি তুলে ধরা হয়েছে।

সত্য হচ্ছে, সকল মানুষ বিষয়গুলিকে এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝতে যাবে না কিংবা বুঝতে পারবেও না। কিছু মানুষকে অন্যের জ্ঞানের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে চলতে হবে এবং এমনটি জাগতিক সকল কর্ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। এমনকি 'করোনা'র পরীক্ষামূলক টিকা নিতেও কারও কথায় আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের বিষয়গুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও এমনটি ঘটে। এগুলিকে অন্ধত্ব বলে না।

আল্লাহ 'সকল কারণের কারণ'। একটি 'একক কেন্দ্রবিন্দু'। যাকে ঘিরে এ বিশ্বজগত, পরিবেশ-প্রকৃতি এবং মানবজীবন ও সমাজের সবকিছু আবর্তিত

হয়। 'আল্লাহর নামে' বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণজনিত একটি রীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল কারণের কারণের প্রতি মানবজাতির কৃতজ্ঞতাবোধেরও একটি প্রকাশ ঘটেছে।

ওপরে উল্লেখ করেছি যে, বাস্তবে এর 'কার্যকারণ সম্পর্কজনিত' আরও নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা, সুফল ও ফল লাভ আছে। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি।

একটি দর্শনে অনেক রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান থাকে। তার আগে থাকে একটি 'লক্ষ্য'। এসব রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানসমুহের একটির সাথে অপরটির যোগসূত্র থাকে। অর্থাৎ 'কার্যকারণ সম্পর্ক' থাকে। যা একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়।

সত্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে- এই একটিমাত্র বিন্দু বা বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়া এবং তাতে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা দর্শনের কার্যকারণ সম্পর্কজনিত অপরাপর সকল রীতি-নীতিতে আস্থা আনয়নের পূর্বশর্ত। যার ওপর সমগ্র দর্শনের লক্ষ্য অর্জন ও সফলতা নির্ভর করে।

সমগ্র দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম এ একটি বিষয়কে অর্থাৎ 'আল্লাহ'কে প্রতিষ্ঠা করা তাই অপরিহার্য্য। অন্যভাবে বলা যায় যে এই একটিমাত্র বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে সমগ্র দর্শনটিকে সফলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে। 'লক্ষ্য' অর্জন সম্ভব হয়। তাই অজানা সত্বেও 'আল্লাহ'কে 'সকল কারণের কারণ' বা একটি 'একক কেন্দ্রবিন্দু' হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় বা ভূলে গেলে চলবে না যে দর্শনের লক্ষ্য অর্জন কিন্তু জাগতিক সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। ফলে বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহকে অন্তর থেকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি তাই বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে এমনকি মানসিক থেকে শুরু করে চিন্তার জগতও বিশৃংখল বা উদভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। যার অশুভ পরিণাম পতিত হবে মানবজীবন, সমাজ এমনকি মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপেও।

বিধাতাপ্রসূত উল্লেখিত বোধ বা উপলব্ধিবোধ বা চিন্তার বিশ্লেষণপ্রসূত তেমন জ্ঞানের কারণেই বিষয়টি অন্তর থেকে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে বা বিষয়টিকে

স্বীকৃতি দিয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। সকল কাজ তথা ভাল কাজ 'আল্লাহর নামে' শুরু করার শিক্ষাদান করা হয়েছে এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে প্রত্যেকের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবজাতিকে অনুপ্রাণীতও করা হয়েছে।

যারা এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানে উপনীত হতে পারবেন, তাঁরা আল্লাহর ধারণাকে অন্তর থেকে স্বীকৃতি দেয়ার যথাযথতা ও প্রয়োজনীয়তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন। বাস্তব জীবন তথা সমাজ বা মানবীয় সুশৃংখল ব্যাবস্থাপনার জন্যও এটি করা প্রয়োজন। আর সে বোধ থেকেই স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও সমর্পন বিষয়গুলি চলে আসে। পরিণতিতে সবকিছু মানব হৃদয়ে 'আল্লাহর নামে' পরিচালিত হয়। সমগ্র মানবজাতি এক লক্ষে ধাবিত হয়।

উল্লেখ্য যে, কোন একটি বিষয়ের প্রণেতাগন এবং পরবর্তীতে সে পথের অনুসারীগণের সকলের বোধ একইভাবে কাজ নাও করতে পারে। ফলে সূরার এ বিশ্লেষণ অনুধাবনে এ বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা প্রণয়নকালীন সময়ের সম্ভাব্য বোধ ও যৌক্তিকতাকে অধিকতর বিবেচনায় রেখে সূরার এ বিশ্লেষণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

'সিদ্ধান্ত' প্রসঙ্গ। কোরআন পাঠের শুরুতে যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে 'আল্লাহর নামে' এভাবে বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে সেটি একটি গৃহীত নিশ্চিত 'সিদ্ধান্ত'রূপেও উপস্থাপিত হয়েছে। নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টিকে কেন পৃথকভাবে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে?

সৃষ্টির শুরু থেকে যুগ যুগ ধরে উদ্ভ্রান্ত-বিচলিত মানব অন্তরসমূহ সৃষ্টির পেছনের রহস্য সন্ধান করে চলেছে। কিন্তু কে তিনি যিনি সব কিছুর পেছনে? সব মানুষ এমন ভাবনা ভাবে না বা ভাবতেও যাবে না। সবাই দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ব্যাস্ত।

জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে কিছু মানুষ বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেন। তাঁরা এসব বিষয়ে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত! তাঁরা যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন সে সিদ্ধান্ত অপরাপর বা সাধারণদের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে কাজ করে। তেমনি ভাবনার ফসল একটি সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ আল্লাহ বিরাজমান, তিনি সব কিছুর মূল।

এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটিই প্রকাশ পায় যে এখানে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের অবকাশ বা দোদুল্যমানতা নেই। এটিই বিশ্লেষনোত্তর সিদ্ধান্ত। বিষয়গুলি নিয়ে অন্যদের বা সাধারণদের আর ভাবতে হয় না। তারা কেবল সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল বিশ্বাস ও ভরসা রাখে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যাতিত এ জগতের পেছনে আর কেউ নেই বা আর কিছু নেই বা আর কোন কারণ নেই এবং তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই বা আর কিছু হতে পারে না। চিন্তাশীল অন্তর এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর অনুসারীদের সবকিছু 'আল্লাহর নামে' চালিত হয়। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ নেই, কিছু নেই।" (আল-কোরআন ১১২:৪)

"আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, কিছু নেই।" (গীতা ৭:৭)

একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ বিষয় নয়। বস্তুত অনেক প্রক্রিয়াকরণের পথ পাড়ি দিয়েই একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। পেছনে কাজ করে জ্ঞান। যখন কোন বিষয় এমনিভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত হয়, তখন সেটি হয় গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়ে। বিশ্বাস গড়ে ওঠে জ্ঞানের চর্চার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে। সেটি কেবলমাত্র অতি সাধারণভাবে কোন একটি বিষয়কে মুখে স্বীকার করে নেয়াকে বোঝায় না।

সীমাবদ্ধ মানবীয় জ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করে বিশ্ব জগতের সমস্ত হিসেব-নিকেশের বিশ্লেষণ সমাপ্ত করার পর পরিশেষে একটি বিন্দুতে এসে অর্জিত জ্ঞান বিশ্বাসে পরিণত হয়। সে বিন্দুতে 'আল্লাহ'র অবস্থান। অন্যভাবে বলা যায় যে সে অবস্থানটিকে আমরা 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করে থাকি। একেকজন একেক নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু জন একই।

আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কারও জানা নেই। বিভিন্ন মানুষ তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে, আবার বিভিন্নভাবে ভাবে বা কল্পনা করে। এতদ্বসত্বেও 'আল্লাহর নামে' এভাবে উচ্চারিত বাক্যটি আল্লাহর ধারণাকে জ্ঞানত মানবজীবনের জন্য একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এটি তার একটি দৃঢ় প্রকাশ

ঘটায় এবং বিষয়টিকে গ্রহণ করে নিয়ে প্রতিনিয়ত যে এটি উচ্চারণ করে তার ভেতরে সে 'বিশ্বাস' দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে।

'বিশ্বাস' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এটি মানুষকে তার দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও ধরে রাখে; যার সাথে দর্শনের সামগ্রীক লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ের গভীর সম্পর্ক থাকে। সকল দর্শনের একটি লক্ষ্য থাকে। আল্লাহকে কেন্দ্র করে যে দর্শন তারও একটি লক্ষ্য আছে। ফলে দর্শনের লক্ষ্য অর্জন তথা সফলতা 'আল্লাহর নামে' ছোট্ট এই গৃহীত সিদ্ধান্তটুকুর ওপরও দারুণভাবে নির্ভর করে। যা একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে মানব জীবনের সাথে জড়িয়ে গেছে এবং আছে।

একজন সত্যিকার 'বিশ্বাসী' প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে তার সব কাজ অন্তরে আল্লাহকে হাজির রেখে সম্পন্ন করে। সে শিক্ষায় সে গড়ে ওঠে। এর মনস্তাত্তিক দিকটি মোটেও ছোট-খাটো কোন বিষয় নয়। বিশ্বাসী ভিন্ন বা যে এ শিক্ষায় গড়ে ওঠেনি তার পক্ষে বিষয়টি বোঝা বা অনুধাবন করা খুব সহজ বা সম্ভবও নয়।

'বিশ্বাসী' তার লক্ষ্য ও তার নিয়তটিকে ভেতরে ধারণ করে। আল্লাহ তার ভাবনায় অতি বিশাল ও অতি উচ্চ মাত্রার একটি বিষয়। বিশ্বাসী আল্লাহকে মনোজগতে তার সামনে উপস্থিত দেখতে পায়। এর ফলে সে যখন আল্লাহকে হাজির রেখে কোন প্রতিজ্ঞা ও কর্ম শুরু করে সে তা থেকে বিচ্যুত হয় না বা হতেও পারে না। এসবের মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে 'আল্লাহর নামে' কথাটির উচ্চারণ লক্ষ্যের পানে ছুটে চলায় বিশ্বাসীর অন্তকরণকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ 'ওঁ তৎ সৎ' তিনটি শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কর্ম শুরু করেন। ব্রহ্মকে বোঝাতে শব্দ তিনটি প্রতীকীস্বরূপ ব্যাবহৃত হয়। এর মাধ্যমে সকল কর্ম সৎ নিয়তে মন থেকে ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে সেটিকে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্তর্নিহিতে ব্রহ্মভাবনা রয়েছে এটি সেটি প্রকাশ করে। এভাবে ব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা কর্ম শুরু করা হয়। বিশ্বাসীর মনোজগতে এসব ক্রিয়ার অনেক মূল্য আছে।

বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ এক। কিন্তু মানুষ অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে চায় না। তারা একে অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দকেও অপছন্দ করে। এগুলি

সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অনুদার মানুষের মনোজাগতিক সমস্যা। সত্যের জ্ঞান অন্তরকে প্রসারিত করে। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলি বলে রাখা হল।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে কেন্দ্র করে যে দর্শন সেটি কারও স্বার্থকে বা কোন গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়নি। সত্য ও ন্যায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত দর্শন সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা বা অন্যায় ও অসত্যকে রহিত বা প্রতিহত করার শিক্ষা দেয়। এটি সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য আগত দর্শন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত দর্শন একজনকে তথা বিশ্বাসীকে তেমন আদর্শিক শিক্ষায়, জ্ঞানে ও চর্চ্চায় গড়ে তুলতে চায়। এর লক্ষ্য জাগতিক সামগ্রীক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত- গোষ্ঠীগত নয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ধর্মের আদর্শিক দিক, দর্শন বা তত্ব নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। বাস্তবের বিচ্যুতির আলোচনা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

অন্তর থেকে যে আল্লাহর নাম উষ্চারণে অভ্যস্ত সে সেই দর্শনে বিশ্বাসী। আবার যে প্রতিনিয়ত এটি উষ্চারণ করে সে ধীরে ধীরে এর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা অনুধাবনের পথে অগ্রসর হতে হতে বিশ্বাসীতে পরিণত হয় এবং প্রদর্শিত পথে চলতে অভ্যস্ত হয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে চলার অপর অর্থই হচ্ছে সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথে চলা এবং সে পথে দৃঢ়তার সাথে অধিষ্ঠিত থাকা বা থাকতে পারা। আল্লাহ কখনই কোন প্রকারের মন্দ কাজের আদেশ দেন না। বলা হচ্ছে,

"বল, আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। ... বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

আল্লাহ যে মন্দ, অন্যায়, অসত্য, অশ্লীল, অবিচারকে গ্রহণ করেন না কোরআনের মাধ্যমে তিনি তা প্রকাশ্যে ঘোষনা করে দিয়েছেন। অতএব বাস্তবে কেউ যদি বিচ্যুত আচরণ করে তবে সেটি আল্লাহ, কোরআন কিংবা দর্শনের সমস্যা নয়। মানবীয় ও জাগতিক সমস্যা। সে কারণেই 'শিরক'কে নিষিদ্ধ বা হারাম করা হয়েছে। কেননা শিরক এর মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ কোনকিছু সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশকে পাশ কাটিয়ে সমাজে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়।

কোরআনের এ বিশ্লেষণে দর্শন প্রকৃতপক্ষে কি বলে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তবের কোন বিচ্যুত কর্ম ও আচরণকে এখানে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কেননা সকলকে দর্শনের যথাযথ পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথেই আসতে হবে এবং এ বক্তব্যকেই আজ নয়ত কাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সেটিই করণীয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, কোরআন প্রদর্শিত পথের সাথে সত্য ও সঠিক পথে চলার নিবির সম্পর্ক আছে। কোরআন সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে। সঠিক আচরণ করতে সকলকে অনুপ্রাণীত করে। কিন্তু বর্তমান বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অনেকেই হয়তবা এ বক্তব্যের সাথে একমত হতে চাইবেন না। তবে কোরআন যে সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে এটি সত্য এবং সে সত্যকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। তবেই ওপরের আলোচনাগুলির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে এবং ধর্ম নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষ মানসিকভাবে সে পথ গ্রহণ করে নিতেও সম্মত হতে পারবে- নয়ত নয়। তেমন ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ ক্ষুদ্র পরিসরের দলীয় গ্রন্থে পরিণত হবে, গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হয়ে কাজ করবে এবং সমগ্র মানবজাতির পথ-প্রদর্শকরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে ব্যার্থ হবে।

কোরআন যে সকল ক্ষেত্রে মানুষকে ন্যায়সম্মত আচরণ করতে শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয়- আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ও প্রযোজ্য প্রতিটি স্থানে সে বিষয়গুলিই এ বিশ্লেষণে তুলে ধরা হবে। সেটি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে ওপরের কথাগুলিও সত্য বলে প্রমাণিত হবে না এবং প্রতিষ্ঠাও পাবে না। সেক্ষেত্রে জগতের সকল মানুষের কাছে এ দর্শন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। তাই ধৈর্য্য, মনোযোগ ও সত্য অন্তরে এ বিশ্লেষণ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সকলের প্রতি আহবান রইল।

বাস্তবে সর্বক্ষেত্রেই কিছু বিচ্যুতি থাকে। সেসবকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে কোন একটি দর্শনের বিচার করা সমীচীন নয়। সেগুলি মানবীয় ত্রুটি। দর্শনে বর্ণিত আদর্শিক রূপরেখা ও বাস্তব এক নয়। বাস্তবে বিচ্যুতি ঘটে ও থাকে। তথাপি দর্শনের আদর্শ থাকা ও তার যথাযথ অলোচনা অব্যাহত রাখার একটি মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে।

দর্শন বা তার আদর্শের অব্যাহত আলোচনা জীবনের জন্য একটি ন্যায়সম্মত ও সঠিক লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে দেয়। মানবজীবনের জন্য যা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য আছে বলে বা লক্ষ্য আজও অর্জন করা সম্ভব হয়নি বলেই তো মানুষের এত এত কাজ ও কর্মব্যস্ততা। নইলে মানুষের তো কোন কাজই থাকত না! মানুষ একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেটি অর্জনে এগিয়ে চলে। বিচ্যূতিসমুহ চিহ্নিত করা ও তা দুর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই তো মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

'আল্লাহর নামে' বাক্যটি উচ্চারণের আরও একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। মানব অন্তরে বিদ্যমান অহমবোধকে এটি অঙ্কুরেই বিনাশ করার একটি প্রক্রিয়া হয়েও কাজ করে। মন থেকে সকল প্রকার অহমবোধকে উচ্ছেদ করার সূচনা সূচীত হয় এখান থেকে এবং বিষয়টিকে প্রতিক্ষণে বিশ্বাসী তথা মানুষকে এটি স্মরণও করিয়ে দেয়। জগতের সকল মানুষের সকল কর্মের কৃতিত্ব এর মাধ্যমে আল্লাহতে পতিত হয়। এটিই 'সমর্পন'। সমর্পনই সকল মানুষের জন্য একমাত্র যথাযথ, গ্রহণযোগ্য ও মনোনীত 'ধর্ম'। আল্লাহতে সমর্পনই ইসলাম ধর্মের নির্দেশনা। যে কথা সকল ধর্মেই বলা হয়েছে। এটিই সনাতন বা চিরন্তন বা চিরসত্য ধর্ম। যেমন বলা হয়েছে,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

"সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ কর। কেবলমাত্র আমাতে সমর্পন কর।" (গীতা ১৮:৬৬)

সমাজ-সংসার ও জগতে শান্তি প্রতির্ষ্ঠায় ব্যাক্তিক ও গোষ্ঠীগত অহমবোধ দুরীকরণ প্রক্রিয়ার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মানুষের নিজের দাবী করা জাগতিক কৃতিত্ব অনেক অনর্থ সৃষ্টির কারণ। এটি পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। ভাল কাজকেও মানুষের কাছে নষ্ট ও অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাই সকল কিছু 'আল্লাহর নামে' পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যিনি সৃষ্টির রহস্য ও পরিণতি বোঝেন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেন যে, জগতের সকল কাজের সকল কৃতিত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর। সমগ্র কোরআনের

আলোচনায় বিষয়গুলির যৌক্তিকতা যথাযথ স্থানে উঠে আসবে। এমনকি সমগ্র গীতায়েও এই একই সুরে কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"ফলাসক্তি ও অহমবোধ পরিত্যাগ করে যে ব্রহ্মে সমর্পন করে সমুদয় কর্ম করে পাপ তাকে স্পর্শ করে না; যেমন পদ্মপাতাকে জল স্পর্শ করে না।" (গীতা ৫:১০)

"তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কর ভগবানের তুষ্টির কথা বিবেচনা করে এবং সে অর্থেই কর্ম কর আসক্তিরহিত হয়ে।" (গীতা ৩:৯)

ওপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি এই একই কথা প্রকাশ করে। যা কোরআনে 'আল্লাহর নামে' কথাটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তার্কিকগণ যত তর্কই করুন না কেন কথাগুলির মর্ম অর্থ একই।

আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কে আমাকে সৃষ্টি করেছে? কে সৃষ্টি করেছে এ জীবন ও জগত? বিচার-বিশ্লেষণ শেষে ধ্যানমগ্ন ও চিন্তাশীল অন্তর সর্বপ্রথম এ জ্ঞানে উপনীত হতে পেরেছে যে পেছনে কেউ একজন আছেন। তিনিই সবকিছুর কেন্দ্রে উপস্থিত। অন্তর এ জ্ঞানে তুষ্ট হয়ে একজনের উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর আরও বিচার-বিশ্লেষণ শেষে ও বাস্তব জীবনেও এর প্রয়োজন উপলব্ধি করে দৃঢ় চিত্তে এ সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করে নিয়েছে যে কেউ একজন আছেন। তিনিই আল্লাহ! তাঁকেই আল্লাহ, ভগবান, গড, ঈশ্বর, প্রভূ, লালন-পালনকর্তা, বিধাতা বা বিভিন্নভাবে বা নামে অভিহিত করা হয়। যাকে কেউ আমরা চিনি না, জানি না। তাঁর কাছেই সব সমর্পিত। তাই জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সকল কাজই 'আল্লাহর নামে' পরিচালিত হয়। এটি জ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত অন্ধত্ব নয়।

খ) আল্লাহ (Allah): পূর্বের আলোচনায় মূলত কেন আল্লাহর নাম নিয়ে কাজের সূচনা করা হয়, হয়েছে বা হবে বা এর প্রয়োজনীয়তা বা যথার্থতা কি ও কেন- সে বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যার ওপরে ভরসা রাখার কথা বলা হচ্ছে সেই 'আল্লাহ' কে বা কি? আমরা কি তাঁকে সঠিকভাবে চিনি-জানি বা বুঝতে পারি? দু'টি কারণে এ বিষয়ের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: মানব মনের আকুঁতি। অর্থাৎ মানুষ জানতে চায় যে কে এই জীবন ও জগত সৃষ্টি করেছেন; কেন সৃষ্টি করেছেন বা কিভাবে এতকিছুর উৎপত্তি হল? যদি কোন স্রষ্টা থেকে থাকেন তবে কি তাঁর রূপ- ইত্যাদি নানান বিষয়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহকে ঘিরে যে দর্শন তার সফলতার জন্য আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন অত্যাবশ্যক; কিন্তু সঠিক জ্ঞান ভিন্ন বিশ্বাস আনা সম্ভব নয়। তাই 'আল্লাহ' কে বা কি এ বিষয়ে একটি ধারণা তুলে ধরা আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়।

আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণার একটি সঠিক অনুধাবন অবশ্যই প্রয়োজন। বিষয়টি মানব মনের একটি আকুঁতি সে কারণে যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ; যে বিশ্বাসের ওপরই সমগ্র দর্শনের সফলতা নির্ভর করে। নিচে আল্লাহর ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার একটি সূত্রপাত করা হল মাত্র।

চিন্তা, ভাবনা এবং ধ্যান ও জ্ঞানের জাগতিক সকল হিসেব নিকেশ সম্পন্ন করে পরিশেষে যিনি আল্লাহতে এসে তরী ভিড়িয়েছেন জ্ঞানত তিনি আল্লাহ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করেছেন বা বলা যায় যে ধারণায় উপনীত হয়েছেন। সে কারণেই তিনি এখানে এসে তরী ভিড়িয়েছেন এবং সকলকে সে ধারণায় বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কিন্তু আল্লাহ কে বা কি সাধারণ মানুষ কি তা জানে বা বোঝে? তারা কেবল জানে আল্লাহ আছেন এবং সেটি বিশ্বাস করে। কিন্তু কি বিশ্বাস করে নিজেরাও জানে না। সত্যি বলতে 'আল্লাহ' শব্দটি সকলে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও কল্পনা বা ধারণায় আল্লাহ সম্পর্কিত কোন প্রতিচ্ছবি, মনোচ্ছবি, ধারণা, কল্পনা বা জ্ঞান সকলের এক নয়। এ সম্পর্কিত ধারণা মানুষে মানুষে পার্থক্যপূর্ণ এবং এটি হওয়াও স্বাভাবিক। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। সে গবেষনায় যাব না।

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষ একটা জায়গায় এসে থমকে দাড়ায়। কোন কারণ খুঁজে পায় না। সবকিছুর কারণস্বরূপ তখন কিছু একটার অস্তিত্বকে ধরে নেয়। সেখানেই আল্লাহর বিদ্যমানতা। বিষয়গুলি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর অবস্থানটি তাই সর্বকালের জন্যই একটি সর্বশেষ অবস্থান। অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ সম্পর্কে কখনও আরও উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করে, তথাপি এ ধারণা প্রসূত অবস্থানটি সুদুরেই থেকে যাবে। কেননা সে পর্যায়ে গিয়েও মানুষ দেখবে যে এখনও অনেক কিছু অজানা! অর্থাৎ একইভাবে একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করতে থাকবে। অন্তত বর্তমান অভিজ্ঞতা তাই বলে।

নতুন নতুন ধারণার সৃষ্টি হবে, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কিত আহরিত জ্ঞান হয়তবা কখনই শেষ হবে না। তাই বলা হয় তিনি থাকেন অনেক পর্দার অন্তরালে। বস্তুত তিনি জ্ঞানের পর্দার অন্তরালে থাকেন। মানুষ যতই অগ্রসর হবে ততই নতুন পর্দার আবির্ভাব হতে থাকবে এবং বিদ্যমান জ্ঞান থেকে আল্লাহর ধারণার সর্বশেষ দুরত্ব সর্বদা সমান বা একই থেকে যাবে। কখনই ফলাফল বের করা সম্ভব হবে না। তাই এ কথা বলা যেতে পারে যে এটি একটি শাশ্বত বা চিরন্তন অবস্থান। চিরকালের জন্য একই রকম- অধরা; ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যেমন বলা হয়েছে,

"কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন ... কোন পর্দার অন্তরাল ... ব্যাতিত ...।" (আল-কোরআন ৪২:৫১)

"আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকি। সকলের নিকট প্রকাশিত নই।" (গীতা ৭:২৫)

জ্ঞানের প্রতিটি 'সর্বশেষ' অবস্থানে এসে একটা কোথাও ভিড়তে পারা তাই জ্ঞানসম্মত। এটি বুদ্ধিমত্তারও পরিচায়ক এবং নিরাপদ। সে অবস্থানটিই হচ্ছে 'আল্লাহ'। যাকে প্রতীকীস্বরূপ 'কুরসী' বা 'আসন' তথা একটি অবস্থান দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়েছে (আল-কোরআন ২:২৫৫)। কারও কাছে তিনি ভগবান, ঈশ্বর বা গড নামে পরিচিত। যিনি সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা এমনকি সংহার বা প্রলয়েরও কারণ। তিনিই সকল কারণের কারণ। যেমন বলা হয়েছে,

"জেন যে ... আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।" (গীতা ৭:৬)

আল্লাহ কে বা কি এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কারও জানা নেই। কারও পক্ষে সেটি জানা সম্ভবও নয়। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে অদ্যাবধি প্রাপ্ত সকল জ্ঞানের পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। মানুষ আজও এ প্রশ্নের নিশ্চিত কোন উত্তর খুঁজে পায়নি। হয়তবা পাওয়া সম্ভবও নয়। ধর্ম গ্রন্থসমুহেও এ বিষয়ে তেমন বার্তা দেয়া আছে। বলা হচ্ছে,

“দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহকে ধারণা-কল্পনা করতে সক্ষম নয়, অথচ তিনি সকল ধারণা-কল্পনাকে জানেন।” (আল-কোরআন ৬:১০৩)

“... তিনি বস্তুগত চেতনা বা জ্ঞানের গোচরীভূত নন ...।” (গীতা ১৩:১৬)

যুগে যুগে মানুষ মনের মধ্যে উঁকি দেয়া নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মানব মনের আকুঁতি। সেভাবেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাইতো মানব জীবনে সচলতা আছে; আছে জীবন, আছে প্রাণবন্ততা। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ তেমনটি করে আসছে। অথচ উত্তর খুঁজে পায়নি।

শুরুতে এ একটি কাজ করতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে। যার শুরু অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স দিয়ে। বিধাতাকে জানা ও বোঝার চেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। ধরণ পাল্টেছে বা উন্নত হয়েছে; কিন্তু কোনদিন শেষ হবে না।

মানবজাতি জীবন ও জগত নিয়ে যত সন্ধান, অনুসন্ধান বা গবেষনা করে থাকে বস্তুত তা তাঁকে ঘিরেই করে। একটু একটু করে তাঁকেই জানার চেষ্টা করে। একই সাথে নিজেকেও চেনে, জানে ও বোঝে। যুগে যুগে নতুন মানুষের আবির্ভাব হবে; প্রত্যেক নতুনের মাঝে প্রশ্নের উদয় হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার উদ্ভব হতে থাকবে। আল্লাহ কে বা কি হয়তবা কোনদিনই জানা সম্ভব হবে না। নিজেকে জানার চেষ্টা অব্যাহত থেকেই যাবে।

‘আল্লাহ’ এমন একটি ধারণা যেটি একবারে বা একবাক্যে বলে দেয়া বা প্রকাশ করা সম্ভব না। আবার যারা তাদের অনুধাবিত সত্য প্রকাশ করতে চাইবে তাদের পক্ষেও বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কেননা এ বিষয়ে সম্ভাব্য নানাবিধ ধারণা মানব মস্তিষ্কে কাজ করে। অথচ এর কোনটির বিষয়েই কেউ নিশ্চিত জানে না। আবার সব ধারণাও সত্য হতে

পারে। তথাপি এ সবকিছুর সমন্বয় কোথায় কিভাবে হয় সে বিষয়েও কেউ নিশ্চিত জানে না। এসব জ্ঞান অনুভবে অনুধাবন করা গেলেও ব্যাখ্যা করা কঠিন।

অপরদিকে সৃষ্টিতে মানবের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও এর একটি বড় কারণ হতে পারে। যেমন কোন সৃষ্টিকর্তা কম্পিউটারের ধারণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিলে সে কম্পিউটারের পক্ষে তার সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব না। যিনি সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনি চাইলে বা অনুমোদন করে দিলেই সেটি সম্ভব। অতএব স্রষ্টার চাওয়া বা ইচ্ছে এ বিষয়ে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে ... নিজের দিকে আসার জন্য সরল পথ প্রদর্শন করবেন।" (আল-কোরআন ৪:১৭৫)

"যারা সর্বদাই আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে তাদেরকে আমি বুদ্ধি-জ্ঞান দান করি যেন তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" (গীতা ১০:১০)

সত্য হচ্ছে, 'আল্লাহ' বিষয়টি আজও মানুষের অজানা। মানুষের জন্য বিষয়টি একটি 'এক্স' ধরে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। যারাই তাকে সন্ধান করে- তারা 'এক্স' 'ওয়াই' ইত্যাদি ধরে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই 'এক্স' 'ওয়াই' এর সন্ধানের ক্ষেত্রে কোরআন একটি দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। তাঁকে জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করার জন্য তাই গবেষনা, পর্যবেক্ষণ, অধ্যায়ন, অধ্যাবসায় এক কথায় মুক্তভাবে জ্ঞানের চর্চ্চা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই।

বিকাশমান মানব জ্ঞানের বর্তমান সর্বশেষ প্রান্তে আল্লাহর উপস্থিতি। সকল জ্ঞান যে এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে সমাধিস্ত হয়েছে এটি সেই বিন্দু। যেখানে কারণের সকল বিশ্লেষণ শেষে পুনঃ বিশ্লেষণ ব্যাতিতই ধরে নেয়া হয়েছে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে যে আল্লাহ সকল কারণের কারণ। তিনিই সব কিছুর পরিচালনাকারী।

মানব জ্ঞান যেখানে রুদ্ধ সেখানে আল্লাহর অবস্থান। এটি একটি ধারণাগত অবস্থান। যেহেতু এ বিষয়ে মানুষের সুনির্দিষ্ট কোন জ্ঞান নেই তাই এটি নিরাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটিকে সঙ্গায়িত করা হলে কিংবা কোন রূপদান করা হলে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এমনকি তাঁকে ছোটও করা হয়। কেননা তাঁর বিশালত্ব ও মহাত্ম বিষয়ে মানবের প্রকৃত কোন ধারণাই নেই। তাঁকে কোন আকার-আকৃতি প্রদান করা হলে ভূল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহর বিষয়ে মনগড়া ভূল ধারণা করা যথাযথ নয়। এটি হতে হবে শাশ্বত। তাই এ বিষয়ে ধারণাটি হতে হবে নমনীয়। নিরাকারের ধারণা নমনীয়তার সে শর্ত পুরন করে। বলা হচ্ছে,

"যারা ... আমার ... নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার স্বরূপকে উপাসনা করে তারা অবশেষে আমাকে লাভ করে।" (গীতা ১২:৩-৪)

নিরাকার একটি নমনীয় ধারণা। তাই এটি শাশ্বত। কেননা এটিকে যে কোনভাবে ভাবা যেতে পারে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে এটি তাল রেখে চলতে পারে। এখন আর মানুষ চন্দ্র, সূর্য্য বা তারা কিংবা বটগাছকে উপাসনা করতে চাইবে না। অথচ একসময় এগুলিও মহাকর্মযজ্ঞ ছিল। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত সেসব ধারণা শাশ্বত হতে পারেনি। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ধারণাটিকে নিরাকার রাখা জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত।

আল্লাহ! যিনি মহিমান্বিত! তাঁকে কোন সঙ্গায় সঙ্গায়িত করা সমীচীন নয়। তাতে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা হয়। ছোট করা হয়। তিনি বিরাজ করেন মানুষের ধারণায়। সে ধারণাও আবার একেক জনের কাছে একেক রকম। একই ধর্মের অনুসারীদের কল্পনার জগতেও তিনি সকলের ধারণায় একই রকম নন।

অজানা-অচেনা, শ্বাপদ-সংকুল ও অনিশ্চিত এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের ধারণায় সর্বশেষ ও একমাত্র সহায় বা অবলম্বন। তিনি বিরাজ করেন সর্বত্র; বাহিরে কল্পনায় উর্ধ্বাকাশে এবং ভেতরে অন্তরে বা হৃদয়ের অনুভবে। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ...।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

"... প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমেশ্বর উপস্থিত...।" (গীতা ১৮:৬১)

আল্লাহকে জানা ও বোঝা সহজ কাজ নয়। তাঁকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। তাঁকে দেখা যায় না, কল্পনায় আনা যায় না। তবে তাঁকে হৃদয়ে অনুভবে পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যখন তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জাগরুক পাওয়া যায়, তখন মানুষ নিজেই তাঁর রূপের তথা গুণের পরশে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহর স্মরণ বিপদে ও শংকায় ভেতরে মনবল ও সাহস সঞ্চার করে। হতাশায় আশার আলো দেখায়। মানুষকে উজ্জীবিত করে, অনুপ্রেরণা দেয়। চিন্তা-চেতনায় দৃঢ়তাকে ধরে রাখতে সহায়তা করে। তাঁর ভাবনা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। ধীরে ধীরে তাঁর পথে গমনে সহায়তা করে। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জগতে আর কেউ নেই, কিছু নেই। তবে এটি এমন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা যে আলোচনা এখানেই শেষ নয়।

আল্লাহ জীবন্ত! সর্বসত্তার ধারক! তাঁর কারণেই অপরাপর সকল কিছু জীবন্ত ও প্রাণবন্ত! তিনি ব্যাতিত কারও কোন অস্তিত্ব কিংবা আশ্রয়ও নেই। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ! .. তিনি জীবন্ত। শাশ্বত/চিরঞ্জীব। সর্বসত্ত্বার ধারক।" (আল-কোরআন ৩:২)

"আমার জীবরূপ ভিন্ন এক পরম প্রকৃতি আছে বলে জানবে। যার দ্বারা এ জগত ধৃত আছে। .. সূতোয় যেমন মুক্তো গাঁথা থাকে তেমনি সবকিছু আমাতে গ্রথিত।" (গীতা ৭:৫-৭)

আল্লাহ সম্পর্কে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তিনি জীবন্ত! সকল কিছুকে ধারণ করে আছেন। তিনি ব্যাতিত কারও কোন আশ্রয় নেই। তাঁকে আশ্রয় করেই বিশ্বজগত ও সকলকিছু টিকে আছে। বলা হচ্ছে,

"আমি ভিন্ন সচল-অচল কোন কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই।" (গীতা ১০:৩৯)

গ) পরম করুণাময়, দয়াময় (The Beneficent, The Merciful): আল্লাহ কে বা কি ইতিপূর্বে আলোচনায় সে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি

উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে স্বচ্ছ বা পরিস্কার কোন ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়নি এবং সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

আল্লাহর ধারণায় মানুষ সবচাইতে বেশী যেটি ব্যাবহার করে থাকে সেটি হচ্ছে 'বিশেষণ'। আল্লাহর ধারণায় কেবল বিশেষণ ব্যাবহারের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু তিনি কে বা কি এ বিষয়ে কেউ কোন স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে না। কেননা সত্যিকার অর্থে এ বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। কেবল জানে তিনি মহান, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি। যদিও গীতায় এ বিষয়ে আরও অগ্রসর কিছু ধারণা দেয়া হয়েছে। চাইলে কেউ নিজ ইচ্ছায় গীতা পাঠ করে বিষয়গুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করতে পারেন।

আল্লাহ কে বা কি আলোচ্য আয়াতের এ অংশেও ঠিক তেমনই একটি উত্তর খুঁজে পাওয়ার সূত্র ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। যাকে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার একটি উপায় বা পথ হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। বলা হচ্ছে- তিনি করুণাময়, দয়াময়। সেই একই বিশেষণ! অর্থাৎ তাঁর গুণাগুণসমুহ!

আল্লাহ সম্পর্কিত এমন ধারণা থেকে প্রকৃতপক্ষে আমরা কি বুঝতে পরি? বুঝতে পারি যে তাঁর কিছু গুণ আছে। তিনি 'করুণাময়' এবং তিনি 'দয়াময়'।

আল্লাহর ধারণায় বস্তুত আমরা এমনিভাবে কিছু গুণাগুণের অস্তিত্ব দেখতে পাই বা খুঁজে পাই। ধারণাগতভাবে আল্লাহ মূলত কতগুলি গুণ, শক্তি, ভাব বা সক্ষমতার আধার বা ধারক। যেমন তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজান্তা, সর্বশ্রোতা, ক্ষমাশীল, করুণাময়, দয়াময় ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি সকল গুণের আধার। সীমাহীন সক্ষমতা তাঁর! যেমন বলা হয়েছে,

"বুদ্ধি, জ্ঞান .. ক্ষমাশীলতা, সত্যবাদীতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রন, সুখ-দুঃখ, .. ভয়-অভয়, অহিংসা, সমভাবাপন্নতা, সন্তুষ্টি, .. সন্মান-অসন্মান জীবের এইসকল নানা প্রকারের ভাব আমার থেকেই উৎপত্তি।" (গীতা ১০:৪-৫)

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই গুণসকলই সত্যিকার অর্থে বিবিধ প্রকারের কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে শক্তি বা 'সক্ষমতার মৌল একক' হয়ে কাজ করে। আল্লাহকে বুঝতে বা প্রকাশ করতে হলে তাই তাঁর গুণাগুণসমুহের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

তিনি করুণাময়-দয়াময়। আবার একইসাথে তিনি বিনাশকারী ও অত্যন্ত কঠোর শস্তিদাতা। তাঁর রুদ্ররোষ যার ওপর পতিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর মাঝে বিপরীতমুখী গুণের উপস্থিতি। বিপরীতমুখী হলেও তাঁর সকল গুণ জীব ও জগতের কল্যাণার্থে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের জন্য। জগতে ভারসাম্য রক্ষা তথা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ফলে তার সকল গুণই দয়া ও করুণা দ্বারা আবৃত। আল্লাহ বলেন,

"... আমার দয়া সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রাখে।" (আল-কোরআন ৭:১৫৬)

"আমাকে সকল জীবের সুহৃদ জেনে ভক্তরা শান্তি লাভ করে।" (গীতা ৫:২৯)

তাঁর সকল নামই কল্যাণার্থের দিক থেকে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রতিটি ধর্মের মানুষ, প্রতিটি ভাষাভাষি মানুষ তাঁকে তাই সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি ধরেই ডাকে। সকল গুণের ক্ষেত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর ওপরে আর কিছু নেই বা হতে পারে না। তাই বলা হয়েছে,

"... আল্লাহর নিকট ক্রন্দন কর কিংবা দয়াময়ের নিকট ক্রন্দন কর, যার কাছেই তুমি ক্রন্দন কর না কেন (অর্থাৎ যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি) বস্তুত সব একই। তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর (সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর উর্ধ্বে আর কিছু নেই)।" (আল-কোরআন ১৭:১১০)

তাঁর নামসমূহ তাঁর গুণাগুণ বা সক্ষমতারই প্রকাশ। যা কিঞ্চিৎ পরিমানে সম্মিলিত মানবের মাঝেও বিদ্যমান। বস্তুত তার সকল গুণ বা সক্ষমতার কোথাও না কোথাও একটি প্রকাশ আছে। তাই আমরা তাঁর গুণগুলিকে জানতে ও বুঝতে পারি। অন্যথায় উপলব্ধি করতে পারতাম না। সকল গুণের নামের সমারোহ কেবল তাঁরই মাঝে। সেখান থেকে গুণগত সকল শক্তি ও সক্ষমতা জগতময় বিস্তৃত হয়েছে।

কোরআন থেকে আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে জানা যায়। নামগুলি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ। গীতায়েও তেমনি প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে তাঁর নামটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে! আমরা কেবল কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম জানি।

বস্তুত তাঁর নাম বা গুণ সীমাহীন। সব আমাদের জানা নেই। আমাদের অগোচরে হয়তবা আরও গুণ আছে। এমনকি আমরা যেগুলি জানি সেগুলিকেও বিশ্লেষণ করলে আরও গুণাগুণ বেরিয়ে আসবে।

বস্তুত সমগ্র বিশ্ব জগতে যা কিছু সম্ভব হয়েছে, হচ্ছে বা হয় তার প্রতিটির ক্ষেত্রে তাঁর কোন না কোন নামের তথা গুণের সংস্পর্শ আছে! এই নাম বা গুণগুলিই সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনের বা এককথায় সকল 'সক্ষমতার একক' বলা যেতে পারে। নিচে গীতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল,

"(অর্জুন বলেন:) .. তোমার মহাশক্তি ও গরিমা সম্পর্কে আমাকে আরও বিস্তৃতভাবে বল; তোমার অমৃতময় বাণী শ্রবণে আমি কখনই ক্লান্ত হই না।

(শ্রীকৃষ্ণ বলেন:) .. নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে আমার ঐশ্বর্য্যশীল স্বরূপ সম্পর্কে বলব তবে শুধুমাত্র সেগুলি যেগুলি প্রসিদ্ধ, কেননা আমার ঐশ্বর্য্য অন্তহীন। .. আমিই সকল সৃষ্টির হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা ..।

.. আলোতে আমি রশ্মিময় সূর্য্য, .. তারকাদের মধ্যে আমি চন্দ্র। .. সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সকল জীবসত্বায় আমি জীবনের গতি- জ্ঞান, চেতনা। .. সমস্ত পর্বতের মধ্যে আমি সুমেরু। .. জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র। .. সমস্ত স্থাবর বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয়। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি পবিত্র বৃক্ষ অশ্বত্থ ..। .. মনুষ্যের মধ্যে আমি শাসনকর্তা। অস্ত্রের মধ্যে আমি 'বজ্র', ..। .. দন্ড-দাতাদের মধ্যে আমি মৃত্যু দেবতা 'যম'। .. বশকারীদের মধ্যে আমি কাল বা সময়; পশুদের মধ্যে আমি 'সিংহ' ..। পবিত্রকারকে আমি বায়ু; .. মৎস্যকুলে আমি 'হাঙ্গর' এবং প্রবাহিত নদে আমি 'গঙ্গা'।

.. সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য। সমস্ত বিদ্যায় বা বিজ্ঞানে আমি 'আধ্যাত্ম্য বিদ্যা' বা আধ্যাত্ম্য বিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদদের যুক্তির মধ্যে আমি 'উপসংহারিক সত্য' বা সিদ্ধান্ত। .. আমিই মহাকাল এবং স্রষ্টার মধ্যে আমি 'ব্রহ্মা', সর্বদ্রষ্টা।

সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভবিতব্য সকল কর্মের স্রষ্টা আমি, নারীদের মধ্যে আমি 'খ্যাতি, ভাগ্য, বাকশক্তি, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য।'.. ঋতুর মধ্যে আমি পুষ্প শোভিত 'বসন্ত'। প্রতারণার খেলাও আমি

এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি 'তেজ'। আমি বিজয়, আমি উদ্যাম এবং শক্তিশালীর মধ্যে আমি শক্তি।

...

শাস্তির মধ্যে আমি শাস্তিদাতা 'লৌহ' এবং বিজয় প্রত্যাশীদের মধ্যে আমি 'নৈতিকতা'। গোপনীয়তায় আমি 'নিরবতা, মৌনতা' এবং জ্ঞানীদের মধ্যে আমি 'জ্ঞান'। .. সকল জীবসত্ত্বা বা বিদ্যমানের মধ্যে আমি সৃষ্টিগত বীজ। কোন সচল ও অচল সত্ত্বা নেই যা আমি ভিন্ন বিদ্যমান থাকতে পারে।

.. আমার স্বর্গীয় প্রকাশমানতার কোন শেষ নেই। যা আমি তোমাকে বলেছি তা আমার সীমাহীন প্রাচুর্য্যতার কিছু নির্দেশক মাত্র। জেন যে- সকল সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালী এবং মহাসৃষ্টি উদ্ভূত হয় আমার স্বর্গীয় দ্যুতির একটুখানি পরশ থেকে। .. জেনে রাখ যে- আমার কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সহায়তা দিয়ে যাই।" (গীতা ১০:১৮-৪২)

প্রতিটি কর্ম বা গুণের ক্ষেত্রে যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিদ্যমানতা। বস্তুত প্রতিটি সমসাময়িক কালের মানুষের বোঝার সুবিধার্থে, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে একই বক্তব্য বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

যেসব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বা ধারণা আছে বা মানুষ যা স্বচক্ষে দেখতে পায় তেমন উদাহরণ তুলে ধরে বিষয়গুলিকে প্রকাশ করা হলে সব ধরণের মানুষের জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। গীতায় তাই উপমা তুলে ধরে বিষয়গুলিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিংহের শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষ অবগত বা এ বিষয়ে মানুষের ধারণা আছে। হিমালয় সম্পর্কে ধারণা আছে। তাই এভাবে উপমা দ্বারা উপস্থাপন করায় সকলের জন্য তাঁর মহাশক্তি সম্পর্কে বুঝতে বা ধারণা পেতে সুবিধা হয়েছে। অথচ না দেখা কোন বিষয়ের শক্তি যেমন মহাকর্ষ সম্পর্কে যদি বলা হত তবে সে যুগে সকলের পক্ষে সবকিছু অনুমান করে নেয়া সহজ বা সম্ভব হত না।

সব রকম মানুষের বোঝার সুবিধার্থে যুগের সাথে তাল রেখে এমন উপস্থাপনা। বিষয়গুলিকে তাই কেবল শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে এসবের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বস্তুত বিধাতার সকল গুণ বা সক্ষমতার কোথাও না কোথাও একটি প্রকাশ আছে। উপমা তুলে ধরে তার প্রকাশিত নানাবিধ গুণ সম্পর্কে গীতায় ধারণা দেয়া হযেছে। যদিও এগুলিই শেষ নয়। কেননা বিধাতার সবকিছুই অন্তহীন।

ওপরের আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহকে জানতে, বুঝতে ও তাঁর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে– তার গুণাগুণসমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে। স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, গুণ হচ্ছে কোন একটি বিষয়ের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু প্রতিটি গুণ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলিকে বিশ্লেষন করলে অনেক সত্য তথা সূত্র বের হয়ে আসবে (সত্য কি? এ বিষয়ে লেখকের 'সত্য' বই দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে, 'পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহ'! 'পরম' অর্থাৎ সর্বশেষ বা চরম পর্যায়। যার ওপরে আর হয় না বা হতে পারে না। অতএব তাঁর করুনা ও দয়া সর্বোচ্চ। কি পরিমাণ তাঁর দয়া? মানব জ্ঞানে সেটি ধারণা বা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

মহাবিশ্বের আপেক্ষিকতায় অতি ক্ষুদ্র বা আণুবিক্ষনীক পর্যায়েরও নয় তেমনই এক প্রাণী হচ্ছে মানুষ। সন্তানের প্রতি মানুষ যে পরিমাণ মমতা অনুভব করে যদি সেটিকে এ জগতে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ধরে নেই, তথাপি তার ক্ষুদ্রত্বের কারণে তার সে মমত্বের ধারণ ক্ষমতাও অতি অল্প। অথচ ব্যাক্তি যখন সন্তানের জন্য মমতা অনুভব করে তখন সেটি মহাসমুদ্রের ধারণ ক্ষমতার চেয়েও অধিক অনুভূত হয়।

মাতা যখন সন্তানের প্রতি ভালবাসা অনুভব করে তখন সেটি মহাসমুদ্রকেও ছাড়িয়ে যায়। অথচ মহাজাগতিক বিবেচনায় সে মহাসমুদ্রও কত ক্ষুদ্র! যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের সকল রহমতকে ধারণ করে আছেন, তাঁর সে ধারণকৃত রহমতের বিশালত্ব কত বড় হতে পারে সেটি এ আলোচনা থেকে কেবল অনুমান করার চেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র। মানবের কল্পনা বা ধারণা করার সক্ষমতার বাইরে সে অসীমত্ব।

আল্লাহ সম্পর্কে বা তাঁর গুণাগুণ সম্পর্কে কোরআন প্রদত্ত প্রথম ধারণাটিই হচ্ছে যে, তিনি করুণাময়, দয়াময়, মমতাময়। হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেই বোঝা সম্ভব যে সবকিছুকে ছাঁপিয়ে এ একটি গুণই মানুষকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে এবং মানবিক বিবেচনায় সবচেয়ে ওপরে অবস্থান করে।

বাস্তব জীবনেও নানান গুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও মানুষ মমতাময়ী মায়ের কাছে এসে নত হয়ে যায়। মাতা তাকে সকল দূর্যোগ সত্বেও আগলে রেখে পরম মমতায় লালন-পালন করেন। বোঝার সুবিধার্থে এটি কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। আল্লাহর এ একটি গুণই জগতের সকলকে তাঁর কাছে কোন একদিন নিয়ে আসতে সক্ষম। তাই বাস্তবতা ও জ্ঞান দুটো কারণেই সকল মানুষকে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে কোন একদিন তাঁর কাছে সেজদাবনত হতেই হবে।

'পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে' সূরার প্রারম্ভিক এ আয়াতটি মহাজগতে মানুষ একা নয় তেমন ধারণা দেয়। সবকিছুর পেছনে একজন আছেন বুঝতে সহায়তা করে। তিনি দয়াময়। ভূল-ভ্রান্তিতে জড়িয়ে যাওয়া সত্বেও সত্য অন্তরে যে আল্লাহর কাছে আসবে তিনি তার রক্ষাকারী; প্রচ্ছন্নে তেমন বার্তা দেয় এ আয়াত। মানুষকে আশাবাদী হতে এবং হতাশ না হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ বাণী মানুষের জন্য এক আশ্রয় এবং প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করে!

পরিবার থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপি প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন, যাদেরকে সবাই হাল হিসেবে ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু যারা নিজেরা কোন হাল খুঁজে পায় না, তাদের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ এক সহায় বা অবলম্বন। সর্বশেষ আশ্রয়। অন্তরের শক্তি ও সাহস ভিন্ন জগতে চলা সম্ভব নয়। বুকের ভেতরে সাহসের সঞ্চার করতে সক্ষম আল্লাহর ধারণা। জগতের সকল শক্তির উৎস হচ্ছেন প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাসজনিত 'আল্লাহ'। তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন তিনি 'একই'।

জীবন, জগত ও সমাজ নিয়ে ধ্যানমগ্ন চিন্তাশীল অন্তর চিন্তার শেষ প্রান্তে এসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত যে সৃষ্টির পেছনে একজন আছেন। তিনিই 'আল্লাহ'! তিনি ভিন্ন না এ জগত, না এ জীবন অস্তিত্বশীল। সবই তাঁর। তাতেই সব

বিলীন। অতএব যে জ্ঞানে এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা- সবই তাঁর এবং তাঁর নামেই উচ্চারিত ও উৎসর্গীকৃত হতে হবে। কিছুই মানুষের নিজের নয়। এ জীবন-জগত, ধ্যান-ধারণা আল্লাহতে সমর্পিত। এ চিন্তাধারা সমর্পনের জ্ঞান থেকে উৎসারিত। কিংবা বলা যায় যে, জ্ঞান এমন বোধ থেকে সমর্পনের পথে জ্ঞানী বা বোধসম্পন্ন মানুষকে চলতে বাধ্য করে।

একজন বোধসম্পন্ন মানুষ তাই তার সকল কাজ 'আল্লাহর নামে'ই শুরু করবেন। যিনি পরম করুণাময়, দয়াময়। মানুষ বিচার-বিশ্লেষণ করে পরিশেষে যা গ্রহণ করবে কোরআন বা ধর্মগ্রন্থসমুহ মানবজাতিকে সে পথ সিদ্ধান্তরুপে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে। মানুষের কাজ গ্রন্থের জ্ঞান যথাযথ জ্ঞানে অনুসরণ করা।

১	সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের অধিকর্তা [Praise be to Allah, Lord of the Worlds]

সূরার প্রথম আয়াতটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। ১.১.১) সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং ১.১.২) যিনি বিশ্ব জগতসমুহের অধিকর্তা।

- **১.১.১** সকল প্রশংসা আল্লাহর (Praise be to Allah): 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' কথাটি সরাসরি স্বীকার বা বিশ্বাস করে নিলে কোন সমস্যা থাকে না। তেমন মানুষের জন্য কোন আলোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে আত্মা গভীরে প্রবেশ করতে চায় তার জন্য অধিকতর আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বিশ্বাসের ভীতকে শক্ত করে গাঁথতে হলেও বিষয়ের গভীরে প্রবেশ প্রয়োজন। কেননা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পেছনে কারণ, বিচার-বিশ্লেষণ তো অবশ্যই আছে। হয়ত সকলের তা জানার প্রয়োজন নেই। জানবে কেবল অনুসন্ধানি মন।

কেন সকল প্রশংসা আল্লাহর বলা হল? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে- অল্লাহ মহান, তিনি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ব জগতসমুহের পরিচালনাকারী অতএব জগতের সকল প্রশংসাতো কেবলমাত্র তাঁরই প্রাপ্য হবে এটিই তো স্বাভাবিক। অর্থাৎ যিনি আল্লাহকে মেনে নেবেন তিনি এ কথাটিও মেনে নেবেন।

মেনে নেয়া ও বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উপলব্ধি করা এক নয়। বিষয়গুলি যারা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছেন তারা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং গভীরে প্রবেশ করেছেন। কি সেই জ্ঞান যা এ উপসংহারে মানুষকে উপনীত করেছে?

বিষয়গুলি জানতে ও বুঝতে হলে আল্লাহ কে বা কি এ বিষয়টি সম্পর্কে নিজের ভেতরে সর্বপ্রথম একটি সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' এ কথার মর্ম অর্থ বোঝা যাবে না। একই সাথে সৃষ্টির পেছনে তাঁর বিদ্যমানতাকে যৌক্তিকভাবে অন্তরকে বোঝাতে হবে। তা না হলেও এ কথার মর্ম অর্থ যথযথভাবে অনুধাবন করা যাবে না।

আল্লাহ কে বা কি এবং কেন- বিষয়গুলি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ধারণা ও বিশ্বাসে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। এমনকি একই ধর্মের অনুসারীদের কল্পনার জগতেও তিনি সকলের ধারণায় একই রকম নন।

আল্লাহ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়ার বিষয়টি সহজ নয়। অর্থাৎ তিনি কে, কি, কেমন, কি তাঁর রূপ ইত্যাদি। তবে তিনি জাগতিক সকল সক্ষমতাজনিত গুণের ধারক ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে সেটি বুঝতে পারি। তিনি তাঁর গুণে সৃষ্টি করেন, লালন-পালন করেন এমনকি সংহারও করেন। এবার আসি সে প্রসঙ্গে যে কারণে 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' বলা হল।

জগতে কত কত সৃষ্টি এবং বিষয় আছে! একটি একটি করে তার প্রতিটির আলোচনার মাধ্যমে বিধাতার মহাত্মকে বোঝা বা প্রকাশ করা কি সম্ভব, নাকি যথাযথ? ব্যাক্তি যে বিষয়ের মুখোমুখী হয় তার নিজেকেই সে বিষয়টির সাথে সৃষ্টিকর্তার মহাত্মের বিষয়টির সংযোগ সাধনের চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলিকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর মহাত্ম অনুধাবনে নিচে দু'টি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রথম উদাহরণ: আমরা জানি কৃষক কষ্ট করে ফসল ফলায়। তার জন্য কৃষকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এেকেকটি কারণে আমরা একেক জনের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

বস্তুত কৃষক কি ফসল ফলায়? কৃষক জমি চাষ করে, বীজ বপন করে, পরিচর্যা করে কিন্তু ফসল কেন ফলে? জমি চাষ করে বীজ বপন করলে ফসলকে ফলতে হবে কেন? তাহলে ফসল কি কৃষক ফলায়? কে ফলায়? বলা হচ্ছে,

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর না আমি উৎপন্নকারী?" (আল-কোরআন ৫৬:৬৩-৬৪)

"আমি একে (পৃথিবীকে/মৃত্তিকাকে) সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তারা সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। ... তারা তাদের হাতে এসব সৃষ্টি করে না। তারপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?" (আল-কোরআন ৩৬:৩৩,৩৫)

বীজ বপন করে কৃষককে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বস্তুত ভেতরে আরও ক্রিয়া আছে। কেউ দেখে না। কে করে সেসব কাজ? কিভাবে সেগুলি সম্পন্ন হয়? এক কথায় প্রকাশ করতে চাইলে বলে দেয়া যায় সব আল্লাহ করেন। কিন্তু যে এটি বলে সে নিজেও ভেতরের অনেক কিছুই জানে না। তাই পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জ্ঞান যেখানে অবরুদ্ধ সেখানেই আল্লাহর উপস্থিতি। বস্তুত আল্লাহ অনেক পরের বিষয়। ভেতরে আরও অনেক বা অনেকের ক্রিয়া আছে। সব দেখা যায় না। সব আজও আবিস্কৃত নয়।

বিজ্ঞানী হয়ত ভেতরের আরও কিছু ধাপের ক্রিয়াকে জেনে থাকবেন, ভবিষ্যতে আরও ধাপের ক্রিয়াকে জানাতে পারবেন। কিন্তু তার পরেও যে আরও অজানা থেকে যাবে না তাই বা বুঝি কি করে? ঠিক যেমন পৃথিবীর বয়স মিলিয়ন মিলিয়ন হয়েছে বিষয়টি জানা সত্বেও এর সৃষ্টি সম্পর্কে আজও নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায়নি।

বস্তুত কৃষক ফসল ফলায় না। সে ব্যাহ্যিক কাজগুলি করে মাত্র। অর্থাৎ ভেতরে অজানা অনেকের সম্পৃক্ততার মতো বাহিরে যতটুকু তার জন্য প্রযোজ্য সে ততটুকু করে। এমনকি যে বিজ্ঞানকে নিয়ে এত হৈ-চৈ সে বিজ্ঞানও কাজগুলি করে না। সে খুঁজে পায়। সে শেখে। অতঃপর কাজে লাগায়। বিজ্ঞানকে কে শেখায়? বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।

যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি সকল কাজের অটোমেশন বা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ধাপে ধাপে অজান্তে ভেতরে কাজগুলি ঘটতে থাকে। আমরা যতটুকু জানি ততটুকু করে দিলে সব আপনা আপনি হতে দেখি। তৈরী পেয়ে যাই। মানুষের প্রতিটি কর্মের ফল প্রাপ্তির পেছনে আরও বহু বহু কারণ রয়েছে। যার

সবকিছুর কারণ বিধাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। যিনি জীবের জন্য এত আয়োজন করে রেখেছেন প্রশংসা কি তাঁর প্রাপ্য নয়?

সত্য গোপন না করে, স্বীকার করে, উচ্চারণ করে, প্রকাশ ও প্রচার করে আল্লাহর মহাত্ম বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি মানুষের উচিৎ নয়? অতএব 'সকল প্রশংসা আল্লাহর' কথাটির পেছনের কারণসমুহ অনুধাবন করে সত্যকে স্বীকার করে নিতে হবে।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি একটি শিক্ষা। যে শিক্ষা বা চর্চা মানবের গুপ্ত চৌর্য্যবৃত্তির মনোবৃত্তিকেও পরিহার করার শিক্ষা দেয়। মিথ্যে আচরণ না করতে বলে। সত্যকে সত্য বলতে শেখায়। অর্থাৎ সত্যিকারভাবে যার যেটি প্রাপ্য তাকে সেটি দিতে বলে। চুরি করে অন্যের কৃতিত্ব নিজের বলে প্রচার বা চালিয়ে দিতে নিরুৎসাহিত করে। এতদ্বসত্বেও সত্য বলতে ইচ্ছে না হলে সকলের সকল কৃতিত্ব আল্লাহর সমীপে সমর্পন করতে বলে। অর্থাৎ 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। এটিই আল্লাহতে সমর্পন। তবুও মিথ্যে ও চৌর্য্যবৃত্তি থেকে দুরে থাকতে বলে এ জ্ঞান। হিংসে ও অহমবোধকে দুরে ঠেলে সকল প্রশংসা আল্লাহর এভাবে নিশ্চিত জ্ঞানে জেনে শান্তি লাভের পথ প্রদর্শন করে এ জ্ঞান। তাই বলা হয়েছে,

"অবিচল ভক্ত কর্মের ফল আমার কাছে সমর্পন করে অনাবিল শান্তি লাভ করে।" (গীতা ৫:১২)

দ্বিতীয় উদাহরণ: বাবা-মা সন্তান জন্ম দেন। মায়া-মমতা আর ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেন। মা-বাবা কি প্রকৃত অর্থে সন্তান জন্ম দেন? বলা হচ্ছে,

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা সেটি সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?" (আল-কোরআন ৫৬:৫৮-৫৯)

যিনি সকল কিছুর নির্ধারক তিনি তার ব্যবস্থাকে সেভাবে সৃষ্টি করে রেখেছেন। মানুষ সে পথে চলতে বাধ্য। মানুষকে আল্লাহর বাঁধানো ছকেই চলতে হয়। আল্লাহই তার চালক। জীবন চক্রের একটি পর্যায়ে মানুষ সন্তান জন্ম দেয়। মানুষ কি প্রকৃতই সন্তানের জন্ম দেয়? ওপরে উদ্ধৃত ফসল ফলনের মতো একই সূত্রে সকল কৃতিত্ব বস্তুত আল্লাহর।

অপরদিকে যে খাবার মানুষকে পুষ্টি দান করে সে একই খাবারে উপাদানসমুহের পরিমাণের হেরফের করে বিষাক্ত করে দেয়া যেতে পারে। সৃষ্টির সকল উপাদানের পরিমাণ যিনি নির্ধারণ করেন, তিনি জগতের সব ওলট-পালট করে দিতে পারেন রেসিপি বা পরিমাপের হের-ফের করে। তার নির্ধারণের ওপরই প্রাণীকুলে মায়া-মমতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা সব নির্ভর করে।

পরিমাণের হেরফের থেকে পরিবর্তীত মানসিক অবস্থা আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। যিনি মানব রসায়নের যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করার মধ্য দিয়ে মাতা-পিতাকে দিয়ে সন্তান লালন-পালন করান সকল প্রশংসা তাঁর নয় কি? তাঁর কারণেই মাতা-পিতাকে আমরা স্নেহময়ী-মমতাময়ী দেখতে পাই। তবে কি তিনিই সকল প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী নন? আল্লাহ বলেন,

“আমি সকল কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণে ও পরিমাপে।” (আল-কোরআন ৫৪:৪৯)

মাতা যখন সন্তানের প্রতি মমতা অনুভব করে সেটি মহাসমুদ্রকেও ছাড়িয়ে যায়। অথচ আমরা যাকে মমতাময়ী দেখি তাকে সেভাবে সৃজন করা হয়েছে। যিনি সৃজন করেছেন, যিনি লালন-পালনের সকল ব্যবস্থা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, যিনি সকল কারণের কারণ তিনিই কি সকল প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী নন?

এমনকি মাতা-পিতাও প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী নয়। তবে মাতা-পিতা অধিকারী এ জন্য যে বিধাতা সেটি নির্দেশ করেছেন। তার নির্ধারণই একটি নির্দেশকে প্রকাশ করে। রূঢ় অথচ সত্য এ কথাটিও বলতে হল চরম সকল রকম পর্যায়েও বিধাতাই সকল প্রশংসা প্রাপ্তির একমাত্র অধিকারী, বিষয়টিকে সকল ক্ষেত্রে উপলব্ধি করার সুবিধার জন্য। এমনিভাবে রূঢ় অথচ কঠিন হলেও সকল মহাসত্যের বিবেচনায় ‘সকল প্রশংসাই আল্লাহর’।

যিনি সমগ্র রহমত ধারণ করেন, তাঁর সে রহমতের বিশালত্ব কত বড় হতে পারে সেটি ক্ষুদ্র এ মানবের পক্ষে ধারণায়েও আনা সম্ভব না। সেখান থেকে তিনি তাঁর মমতা বিন্দু বিন্দু করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। তাতেই প্রাণীকুল ব্যাকুল হয়ে ওঠে আনন্দ-বেদনায়। মমতা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি সব লালন-পালন

করেন এবং করান। যদি তিনি তাঁর রোষ ছড়িয়ে দেন? তিনি করুণাময়, দয়াময়- প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি।

মানুষ তার সকল রকম প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া ছাড়া গতান্তর নেই। তিনি তাঁর সুবিবেচনা প্রসূত পরিমাণ নির্ধারণ করে সকল কিছু প্রেরণ করেন।

যদি মানুষ আল্লাহর বিদ্যমানতাকে ও মহাত্বকে বুঝতে পারে এবং স্বীকার করে তবেই কেবল সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে নচেৎ নয়। আবার বিষয়গুলি যে বুঝতে পারে অথচ আল্লাহ বা কোন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে না সে কার কাছে কৃতজ্ঞ হবে? এটি তাদের কাছে প্রশ্ন যারা সৃষ্টিকর্তার ধারণায় বিশ্বাসী নয়।

সকল সৃষ্টির পেছনে কোরআন আল্লাহর বিদ্যমানতাকে স্বীকার করার শিক্ষা দেয়। সব কিছুর কারণরূপে তাঁকেই বুঝতে শেখায়। এর পেছনে যৌক্তিক ভিত্তি আছে। জ্ঞান সম্মত বিচার-বিশ্লেষণ আছে। যা ওপরে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মানবজাতির প্রতি প্রশ্ন রেখে বলা হয়েছে,

"তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাত্বকে কামনা করছ না, যখন তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে ও বিভিন্ন ধাপে ধাপে?" (আল-কোরআন ৭১:১৩-১৪)

গীতায় বলা হয়েছে, "... মহাত্মাগণ আমাকে সকল কিছুর 'কারণ' ভগবানরূপে জেনে অনন্যমনা হয়ে আমার ভজনা করে।" (গীতা ৯:১৩)

অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম থেকে শুরু করে বৃহৎ পর্যন্ত সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে সর্বদা এ একই উপসংহারে পৌঁছাতে হবে। সব কিছুর মূলে তিনি 'একজন'। কিন্তু সেই তিনি কে আমরা কেউই জানিনা। কেবল ধারণায় তাঁকে লালন করি। সকল প্রসংশা প্রাপ্তির অধিকারী শেষ বিচারে মূলত তিনি 'একজন'ই। এটি যুক্তি এবং জ্ঞানের কথা। যারা এ উপসংহারে পৌঁছাতে সক্ষম হবে- বলা হচ্ছে,

"... তাদের সকল প্রার্থনার নির্যাস হবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (যিনি) বিশ্ব জগতসমুহের প্রতিপালক!" (আল-কোরআন ১০:১০)

যারা 'আল্লাহ' শব্দটিতে বিশ্বাসী তাদের কাছে সকল প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী আল্লাহ। আল্লাহ কেবল একটি শব্দই নয়, এর পেছনে আছে বিশাল এক দর্শন। আছে অনেক রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও নানান কর্মকান্ড। যারা তাঁকে অন্য নামে ডাকে তারাও ঐ একই জনকে ইংগিত করে। কেননা স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণা কারও মাঝেই বিদ্যমান নেই।

যারা আল্লাহ, ভগবান, ইশ্বর, গড কোন কিছুতেই বিশ্বাসী না- এ বিষয়ে অর্থাৎ জগৎ ও সৃষ্টিজনিত 'সকল প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী' কে হবে তাদের সিদ্ধান্ত তারাই নির্ধারণ করবে। হতে পারে তাদের বিবেচনায় সেটি প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির নিয়ন্তা কে সেটিও একটি প্রশ্ন? প্রকৃতি যে আল্লাহ, ভগবান, গডের অংশ বা প্রকৃতি নয় তাই বা বলি কি করে? তিনি নিজেই এ প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন বিষয়টি এমনও হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"আমার অব্যাক্ত রূপে আমার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিবেষ্টিত। সকল জীব আমার মধ্যে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নই।" (গীতা ৯:৪)

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

যারা কোন কিছুতেই বিশ্বাসী নয় হয়তবা তারা কাউকেই সে প্রশংসা দেয়ার বিষয়টি আদৌ ভাববারও প্রয়োজন বোধ করে না- বিষয়টি তেমনও হতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে সেটি হবে অকৃজ্ঞতা।

বিধাতাকে আমরা যথাযথভাবে জানি কিংবা না জানি- এটি তো সত্য এবং জানি যে, এ ধরায় আমরা অনেক কিছুই ভোগ-উপভোগ করে চলেছি যার নিয়ন্ত্রক আমরা নিজেরা নই! এমনকি আমাদের সৃষ্টি ও জীবনও আমাদের নিজেদের ইচ্ছে ও নিয়ন্ত্রানাধীন নয়। কোথা থেকে আসছে সব? কে সরবরাহ করছে এত কিছু? কে পরিচালনা করছে জীবন ও জগৎ? নিশ্চয়ই পেছনে কেউ বা কিছু একটা আছে। এ ভাবনাই যৌক্তিক।

আমরা তো পেছনের সেই অজানাকেই 'আল্লাহ' নামে জানি। কেউ জানে ভগবান নামে; কেউ ঈশ্বর, কেউ গড নামে তাঁকে অভিহিত করে। তাতে কি এসে যায় যখন এ বিষয়ে সত্যটি কারই জানা নেই?

একই পানিকেও তো আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে ডাকি। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? সেই তো একই H_2O। অতএব যৌক্তিক কারণেই তো একজন ‘এক্স’ কে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রনের কারণরূপে কৃতজ্ঞতা জানানই উচিৎ! তিনিই আল্লাহ। কারও কাছে ভগবান, ঈশ্বর, গড ইত্যাদি।

আল্লাহকে বা আল্লাহর ধারণাকে যারা গ্রহণ করে নিতে চায় না- হয়তবা তেমন মানুষদের অন্তর এভাবেও ভাবতে বা চাইতে পারে যে, ‘তারা নিজেরাই সকল প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী’ বা ‘প্রশংসা প্রাপ্তির প্রকৃত দাবীদার!’ সেটি জ্ঞানসম্মত হবে কি-না তাদেরকেই বিবেচনা করে দেখতে হবে। অতএব ‘সকল প্রশংসাই আল্লাহর’।

আয়াতের এ অংশটি নিজ অহমবোধ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহতে সমর্পনের শিক্ষা দেয়। নিজের বা নিজেদের নয়, সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা জগতসমুহের অধিকর্তা আল্লাহর সমীপে সমর্পন করার কথা বলে। বুঝতে সহায়তা করে যে মানবের সকল কর্মের মূল কারণ মূলত ‘একজনা’। এখানে কারই নিজের কোন কৃতিত্ব নেই। যা কিনা শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলসূত্র।

বস্তুত মানুষের দাবী করা নিজ কৃতিত্ব, মূল্য, মর্যাদা ও প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা জগতে অনেক অঘটন ঘটনের মূল কারণ। অহমবোধ এবং সে বোধ থেকে নানান কামনা-বাসনা এবং সে আকাংখা থেকে মানব জীবনে উদ্ভুত নোংরা প্রতিযোগীতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং পরিণতিস্বরূপ করা ভূল আচরণ জাগতিক সকল অশান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। আল্লাহতে সমর্পন ও অহমবোধের বিসর্জন তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। সমগ্র গীতায় সে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“ভগবানের জন্যই কেবল কর্ম; অন্যথায় কর্ম এ জগতে কেবল বন্ধনেরই কারণ।” (গীতা ৩:৯)

“নিষ্ঠাবান ব্যাক্তি কর্মের ফল ভগবানে সমর্পন করে অনাবিল শান্তি লাভ করে।” (গীতা ৫:১২)

▪ **১.১.২** যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের অধিকর্তা (Lord of the Worlds): আল্লাহর ধারণায় তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা, পরিচালনাকারী, সকল কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। সে কারণে যত বিশেষণ হতে পারে তিনি সকল বিশেষণ প্রাপ্তির একচ্ছত্র

অধিকারী। তাঁর সক্ষমতাকে সঙ্গায়িত করে সীমাবদ্ধ করা যায় না বা করা সমীচীনও নয়। সমস্ত গুণাবলী, শক্তি বা সক্ষমতার নামসমুহ একমাত্র তাঁরই। তিনিই সকলের লালন-পালনকর্তা। সকল কারণের কারণ। তিনিই হচ্ছেন জগতের মূল।

আল্লাহকে এখানে 'বিশ্ব-জগতসমুহের' অধিকর্তা বলা হয়েছে। 'বিশ্বজগত' না বলে 'বিশ্ব-জগতসমুহের' অধিকর্তা বলা হয়েছে কেন? বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই। কেননা এভাবে বলার কারণে অনেকগুলি বিশ্ব জগতের বিদ্যমানতার ধারণা পাওয়া যায়। যার অধিকর্তা স্বয়ং আল্লাহ!

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ব-জগতসমুহ বলতে এখানে কি বোঝান হয়েছে? পৃথিবীর মতো বসবাসযোগ্য এক একটি গ্রহই কি এক একটি 'বিশ্ব'? তবে কি যিনি সব বিশ্বকে ধারণ করে আছেন তাঁকে 'বিশ্ব-জগতসমুহের' অধিকর্তা না বলে 'বিশ্বজগতের' বা 'মহাবিশ্বের' অধিকর্তা বলা যেতে পারে না? যেখানে সব 'বিশ্ব' মিলে একটিমাত্র 'মহাবিশ্ব'। অর্থাৎ 'একক' একটিই। যা 'এক' এর ধারণাকে সমুন্নত করে। যেমন কোন একটি বিশেষ অণুর মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা যতই হোক না কেন অণু কিন্তু একটিই। বিষয়টিকে আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি।

'এক' সংখ্যাটি একটি 'একক'। 'দুই' এর মধ্যে 'এক' এর মতো দুইটি এককের উপস্থিতি আছে। এভাবে সংখ্যা যখন অধিক হয়ে যায় তখন 'হাজার'কেও আবার একটি 'একক' হিসেবে ধরে নিয়ে সামনে এগুতে হয়। তাই আমরা পরিমাপজনিত বিষয়ে অতি বৃহতের ক্ষেত্রে 'আলোকবর্ষ' দিয়েও কিছু বুঝিয়ে থাকি। এক আলোকবর্ষের মাঝেই রয়েছে সময়ের বহু একক। সব মিলিয়ে আলোকবর্ষ একাই একটি 'একক'।

আমাদের এ 'পৃথিবী'ই আমাদের বিশ্ব। একটি 'একক'। কিন্তু যখন আমরা পৃথিবীর মতো অনেকগুলি গ্রহ খুঁজে পাই তখন একটি 'সৌরজগত' একটি 'একক' হয়ে যায়। আবার অনেক সৌর জগতের প্রাপ্তিতে 'অনেকগুলি সৌরজগত'কে 'একক' ধরে নিয়ে হিসেব করতে হয়।

'একজন মানুষ' একটি 'একক'। একটি মানুষের ভেতরে আছে এক বিশাল জগৎ। সব মিলিয়েই মানুষ কিন্তু 'একজন'ই। অর্থাৎ মানুষই একটি 'একক'।

প্রত্যেকটি মানুষের ভেতরে আছে পৃথক পৃথক জগৎ। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আছে পার্থক্যপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। সব প্রাণী মিলিয়ে আবার কোন একটি 'একক'। আল্লাহ হচ্ছেন সর্বসত্বার ধারক। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ ... সর্বসত্বার ধারক।" (আল-কোরআন ৩:২)

"ভগবান ... সকল কিছুর ধারক।" (গীতা ১৩:১৫)

এমনিভাবে 'এক আল্লাহ'কে 'বিশ্ব-জগতসমুহের' অধিকর্তা না বলে এক 'বিশ্বজগতের' বা 'মহাবিশ্বের' অধিকর্তাও বলা যেতে পারে।

'বিশ্বজগত' ও 'বিশ্ব-জগতসমুহের' এ বিষয়টি নির্ভর করে ধারণায় বিশ্বের ব্যাপ্তিকে আমরা কিভাবে দেখছি তার ওপর। কিংবা যিনি সেটিকে প্রকাশ করছেন তিনি বিষয়টিকে কিভাবে প্রকাশ করছেন তার ওপর। যদি সব বিশ্বকে মিলিয়েই একটিমাত্র জগতকে বোঝান হয় তবে বিশ্ব কেবলমাত্র একটিও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আল্লাহকে 'বিশ্ব-জগতসমুহের' অধিকর্তা না বলে 'বিশ্বজগতের' বা 'মহাবিশ্বের' অধিকর্তাও বলা যেতে পারে।

এ বিষয়ের আলোচনা হয়তবা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে একটি ধারণা হিসেবে এখানে উপস্থাপন করে রেখে দেয়া হল।

সব বিশ্বকে বা জগতের সকল কিছুকে মিলিয়ে যদি একটিমাত্র বিশ্বকে বোঝান হয়ে থাকে তবে বিশ্ব কেবলমাত্র একটিও হতে পারে। বিষয়গুলি সবই নির্ভর করে ধারণায় বিশ্বের ব্যাপ্তিকে আমরা কিভাবে দেখছি তার ওপর। কিংবা যিনি বা যারা সেটিকে প্রকাশ করছেন তারা কিভাবে বিষয়টিকে প্রকাশ করছেন তার ওপর। সব কিছুর সমন্বয়ে বা সব মিলিয়েই 'আল্লাহ এক' এবং তিনিই সচল-অচল সকল কিছুর ধারক বা অধিকর্তা। একটিই 'একক'।

একজন চিন্তাশীল বা গবেষক কিংবা সন্ধানি মনের মানুষ এ বার্তা থেকে যে পথের সন্ধান পাবে, একজন অতি সাধারন মানুষ হয়তবা তা পাবে না। সাধারণ মানুষ কেবল শাব্দিক অর্থ বুঝবে। আবার সাধারণের সেটি ভাবনারও বিষয় নয়। তবে অবশ্যই এটি বিবেচনায় রাখতে হবে যে কোরআন কোন বিজ্ঞান বই নয়। এখানে সবকিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বিস্তারীত তুলে ধরা হয়নি। এটি একটি দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। এখানে কেবল দিক-নির্দেশনাপূর্ণ ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

'যিনি বিশ্ব জগতসমুহের অধিকর্তা' এ বিষয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধিক আলোচনা না করে বিজ্ঞান কি বলে বা ভবিষ্যতে কোন দিকে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এসব বিষয়ে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের দিক-নির্দেশনাই অনুসরণীয়। বিজ্ঞানই আল্লাহর মহাত্বকে জানা-বোঝা এবং যথাযথভাবে প্রচার ও প্রসার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে কাজ করে। বিজ্ঞানই তার প্রাপ্তি মানবসমাজে সবচাইতে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যরূপে প্রকাশ করে থাকে। এমনকি কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেও। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই এই কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমারই।" (আল-কোরআন ৭৫:১৯)

বিজ্ঞান বস্তুত সত্যের সন্ধান করে। সত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছেন চরম সত্য। তাই জ্ঞান-গবেষনার সকল কাজ বস্তুত এবাদতেরই অংশ। এবাদতের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি করি? আল্লাহর মহাত্ম বর্ণনা করি! তাঁর গুণগান করি!

মহাবিশ্ব সম্পর্কে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান যেসব কথা বলে গীতায় বহু পূর্বেই তেমন ধারণা দেয়া হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ) এর মেরাজ গমনের ঘটনায়েও তেমন ধারণা পাওয়া যায়! ধর্মগ্রন্থসমুহ সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানকেও পথ প্রদর্শন করে। এ সকল ধারণা বিজ্ঞানকে তাঁর সন্ধানে আশাবাদী করে তোলে ও প্রেরণা হয়েও কাজ করে। সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানকেই বর্তমানে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করে নিতে হবে। বিজ্ঞান যখন কোন বিষয়কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দান করে উপস্থাপন করে, ধর্ম গ্রন্থের বক্তব্যও বস্তুত তখনই গ্রহণযোগ্যতা পায়। যারা এখনও সে পথে আসেনি তাদেরকেও ধীরে ধীরে এ পথে আসতে হবে।

আয়াতের এ অংশেও আল্লাহ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ সমগ্র মহাজগতের অধিকর্তা। সমগ্র জগতকে ধারণ করে আছেন। তিনি ভিন্ন আমরা শূন্য; কিছুই না। অস্তিত্বহীন এমনকি অধিষ্ঠানবিহীন।

উল্লেখ্য যে, গীতায় ঈশ্বরের বিশ্বরূপের একটি ধারণাও মানবসমাজের জন্য তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে সমগ্র জগত-মহাজগতকে তিনি একাই ধারণ করে আছেন। বলা হচ্ছে,

"জেনে রেখ- আমার কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সহায়তা দিয়ে যাই।" (গীতা ১০:৪২)

কোরআনে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘূর্ণায়মান বা ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে।" (আল-কোরআন ৩৯:৬৭)

২	তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময় [The Beneficent, the Merciful.]

▪ **১.২** তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময় (The Beneficent, the Merciful): প্রারম্ভিক আয়াতের বিশ্লেষণে 'পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহ' এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে 'তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময়'। উদ্ধৃতির ধরণ থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র আল্লাহই করুণাময়, আল্লাহই দয়াময়। করুণা বা দয়ার একমাত্র আধার বা উৎসই হচ্ছেন আল্লাহ। বস্তুত সকল গুণেরই উৎস মূলত আল্লাহ। তাঁর থেকেই মহাজগতের সর্বত্র সকল গুণ ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"... জীবের নানা প্রকারের সকল ভাব আমার থেকেই উৎপত্তি।" (গীতা ১০:৪)

বস্তুত জীব যখন কারও প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করে সে সেটি করে আল্লাহ থেকে পরিবাহিত বা প্রবাহিত দয়ার গুণের কারণে। দয়া থেকে শুরু করে সকল গুণের একমাত্র উৎসই হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর গুণসমুহের প্রকাশ ঘটে কোন না কোন মাধ্যম হয়ে। তাই আমরা সে গুণের মহাত্ব বুঝতে পারি। জীব যখন কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করে বস্তুত সেটি তিনিই প্রদর্শন করেন। তিনিই একমাত্র করুণা ও দয়ার আধার, আর কেউ নয়।

এ আয়াতের পরের আয়াতে একটি বিচার দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, এ আয়াত মানবের মনে সাহসের সঞ্চার করে। মানুষকে আশার আলো দেখায়। ভূল-ভ্রান্তি করা সত্বেও যদি কেউ সত্য অন্তরে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তবে মহান আল্লাহর এ দয়ার গুণেই সে ক্ষমা

পেতে পারে প্রচ্ছন্নে এখানে সে বার্তা রয়েছে। বস্তুত আল্লাহর দয়ার গুণ তাঁর সকল গুণকে ছাঁপিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

"... আমি আমার শাস্তি দ্বারা যাকে ইচ্ছে তাকে আঘাত করি এবং আমার দয়া সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রাখে।" (আল-কোরআন ৭:১৫৬)

বলা হচ্ছে, "...সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর অভিমুখে ফিরে আসে।" (আল-কোরআন ২:২২২)

সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের বা ভূল করেও সঠিক পথে ফিরে আসা মানুষের হতাশার কোন কারণ নেই। তবে একইসঙ্গে এটিও স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ক্ষমাপ্রার্থী যদি আল্লাহর বিচারে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয় তবেই সে ক্ষমা পেতে পারে। যে যোগ্য না তাকে বিচার-বিবেচনা ছাড়া অবলিলায় ক্ষমা করে দেয়াও অন্যদের প্রতি অবিচার করার সামিল।

কিছু কিছু ভূলের জন্য ভূলকারীকে তাই কখনও না কখনও শাস্তিকে বরণ করে নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে আসতে হয়। ক্ষমাপ্রাপ্তির যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভূলের পুনরাবৃত্তি করা চলে না। ক্ষমা প্রাপ্তির অন্যান্য শর্তাবলীও পুরণ করতে হবে যা যথাস্থানে আলোচনায় আসবে।

ওপরে যা কিছু বলা হল তার সবই হচ্ছে নিয়মের কথা। এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহ হচ্ছেন পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান; সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও বিবেচক এবং সবজান্তা ও সবকিছুর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। তিনি ব্যাক্তি, গোষ্ঠি, জাতি সকলের পূর্বাপর সবকিছু জানেন। ভাল-মন্দ জানেন। তিনি বিচার করবেন সমগ্রের ওপর ভিত্তি করে। এমনকি তিনি অন্তরের গোপন বিষয় ও নিয়তকেও বিবেচনায় নেবেন। সে বিবেচনা মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। তাই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি যে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন, যে কাউকে শাস্তি দিতে পারেন।

বস্তুত এটি কিন্তু কোন প্রকারের খাম-খেয়ালিপনা নয়। তিনি পূর্বাপর সকল বিষয় বিচার-বিবেচনা করেই সব করেন। সত্যের ওপর ভিত্তি করে করেন। কিন্তু মানুষ ভেতরের সে ক্যালকুলেশন জানে না বা বোঝে না বিধায় এভাবে বলা হয় যে, তিনি যে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন এবং যে কাউকে শাস্তি দিতে পারেন। বস্তুত সকল কারণ কেবল তিনিই জানেন। আল্লাহকে কারও কাছেই কোন বিষয়ে জবাবদিহি হতে হয় না। বলা হচ্ছে,

"তিনি যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা (মানুষ, অন্যায়কারীরা, অবিশ্বাসীরা) জিজ্ঞাসিত হবে।" (আল-কোরআন ২১:২৩)

অতএব যে কোন বিচারে আল্লাহর ওপর চরম ও পরম ভরসা রেখে সুপথে ফিরে আসার আশার পথ মানুষের জন্য সদা-সর্বদা উন্মুক্ত। তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময়। দয়া ও করুণার একমাত্র আধার।

৩	বিচার দিবসের মালিক। [Owner of the Day of Judgment]

- **১.৩** বিচার দিবসের মালিক (Owner of the Day of Judgment): সূরার এ আয়াতে আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক বলা হয়েছে। ফলে সমগ্র কোরআন অধ্যায়নের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এ আয়াতটি মানবজাতিকে একটি বিচার দিবস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

এ আয়াত অধ্যায়নের সাথে সাথে মানব মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেসব প্রশ্নের একটি উত্তর অবশ্য আয়াতেই পেয়ে যাই। যেমন বলা হয়েছে বিচার দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ তিনিই বিচার দিবসের মালিক। উদীত অপরাপর প্রশ্নগুলি হতে পারে যেমন- কবে, কখন, কোথায় সে বিচার দিবস সংঘটিত হবে; এর ফলাফল প্রাপ্তিই বা কি হতে পারে ইত্যাদি?

এই একটি ধারণা মানব জ্ঞান ও চিন্তার জগতে এবং মানব জীবন-দর্শনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টিকারী। সমগ্র কোরআনে যত আলোচনা রয়েছে তার সার সংক্ষেপিত মূল বক্তব্য রয়েছে এখানে। অপরাপর সকল বিষয় কোন না কোনভাবে এর সাথেই সম্পর্কিত। জীবন ও জগত সম্পর্কিত একটি পৃথক জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি এখানেই নিহিত। কেবলমাত্র এ একটি ধারণার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে আরও অনেক বিষয়, অনেক ধারণা, নানান কর্মকান্ড ও শর্তাবলী।

এ বাক্যটি কৃতকর্মের জন্য মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা বলে। ফলে এ আয়াতে যে বিশ্বাসী হবে সে ইহকালে যথেচ্ছাচারী হতে পারে না। অবিশ্বাসীদের কথা ভিন্ন। তবে ভিন্ন হলেও তাদেরকেও আহবান করা

হয়েছে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে। সুশৃংখল মানবসমাজ ও জীবন গঠনে কেবল এ একটি আয়াতের রয়েছে অপরিসীম প্রভাব ও ভূমিকা। এ ধারণার অবর্তমানতা যে কোন সভ্য সীমা লংঘনকে প্রচ্ছন্নভাবে বা মানসিকভাবে অনুমতি দিয়ে দেয়, কিংবা অনুমোদন না দিলেও অন্তত বাঁধা প্রদানকেও উৎসাহিত কিংবা কার্যকরীকরণে ভূমিকা রাখে না।

এ আয়াতটি কৃতকর্মের জন্য মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা বলে। প্রচ্ছন্নে যা ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তির বার্তা দেয়। কর্মের হিসেব সংরক্ষনের কথাও এ আয়াতের পেছনে লুক্কায়িত আছে। কে হিসেব সংরক্ষন করবে, কোথায় সংরক্ষন করবে এ বিষয়গুলির প্রশ্নও মনের মধ্যে চলে আসে। মনের মধ্যে উদীত হওয়া এ সকল প্রশ্নের উত্তর রয়েছে কোরআনে। সমগ্র কোরআনে মূল যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে– বলা যায় এ সূরার অন্তর্নিহিতে তার একটি নির্যাস রয়েছে।

মানুষের মৃত্যু হবে। বিচার হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তথা পরকালে। অর্থাৎ পরবর্তী জীবনের ধারণা দেয় এ আয়াত। মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান হবে। পুনরুত্থানের পর বিচার হবে। পুনরুত্থানের ধারণা এর সাথে সম্পর্কিত। স্বাভাবতই পুনরুত্থান কখন-কিভাবে হবে সে প্রশ্নও চলে আসে এখান থেকে। বিষয়গুলি যথাস্থানে বিস্তারীত আলোচনা করা হবে।

কোরআনের প্রারম্ভিক সূরা বা সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে মানব মনে যেসব প্রশ্ন আপনা থেকে উদীত হয়, সেসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে প্রেরীত গ্রন্থ আল-কোরআনে। এ মহাগ্রন্থ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির কেবল পার্থিব জীবনের জন্যই নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনের পথ চলার দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে যার সীমানা পার্থিব জীবনকেও ছাড়িয়ে যায়। আশার আলো প্রদর্শন করে। জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। কেননা ধারণায় এখানেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। কেবল মৃত্যুই আপনজনদের থেকে বিচ্ছেদের কারণ নয়। ভাল মানুষদের অন্তরে আশার আলোও সঞ্চার করে কোরআনের বাণী। যেমন বলা হয়েছে,

“যারা বিশ্বাসী এবং যাদের সন্তানেরা বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব এবং

তাদের কাজের যথাযথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বিন্দু পরিমাণেও বঞ্চিত করা হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা অর্জন করেছে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে।" (আল-কোরআন ৫২:২১)

সহজাতভাবে মানবের যথেচ্ছাচার আচরণে কিংবা ক্ষমতাবানের যা খুশী তাই করণে কোথাও কোন বাঁধা নেই। কেবলমাত্র এই একটি ধারণা বা দর্শন মানবকে তার যথেচ্ছাচার আচরণ করা থেকে সর্বপ্রথম নিজ থেকে বাঁধা প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ জ্ঞান মানব মনে একটি মানসিক বাঁধা সৃষ্টি করে। তবে এটি সকলের ওপর সমভাবে কাজ নাও করতে পারে। এটি কাজ করবে বিশ্বাসীর ওপর। তাই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ এবং সে কারণেই সমাজ ও জীবনের সুশৃংখল পরিচালনের জন্য মানুষকে কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে একদিন তার সকল কাজের হিসেব হবে। তাকে বিচারের মুখোমুখী হতে হবে। কর্মের দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ভোগ করতে হবে। সে নিজ থেকে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তার এ বিশ্বাসের কারণে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ বিশ্বাস যা বল প্রয়োগ ব্যাতিতই মানুষকে বিবেচক হয়ে গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে।

ক্ষমতাবানের যথেচ্ছাচার আচরণে মানসিক বাঁধা প্রদানের পাশাপাশি এটি অন্যায়ের বিপক্ষে সামাজিক শক্তিকে দাড়াতেও উদ্বুদ্ধ করে। কোরআনের প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনা যদি সত্য, সুন্দর, সঠিক ও ভাল পথ প্রদর্শন করে এবং কেউ যদি তা সঠিকভাবে অধ্যায়ন করার মাধ্যমে সঠিক বার্তাটি অনুধাবনে সক্ষম হয় এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সে পথ অনুসরণ করে চলে- তবে সমাজে ভালটিই প্রতিষ্ঠা পাবে এমনটিই ধরে নেয়া যায়। কোরআন তাই তার প্রদত্ত বার্তায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মানুষের প্রতি আহবান জানায় এবং অবশ্যই সেটি কু-সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে নয়, বরং যথাযথভাবে বার্তা অনুধাবনের মাধ্যমে।

কোরআন প্রনয়ণকারী নিশ্চিতভাবে জানেন যে তাঁর প্রদত্ত বার্তা বাস্তব জীবনে চলার পথে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু তার অপব্যাখ্যা কিংবা ভূল অনুধাবনের দায় কোরআনের নয় কিংবা তার প্রনয়ণকারীর নয়।

এ দায় বিষয়ের বোদ্ধাদের; কিংবা মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যাক্তির নিজের যারা তা সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যার্থ হল। তাই এ বার্তা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়া একটি অবশ্য করণীয় কাজ। বার্তা জেনে যারা তা অপরের কাছে পৌঁছে দেবে না তাদেরও দায় আছে। দায় আছে অবিশ্বাসের পরিণাম হেতু সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ প্রদানের জন্য। আর এতসব কারণেই বিচার দিবস। যেখানে কর্মের ফলাফল প্রাপ্তি ঘটবে। তাইতো পার্থিব জীবনকে এক 'পরীক্ষা' বলা হয়ে থাকে।

বিচার দিবসের ধারণা ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এ ধারণা মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। এ ধারণা সমাজে অন্যায়কে প্রতিরোধে মানুষকে উজ্জীবিত করে। অন্যায় প্রতিরোধে মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসকে উৎসাহিত করে। অন্যায় প্রতিরোধে ন্যায়কারীকে সাহস প্রদান করে। একই সাথে অন্যায়কারীরকে অন্যায়করণে মানসিক ও সার্বিকভাবে দুর্বল করে। কোরআন ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে শিক্ষা ও নির্দেশনা দেয় এবং উৎসাহিতও করে।

কোরআনের বার্তা থেকে ন্যায় পথের সুবিধা নিতে হলে মানুষকে আল্লাহতে ও তার নির্দেশিত পথে বিশ্বাসী হতে হবে। হতে হবে এ কারণে যে, বিশ্বাস ভিন্ন সত্যিকারভাবে এ পথে চলা সহজ হবে না। পথটিকে নির্ভূল ও যথাযথভাবে পেতে হলে সে বিশ্বাস জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করে স্থাপন করতে হবে। জ্ঞান ভিন্ন বিশ্বাস কচুপাতার পানির মতো টলটলায়মান। পড়ে যেতে পারে। আবার সেটি অন্ধত্বও সৃষ্টি করতে পারে যেটি অধিক ভয়াবহ যদি না সঠিক নেতৃত্বের ছাঁয়াতলে থাকে। তাই জ্ঞান দ্বারা এ একটি বিষয়ের অনুধাবন অত্যান্ত প্রয়োজন যে, কোরআনের প্রতিটি নির্দেশনা ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। এমনকি নিজের বা নিজেদের বিপক্ষে হলেও! তবেই জগতের সকল মানুষের কাছে কোরআনের বাণী গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। যা বিচার-বিশ্লেষণ ও সত্যের জ্ঞান ভিন্ন করা আদৌ সম্ভব নয়।

আলোচ্য গ্রন্থে সমগ্র আলোচনায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে সত্যই তুলে ধরা হবে। এ কাজের এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলা যেতে পারে। ন্যায়ের পথ প্রদর্শনকারী, ন্যায়ের পথে চলতে প্রধান প্রেরণাদানকারী মহান গ্রন্থ আল-

কোরআন থেকে নিচের উদ্ধৃতিটি তাই সকল মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তুলে ধরা হল।

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর পথে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদান কর, যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও যায়। ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম। অতএব তোমরা কারও জন্য ব্যাথিত হয়ো না। কেননা তাতে তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যূত হওয়ার শংকা আছে। আর যদি তোমরা সত্য থেকে বিচ্যূত হও কিংবা তাতে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবগত।" (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

উল্লেখ্য যে, কোরআনের বার্তা থেকে সুবিধা নিতে হলে অন্যায়কারীর ভেতরেও এ বার্তা প্রবেশ করাতে হবে। এটি তাকে দুর্বল থেকে নমনীয় হয়ে উঠতে এবং সঠিক পথে ফিরে আসতে সহায়তা করবে। এক কথায় মানুষ হিসেবে কোরআনের বার্তা থেকে সুফল পেতে হলে নিজেকে বিশ্বাসী হতে হবে এবং অপরের মাঝেও সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। তাই বিশ্বাসের এত গুরুত্ব। আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক আখ্যায়িত করে কোরআন সে বার্তাই মানব সমাজে পৌঁছে দিয়েছে। যা ব্যাক্তির সুস্থ্য মানসিক অবস্থা থেকে শুরু করে সুষ্ঠ সমাজ ও বিশ্ব ব্যাবস্থা বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আল্লাহ বিচার দিবসের মালিক এ বার্তা প্রদান করে বিচার দিবসে পুঙ্খানুপুঙ্খ, সূক্ষতিসূক্ষভাবে যথাযথ বিচারের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। মানবীয় বিচার ব্যাবস্থায় নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যূতি থাকে। কিন্তু আল্লাহর বিচারের দিনে সে ত্রুটি থাকবে না। মানুষকে সে আশ্বাস দিয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এটি যেমন ভাল পথ অবলম্বনকারীদের জন্য সুখবর, তেমনি মন্দ পথ অবলম্বনকারীদের জন্য সতর্কবার্তাও। বলা হচ্ছে,

"... সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং বিচার করা হবে সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ... এই দিনে তথা বিচার দিবসে কারও প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না

এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।" (আল-কোরআন ৩৯:৬৯, ৩৬:৫৪)

এ আয়াত থেকে উদ্ভুত একটি ভিন্ন অনুধাবন প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব। আবার আল্লাহ এটিও বলেছেন যে, যুগে যুগে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। কাউকে গ্রন্থ দিয়েছেন কাউকে দেননি। তাদের অনেকের নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে,

"(হে মোহাম্মদ) আমি তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করিনি।" (আল-কোরআন ৪০:৭৮)

ইসলাম ধর্ম এসেছে সর্বশেষে। ইসলামের পূর্বেও আমরা আমাদের উপমহাদেশের দিকেও যদি তাকাই- তবে দেখতে পাব যে সনাতন ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি ধর্ম ইসলামের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। সে সব ধর্মেও কর্ম ও তার ফলাফল প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। পুনরুত্থান ও পুনর্জন্ম আলোচিত হয়েছে। উপস্থাপনা ভিন্ন হলেও প্রচ্ছন্নে একই বার্তা ও কর্মকান্ডের উপস্থিতির ইংগিত রয়েছে এসব বার্তায়। আল্লাহ বলেন,

"... এমন কোন সম্প্রদায়, জাতি বা গোষ্ঠি নেই যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি।" (আল-কোরআন ৩৫:২৪)

বস্তুত তিনি সকল সমাজে একই বার্তা প্রেরণ করেছেন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে উপস্থাপনায় ভিন্নতা আছে এবং সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। যদি কেউ সকল বার্তার মর্মার্থ জেনে-বুঝেও মানব সমাজে বিভেদ ও সংঘাতজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তবে অবশ্যই সে অজ্ঞতা ও পরিণতির দায় তাদেরকে নিতে হবে।

এ আয়াত মানুষকে তাদের যে কোন প্রকার ভূল আচরণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সেটিও করে কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং মানবের সার্বিক মঙ্গলের জন্য; সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য; ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং পরিশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। 'ইসলাম' তাই 'শান্তির ধর্ম'।

আল্লাহতে সমর্পনেই শান্তি। সমর্পনই ইসলাম। উল্লেখ্য যে, দর্শন হিসেবে সনাতন ধর্মও হুবহু একই কথা বলে।

কোরআনের প্রারম্ভেই একটি বিচার দিবসের বিষয়ে মানবজাতিকে ধারণা দেয় সূরা ফাতেহা। যে ধারণা মানুষকে সত্য ও ন্যায় পথে চলতে দিক-নির্দেশনা দেয়। মানুষকে সে পথে চলতে অনুপ্রাণীত করে। মানুষকে তার কর্ম ও আচরণে সদা সতর্ক থাকতে সচেতন করে তোলে আবার উদ্বুদ্ধও করে।

জাগতিক সকল দর্শনের জগতে পরিবর্তনের সূচনা করেছে কোরআনের এ বাণী। মানবজীবনকে যা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ও সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণীত করেছে। এর সঙ্গে মনের মধ্যে উদীত হওয়া অনেক অনেক প্রশ্ন ও বিষয়ের সম্পৃক্ততা আছে। সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে কোরআনের সামগ্রীক আলোচনায়। যার কিছু ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। বলা যায় সমগ্র কোরআনব্যাপী আলোচ্য সকল মূল বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে সূরা ফাতেহায়।

৪	আমরা (শুধুমাত্র) তোমারই উপাসনা করি; আমরা (কেবলমাত্র) তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি। [Thee (alone) we worship; Thee (alone) we ask for help,]

উদ্ধৃত আয়াতটিকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হবে। প্রথমত: ১.৪.১) আমরা (শুধুমাত্র) তোমারই উপাসনা করি এবং ১.৪.২) আমরা (কেবলমাত্র) তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি।

▪ **১.৪.১** আমরা (শুধুমাত্র) তোমারই উপাসনা করি (Thee alone we worship) : ইতিপূর্বে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যখন বলা হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করি, তখন আমরা আল্লাহরই উপাসনা করি এখানে সেটিই বোঝান হয়েছে।

'আমরা' শব্দটি দ্বারা এখানে কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীদেরকে বোঝান হয়েছে। হুবহু কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। বস্তুত তারাও একজনারই উপাসনা করে। অতএব মানুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তারা সকলে আল্লাহরই উপাসনা করে তা সে যে প্রকারেই করা হোক না

কেন, কিংবা যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন। তিনি একজনাই সকল কারণের কারণ। তাঁর সকল নামই মহিমান্বিত!!

আল্লাহ কে বা কি সে বিষয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানে না। বিষয়গুলি ওপরেও আলোচনা করা হয়েছে। অতএব যখন বলা হচ্ছে যে, 'আমরা শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করি' তখন প্রশ্ন উদিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে তাহলে আমরা আসলে কার উপাসনা করি? কি উপাসনা করি? যার উপাসনা করি তাঁর কোন রূপের উপাসনা করি?

এটি একটি বড় প্রশ্ন যে, মানুষ আদৌ কাউকে উপাসনা করবে কিনা, কিংবা আদৌ কাউকে উপাসনা করার প্রয়োজন আছে কিনা। যদি থাকে তবে কার উপাসনা করবে? কিংবা ক'জনের উপাসনা করবে? যাকে উপাসনা করবে তাঁর কোন রূপকে ভাবনা বা কল্পনায় রেখে উপাসনা করবে ইত্যাদি?

বিষয়গুলিকে আজকের পর্যায় থেকে ভাবলে হবে না। ভাবতে হবে বর্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বের সময়কে বিবেচনায় রেখে। অর্থাৎ যখন মানুষের কাছে এসব প্রশ্নের যথাযথ কোন উত্তর জানা ছিল না। তবেই আমরা আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ 'আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করি' এ কথার তাৎপর্য ও যথার্থতা বুঝতে পারব। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে এ আয়াতের যথার্থতা খুঁজে পাওয়ার তাৎপর্য কি?

বিশ্বাস স্থাপনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যথায় অন্তর তুষ্ট হবে না। অন্তরের তুষ্টি ভিন্ন সত্যিকারের বিশ্বাস জন্মাবে না। সত্যিকারের বিশ্বাস না জন্মালে বিশ্বাসজনিত অপরাপর বিষয়াবলীর পরিপালনও যথাযথ হবে না।

আয়াতের এ বিশ্লেষণ তাই মানবের এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথার্থতাকে তুলে ধরবে। হয়তবা সকলের জন্য এ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু মানুষের অন্তর বিষয়গুলি জানতে চাইবে। আলোচনাটি তাদের জন্য। এখানে তাই কেন আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, 'আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করি' সে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হবে।

ওপরে উদ্ধৃত প্রশ্নসমুহের সঠিক উত্তর জানা না থাকায় যুগে যুগে মানুষ দিশেহারা হয়ে ঘুড়ে বেরিয়েছে। দেশে দেশে এসব প্রশ্ন সন্ধানি মনের মানুষকে

ভাবিয়েছে। ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করলেও মানব মনের এমন আকুঁতির চিত্রটি স্পষ্টরূপে ধরা দেয়। যেমন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়ে বলেন,

"হে ভগবান! কিরূপে আমি তোমাতে ধ্যানগ্রস্থ হব? কোন কোন বিবিধ প্রকারের আকৃতিতে আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করব?" (গীতা ১০:১৭)

ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা! ... আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর ...।" (আল-কোরআন ২:১২৮)

মানবজীবনের খুব প্রাথমিক অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়গুলি একটু ভাববার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মানুষ আদৌ কাউকে উপাসনা করবে কিনা, কিংবা আদৌ কাউকে উপাসনা করার প্রয়োজন আছে কিনা ইত্যাদি।

মানব ইতিহাসে নিশ্চয়ই এমন একটা সময় পেরিয়ে গেছে যখন মানুষের সম্মুখে কোন প্রকারের দিক-নির্দেশনা ছিল না। মানুষ জানে না যে কে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির মূলে? কে তাকে এখানে জীবিত প্রেরণ করেছে? কিন্তু সে এটি জানে যে সে নিজে কোন কিছু সৃষ্টি করে নাই। সে এ জগতের হর্তাকর্তা নয়। তাহলে কে এ সবকিছুর অন্তর্নিহিতে? কে সকল কারণের কারণ? সে নিজেই তেমন একজনকে সন্ধান করে। সে নিজেই তাঁর কাছে নত হতে চায়। মানব মনের এমন আঁকুতির কারণেও মানুষ তেমন একজনের উপাসনা করতে চায়। আরও কারণ আছে। সে আলোচনাও করা হবে।

অতঃপর প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ কার বা কিসের উপাসনা করবে? অর্থাৎ মানুষ তখনও যথাযথভাবে জানেনা যে সে কার উপাসনা করবে। কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি ইব্রাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বিষয়সমূহ প্রদর্শন করতে লাগলাম যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের একজন হয়।

যখন রাতের অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হল তখন সে একটি তারা দেখতে পেল। সে বলল, এটিই আমার প্রতিপালক যার উপাসনা করা যায়। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, আমি ভালবাসি না সেই বস্তু যা অস্তমিত হয়।

অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল সে উচ্ছসিত হয়ে বলল, এটিই আমার প্রতিপালক যার উপাসনা করা যায়। কিন্তু যখন তা অস্তমিত

হল সে বলল, যদি না আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন করেন তবে নিশ্চিতভাবেই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।

যখন ইব্রাহীম সূর্য্যকে উদিত হতে দেখল বলল, এটি আমার পালনকর্তা; এটি বৃহত্তর যার উপাসনা করা যায়! কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয় আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ কর আমি সে সব থেকে মুক্ত। নিশ্চয়ই! আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।” (আল-কোরআন ৬:৭৫-৭৯)

উপাস্যের বিষয়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর উদাহরণ তুলে ধরে ওপরে যা বলা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উপাস্যের সন্ধান করতে গিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) প্রতিবারই একটি বৃহৎ শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ উপাস্যের সন্ধান করতে গিয়ে যুগে যুগে মানুষ এমনিভাবে বৃহত্তর শক্তিরই সন্ধান করে গেছে। অথচ এ বৃহতের কোন শেষ নেই। একটির পর একটি বৃহৎ আগমন করেই চলেছে।

আরও বলা হচ্ছে, “যখন ইব্রাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের উপাসনা কর? তারা বলল, আমরা মূর্তির পূঁজা করি এবং তাদের প্রতি সর্বদাই আমরা নিষ্ঠাবান। সে বলল, যখন তোমরা আহবান কর তখন কি তারা শুনতে পায়? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?” (আল-কোরআন ২৬:৭০-৭৩)

ওপরের আয়াত থেকেও এটিই স্পষ্ট হয় যে, উপাস্য আসলে সেই হতে পারে যে উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য। কোন না কোনভাবে আমরা প্রকৃতপক্ষে শক্তিমানের পূঁজা, উপাসনা বা এবাদাত করি।

উপাস্যের ধারণায় ক্ষমতা ও শক্তি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। যার শক্তি আছে, যে সবাইকে নত করে রাখতে সক্ষম সেই উপাস্য হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যার কাছে সবাই নত হতে বাধ্য হয় সেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য।

যুগে যুগে মানুষ তাই শক্তির পূঁজা, উপাসনা বা এবাদাত করেছে। একসময় মানুষ বন-জংগল ও গুহায় বসবাস করেছে। বৃহৎ ও শক্তিমান যাকে পেয়েছে তার কাছেই মাথা নত করেছে। তার পূঁজা-উপাসনা করেছে। বটবৃক্ষ থেকে শুরু করে হিংস্র বন্য প্রাণীরও উপাসনা করেছে। কিন্তু মানুষ তৃপ্ত হতে পারেনি।

উপাস্যের সন্ধান করতে গিয়ে এমনিভাবে প্রতিবারই মানুষ নব্য বৃহতকে গ্রহণ করেছে। আবার পুরোনো রীতিও থেকে যাচ্ছে কিছু মানুষের মাঝে। ফলে সমাজে যুগপতভাবে নতুন ধারণা ও পুরোনো ধারণা একইসাথে বিরাজ করে চলেছে।

মানুষ একবার তার গ্রহণ করে নেয়া বিশ্বাসকে সহজে ছাড়তে পারে না। অনেক নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে যায়। বিষয়গুলি সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে উপাস্যের পাহাড় জমে যায়। এতে মানুষের কোন ত্রুটি নেই। এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তা না হলে বর্তমানেও সে যেটিকে সঠিক ভেবে বিশ্বাস করে সেটিও এক মুহুর্তে ছেড়ে দিত। ধরে রাখতে পারত না।

খুব সহজেই যেমন একটি বিশ্বাসকে ধরে ফেলা যায় না তেমনি আবার ছেড়েও দেয়া যায় না। যুগপতভাবে পুরোনোকে ধরে রাখা ও নতুনকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই পূর্বাপর জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে। এটিও প্রয়োজনীয়। তা না হলে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিষয়গুলিকে মূল্যায়ন করতে পারত না। সত্য-মিথ্যে চিনতে পারত না।

মানুষ কার বা কিসের উপাসনা করবে? মানুষের জানা ছিল না কিংবা আজও কিছু মানুষের কাছে বিষয়গুলি সুস্পষ্ট নয়। তবে মানুষের জ্ঞান বা স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে এই যে সে বরাবরই শক্তি বা ক্ষমতাবানের উপাসনা বা আরাধনা করে।

কিছু মানুষ তাই দেবদেবী, মহামানব, অতিমানব বা তার নিজেরই মতো অপর একজন শক্তিমান বা ক্ষমতাবান মানুষকে দেবতাতূল্য গণ্য করে দেবতার আরাধনায় লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদেরও আরাধনা করে। তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের মূর্তী বা প্রতিকৃতি তৈরী করে তাদের পূঁজা-অর্চনা করে। অথচ তারা বোঝে না যে, তারা যে সকল দেবদেবীর দ্বারস্ত হয় সেই

দেবদেবীরা নিজেরাই কোন সাহায্যদাতাকে খুঁজে বেড়ায়। তাই কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে,

“যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য উপায় সন্ধান করে।” (আল-কোরআন ১৭:৫৭)

গীতায় বলা হয়েছে, “প্রকৃতপক্ষে সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেবদেবীদের উপাসনা করে।” (গীতা ৭:২২-২৩)

সত্য হচ্ছে, আল্লাহ ভিন্ন কেইউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। দেবতারাও আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তবুও কেন মানুষ দেবদেবীদের উপাসনা করে? তাদের বিষয়ে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

“জ্ঞান যাদের কামনা-বাসনা দ্বারা অপহৃত হয়েছে .. তারা .. অপরাপর দেবতাদের ভজনা করে।” (গীতা ৭:২১)

দেবোপাসকদের অন্তরে অনেক চাহিদা। তারা মনে করে যে এক এক দেবতা আল্লাহর এক একটি বিষয়ের দেখভাল করে। তারা তাদের থেকে তাদের কাম্য বিষয় বা বস্তু লাভ করার বাসনায় তাদেরকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে। তাই তারা দেবদেবী, মহামানব, অতিমানব এমনকি ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতানেত্রীদেরও আরাধনা করে। দেবোপাসকদের উপাসনার যৌক্তিকতার বিষয়টি কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

“... যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তাদের উপাসনা করি এ জন্য যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।” (আল-কোরআন ৩৯:৩)

অর্থাৎ দেবদেবীদের উপাসকরাও অজানা, অচেনা বা বোধগম্যতার উর্ধ্বের ধারণা সম্বলিত ‘আল্লাহ’র সান্নিধ্য লাভ করতে চায় এবং সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাদের বিবেচনায় ঈশ্বরে মনোনিবেশের সুবিধার জন্য তারা একটি রূপকে কল্পনা করে নেয়। বাস্তবে সে রূপের ছবি, মূর্তী তৈরী করে নিয়ে তার উপাসনা করে। এভাবে তারা ঈশ্বরে মনোনিবেশের চেষ্টা করে। তারা এভাবে

অভ্যস্ত এবং এতে তাদের ঈশ্বরে মনোনিবেশে সুবিধা হয়। বস্তুত উদ্দেশ্য কিন্তু একই। সকলেই ঈশ্বরকে চায়। কেবল পথগুলি ভিন্ন।

এটি তো আমরা নিজেদের জ্ঞানেই বুঝতে পারি যে, নিজ হাতে গড়ে তোলা মূর্তীর বস্তুত সাহায্য করারই কোন ক্ষমতা বা সামর্থই নেই। সে তো নিজেই সৃজিত। তাই যৌক্তিভাবেই কোরআনে বলা হয়েছে যে,

"যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের (মূর্তীদের) ডাকে ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত।" (আল-কোরআন ১৬:২০)

"তারা কি এমন কিছুকে (আল্লাহর) অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেকে সাহায্য করতে পারে। ... আর তুমি তো তাদেরকে (মূর্তীগুলিকে) দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। (আল-কোরআন ৭:১৯১-১৯৮)

কোরআনে আমরা জ্বিনদের বিষয়েও ধারণা পাই। বলা হচ্ছে, কিছু মানুষ আবার জ্বিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে,

"ভূলপথগামীরা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুমান করে। অথচ জ্বিনেরা ভাল করেই জানে যে তাদেরকে জবাবদিহিতার জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে।" (আল-কোরআন ৩৭:১৫৮)

অর্থাৎ জ্বিনদেরকেও মানুষের মতই তাদের ভাল-মন্দ কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। তাহলে তারা উপাস্য হয় কি করে?

চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা, দেব-দেবী, নেতা-নেত্রী, জ্বিন-মূর্তী এত এত শক্তিমান কিংবা উপাস্যের ভীড়ে মানুষ তাহলে কার উপাসনা করবে? ক'জনার উপাসনা করবে? কোথায় পাবে মানুষ সঠিক পথের দিশা?

পূর্বতনদের দেখান পথ পরবর্তীদের জন্য দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। যদিও যৌক্তিকভাবেই এর শুরু বা সূচনা হয় মূলত বিধাতা থেকে। কেননা একটা পর্যায়ে কোন পূর্বতনও ছিল না। আমরা যাদেরকে পূর্বতন বলব তারাও মানুষ। তারা কোথা থেকে এল? সত্যের সন্ধানে এমনিভাবে পেছনে যেতে থাকলে একসময় মূল উৎস বেরিয়ে আসবে। ফলে বলা যায় স্রষ্টা বা

বিধাতাতেই সকল দিক-নির্দেশনার শুরু। যা ধারাবাহিকভাবে মানবসমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

দেবতা, মূর্তি, জ্বিন কিংবা মনুষ্যজগতে দেবতাতূল্য কোন মহামানব কেউই প্রকৃতপক্ষে উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। কেউই শক্তির প্রকৃত উৎস নয়। কেউই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়। যারা এসবের উপাসনা করে বলা যায় তারা ভূল কাজ করে। তাহলে মানুষের মন যদি কারও উপাসনা করতেই চায় তবে সে কার উপাসনা করবে? কোথায় পাবে মানুষ সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা?

বাইবেলের দশ নির্দেশনার প্রথমেই আল্লাহ বলেন, "আমিই গড। আমি ব্যাতিত আর কোন গড নেই। আমি ব্যাতিত আসমান, জমিন বা পানিতে কোন ছবি, মূর্তী বা অন্য কোন কিছুকেই উপাসনা করবে না।"

অপরদিকে সমগ্র কোরআন তো আল্লাহর একত্বের প্রচার করতে গিয়ে এসবের বিরোধীতাই করে এসেছে। বলা হচ্ছে, "তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই।" (আল-কোরআন ২:১৬৩)

সত্য হচ্ছে, কোন দেবদেবী নয় আল্লাহ একাই সবকিছু দিয়ে থাকেন। দেবদেবীরাও আল্লাহর দ্বারস্ত হয়েই কারও জন্য কিছু বরাদ্দ নিয়ে আসেন। সে সত্য তুলে ধরে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"প্রকৃতপক্ষে সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেবদেবীদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭:২২-২৩)

অতএব যারা এ ধরণের কাজ করে তারা যে ভূল কাজ করে সেটি সর্বত্রই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

বস্তুত কোন ছবি, মূর্তী বা দেবদেবী বা কোন মহামানব আমাদের স্রষ্টা নয়- এটি আমরা আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকেই বুঝি। সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। দেবদেবীরাও আল্লাহর মুখাপেক্ষী। জ্বিনদেরকেও তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহি হতে হবে। তারাও আল্লাহর মুখাপেক্ষী। অপরদিকে মূর্তীর উপাসনা করা তো একেবারেই জ্ঞানসম্মত নয়। মূর্তী কখনই সৃষ্টিকর্তা কিংবা পালনকর্তা নয়। তাদেরকে যে আকৃতি দান করা হয় সেগুলি প্রকৃত বিধাতার কোন আকৃতিও নয়। এ কাজগুলি জ্ঞানসম্মত নয়। এসবের স্মরণাপন্ন হওয়া বা তাদের কাছে আরাধনা করার বিষয়টি অজ্ঞতার সাথে

সম্পর্কিত। তাই বর্জনীয়। তাহলে মানুষ কার উপাসনা করবে? ক'জনার উপাসনা করবে?

ওপরে উদ্ধৃত প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ একজনকেই উপাসনা করার কথা বলে। তিনিই আল্লাহ বা কোরআনে তাঁকে আল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেউ গড, কেউ ভগবান বিভিন্ন নামে তাঁকে অভিহিত করে থাকে। তবে যে যে নামেই তাঁকে অভিহিত করুক না কেন তাঁর সকল নামই সর্বশ্রেষ্ঠ ও তুলনাবিহীন! বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু নেই।" (আল-কোরআন ১১২:৪)

"আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।" (গীতা ৭:৭)

আল্লাহ! তিনিই শক্তির মূল উৎস। যাকে আমরা কেউই যথাযথভাবে জানি না। যার আঁকার-আকৃতি রূপ বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা নেই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ! সর্বশক্তিমান! সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। জগতের স্রষ্টা! লালন-পালনকর্তা! তিনি জীবন্ত! তিনি চিরজীবি! তাঁর ওপরে কেউ নেই, কিছু নেই।

মানবজাতি দ্বারা যিনি এত এত বিশেষণে বিশেষায়িত ও স্বীকৃত; মানব জ্ঞান যখন ধরেই নেয় যে অদেখা আল্লাহই সকল কারণের কারণ, তখন তিনিই তো একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপাস্য হবেন এটিই তো সঠিক! উপাসনা তো তাঁরই প্রাপ্য! তখন আর কাউকে উপাসনা করারও থাকে না। যাকে সবকিছুর হর্তাকর্তা ধরে নেয়া হয়েছে তাঁকেই উপাসনা করতে হবে। সে জ্ঞান থেকেই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করি'।

বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে পথ-নির্দেশনা পেয়ে থাকি। ধর্মগ্রন্থসমূহ আমাদেরকে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত দিক-নির্দেশনা দেয়। সকল শাস্ত্র গ্রন্থই আমাদেরকে একজনকে উপাসনা করার কথা বলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহকে আমরা কেউই চিনি না, জানি না, কখনও দেখি নাই। তাঁর বিষয়ে প্রকৃত কোন ধারণাই মানুষের নাই। তথাপি আল্লাহ নামটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষনে বা বিশেষণে বিশেষায়িত করে আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি। এত সুশৃংখল সৃষ্টির পেছনে একজন স্রষ্টার উপস্থিতি থাকাটিই যৌক্তিক। এটি জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত। বলা হচ্ছে,

"তারা তোমার কাছে এমন কোন দৃষ্টান্ত বা সমস্যা উত্থাপন করে না বা নিয়ে আসে না যার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে সত্য বা সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান না করি কোরআনের মাধ্যমে।" (আল-কোরআন ২৫:৩৩)

মনগড়া কোন কথা নয়, কোরআনে সকল বিষয় যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ ভিন্ন যদি আর কোন উপাস্য থাকত তবে এ পৃথিবী বিশৃংখল হয়ে যেত। তাই যৌক্তিকভাবেই বলা হয়েছে যে,

"যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত। ...।" (আল-কোরআন ২১:২২)

উপাস্য সকল কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান হতে হয়। তিনি সবকিছুর পরিচালনাকারী ও সমন্বয়ক। তাই তাঁকে 'এক' হতে হয়। যেহেতু ধারনাগতভাবে মানবজাতি আল্লাহ নামটিকেই তেমন আসনে আসীন করে নিয়েছে তাই আল্লাহই একমাত্র উপাস্য।

আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা, দৈহিক প্রকৃতি ও চারপাশের প্রকৃতিও আমাদেরকে সে শিক্ষা দেয়। আর কোন উপাস্য থাকলে অর্থাৎ আল্লাহর পাশাপাশি বা তাঁর সমপর্যায়ের আর কেউ থাকলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হত। তাই সত্য, বাস্তবতা ও যুক্তিসম্মতভাবেই কোরআনে বলা হয়েছে যে,

"... তাঁর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য নেই। থাকলে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত।" (আল-কোরআন ২৩:৯১)

কোরআন যে বার্তা দেয় তা জ্ঞান ও যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে দেয়। কিন্তু বিশ্বাসীগণ বিশেষত অনুসারীরা তেমন বিশ্লেষণে যায় না বা যাবে না বা তারা সেসবের প্রয়োজনও বোধ করে না। কেননা এক কথায় তারা বিশ্বাসী।

সত্য হচ্ছে, সকলকে চুলচেরা বিশ্লেষণে যেতেও হবে না। আবার সকলে যেতে পারবেও না। যাবে সন্ধানি মন। যে কিনা সবকিছু ত্যাগ করে হলেও গভীরে জানতে ও বুঝতে আগ্রহী এবং অনুধাবিত সত্য মানব সমাজে তুলে ধরতে চায় ভীষনভাবে অনুপ্রাণীত হয়ে।

নিজ জ্ঞানে বিচার বিশ্লেষণ শেষে যে বা যারা এ উপলব্ধিবোধে পৌঁছুবে যে একজনই নিয়ন্ত্রক, একজনই সমন্বয়ক, একজনই পরিচালনাকারী, একজনই সকল কারণের কারণ তারা একজনকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে। আর সে একজনকেই 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে। তবে তাঁর সকল নামই মহিমান্বিত! সবচাইতে সুন্দর! বলা হচ্ছে,

"বল (মানব সম্প্রদায়কে): আল্লাহর নিকট ক্রন্দন কর কিংবা দয়াময়ের নিকট ক্রন্দন কর, যার কাছেই তুমি ক্রন্দন কর না কেন, একই। তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর।" (আল-কোরআন ১৭:১১০)

আল্লাহ, ভগবান, গড যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন সকলেই তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষন বা নামটি ধরেই সম্বোধন করে থাকে। এর কোন ব্যাত্যয় নেই।

ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন, 'আমি ভালবাসি না সেই বস্তু যা অস্তমিত হয়।' আল্লাহ বলি, গড বলি, ভগবান বলি তিনি- জীবন্ত! চিরঞ্জীব!! গীতায় বলা হয়েছে, তিনি অব্যয়-অক্ষয়!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণসমুহ শুধুমাত্র তাঁর জন্যই প্রযোজ্য। সেভাবেই তাঁকে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যদিও তাঁকে কেউ চেনে না, জানে না। তাঁর আকার-আকৃতি, রূপ সম্পর্কে কারও কোন ধারণাও নেই। তিনি দয়াময়, করুণাময়। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

যারা তেমন উপসংহারে পৌঁছাতে পেরেছে তারা কেবলমাত্র একজনকেই উপাসনা করে। তারা 'এক আল্লাহ'র উপাসনা করে। তাই বিষয়টি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, 'আমরা শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করি'। তুমি ভিন্ন অন্য কারও বা কোন কিছুর উপাসনা করি না।

প্রশ্ন হচ্ছে, উপাসনাকালে সেই একজনের প্রতি মানুষ কিভাবে ধ্যানস্ত হবে? বা কিভাবে তাঁকে ভাববে বা কল্পনা করবে? তাঁর কোন রূপের উপাসনা করবে? মানুষের এসব বিষয় জানা ছিল না। যুগে যুগে মানুষ দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশায় তাই আল্লাহর দ্বারস্ত হয়েছে। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়ে বলেন,

“হে ভগবান! কিরূপে আমি তোমাতে ধ্যানস্থ হব? কোন কোন বিবিধ প্রকারের আকৃতিতে আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করব?” (গীতা ১০:১৭)

অপরদিকে বলা হচ্ছে, “যখন ইব্রাহীম সূর্য্যকে উদিত হতে দেখল বলল, এটি আমার পালনকর্তা; এটি বৃহত্তর যার উপাসনা করা যায়! কিন্তু যখন তা অস্তমিত হল তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয় আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ কর আমি সে সব থেকে মুক্ত। নিশ্চয়ই! আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।” (আল-কোরআন ৬:৭৫-৭৯)

পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনে ঘটনাটি মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে। বিষয়টি তেমন নয়। এভাবে পরিবর্তন আসে না। একটি দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষনজনিত প্রক্রিয়ার ফল এগুলি। যার শুরু ও শেষ শিশুমন থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্তও হতে পারে। অতঃপর চন্দ্র, সূর্য্য, তারা সবকিছুর পেছনের কারণ যার ‘স্বরূপ’ সম্পর্কে জানা নেই তিনি তেমন ‘নিরাকার’ আল্লাহর ধারণায় উপনীত হন। অর্থাৎ কোন আকার-আকৃতির উপাসনা না করা। ধারণার ক্রমবিকাশের ধারায় বর্তমানে আমরা বা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীরা কোন আকার-আকৃতির উপাসনা করি না। ‘নিরাকার’ আল্লাহর উপাসনা করি। যার আকার-আকৃতি বিষয়ে সত্যিকারভাবেই আমাদের কোনকিছু জানা নেই। তাই তাঁকে নিরাকার বলাই শ্রেয়। তাই তিনি ‘নিরাকার’।

কেউ যদি কোন উপাস্যের ধারণাতেই বিশ্বাস করতে না চায় তবে সেটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু যদি কেউ উপাস্যের ধারণায় বিশ্বাসী হয় বা হতে চায় তবে ‘নিরাকার’ উপাস্যের ধারণা সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা এটি একটি নমনীয় ধারণা। কেন?

নিরাকারে সীমাবদ্ধতা নেই। উপাস্যকে আকার-আকৃতি প্রদান করা হলে সর্বশক্তিমানকে সীমাবদ্ধ করা হয়। এভাবে সীমাবদ্ধ করা হলে সর্বশক্তিমানের ধারণা মানবসমাজে কখনও অধঃপতিত হয়ে যায়। কেননা যখন আরও বড় কোন শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তখন পূর্বের আকার-আকৃতি বা রূপটি তার

গুরুত্ব হারায়। কিন্তু নিরাকারে সে সীমাবদ্ধতা নেই। এটি কখনই ছোট হবে না। যে-ই বৃহত্তর হয়ে আগমন করবে সে-ই নিরাকারের ধারণায় যুক্ত হয়ে যাবে। ফলে এটিকে একটি নমনীয়, শাশ্বত ও সার্বজনীন ধারণা বলা যেতে পারে। নিরাকারের উপাসনা বিষয়ে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"যারা ... আমার অপ্রকাশিত রূপ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত, ... যাকে ধারণা-কল্পনা করা যায় না, ধ্রুব এবং নিশ্চল- পরম সত্যের নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার স্বরূপকে পরিপূর্ণরূপে উপাসনা করে তারা অবশেষে আমাকে লাভ করে।" (গীতা ১২:৩-৪)

গীতায় অবশ্য অতি সাধারণ মানুষদের কথা বিবেচনা করে একথাও বলা হয়েছে যে, "যারা ভগবানের অপ্রকাশিত নৈর্ব্যক্তিক রূপে অনুরক্ত, তাদের পক্ষে সে পথে অগ্রগমন অত্যান্ত কষ্টকর। কেননা দেহবিশিষ্টদের জন্য অব্যাক্তের উপাসনা দুরুহ বা কঠিন হয়।" (গীতা ১২:৫)

যে নিরাকারে মনোনিবেশ করতে পারে না বা তাতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেনি তাকে দিয়ে হঠাৎ করে বা জোর করে তা করানো সম্ভব নয় এবং সেটি সমীচীনও নয়। বলা হচ্ছে,

"যদি তোমার পালনকর্তা চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করত। তুমি কি (মোহাম্মদ) যতক্ষণ না তারা নিজেরা বিশ্বাস স্থাপন করছে তাদের বিশ্বাস করাবার জন্য বাধ্য করবে?" (আল-কোরআন ১০:৯৯)

এ বিষয়টিও সঠিক যে, কিছু মানুষ নিরাকারে মনোনিবেশ করতে পারে না বা তারা সেভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের জন্যও তো কিছু একটা ব্যবস্থা আপাতত থাকতে হবে। ফলে তাদের জন্য তাদের ব্যবস্থা। তারা একটি রূপকে কল্পনা করে নিয়ে তার প্রতি মনোনিবেশ করে। তাই কোরআনের জ্ঞান যতদিন তাদের মস্তিষ্কে সঠিকভাবে প্রবেশ না করবে ততদিনের জন্য বলা হচ্ছে,

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম বা পথ, আমার জন্য আমার ধর্ম বা পথ।" (আল-কোরআন ১০৯:৬)

কাউকেই কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বাধ্য করা যাবে না। আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় সূত্র যে বোঝে না তাকে কি জোর করে তা বোঝান সম্ভব? তার নিজের ভেতরে সে বুঝ আসতে হবে। তবে বোঝাবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা সত্যের জ্ঞান সকলের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহতে মনোনিবেশকে লক্ষ্য রেখেই বস্তুত বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে এসব ব্যাবস্থা মানুষ নিজেরা গড়ে তুলেছে। আল্লাহর দিক-নির্দেশনা নয়। ওপরে বাইবেল, কোরআন, গীতার উদ্ধৃতিসমুহ থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

এক আল্লাহ ভিন্ন কোন দেবদেবী, ছবি, মূর্তী বা এমনকি কোন মহামানবের আরাধনা করা জ্ঞান সম্মত নয়। সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানবজাতির জন্য নির্জ্ঞানমূলক কোন কাজই শোভনীয় নয়। তাই এগুলি নিষিদ্ধ। সে জ্ঞান থেকেই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'আমরা শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করি'।

জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে এই প্রকারের ভূল কর্মকান্ড ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ এগুলি কেবল পরিত্যাগই করবে না, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসহীন এসব কর্মকান্ডের জন্য লজ্জিতও হবে। বস্তুত জগতের সকল মানুষের উপাস্যই এক। তাই বলা হয়েছে,

"আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য।" (আল-কোরআন ২৯:৪৬)

কাকে উপাসনা করতে হবে, কি উপাসনা করতে হবে, ক'জনকে উপাসনা করতে হবে, যার উপাসনা করতে হবে তাঁর কোন রূপের উপাসনা করতে হবে- কোরআন এ বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্যই জ্ঞানের আলোকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যে দিক-নির্দেশনা আমাদেরকে যৌক্তিক জ্ঞান থেকেই নিরাকার এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলে।

ওপরে বাইবেল, কোরআন ও গীতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সর্বত্র এক উপাস্যের কথা বলা হয়েছে। অথচ বাস্তবে সনাতন ধর্মের অনুসারীদেরকে মূর্তী ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূঁজা-অর্চনা করতে দেখা যায়। খ্রীষ্টানরা জেসাস বা ঈসা (আঃ) কে গডের পুত্র বলে থাকে।

অপরদিকে বৌদ্ধরা স্বয়ং বুদ্ধকেই উপাসনা করে। মুর্তী পূঁজার মতোই। অথচ তাদের ধর্মে কোন উপাস্যই নেই। সেটি ভীষনভাবে বাস্তব ও কর্মমুখী একটি ধর্ম।

কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীরা আল্লাহর পাশে তাঁর সমমর্যাদার আর কাউকেই গণ্য করে না এবং সে কারণে আর কারও উপাসনাও করে না। তারা আল্লাহর সাথে কারও অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত করে না। যা মানুষের তথা বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই করে থাকে।

কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীদের সঙ্গে অপরাপর বিশ্বাসীদের মধ্যে এখানেই বড় পার্থক্য। আয়াতের উপস্থাপনা সে বিষয়টিকেও স্পষ্ট করেছে। এটি একটি বিচার-বিশ্লেষনোত্তর দৃঢ় সিদ্ধান্তের প্রকাশ। অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনা করি। উল্লেখ্য যে, দর্শনগতভাবে সনাতন ধর্মও অপর কারও উপাসনাকে যথাযথ গণ্য করে না। ইহুদি-খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় দর্শনও একই। কিন্তু বাস্তবে সকল ধর্মেই নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যূতি দেখা যায়। সেগুলি দর্শনের ত্রুটি নয়। মানবীয় ত্রুটি।

আদর্শ, দর্শন ও বাস্তবতার মধ্যে কিছু ব্যাত্যয় থাকেই। তেমনটি ইসলাম ধর্মের মধ্যেও আছে। তাই জবরদস্তী নয়। মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে জয় করে জ্ঞানের আলোকে সকলকে সত্যের পথে আহবান করতে হবে। বলা হচ্ছে,

“তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের আলোকে, যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়।” (আল-কোরআন ১৬:১২৫)

উল্লেখ্য যে, তাত্বিক বা আদর্শিক জ্ঞান এবং বাস্তবতা এক নয়। আদর্শিকভাবে সত্য কখনই নির্জ্ঞানতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। সত্য কেবল সত্যকেই তুলে ধরবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সত্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যহত রাখবেই। দর্শন তাই করে। সে চরম সত্য বা আদর্শের কথা বলে বা তার বিধি অনুসারে তেমন কথা বলতে সে বাধ্য। কোরআনও তাই করেছে। সে সত্যের পথ প্রদর্শন করেছে। তার দর্শনে বা বক্তব্যে আল্লাহর একত্বের বিষয়ে কোরআন কোন প্রকার আপোষ করেনি।

এটিও সত্য যে, বাস্তবতাকে অনেকসময় অনেক ভূল কর্মকান্ড সাময়িকভাবে মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয় আদর্শিক লক্ষ্যে পৌঁছুবার স্বার্থেই। অর্থাৎ

মেনে নেয়াটি শেষ বা মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সত্য ও সঠিক জ্ঞানের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও যথাযথ উপায়ে তার প্রচার ও প্রসার করা যা সকল মানুষকে একদিন সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে।

বস্তুত 'সত্য' আপতদৃষ্টে মনে হওয়া কোন প্রতীক, মূর্তী বা আল্লাহর অংশীদারিত্বের যতটা না বিরোধীতা করে তার চেয়েও অধিক বিরোধীতা করে মূলত অজ্ঞতা, নির্জ্ঞানতা, উদাসীনতা, মুর্খতা এবং সর্বপরি আত্মবিশ্বাসহীন আচরণের। অজ্ঞতা বা মূর্খতা থেকেই আত্মবিশ্বাসহীনতার সৃষ্টি।

কোরআন যখন আল্লাহতে বিশ্বাসের কথা বলে তখন তা প্রকারান্তরে বা প্রচ্ছন্নে আত্মবিশ্বাসের কথা বলে। নিজের ওপর নিজের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতা ভিন্ন এ বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়। বস্তুত এ আয়াত মানুষের আত্মবিশ্বাসের উৎস সম্পর্কে সূত্র ধরিয়ে দেয়।

আল্লাহকে ভালবাসলে মানুষ ধীরে ধীরে তাঁর পরশ লাভ করে। সে পরশে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতে শুরু করে। তাঁর মহাত্মকে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে। মানুষ আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দানের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এবং তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। এ অবস্থায় মানুষ নিজেকেও সন্মান করতে শেখে। কেননা আল্লাহর পরশ তার ভেতরেই বিদ্যমান সেটা সে বুঝতে শেখে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অত গভীরের ভাবনা ভাববে না।

অজ্ঞতা থেকে ভূল ধারণায় বিশ্বাসী বা কোরআনের ধারণায় অবিশ্বাসীদের কখনও না কখনও আলোর পথে ফিরে আসতেই হবে এবং সেটি হতে হবে মস্তিষ্কে জ্ঞান প্রবেশের মাধ্যমে যদি না অহমবোধ বাঁধা হয়ে দাড়ায়। সে আলোকে কাজ করাই একজন যথার্থ মানুষের বা মুসলিমের কাজ; যদিও বিষয়টি সময়সাপেক্ষ।

এ আয়াত আল্লাহর প্রতি কোনরূপ অংশীদারী আরোপ না করার বিষয়ে প্রার্থনাকারীর ভেতরের জ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত ও সংকল্পকে প্রকাশ করে। আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ অংশীদারী আরোপকরণকে বর্জন করার শিক্ষা দেয়। বারংবার এর উচ্চারণ মানব অন্তরকে বিষয়ের যৌক্তিকতা বিষয়ে সন্তুষ্টির পথে নিয়ে আসতে সহায়তা করে। আবার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তিযুক্ততার প্রচার ও প্রসারও ঘটায়। সমাজে বার্তা পৌঁছে যায়। মানুষকে ভূল পথ থেকে সঠিক

পথে বা সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের পথে আসতে তাদের চিন্তা-চেতনা ও বিবেককে জাগ্রত করে। অন্যথায় মানবজাতিকে এর নানাবিধ কু-ফলের মধ্যে পতিত হতে হবে। বাস্তবে মানুষ তেমন বিপদের মধ্যে বর্তমানে ডুবেও আছে।

আমরা জাগতিক সু-শাসনের যে সমস্যাগুলি দেখি তা এরই ফলাফল। কিন্তু বিষয়গুলিকে অনেকেই যথাযথ জ্ঞানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পরছে না। আবার যারা পারে বা বিষয়গুলি বোঝে তারা অজ্ঞদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানাবিধ সুবিধা লুটে নিচ্ছে।

কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার অপর অর্থ হচ্ছে তাঁর সঙ্গে কাউকে 'শরীক' না করা। যা 'শিরক' এর পাপ হিসেবে পরিচিত। ইসলাম ধর্ম মতে যা গর্হিত কাজ। বস্তুত নির্জ্ঞনতাই পাপ। আল্লাহর সঙ্গে কারও বা কোন কিছুর অংশীদারী আরোপকরণকে কোরআনে তাই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা সমাজ, সংসার ও জগতে বাস্তবিকই এর বহুবিধ ক্ষতিকর দিক আছে।

বলা হচ্ছে 'শিরক' একটি মাহাপাপ। আল্লাহ সব পাপ মাফ করলেও এ একটি পাপ মাফ করেন না। কেননা এটি সকল পাপের উৎস। কেন এটিকে সকল পাপের উৎস বলা হচ্ছে?

'শিরক' মানুষকে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিপরীতে চালনা করে। সত্য ও ন্যায়কে সমাজে উঁচু হয়ে দাড়াবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে কাজ করে। মানুষের আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়। মানুষকে হীনমন্য করে তোলে। অথচ সত্য হচ্ছে, একমাত্র আত্মবিশ্বাসীই আল্লাহর পরশ লাভ করে। তেমন মানুষই নিজেকে বা আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতে পারে। ভেতরটাকে জানতে পারে।

'শিরক' এর পাপের কারণে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষাকেও হারিয়ে ফেলে। সত্য বলার সাহস হারিয়ে ফেলে। নানান ছল-চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসহীন মানুষদের কাজে লাগিয়ে 'শিরক' এর প্রবক্তা ও অনুসারীরা অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয়। 'শিরক' মানুষকে নিজ শিরঃদাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। পরনির্ভরশীলতার শিক্ষা দেয়। তাতে অভ্যস্ত করে তোলে।

'শিরক' মহাপাপ এ কারণে যে, এটি বাস্তবিক অর্থে বড় বড় পাপের উৎস ও প্রশ্রয়দাতা। ক্ষমতাশালী ও সুযোগ সন্ধানিরা 'শিরক' এর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে, ধোঁকা দিয়ে অনেক অবৈধ ও অনৈতিক

সুবিধা লুটে নেয়। সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। সমাজে পাহাড় পরিমাণ বৈষম্য সৃষ্টি করে একে কাজে লাগিয়ে। অসহায় মানুষকে উৎপীড়ন-নির্যাতন করার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে 'শিরক'। আল্লাহর নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে সুবিধাবাদীদের জন্য সুবিধাজনক নিয়ম প্রবর্তনের উছিলা হয়ে কাজ করে 'শিরক'। তাই এটি সকল পাপের উৎস। বিষয়গুলি যথাস্থানে আলোচনায় আসবে [এ প্রসঙ্গে লেখকের 'আইডিয়াস এন ভিউস' বইয়ের 'একটি ভ্রম সংশোধন' লেখাটি দ্রষ্টব্য]।

সূরা ফাতেহা কোরআন পাঠের শুরুতেই মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে দিক-নির্দেশনা দেয়। তাই সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তার সাথে কেবলমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলে।

কেন আমরা আল্লাহর উপাসনা করি বা করব সে বিষয়ে আলোচনার শুরুতেই কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। মানব মনের আকুঁতির কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা তুলে ধরতে চাই।

প্রশ্নের প্রথম ও প্রাথমিক উত্তর হতে পারে যে, আমরা উপাসনা করি কেননা এটি সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর নির্দেশ। একজন বিশ্বাসী যেহেতু আল্লাহকেই তার নিজের ও সমগ্র জাহানের হর্তাকর্তারূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, অতএব তাঁর নির্দেশ পালন করতেই হবে। তাতে সে উপকার প্রাপ্ত বা পুরস্কৃত হবে, অন্যথায় শাস্তিতে পতিত হতে হবে। তাই উপাসনা করতে হয়।

অর্থাৎ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারীতা বুঝি কিংবা না বুঝি, কাজটা কোন প্রাপ্তির আশা থেকে নয়ত কোন শাস্তির ভীতি থেকে করে যাচ্ছি। এ কাজে কোন আন্তরীকতা নেই। নেই হৃদয়ের সিক্ত অনুভূতি। আল্লাহর নির্দেশ তাই পালন করতে হবে। স্কুল জীবনে যেমন মন না চাইলেও শ্রেণী শিক্ষকের নির্দেশ পালন করতে হত বিষয়টি তেমন। অর্থাৎ একটি বাধ্য-বাধকতা। যার থেকে এ জীবনে নিস্তার নেই। এর কোন ব্যাত্যয় হবে না বা হতে পারবে না। কোনরূপ বিতর্ক ব্যাতিতই আমরা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন করে চলেছি।

ওপরে উদ্ধৃত উত্তরের ক্ষেত্রে সম গুরুত্বসম্পন্ন দু'টি বিবেচ্য বিষয় আছে। প্রথমত: এটিও ফেলে দেয়া যাবে না যে বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশ তাই পালন করি এবং করতে হবে। এ চেতনা না থাকলেও আল্লাহর নির্দেশ পালন করার কোন অর্থ হয় না বা সমগ্র দর্শন অনুযায়ী চলেও কোন ফল প্রাপ্তি হবে না।

আল্লাহকে দ্বিধাহীন চিত্তে মানতে হবে। তাঁর প্রতি ভীতি, প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা এবং বিশ্বাস ও ভরসা থাকতেই হবে। দর্শনের প্রয়োজন বিবেচনায় ও সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে এটিও গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত: এটিও বুঝতে হবে যে আল্লাহ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রয়োজন বা গুরুত্ববিহীন কোন নির্দেশনা জারি করেন না। তাঁর প্রতিটি নির্দেশনার পেছনে কারণ নিহিত আছে। সেখানে আছে সত্য বা সূত্র। কিন্তু সবাই সে সূত্র বুঝতে যাবে না বা সবার সেটি বোঝার প্রয়োজনও নেই। তবে কিছু মানুষের জন্য সেটি বোঝারও প্রয়োজন আছে। কিছু মানুষ সেটি না বুঝলে এ জগত যথাযথভাবে সচল থাকতে পারবে না।

মহান আল্লাহ, বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তা অযথা কোন নির্দেশনা জারি করেন না। তাঁর প্রতিটি কর্মকান্ডের কারণ আছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা তাঁর কারণহীনতারও কারণ আছে।

তিনি কেন এমন নির্দেশনা দিয়েছেন? অর্থাৎ উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলেছেন? তিনি মানবের জন্য এর পরিপালনের উপকারীতা ও পালন না করার অপকারীতা বা ফলাফল বিষয়ে জানেন। উপাসনার অনেক কারণ ও মঙ্গলকর দিক আছে। প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা করি।

যিনি সবকিছু দান করেন তাঁকে তুষ্ট বা সন্তুষ্ট রাখা কর্তব্যের মধ্যে পরে। তিনি সেটি চান কিংবা না চান প্রক্রিয়াটি এমন। এটি কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ। এর ফলেই দাতার অনুগ্রহ বা রহমত লাভের দ্বার উন্মোচন হয়। খুব সাধারণ সূত্র। মানুষ নিজেকে দিয়েও এ সূত্রের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

‘আমরা তোমারই উপাসনা করি’- আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কারণে বিশ্বাসী তথা মানবজাতি এ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করে আল্লাহ এভাবেই মানবজাতিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শিক্ষা দান করেছেন।

জাগতিক শান্তি রক্ষার স্বার্থে মানুষের পারস্পরিক করা আচরণের ক্ষেত্রেও কৃতজ্ঞতার এ একই রীতি বা সূত্র অনুসরণীয়। এগুলি শান্তির পথ। আল্লাহ সে পথই প্রদর্শন করেছেন। মানুষের পরস্পরের প্রতি করা সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি একটি শিক্ষা। গীতায়েও একই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতার বিপরীত হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ভয়ঙ্কর। আল্লাহর রুদ্ররোষ থেকে নিজেদেরকে ও প্রজন্মকে রক্ষা করারও একটি দায়িত্ব আছে। মানুষ নিজেকে দিয়েও বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আল্লাহর গুণাগুণসমূহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মানবের মাঝেও বিদ্যমান। আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতাবোধের পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে যদি না তিনি তা ক্ষমা করে দেন।

তিনি ক্ষমাশীল এই ভেবে এ ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। যদি তিনি ক্ষমা না করেন? তিনি কোন কারণে কি করবেন সেটি তিনিই ভাল জানেন। তাঁর জ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই উত্তম। তাই কিছু নিয়ম পালন করেই চলতে হয়। এবাদতের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতার ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে আমরা নিজেদেরকে ও প্রজন্মকে রক্ষা করি। এবাদতের মাধ্যমে আমরা তাঁর সপ্রশংস মহাত্ম বর্ণনা করি। তাঁকে তুষ্ট করি। এটি করা প্রয়োজন। মানুষ নিজেদের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেও এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।

উপাসনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে সবসময় স্মরণে রাখি। তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলি যা ভেতরে সব সময় তাঁর উপস্থিতির উপলব্ধিকে উজ্জীবিত করে রাখে। তাঁকে ভূলে যাই না। তার নির্দেশিত ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই না। মন্দ কর্ম থেকে নিজেকে বা নিজেদেরকে নিবৃত রাখতে সক্ষম হয়ে উঠি।

উপাসনা অন্তরকে জাগ্রত রাখে, সচেতন করে রাখে। তিনি বিরাজ করেন প্রতিটি জীবের ভেতরে, অন্তরে। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ...।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

গীতায় বলা হয়েছে, "আমি সকলের হৃদয়ে স্থিত ...।" (গীতা ১৫:১৫)

প্রত্যেকের ভেতরেই তার উপস্থিতির উপলব্ধিবোধ আছে বা থাকে। স্মরণ বা চর্চ্চার মাধ্যমে সেটিকে জাগিয়ে বা উজ্জীবিত করে রাখতে হয়। উপাসনা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের, তাঁর থেকে প্রত্যাশিত গুণের পরশ লাভের একটি উপায় হয়ে কাজ করে যা মানুষকে তার প্রত্যাশিত গুণে গুণান্বিত করে তোলে।

আলোকিত করে দেয়। ভেতরে সাহসের সঞ্চার করে। সাহস ভিন্ন কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

বৈচিত্রময় মানবজীবন ও বিশ্বজগতের সবই আনন্দময় যদি মানুষ আনন্দ নিতে জানে। আল্লাহ নিজেই অফুরন্ত দান করেছেন। তিনি মানুষের ভোগ-উপভোগকে অনুমোদন করে দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"বল: আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার মাঝে তারা (মানুষ) উৎফুল্ল থাকুক।" (আল-কোরআন ১০:৫৮)

সব কিছুরই একটা শেষ আছে। উৎফুল্লতারও শেষ আছে। আছে একঘেঁয়েমি। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন আনন্দপূর্ণ জীবনও চিরকালের জন্য সুখকর নয় বা হয় না বা হতে পারে না। একসময় মনে হতে পারে এসবের অর্থ কি? আর কত? লাভ কি ইত্যাদি। অন্তরাত্মা কখনও বিচলিত হয়ে উঠতে পারে। হতাশা নেমে আসতে পারে জীবনে। ভাল না লাগা কাজ করতে পারে। মানসিক এমন অবস্থাজনিত কারণে কিছু মানুষ আত্মহননের পথও বেছে নেয় বা নিতে পারে।

মনের এমন অবস্থায় আল্লাহর স্মরণই সুখকর, আনন্দময়। যা আমরা উপাসনার মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এ সুখ কখনই নিঃশেষ হবার নয়। বলা হচ্ছে,

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমুহ প্রশান্তি লাভ করে।" (আল-কোরআন ১৩:২৮)

পথ খুঁজে না পাবার কারণে কেউ হয়তবা ওপরোক্ত কথাটির মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি নাও করতে পারে। আর পারবে না তারা যাদেরকে আল্লাহ নিজেই বঞ্চিত করে রেখেছেন। তবে এটি সত্য যে, আল্লাহর স্মরণ অত্যান্ত প্রশান্তদায়ক! এ প্রশান্তি নিঃশেষ হবার নয়।

'আমরা তোমারই উপাসনা করি'- আল্লাহর উপাসনা করা এক অর্থে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যেকে বর্জন করার একটি সংকল্পও বলা যেতে পারে। কেননা এ দর্শন সে-ই গ্রহণ করে যে আল্লাহর পথ ও নির্দেশনাকে মেনে নিয়েছে বা অন্যকথায় মেনে চলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত। আর আল্লাহর পথ বা কোরআনের দিক-নির্দেশনা হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। যে কোন প্রকার

মন্দকাজ বর্জন করে চলা। এসবের মনস্তাত্বিক মূল্য আছে যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের দিক-নির্দেশনা যে মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে বলে- এ গ্রন্থে সে বিষয়টিই গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। যেন বিষয়টি মানুষের মাঝে তথা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলের কাছে সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং এ বিষয়ে কারও মাঝে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ না থাকে। বাস্তবের ব্যাত্যয় মানবীয় ত্রুটি, দর্শনের নয়।

'আমরা তোমারই উপাসনা করি'- প্রার্থনার ধরণটি এখানে এমন যেন প্রার্থনাকারী বা বিশ্বাসী সকল মানুষের তথা ভাইয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে আল্লাহর সম্মুখে তুলে ধরেছে, স্বীকার করেছে এবং প্রকাশ করছে। ব্যাক্তি হিসেবে কেউ সে উপলব্ধিবোধে পৌঁছুক কিংবা না পৌঁছুক তার পক্ষ হয়েও এটি বিশ্বাসীর হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ এক ভাই অপর ভাইয়ের অজ্ঞতা সত্বেও তার হয়ে এ দায়িত্ব পালন করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয় বিবেচনায় নেন।

প্রসঙ্গক্রমে উপাসনা বিষয়টিকে নিয়ে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে চাই। প্রচলিত নিয়মে আমরা যাদেরকে নিয়মিত এবাদত বা উপাসনা করতে দেখি না আল্লাহ কি তাদের প্রতি সদয় নন? তিনি কি তাদের প্রতি তাঁর দয়া, অনুগ্রহ বা রহমত বর্ষন করেন না? কিংবা তাদের ভেতরে কি আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাশিত গুণাবলী উজ্জীবিত নেই বা হয় না?

সত্যি বলতে বাস্তবেও দেখা যায় যে অনেকের মাঝে নিয়মিত এবাদতকারীর চেয়েও জীবন উচ্চমাত্রায় উজ্জীবিত থাকে। এমনকি যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয় তাদের মধ্যেও! সত্য হচ্ছে আমাদের চোখের দেখাই সব না। আল্লাহ জানেন কে সত্য ও সঠিক পথে আছে এবং সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই উপাসনা বা এবাদত পালন করতে হয়। আল্লাহ বলেন,

"সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম ... স্বর্ণ নির্মিত অলংকার। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার মাত্র।

পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ, তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৩-৩৫)

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সত্যের পথ অবলম্বন করা। বস্তুত সে কারণেই এত রীতি-নীতি, নিয়ম-বিধি এত এবাদত-উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এবং সে কারণেই বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যে সত্যের পথ অবলম্বন করে বস্তুত সে আল্লাহর পথই অবলম্বন করে। সেই প্রকৃত বিশ্বাসী। তার কর্ম ও আচরণই সে সত্যের প্রমাণ দেয়।

সাধারণ চোখের দেখায় যাদেরকে আমরা প্রতিনিয়ত এবাদত করতে দেখি, এমনকি তাদের সকলেই এবাদতের সে মাত্রায় পৌঁছাতে পারে না যে মাত্রায় পৌঁছালে সত্যিকার এবাদত হয়। যা নিজেকে সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে। অপরদিকে যাদেরকে প্রচলিত নিয়মে প্রতিনিয়ত এবাদত করতে দেখি না তাদের মধ্যেও অনেকেই কিন্তু তাদের নিয়মে এবাদত করে এবং উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যায়। তাদের এবাদত তাদেরকে সত্যের পথে দৃঢ় অবস্থানে থাকতে সহায়তা করে। বস্তুত সত্যের পথে দৃঢ় অবস্থানে থাকাটিই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যেই আল্লাহর এবাদত করতে হয়।

এবাদতের আছে বিভিন্ন ধরণ। এখানে সে আলোচনার অতি বিশ্লেষণে যাব না। প্রচলিত নিয়মে যেভাবে আমরা এবাদত করি বা যেটিকে আমরা এবাদতস্বরূপ বুঝে থাকি কেবল সেটিই এবাদত বা উপাসনার একমাত্র পদ্ধতি নয়। বিষয়গুলিকে জ্ঞানের আলোকে বুঝতে হবে। সবাইকে বুঝতে হবে না। কিছু মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে।

আল্লাহকে হৃদয়ে যে কোনভাবেই ধারণ ও স্মরণ করা যায়। তবে বৃহৎ ও সাধারণ জনগোষ্ঠির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উপাসনার প্রচলিত ব্যাবস্থা একটি সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য নিয়ম। যে নিয়ম অবশ্য পালনীয়। অবশ্য পালনীয় এ জন্য যে নিয়মের লংঘন সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তথাপি এ বিষয়ে আরও কিছু বোধের জাগরণের প্রয়োজন আছে। সত্যকে বোঝার আছে। বলা হচ্ছে,

"তুমি কি দেখনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে? প্রত্যেকেই তার উপাসনা ও মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি জানে। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ২৪:৪১)

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে এবং এমন একটি কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে না। কিন্তু তাদের মহিমা প্রকাশকে তোমরা উপলব্ধি/অনুধাবন করতে পার না।" (আল-কোরআন ১৭:৪৪)

"তুমি কি দেখনি, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে এবং যা কিছু আছে ভূ-মণ্ডলে; সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেক ...।" (আল-কোরআন ২২:১৮)

'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এসবের মাঝে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে।' গাছ, লতা-পাতা প্রত্যেকেরই জীবন আছে। তারাও আল্লাহর এবাদত করে। সে নিয়মেই সবকিছু সৃষ্ট। তারা কি মানুষের নিয়মে এবাদত বা উপাসনা করে? বলা হচ্ছে, 'প্রত্যেকেই তার উপাসনা ও মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি জানে।'

এবাদতের আছে বিভিন্ন ধরণ। সাদা চোখে যাদেরকে আমরা উপাসনা করতে দেখি না তারাও উপাসনা করে। বুঝতে হবে যে, বস্তুত সবই আল্লাহর ইচ্ছে ও অনুমোদন সাপেক্ষ বিষয় এবং আল্লাহর দ্বারা গ্রহণ করে নেয়া বা না নেয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, মানুষ ও অপরাপর প্রাণী বা গাছ-পালা, পশু-পাখি তো এক নয়। তাদের ও আমাদের এবাদত বা মহিমা প্রকাশের ভঙ্গি তো এক হবে না! এটিই তো স্বাভাবিক! তাহলে এখানে এ তুলনা কেন তুলে ধরা হচ্ছে? অন্তত সকল মানুষের এবাদতের ধরণ তো এক হতে হবে।

ওপেরোক্ত ভাবনাটিও যথার্থ। তবে এ কথাও সত্য যে মানুষ যেমন এক প্রকারের প্রাণী তেমনি পশু-পাখি, গাছ-পালাও প্রাণী। সকলে প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে থাকে।

অপরদিকে সব মানুষ দেখতে একই রকম। অথচ মানুষের মধ্যেও রকমভেদ আছে। কারও পাষান হৃদয়, কারও হৃদয় মমতায় ভরা। মানুষের মধ্যে পাথর হৃদয়ও আছে। অথচ দেখতে সব একইরকম মানুষ। সকলেই জীব বা প্রাণী হওয়া সত্বেও যেমন তাদের উপাসনার ধরণে ভিন্নতা আছে, তেমনি সব মানুষ মানুষ হওয়া সত্বেও তাদের উপাসনার ধরণে ভিন্নতা আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু সবাই বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে চেষ্টা করি না। সবাই সকলের করা এবাদতকে অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পারি না। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সকলেই বিধাতার বিদ্যমানতাকে স্বীকার করে কি-না এবং স্বীকার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে মস্তক অবনত করে কি-না সেটি। সত্য হচ্ছে, সকলেই করে।

আমরা প্রত্যেকেই মানুষকে বুঝি নিজেদের মতো করে। বাহির থেকে যেভাবে দেখি সেভাবে ভাল-মন্দ বিচার করি। কিন্তু মানুষ না জানলেও আল্লাহ সকলের ভেতর-বাহির সব জানেন। তিনি সকলের অন্তরের গোপন ভাবনাও জানেন। একইরকম হোক কিংবা ভিন্ন রকম হোক তিনি জানেন কে সত্যিকার এবাদতকারী, কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং কে অকৃতজ্ঞ। বস্তুত তাঁর জানাটিই গুরুত্বপূর্ণ।

ওপরে এতগুলি কথা কেন বলতে হল? বলতে হল এটি বোঝাবার জন্য যে, যাদেরকে আমরা উপাসনা করতে দেখি এবং যাদেরকে উপাসনা করতে দেখি না, চোখের দেখার এ পার্থক্য সত্বেও সবাই একজনারই উপাসনাকারী। ব্যাহ্য দৃষ্টিতে আমরা সব দেখতে পাই না। অন্তর এবাদত করে।

একজন বিপদগ্রস্ত বেশ্যার অন্তরও আল্লাহকে স্মরণ করে। সংস্কৃতি কর্মীও আল্লাহর এবাদত করে। সে নিয়মেই এ জগত সৃষ্ট। বস্তুত ভেতরে আরও অনেক ক্রিয়া আছে। বলা হচ্ছে,

“নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, ঠিক যেমনিভাবে তাদের ছাঁয়া সকালে ও সন্ধ্যায় পতিত হয়।” (আল-কোরআন ১৩:১৫)

সৃষ্টির সূত্র বা নিয়মটিই এমন যে এটি হতে বাধ্য। ইচ্ছে হোক কিংবা না হোক সৃষ্টি তার স্রষ্টার তথা আল্লাহর সেজদায় পতিত হতে বাধ্য। যেমন ছাঁয়া

মাটিতে পড়তে বাধ্য। আল্লাহ সেভাবেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন! যদিও অনেকে সেটি উপলব্ধি করতে পারে না।

মানুষকে আমরা সাদা চোখে এবাদত করতে দেখি না যখন তার দেহকে এবাদতের প্রচলিত ঢং বা ধরণে নড়াচড়া করতে দেখি না। কিন্তু তার হৃদয়? তার মস্তিষ্ক, তার ভাবনা, তার চিন্তা?

প্রচলিত ধরণের এবাদতের মধ্যেও একজন কু-চিন্তায় মশগুল থাকতে পারে। ষড়যন্ত্রের হিসেব-নিকেশ করতে পারে। অবৈধ অর্থ উপার্জনের চিন্তা করতে পারে। আবার আড্ডার মধ্যে থেকেও কেউ এবাদতে মশগুল থাকতে পারে। বাহির থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। চোখের দেখাই সব না। বিচারের ভার তাই অন্তর্যামীর ওপর।

আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনি জানেন সব। আল্লাহর বিচার-বিবেচনা ও মানুষের বিচার-বিবেচনা এক নয়। যদি এক হত তাহলে আল্লাহর বিচারের আর প্রয়োজন হত না। আল্লাহর বিবেচনায় মানবের অন্তরের ইচ্ছে ও ‘নিয়ত’ প্রাধান্য পাবে। মানুষের পূর্বাপর তথা পরিপূর্ণ জীবনের হিসেব বিবেচনায় আসবে। তার ভাল-মন্দ কর্মসমুহের গুরুত্বও বিবেচিত হবে। পরিশেষে তাই সকলকে এবং সব কিছুকে আল্লাহর ফয়সালার কাছে যেতেই হবে। তাই বলা হয়েছে,

“বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য।” (আল-কোরআন ২:২১০)

ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, চেতনে কিংবা অবচেতনে সকলের মস্তিষ্ক ও হৃদয় আল্লাহর ভাবনা ও এবাদতে মশগুল। সবাই আমরা সব বুঝতে পারি না। ছাঁয়ার উদাহরণ এজন্যই তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টির সূত্রটিই এমন যে না চাইলেও সময়ের সাথে সাথে ছাঁয়ার সূত্রের মতো সকলে আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। এর অন্যথা করার সক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি। এটি হতে বাধ্য।

অমরা জ্ঞানত বা স্বেচ্ছায় আবার অনিচ্ছায়েও আল্লাহরই এবাদত করি। সবাই সব বুঝতে পারি না। বোঝার প্রয়োজনও নেই। যার এবাদত করা হয়

তিনি বুঝলেই যথেষ্ট। অন্তর এবাদত করে। তাই এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বা বিবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়। বলা হচ্ছে,

“প্রত্যেক জাতি/সম্প্রদায়ের জন্যই আমি উপাসনার নিয়ম-বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিবাদ না করে। তুমি তাদেরকে তোমার পালনকর্তার দিকে আহবান কর। নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) সরল পথেই আছ। যদি তারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করে তবে বল: তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ ভালভাবে জ্ঞাত। তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।” (আল-কোরআন ২২:৬৭-৬৯)

এবাদত বা উপাসনা বিষয়টি নিয়ে কারই কোনরূপ অহম প্রদর্শন করা সমীচীন নয়। যেমন কে বেশী এবাদতকারী বা কে কম এবাদতকারী; কিংবা কে শুদ্ধ এবাদতকারী বা কে অশুদ্ধ এবাদতকারী ইত্যাদি।

একইভাবে না জেনে-বুঝে কারও প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন বা কটাক্ষ করাও যথাযথ নয়। কে বেশ্যা, কে গান গায়, কে নাটক করে, কে নাচ করে এভাবে কাউকে কটাক্ষ করা উচিত নয়। প্রত্যেকেরই জীবনের গল্পে ভিন্নতা আছে। আল্লাহ সেভাবেই জগত সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে তোলার জন্য। শিক্ষার জন্য জগতের সবকিছুই প্রয়োজনীয়। এখানে সবাই তার নিজ নিজ জায়গা থেকে অবদান রেখে চলেছে। আর এই বিচিত্র সব কর্ম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমন করে পরিশেষে মানুষ যেটি জানতে পারে সেটি হল,

“আমার উপাসনা, আমার উৎসর্গ এবং আমার বেঁচে থাকা ও আমার মরণ সব আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।” (আল-কোরআন ৬:১৬২)

বস্তুত পার্থিব জগতে মানুষকে বিচিত্র সব পথ পাড়ি দিয়ে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরিশেষে সত্যের পথ চিনতে সহায়তা করা হয়েছে। জীবনের সকল তিক্ত রাস্তা পাড়ি না দিয়ে কেউই সহজ-সরল ও সোজা পথকে চিনতে পারে না। তা গ্রহণ করতেও অনুপ্রাণীত হয় না। শিক্ষার জন্য এখানে সবকিছুই প্রয়োজনীয় ও অতি মূল্যবান। আল্লাহর সৃষ্টির কোন কিছুই

অপ্রয়োজনীয় নয়। তাই কোন কিছুকে ঘৃণা করা সমীচীন নয়। তেমন শিক্ষায় কাউকে গড়ে তোলা উচিৎ নয়। কোন কিছুকেই উৎপাটন করার চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ নিজেই সেটি করেন নি। কেবল ভাল-মন্দ চিনতে ও বুঝতে হয়। অতঃপর এর মধ্যে থেকেও নিজেকে সঠিক পথে চলতে হয়। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি সকলকে তার দিক-নির্দেশনার মধ্যেই নিয়ে আসতেন। অতএব তুমি বোকাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।" (আল-কোরআন ৬:৩৫)

গভীর অনুধাবনের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ পাড়ি দিয়ে বস্তুত সকলের হৃদয় একজনের কাছেই নিজেকে সমর্পন করে। অতএব কারও অবস্থা, অবস্থান ও অন্তরকে না জেনে-বুঝে অপরকে নিয়ে যে কটাক্ষপূর্ণ কথা বলবে সে নিজেই আল্লাহর রচিত জালে নিজেকে আটকে ফেলবে। অতএব অহম প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সাবধান!

আল্লাহ জানেন সত্যিকার এবাদতকারীর অন্তর এবং তাঁর জানাটিই গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আজকের পরিপূর্ণ শুদ্ধ এবাদতকারীর পরিচয়দানকারীও একদিনেই শুদ্ধ এবাদতকারী হয়ে যাননি। তার পূর্ব-পুরুষেরা জগতের বহু বহু ভাল-মন্দ পথ পাড়ি দিয়েই তাকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

কি বা কার উপাসনা করতে হবে, ক'জনার উপাসনা করতে হবে, যার উপাসনা করতে হবে তাঁর কোন রূপের উপাসনা করতে হবে এসব বিষয়ে ধর্মগ্রন্থসমুহ যুগে যুগে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে এসেছে। আমরা কেউ বিশ্বাস করেছি কেউ করিনি। যারা বিশ্বাস করেছে তাদের বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি আছে। যারা বিশ্বাস করেনি তাদের অবিশ্বাস করার পেছনেও যুক্তি আছে। বস্তুত সবই জ্ঞান ও যুক্তির খেলা এবং সেখান থেকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস। জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলে যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অবিশ্বাসীদের জ্ঞান সম্পর্কেও কিছু উদ্ধৃত হয়েছে [দ্রষ্টব্য ১.১.১]।

কোন মহামানব বা দেবতা মানুষের উপাস্য হতে পারে না। কোন জ্বিন বা কোন মূর্তী উপাস্য হতে পারে না। অজানা উপাস্যের মনগড়া কোন আকার-আকৃতি প্রদানও জ্ঞানসম্মত নয়।

সত্যের তেমন জ্ঞানে জগতের সকল মানুষকে দৃঢ়তার সাথে প্রতির্ষ্ঠিত হতে হবে, যেন সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ মিথ্যে ও যা কিছু ভূল ও নির্জ্ঞানতার সাথে সম্পর্কিত তার ছোবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। যেন মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে জ্বিন, মূর্তী, দেবতায় বিশ্বাসী হয়ে পরনির্ভরশীল একটি অকর্মণ্য সৃষ্টিতে পরিণত না হয়। যদি মানবজাতির পরিণতি তাই হয়, তবে হয়তবা আল্লাহর কাছে তেমন সৃষ্টির আর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তাই বলা হয়েছে,

“যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তিনি তোমাদের অপসৃত করতে পারেন এবং কোন নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে পারেন।” (আল-কোরআন ৩৫:১৬)

প্রতিটি মানুষকে তাই নিজ শিরঃদাড়ায় দাড়াতে হবে। সত্যকে প্রতির্ষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে হবে। তার জন্য নিজেকে চিনতে-জানতে ও বুঝতে শিখতে হবে। তবেই আল্লাহকে চেনা সম্ভব হবে। তবেই নিজের সক্ষমতায় বিশ্বাস জন্মাবে এবং কারও ভয়ে ভীত না হয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ়চিত্তে অন্তরে ধারণ করা সত্যকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। অতএব নিজ জ্ঞানে সত্য কথা বলতে হবে। সমাজ থেকে মিথ্যে, অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন ও বৈষম্য দুর করার ক্ষেত্রে তবেই মানুষের ভূমিকা যথাযথ হবে। মানব সৃষ্টি সার্থক হবে। কারও বা কোনকিছুর উছিলা প্রদর্শন করে কেউ কাউকে ভীত কিংবা প্রতারিত করতে পারবে না।

যারা আজও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারেনি, কিংবা যারা সে ধারণায় আজও দৃঢ়চিত্ত হতে পারেনি, আল্লাহর পাশে যারা আজও কোন দেবতা, মূর্তী, জ্বিন বা মহামানবদের আরাধনা করে- ওপরের যুক্তিপূর্ণ আলোচনাসমূহকে তাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে, যেন জগতের সকল মানুষ জ্ঞান ও সত্যের পথে ফিরে আসে; অথবা তারা ওপরে আলোচিত অকাট্য যুক্তিসমুহের সত্যাসত্য খন্ডন করে নিজেদের বিশ্বাসেও অটল থাকতে পারে। বলা হচ্ছে,

"সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য! যারা আল্লাহ ব্যতিত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে (নিজেদের কার্যকলাপকে সঠিক প্রতীয়মান করার জন্য) তারা বলে, 'আমরা তাদের উপাসনা করি এ জন্য যে তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।' তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে আল্লাহই তার মিমাংসা করবেন।" (আল-কোরআন ৩৯:৩)

▪ **১.৪.২** আমরা কেবলমাত্র তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি (Thee alone we ask for help) : উপাসনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। যে স্মরণের অনেক অনেক উপকারীতা আছে। যার কিছু ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। উপাসনা বা এবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি। তাঁকে তুষ্ট করি, তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর মহাত্ম তুলে ধরি। আবার তাঁর কাছে কিছু যাচ্ঞা করি। তাঁর সাহায্য কামনা করি। আল্লাহর সাহায্য ব্যাতিত মানুষের একার পক্ষে চলা সম্ভব নয়; জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে মানুষ অবশ্যই সেটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের চাওয়া থাকে। সব চাওয়াকে এক বাক্যে পৃথকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এককথায় বা একটিমাত্র সংক্ষেপিতরূপে প্রকাশ করতে গেলে বলা যায় যে প্রত্যেকেই আমরা তাঁর কাছে কোন না কোন প্রকার সাহায্য কামনা করি।

'আমরা কেবলমাত্র তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি' অর্থাৎ আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি; আর কোথাও নয়, অন্য কারও কাছে নয়। কখন মানুষ কেবলমাত্র একজনের কাছেই সহায়তা কামনা করে? অন্য কোথাও যায় না?

সকল বিচার-বিশ্লেষণ শেষে জ্ঞান যখন এ বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, একজনই সকল কিছুর প্রকৃত দাতা- আর কেউই নয়, কেবল তখনই মানুষ একজনের কাছে যাচ্ঞা করে- প্রার্থনা করে। অতএব এ প্রার্থনা জ্ঞানত এক আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুরূপে বুঝতে পারার এবং তাঁর সাথে কোনরূপ অংশীদারীত্ব আরোপ না করারও একটি নির্দেশক। গীতায় বলা হয়েছে,

“দেবমূর্তী অর্চনকারী দেবোপাসকগণ ... আরাধ্য দেবতা থেকে যে সকল কাম্য বস্তু লাভ করে, বস্তুত সে সবই আমার দ্বারা বিহিত হয়ে থাকে।” (গীতা ৭:২২)

সবকিছুর দাতা একমাত্র আল্লাহ। যিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেন তিনি সে সত্যকে জ্ঞানত বুঝতে পেরেছেন। আবার সর্বদা এর উচ্চারণও চিন্তাশীল মাস্তিষ্ককে এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। অতএব এ প্রার্থনা যেমন আল্লাহকে সকল কিছুর হর্তাকর্তা জেনে-বুঝে করা হয়, তেমনি এ প্রার্থনা সত্যকে বুঝতেও সহায়তা করে।

‘আমরা কেবলমাত্র তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি’ বাক্যটি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসার প্রকাশ। প্রার্থনার এ ধরণ আল্লাহর ওপর বিশ্বাসী বা প্রার্থনাকারীর পরিপূর্ণ আস্থা ও সমর্পনকেও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছে। আর কোথাও নয়, কেবল আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করে দেয়া। তার ওপর ভরসা করা। আল্লাহ ভালবাসেন তাদের যারা তাঁর ওপর ভরসা করে। বলা হচ্ছে,

“... যখন কোন কাজের সংকল্প কর, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহ ভালবাসেন তাদের যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।” (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

কিছু মানুষ আল্লাহ ভিন্ন অপরাপরদের কাছেও সহায়তা কামনা করে। তাদের বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তারা মূর্তী, গুরু বা ধর্মগুরু, কোন মানব বা কোন মহামানব তথা দেবদেবী এমনকি জ্বিনদের সহায়তার আশ্রয়ও গ্রহণ করতে চায়। বস্তুত বিষয়গুলি নির্জ্ঞানতার সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহ ভিন্ন যাদের কাছে তারা যাচ্ঞা করে নিজের ওপর বিশ্বাস এলে বা আত্মবিশ্বাসী হলে তারা সেটি করবে না বা সেসব কর্ম পরিত্যাগ করবে। নিজের কর্ম ও প্রচেষ্টা দ্বারা তারা সকলকিছু অর্জন করার চেষ্টা করবে। তবে যথাযথ জ্ঞান ভিন্ন সে বিশ্বাস আসবে না। সে জ্ঞানটিও আবার আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদস্বরূপ। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণ শেষে তেমন জ্ঞান ভেতর থেকে আসে। যারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাববে না তারা এর যথাযথতা বুঝতেও পারবে না। এর জন্য অন্তরকে সত্যের সন্ধানী হতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে,

"স্বল্প জ্ঞানের দেবোপাসকদের প্রাপ্ত ফল অত্যান্ত সীমিত ও নশ্বর হয়।" (গীতা ৭:২৩)

যারা পরের দ্বারস্থ হয়ে কাম্য কিছু পেতে চায় তারা নেতানেত্রী, মহামানব বা দেবদেবীদের আরাধনা করে। যদি কিছু পায় তো প্রাপ্ত বস্তু হারিয়ে বা নিঃশেষ হয়ে গেলে পুনরায় তাদেরই দ্বারস্ত হতে হয়। কেননা সেটি তার নিজের অর্জন নয়। কিভাবে অর্জন করতে হয় তা তারা জানে না। তারা কেবল চাইতে জানে। অপরের দেয়া কোন কিছুর ফল তাই সীমিত ও নশ্বর হয়।

এমন আচরণ মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। বারবার সাহায্যের জন্য অপরের দ্বারস্ত হতে হয়। এভাবে নিজের সক্ষমতার বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায় না। মানুষ নিজে অর্জন করতে শেখে না। নিজের সক্ষমতা অর্জনের পথে এমন আচরণ প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে কাজ করে। তাই এগুলি বর্জনীয়।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য এমন কাজ ও আচরণ বেমানান। এটি আত্মবিশ্বাসহীনতা ও মূর্খতার প্রকাশ। তাই দেবোপাসকদেরকে গীতায় স্বল্প জ্ঞানের মানুষ বলা হয়েছে। তারা আল্লাহ কি জানে না। আল্লাহ তথা নিজের ওপর বিশ্বাসী হতে পারে না।

মানুষের নিজেদের কাজ বস্তুত নিজেদেরকেই করতে হয়। কেউ এসে করে দিয়ে যায় না। কেবল ভেতরটাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। সেখানেই আল্লাহ!

আল্লাহ মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণীত করেন। আত্মবিশ্বাসী যা অর্জন করে নিজ প্রচেষ্টায় অর্জন করে। তা কখনও হারিয়ে যায় না। কেননা জ্ঞানটি তার নিজের ও প্রচেষ্টাটিও তার অভিজ্ঞতা হয়ে নিজের কাছেই থেকে যায়। প্রয়োজনে নিজেই আবার সব গড়ে তুলতে পারে। অপর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। কেবল আল্লাহমুখী হতে হয়।

কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়া বা তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার মনস্তাত্বিক গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এটি নিজেকে নিজের ওপর বিশ্বাসী করে তোলে এবং নিজের ওপর নিজেকে ভরসা করতে শিক্ষা দেয়। বস্তুত মানুষ নিজের ওপর নিজে তথা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী হয়। মানুষ আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতে শেখে। আল্লাহ বিরাজ করেন প্রত্যেকের ভেতরে- হৃদয়ে।

জগতে আল্লাহ মানুষের একমাত্র সহায়। তাঁর স্মরণ বিপদে ও শঙ্কায় বিশ্বাসীর অন্তরে মনবল ও সাহসের সঞ্চার করে, হতাশায় আশার আলো দেখায়, চিত্তকে দৃঢ় রাখে, মানুষকে উজ্জীবিত করে, মানুষের জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করে। বারংবার এ বাণীর উচ্চারণ কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেকে নিজের জাগিয়ে তোলার উত্তম উপায় হয়ে কাজ করে। কিভাবে?

বস্তুত আল্লাহকে আমরা কেউই চিনি না, জানি না বা দেখি না। আল্লাহ সরাসরি এসে কাউকে কোন সহায়তাও করেন না। মানুষের নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। আমরা যখন আল্লাহর সহায়তা কামনা করি, বস্তুত তখন আমরা নিজের ভেতরে নিজের কাছে চাই। তিনি সেই নিজের সাথে সংযুক্ত। ভেতরে। হৃদয়ে। এটি নিজেকেই জাগিয়ে তোলে। নিজেকে নিজে উজ্জীবিত করার এটি একটি প্রক্রিয়া। নিজেই যোগ্য হয়ে গড়ে উঠি ও অর্জন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রার্থনাকারীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয় ও সহায়তাও করে। আল্লাহ অতি সন্নিকটে নিজের ভেতরেই বিরাজ করেন। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেও তিনি অতি সন্নিকটে। কিন্তু যথাযথ সাধনা ও জ্ঞানের অভাবে মানুষ তাঁকে খুঁজে পেতে ব্যার্থ হয়। বলা হচ্ছে,

"আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক সন্নিকটবর্তী।" (আল-কোরআন ৫০:১৬)

"পরম সত্য ... যদিও বহু বহু দুরে তথাপি সকলের অত্যান্ত নিকটবর্তী।" (গীতা ১৩:১৬)

বলা হচ্ছে, "তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

আমরা যা দেখি ও শুনি বলে মনে করি প্রকৃতপক্ষে তিনি তার সবই জানেন। অর্থাৎ তিনিই বিরাজ করেন প্রতিটি জীবের ভেতরে, অন্তরে। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ...।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

গীতায় বলা হয়েছে, “আমি সকলের হৃদয়ে স্থিত ...।” (গীতা ১৫:১৫)

তিনিই ভেতরে বিরাজ করেন। তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া মানে নিজেকেই নিজের জাগিয়ে তোলা। নিজেই নিজের কাম্য বিষয় বা বস্তু অর্জন করায় উদ্যেগী হওয়া। এটি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠতে ভূমিকা রাখে। আল্লাহর ধারণা ভিন্ন বিশ্বাসী নিজেকে জাগিয়ে তোলার সে মাত্রার প্রেরণা লাভ করতে পারে না। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে, যিনি ভেতরে বিরাজ করেন তথা নিজেকে) সাহায্য করে।” (আল-কোরআন ২২:৪০)

নিজেকে নিজের জাগিয়ে তুলতে হয়। আল্লাহর সংস্পর্শকে অনুভবে এমনভাবে নিয়ে আসতে হয় যেন ভেতরে তিনিই বিরাজ করছেন সেটি উপলব্ধ হয়। সকল সহায়তা তার নিকট থেকে আসে। ভেতর থেকে আসে। অন্তর জাগ্রত হয়। অন্তরে সাহসের সঞ্চার হয়। অন্তর প্রেরণা লাভ করে। মানুষ উদ্যেমী ও উদ্যোগী হয়।

এমনিভাবে মানুষ নিজেই যখন নিজের সহায় হয় বস্তুত আল্লাহই তার সহায় হন। কিংবা বলা যায় যে, আল্লাহ তারই সহায় হন যে নিজেই নিজের সহায় হয়। নিজের ভেতরেই আল্লাহ। নিজের ভেতরে নিজেই আল্লাহ যখন তাঁকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত পাওয়া যায়। তাঁর সামান্য ইচ্ছে ও পরশে মানুষ জেগে ওঠে; উজ্জীবিত ও প্রস্ফুটিত হয়। জেগে ওঠে তার সত্যিকারের রূপ, সৌন্দর্য্য ও সক্ষমতা! কর্মে স্বর্তস্ফুর্ততা আসে। বুদ্ধি ও জ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়। লক্ষ্য স্থীর হয়। কর্ম ও আচরণে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে চলে আসে। বলীয়ান হয়ে ওঠে মানুষ। সে সৌভাগ্য হয়তবা সবার হয় না। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ কেবলি একটি মৃত খোলস মাত্র। বিশ্বাসী ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে এ প্রার্থনা তাই অত্যান্ত গুরুত্ববহ। এটিই আত্মবিশ্বাসের উৎস।

নিজেকে নিজের সহায়তা করতে হয়। আল্লাহ বিরাজ করেন প্রত্যেকটি নিজের ভেতরে। আল্লাহকে সহায়তা করাই নিজেকে সহায়তা করা। নিজেকে সহায়তা করাই আল্লাহকে সহায়তা করা। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখা নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার অপর নাম। যার নাম ‘আত্মবিশ্বাস’। যারা আল্লাহতে

বিশ্বাসী হয় বস্তুত তারা আত্মবিশ্বাসী হয়। আল্লাহকে কেউ চেনেও না, জানেও না এমনকি যথাযথভাবে বোঝেও না। অথচ তাঁকে কেন্দ্র করে মানুষ নিজের ওপর নিজে প্রচন্ড বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বলা হচ্ছে,

"আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করা কর্তব্য। আত্মাকে অধঃপতিত করা উচিত নয়। আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার শত্রুও। যে আত্মার দ্বারা আত্মাকে জয় করতে পেরেছে আত্মাই সে আত্মার বন্ধু। কিন্তু যে আত্মা আত্মাকে বশ করতে পারেনি আত্মা শত্রুবৎ তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়।" (গীতা ৬:৫-৬)

অতএব নিজেকে নিজেরই সহায়তা করতে হয়। নিজেই নিজের শত্রু আবার বন্ধুও। যে যেভাবে নিজেকে জাগিয়ে তোলে। জড় দেহ নয়; আত্মাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। আত্মাই হচ্ছে 'নিজ'।

উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে মানুষ কিন্তু অপর মানুষের ও আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিসমুহের নিকট থেকেও সাহায্য নিয়ে থাকে। বুঝতে হবে যে, পরোক্ষে সেটিও আল্লাহর নিকট থেকেই প্রাপ্ত সহায়তা। কেননা সকল সৃষ্টিই আল্লাহর। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েও সহায়তা করেন। তথাপি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার এ বিষয়টিকে অপর কারও নিকট থেকে চাওয়া সহায়তার সাথে মিলিয়ে বা গুলিয়ে ফেলা যাবে না। আল্লাহর অপর কোন সৃষ্টির নিকট থেকে প্রার্থিত সহায়তা ও আল্লাহর কাছে সরাসরি যাঞ্চা করা সাহায্যের এ প্রার্থনার বিষয়টি এক নয়। কেন এক নয় সে বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি।

মানুষ যদি বেঁচে থাকে তবেই তার আল্লাহর অপরাপর সৃষ্টি থেকে সহায়তা প্রাপ্তির প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হতে পারে। অতএব সৃষ্টিসমুহের পারস্পরিক সহায়তা যাঞ্চার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা বা টিকে থাকাটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হচ্ছে ভেতরকে তথা নিজেকে জাগ্রত করা ও রাখা। যেটা জাগ্রত হলেই কেবল বেঁচে থাকা বা টিকে থাকা সম্ভব। তারপরেই সৃষ্টিসমুহের পারস্পরিক সহায়তার প্রসঙ্গটি আসে। নিজেকেই যদি বাঁচিয়ে রাখা না যায় তবে পারস্পরিক সহায়তার বিষয়টি আসে না।

আল্লাহর সাহায্যকে তাই বেঁচে থাকার সর্বশেষ পর্যায়ের উপলব্ধিবোধ থেকে উপলব্ধি করতে হবে। যেখানে বা যে পর্যায়ে মানুষকে সহায়তা করার আর কেউ নেই বা থাকে না। এ পর্যায়ে মানুষ নিজেকে ভীষনভাবে অসহায় ও

একা অনুভব করে। জাগতিক সর্বশেষ অবলম্বনটিও তার নিঃশেষ যায়। তখনই আল্লাহর সহায়তার প্রসঙ্গটি চরমভাবে উপলব্ধ হয়।

দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভর করে, আল্লাহকে স্মরণ করে ভেতর থেকে তাঁকে তথা নিজেকে উজ্জীবিত করে নিজ প্রচেষ্টায় নিজেকে নিজে উদ্ধার করে জীবন ফিরে পাবার পরেই অপরাপর সহায়তাসমুহের প্রসঙ্গগুলি আসে। সর্বশেষে মানুষ এভাবেই নিজেকে নিজে জাগিয়ে তোলে আল্লাহর সহায়তা নিয়ে এবং নিজেই নিজেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সফল হয়। প্রকৃত অর্থে এটিই আল্লাহর সহায়তা। আল্লাহই রক্ষাকর্তা। তিনিই শক্তিদাতা। বুদ্ধি ও জ্ঞানদাতা। আল্লাহ নিজে এসে কাউকে সহায়তা করেন না। আল্লাহ এভাবেই সহায়তা করেন। এভাবেই তিনি নিজে আবির্ভূত হন। এ বিশ্লেষণগুলিই হচ্ছে প্রকৃত 'সত্য' কিংবা বলা যায় যে, 'রূঢ় সত্য'। তথাপি মনে রাখতে হবে যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"সকল কর্ম সম্পাদনের পেছনে পাঁচটি কারণ আছে বলে বলা হয়। তন্মধ্যে পঞ্চম কারণ হচ্ছে 'দৈব'।" (গীতা ১৮:১৩-১৪)

অতএব দৈবক্রমেও আল্লাহর সাহায্য লাভ হয়। সেটিও বিশ্বাস রাখতে হবে। এ বিশ্বাসও সংকটকালে সাহসের সাথে চিত্তের দৃঢ়তা ধরে রাখতে নিজেকে সহায়তা করে।

যেখানেই আল্লাহর সাহায্যের প্রসঙ্গ আসবে সেখানেই বিষয়গুলিকে এমনিভাবে চরম বা সর্বশেষ পর্যায় থেকে বুঝতে হবে। বাস্তবেও দেখা যায় যে, সকল মানুষই একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে একবারের জন্য হলেও সেই আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড ইত্যাদিকে স্মরণ করে বা করতে বাধ্য হয়, যখন পাশে আর কেউই থাকে না বা কাউকেই পাওয়া যায় না। এর পূর্ব পর্যন্ত অনেকের সহায়তাই মানুষ কামনা করে। শেষ পর্যায়ের এ উপলব্ধিবোধকে সকলের বোঝার সুবিধার জন্য কোরআনে বিষয়টিকে নিচের উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

"যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে, তখন আল্লাহ ব্যাতিত অপরাপর যাদেরকে আহবান কর তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি

যখন তোমাদেরকে স্থলভাগে উদ্ধার করে আনেন, তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না, অথবা তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন রক্ষাকর্তাকে পাবে না। অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? সাহায্যকারী হিসেবে তখন তোমরা আমার বিপরীতে কাউকেই পাবে না।” (আল-কোরআন ১৭:৬৭-৬৯)

জীবনের কোন এক পর্যায়ে বা কোন না কোন সময়ে তথা দুঃসময়ে বা ক্রান্তিলগ্নে মানব জ্ঞান মানুষকে তার ক্ষুদ্রত্ব ও অসহায়ত্বকে বুঝতে সহায়তা করে। পারস্পরিক সকল বন্ধন থেকে নিজেকে মানুষ একা ও বিচ্ছিন্ন দেখতে পায়। সকলে হয়তবা সে অভিজ্ঞতার মুখোমুখী নাও হতে পারে। ফলে সকলের পক্ষে সে উপলব্ধিতে পৌঁছান হয়তবা সম্ভব না। তবে যারা জাগতিক সকল কর্মকান্ডের পরিণতির বিচার-বিশ্লেষণ করেন, বিষয়গুলি তাদের কারও কাছে এমনিভাবে ধরা দিতেও পারে। তেমন ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকেন শুধুমাত্র সৃষ্টি, লালন-পালন ও সংহারকর্তা ‘আল্লাহ’।

মানুষ তার সর্বশেষ ভরসাস্থল বা আশ্রয়দাতারূপে তখন কেবল সৃষ্টির্তাকেই খুঁজে পায়। এমতাবস্থায় মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পন করে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। কারও ধারণায় সেটি অন্য কিছুও হতে পারে। অর্থাৎ যার জ্ঞান যেমন। তবে শেষ পর্যায়ে কোথাও না কোথাও সে নোঙ্গর করেই। সেখানেই ‘তিনি’।

অসহায় পিপড়ে যেমন জলাধারে নিরুপায় হয়ে একটি পাতার ওপর ভেসে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার শেষ চেষ্টাটি করে বিষয়টিকে সেভাবে ভাবা যেতে পারে। একমাত্র অবলম্বন। একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থান। ভালবাসার স্থান। সেখানেই তৃপ্তি। সেখানেই শান্তি ও আনন্দ। আত্মা তেমন অবস্থায় কেবল ভরসার জায়গাটিতে মগ্ন থাকে। অন্য সবকিছুকে অর্থহীন দেখতে পায়।

জগতের সকল আস্ফালনই যে মিছে মরীচিকা জ্ঞান সেটি বুঝতে সহায়তা করে। এ পর্যায়ে এসে মানুষ কেবল আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়। যে যে নামেই তাঁকে ডাকুক না কেন তিনি কিন্তু 'একই জন'।

বস্তুত নিজের কাজ মানুষকে নিজের বা নিজেদেরকেই করতে হয়। দৈবক্রম ব্যাতিত আল্লাহ সরাসরি এসে কাউকে সহায়তা করেন না। কিন্তু আল্লাহর ভাবনা ও স্মরণ মানুষকে সাহায্য করে। আল্লাহর স্মরণ মানুষকে জাগিয়ে তোলে। উজ্জীবিত করে। প্রাণে শক্তি ও সাহস ফিরিয়ে আনে। চরম বিপদেও মানুষ জেগে উঠলে সাহস ও চিত্তের দৃঢ়তা নিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টাটি করে বা করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। সফলও হয়। এটিই আল্লাহর সাহায্য! কিন্তু যে নিজেকে জাগাতে পারে না বা ব্যার্থ হয় সে হাল ছেড়ে দেয়। নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। তাই সর্বদা আল্লাহর সাহায্যই কামনা করে নিজের ওপর নিজেকে ভরসা করতে হয়। পরিশেষে আল্লাহই সর্বশেষ বা একমাত্র সহায়!!

আল্লাহর ভাবনা প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করে। ভেতরে আশা জাগ্রত করে। স্বতঃস্ফুর্ততা দান করে। মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়। প্রয়োজনে একা ছুটতেও দ্বিধাবোধ করে না। প্রেরণা, শক্তি, সাহস সবকিছু আসে তাঁর নিকট থেকে। জাগ্রত অন্তর থেকে।

এমনিভাবে মূল সাহায্য আসে আল্লাহ থেকে। যিনি ভেতরেই বিরাজ করেন। অতঃপর মানুষ জেগে উঠলে জাগতিক প্রয়োজনে বা কৌশলগত কারণে নিজেরা পরস্পরকে সহায়তা করে সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। মানুষের প্রতি মানুষের করা সাহায্য-সহযোগীতাকে সরাসরি আল্লাহর কাছে যাঞ্চা করা সাহায্য প্রার্থনার সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। ভূলভাবে মিলিয়ে ফেলা ভাবনাগুলি মানুষকে সংশয়াবৃত বা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিতে পারে তাই প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হল।

এ আয়াত মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করার ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ নিজের ভেতরে। অতএব নিজের কাছে নিজের চাওয়া। এটি মানুষকে নিজের ওপর নিজেকে ভরসা করতে শেখায়। আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষা দেয়। বস্তুত সকল শক্তি নিজের কাছে, নিজের ভেতরে। কেবল জাগিয়ে তোলার অপেক্ষা। নিজের ভেতরেই আল্লাহর পরশ বিদ্যমান- মানুষকে জ্ঞানের এ পর্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

প্রতিনিয়ত আল্লাহর স্মরণ তথা নানাবিধ চর্চা ও সাধনা ভিন্ন কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব হয় না। চর্চার সাথে সাথে যথাযথ আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় আল্লাহকে সহায়তাকারীরূপে পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি গীতায় উদ্ধৃত হয়েছে। তবে কেবল শাব্দিক নয় মর্মার্থ বুঝতে হবে। বলা হচ্ছে,

"তুমি তোমার দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার যে রূপ দেখেছ- তা কেবল বেদ (অর্থাৎ কোন শাস্ত্র) পাঠ করে বোঝা বা ধারণা করা সম্ভব নয়, না কোন কঠিন ব্রত পালন করে, না দান করে, না উপাসনা করে। এগুলি সে উপায় নয় যা দ্বারা আমি যা তা একজন দেখতে পাবে। .. শুধুমাত্র নিরবিচ্ছিন্ন ভক্তির মাধ্যমেই আমি যা তা একজন জানতে, বুঝতে ও আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে। শুধুমাত্র এ পথেই তুমি আমাকে বুঝতে, আমার মায়াময় জগতে প্রবেশ করতে পারবে।" (গীতা ১১:৫৩-৫৪)

আল্লাহতে প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বাস রেখে তাঁকে প্রচন্ড ভালবেসে ভক্তিতে নিমজ্জিত হয়ে তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর কাছে চাইতে হবে। হতাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষাও করেন। যথাযথ বিশ্বাসী সর্বশেষ ভরসাস্থল একমাত্র আল্লাহর কাছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে!

সূরা ফাতেহা অন্য কোথাও নয় অর্থাৎ কোন দেব-দেবী, জ্বিন-পরী কিংবা ধর্মগুরু বা দেবতারূপী কোন মহামানব বা নেতা-নেত্রীর কাছেও নয়, একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বিরাজ করেন নিজের ভেতরে। অতএব এটি নিজের ওপর নিজেকে শক্তিশালী বা বিশ্বাসী হতে শিক্ষা দেয়। 'আত্মবিশ্বাসী' হতে শিক্ষা দেয়। এ প্রার্থনার মনস্তাত্তিক গুরুত্ব অপরিসীম।

আত্মবিশ্বাস ছাড়া জগতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ অপরকে হাল ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। তারা প্রতারিত হয়। ধাক্কা খেয়ে, তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে জগতকে চিনতে ও বুঝতে শেখে। ধীরে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়। সকলে সেটিও হতে পারে না। কেননা এর জন্য জ্ঞানের

পাশাপাশি আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্টও হতে হয়। তাই আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ।" (আল-কোরআন ১১:৭)

সূরা ফাতেহা মানুষকে তার 'নিজের সক্ষমতার পরিধীর মধ্যে' স্বনির্ভর হতে শিক্ষা দেয়। 'নিজের সক্ষমতার পরিধীর মধ্যে' বলা হচ্ছে কেননা স্বনির্ভর বা আত্মনির্ভর কথাগুলি মানুষ ও জ্বিন জাতির জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ ভিন্ন তারা কখনই তেমনটি হবে না বা হতে পারবে না। বস্তুত সকল সৃষ্টিই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৫৫:৩১)।

আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে 'নিজের সক্ষমতার পরিধীর মধ্যে' আল্লাহ যতটুকু মানুষের জন্য অনুমোদন করেছেন মানুষকে তার নিজের কার্য সে পরিধীর মধ্যে নিজেকেই সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের পথ নিজেকেই অন্বেষন করতে শিক্ষা দেয় এ বাণী (দ্রষ্টব্য ১.৫)।

সত্যি বলতে প্রার্থিত বিষয় মানুষের নিজেকেই অর্জন করে নিতে হয়। প্রার্থনা বিশ্বাসীর সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দেয় যখন সে আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়। যেমন ঔষধকেই তার নিজ কার্য সম্পন্ন করতে হয়, কিন্তু ভিটামিন তার সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে বিষয়টি তেমন। সূরা ফাতেহা আল্লাহতে ভরসাকারী হয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের সক্ষমতায় চলতে শিক্ষা দেয়। এমন শিক্ষাই মানুষকে সক্ষম হয়ে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। পরনির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয়।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি মানবজাতি যা কিছু অর্জন করেছে তা নিজেদেরই অর্জন। কেউ এসে করে দিয়ে যায়নি। বস্তুত সব আল্লাহর সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে। এ আয়াত আল্লাহকে বুঝতেও সহায়তা করে (আগ্রহীগণ এ বিষয়ে অধিকতর জানতে চাইলে 'ভগবদ গীতা' পাঠ করে দেখতে পারেন। সেখানে আত্মা, পরমাত্মা আল্লাহ-ভগবান এ সকল বিষয়ে অধিকতর ধারণা দেয়া আছে যা বিষয়গুলি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে)।

৫	আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, [Show us the straight path]

■ **১.৫** আমাদেরকে সরল পথ দেখাও (Show us the straight path) : 'সূরা আল-ফাতেহা' অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরাটি যদি হয় একটি 'প্রার্থনা' তবে সূরার এ আয়াতটিই প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট 'প্রার্থনা' বা সরাসরি কিছু একটা চাওয়া বা যাচ্ঞা করাকে বোঝায়।

পূর্বের আয়াতসমুহ সারাসরি চাওয়া বা প্রার্থনা করার পূর্বে অনেকটা ভূমিকার মতো বলা যেতে পারে। অর্থাৎ যার কাছে চাইতে হবে সেক্ষেত্রে শিষ্ঠাচারটি কেমন হবে সে সম্পর্কে ধারণা বা শিক্ষা দেয়। যেমন যার কাছে চাইতে হবে তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে, তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে, তাঁর মহাত্ম তুলে ধরতে হবে, সত্য অন্তরে তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করে। এক কথায় যার কাছে চাইতে হবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। তবেই তাঁর কাছে চাওয়া যেতে পারে। এখানেও তাই করা হয়েছে। আল্লাহর মহাত্ম তুলে ধরে তাঁর কাছে নম্র ও বিনয়ী হয়ে যথাযথ আচরণে প্রার্থনা করা হয়েছে।

পরের আয়াত দু'টি আলোচ্য প্রার্থনার মূল বক্তব্যেরই প্রয়োজনীয় কিছু বাড়তি সংযোজন যা বিষয়টিকে বিস্তারীতভাবে প্রকাশ ও সহজবোধ্য করেছে বলা যায়। তবে সূরায় আল্লাহর কাছে প্রকৃত চাওয়া বা প্রার্থনাটি হচ্ছে, সরল পথে চলার একটি সঠিক ও যথাযথ দিক-নির্দেশনা লাভ করা।

'হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও' প্রার্থনায় চাওয়ার এ ধরণটি অন্তরের লোভ থেকে উৎসারিত কোন হীন প্রকৃতির চাওয়া নয়। অর্থাৎ ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা বস্তুগত কোন চাওয়া নয়। আল্লাহর কাছে এমন জ্ঞান ও দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে যা পেলে মানবসমাজ নিজেরাই নিজেদেরকে সফলভাবে সঠিক পথে চালাতে পারবে। প্রার্থনার এ ধরণ উন্নত চিন্তা ও উচ্চ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

মন থেকে যিনি এ বাণী উচ্চারণ করেন সেটি তাঁর সহজ-সরল পথে চলার আন্তরিক ইচ্ছের একটি বহিঃপ্রকাশও বলা যেতে পারে। আবার প্রতিনিয়ত এ বাণীর উচ্চারণ মানুষকে আন্তরীকতার সাথে সরল পথে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতেও সহায়তা করে এবং পথ খুঁজে পাবার মানবীয় প্রচেষ্টাকে বেগবান ও অনুপ্রাণীত করে।

প্রাত্যহিক উপাসনায় প্রতিনিয়ত এর উচ্চারণ মানুষের সরল পথে চলার বা অধিষ্ঠিত থাকার লক্ষ্যকে তার সামনে তুলে ধরে। স্মরণ করিয়ে দেয় যেন জীবনের দৈনন্দিন সকল প্রকারের ব্যাস্ততা সত্বেও মানুষ লক্ষ্যচ্যূত না হয়।

সত্যি বলতে সরল পথ কি বা সরল পথ বলতে কি বোঝায় সেটি বুঝতে পারাও খুব সহজ বিষয় নয়। তাই দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশায় এমন প্রার্থনা করা হয়েছে।

অপরদিকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও সমাজের নানান প্ররোচনা কিংবা রিপুর তাড়না মানুষকে প্রতিনিয়ত সরল পথ থেকে বিচ্যূত করার চেষ্টায় রত। মানুষ বিষয়গুলি সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। কখনও বুঝেও বুঝে না। আবার কখনো বুঝেও তাতে স্থীর থাকতে পারে না। ফলে সরল পথ থেকে বিচ্যূত হয়। জাগতিক নানান মিথস্ক্রিয়ার কারণে সরল পথে ধৈর্য্যের সঙ্গে স্থীর থাকতে পারার বিষয়টি মোটেও সহজ নয়।

সরল পথের বিপরীতে চলার এ প্ররোচনাই শয়তানের কর্মকান্ড নামে পরিচিত। যা মানব অন্তরে আসূরিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে। ফলে এ প্রার্থনা কেবল সরল পথে চলার দিক-নির্দেশনা কামনা করাই নয়; প্রচ্ছন্নে রয়েছে শয়তানের প্ররোচনা বা ভূল পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ইচ্ছে ও বাসনা এবং প্রদর্শিত পথে স্থীর থাকতে পারার মানসিক শক্তি ও ধৈর্য্য অর্জনের প্রত্যাশা।

যারা সমাজকে কলুষিত করে তারাও যেন আল্লাহর কৃপায় ভূল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে এ প্রার্থনা সে বিষয়টির প্রতিও ইংগিত করে।

'হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও'- প্রার্থনার ধরণ থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে যারা এ প্রার্থনা করেন তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করেন সকলের পক্ষ হয়ে। সেভাবেই এটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা মানবজাতিকেই সহজ-সরল ও শান্তির পথ প্রদর্শনের আঁকুতি জানান হয়েছে এ প্রার্থনায়।

প্রতিটি একক ব্যাক্তির সরল পথে চলা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু একক কোন ব্যাক্তির সরল পথে চলা বিশাল এ ব্রহ্মান্ডে কোন গুরুত্ব বহন করে না। সরল পথে চলার অবশ্যই একটি লক্ষ্য থাকতে হবে। আর সে লক্ষ্য হচ্ছে, সৃষ্টিকে সমুহ অনাসৃষ্টি কিংবা ধ্বংসের থেকে রক্ষা করা। সৃষ্টির পরিচর্যা করা ও

সৃষ্টির অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করা। জগতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা।

মানব সমাজে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা না যায় এবং একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি ধরে রাখা না যায় তবে সরল পথে চলার কোন মূল্যই থাকে না। সেটি করতে হলে সমষ্ঠিকে সরল পথে চলতে হবে। কেননা সমাজে একজনের ভূল পথে চলাও সামগ্রীক পরিবেশকে বিনষ্ট করতে পারে। সমষ্ঠি যখন সরল পথে চলবে তখনই সেখান থেকে কিছু অর্জন হবে। তখনই কোন একক ব্যাক্তির সরল পথে চলাও একটি মূল্য বহন করবে। তাই 'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও' এভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাক্তি সকলের পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করে।

আয়াতে আল্লাহর কাছে সরল পথ প্রদর্শনের আকুঁতি জানান হয়েছে, তবে প্রচ্ছন্নে সে পথে চলতে পারার মানসিক পরিবর্তন সকলের মধ্যে অনুমোদন করে দেয়ারও একটি আকুঁতি আছে প্রার্থনায়। ভেতরে আল্লাহর সে অনুমোদন ভিন্ন এ পথে চলতে পারা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে আমরা আল্লাহর কাছে সহজ-সরল পথে চলার দিক-নির্দেশনা চাই, প্রকৃতপক্ষে আমরা কি চাই? সহজ-সরল বা সোজা পথটি কি? আল্লাহর কাছে চাওয়ার পূর্বে আমাদের নিজেদেরকেও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা কি বোঝায় সেটি বোঝারও চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ যা চাই প্রকৃতপক্ষে কি চাই?

যে নিজেই জানে না বা বোঝে না যে সে কি চায় আল্লাহ তার জন্য পথ অনুমোদন করে দিলেও সে সে পথে চলতে পারবে না। চলতে হয় মানুষের নিজেকে। তাই প্রার্থিত বিষয়টি নিজেদেরকেও বুঝতে হবে।

প্রত্যাশিত সহজ-সরল পথকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে বোধসম্পন্ন কিছু মানুষকে এর সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। মর্ম কথা অনুধাবন করতে হবে এবং যথাযথ ধারণাকে মানব সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এক কথায় বা খুব সহজেই সরল পথ সম্পর্কে বলে দেয়া যায় না। এর নানান দিক আছে। সরল পথ সহজভাবে বুঝতে হলে 'জটিল পথ'টিকেও বুঝতে হবে।

জটিল পথ হচ্ছে, কৃত্রিম উপায়ে পথ আবিস্কার করার চেষ্টা করা যা প্রকৃতি ও পরিবেশ গ্রহণ করে না। হোক সেটি ব্যাক্তিক, সামাজিক কিংবা বৈশ্বিক পর্যায়ে। যে কর্মকান্ড স্বার্থজনিত কারণে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, যাতে বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিঃস্বার্থ বাসনা নেই, যেখানে কূট-কৌশল, ধূর্ততা ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে সেগুলিই 'জটিল পথ'।

পরনিন্দা-পরচর্চ্চা, কটূক্তি করা এর প্রতিটি তার নিজের, পরিবারের ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমাজ ও জীবনকে অশান্ত করে তোলে। কারও দ্বারা সৃষ্ট অতি সূক্ষ্ণ কোন চাল/চক্রান্ত/যড়যন্ত্র একজনকে সাময়িক সুবিধা এনে দিলেও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে দেয়। যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সমাজ দাড়িয়ে আছে। এগুলি সবই সরল পথে চলার বিপরীত আচরণ। অ-দায়িত্বশীল আচরণ।

এগুলি করে কিছু মানুষ নিজেদেরকে ক্ষমতাশালী ও মহানরূপে সমাজে কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে বড় ও মহান প্রমাণ করার এমন অপচেষ্টা অপরাপর সকলকে মন্দভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ অশান্ত হয়। নিজেদের জীবনও হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতি বুদ্ধিমান কিছু মানুষের সরল পথের বিচ্যুতি থেকে এসবের সৃষ্টি।

রাগ, লোভ, হিংসা, বাসনা, মুর্খতা, বোকামি, অহম ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন কোন কাজ করে তখন সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

সৃষ্টির আদি থেকে মানবজাতির সামনে নানান 'দিক-নির্দেশনা' বিদ্যমান আছে। এসব দিক-নির্দেশনায় ভাল পথ ও মন্দ পথ চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান আছে বলেই হয়তবা এসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে আমরা অনেকেই অনুভব করতে পারছি না। কিন্তু মানবজাতির সামনে যদি কোন দিক-নির্দেশনা না থাকত, যদি কোন অনুপ্রেরণা না থাকত তবে এর প্রয়োজনীয়তা হয়তবা মানুষ গভীরভাবে অনুভব করতে পারত। দিক-নির্দেশনার অভাবে মানুষ উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত। আজও কিছু মানুষ তেমন আচরণ করে। দিক-নির্দেশনা মানুষের জন্য ভাল পথে চলা ও মন্দ পথ পরিত্যাগে প্রেরণা হয়েও কাজ করে।

বাইবেল, কোরআন, বেদ, গীতা এগুলো হচ্ছে মানবজাতির জন্য তেমনই দিক-নির্দেশনা। স্থান-কাল ও পাত্রভেদে এসব দিক-নির্দেশনা বিভিন্নভাবে

উপস্থাপিত হয়েছে। কখনও গল্পের আকারে উদাহরণের মাধ্যমে কোন একটি বিষয়কে মানব সমাজে তুলে ধরা হয়েছে। গল্প বা ঘটনার আলোকে বর্ণনা করা হলেও যুগের মানুষের হৃদয় ও বিবেককে ভাল-মন্দ বিষয়ে এসব উদাহরণ নাড়া দিয়েছে। কোন বিষয়টি গ্রহনীয় এবং কোন বিষয়টি গ্রহনীয় নয় সেভাবে বিবেচনা করতে সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানুষ ভাল-মন্দ বুঝতে শিখেছে। সঠিক নিয়ম প্রবর্তনে সমাজ সহযোগী হয়ে এগিয়ে এসেছে। কখনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা পরিস্থিতির পর্যালোচনার প্রেক্ষিতেও ভাল-মন্দ পথ প্রদর্শিত হয়েছে।

স্থান-কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক এ সকল শাস্ত্র বা ধর্ম গ্রন্থসমুহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এক একটি সমাজ এক একটি ধর্ম গ্রন্থের বাণীকে অন্তরে ধারণ করে প্রভাবিত হয়েছে। তাতে মানুষ বিভাজিত হয়েছে। তবে সকল দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থের ভেতরের মর্ম কথা কিন্তু এক। অর্থাৎ মন্দ কর্ম ও পথ পরিহার করে চলা, ভাল পথে চলা; অন্যায়কে পরিহার ও প্রতিহত করা; ন্যায়কে সমুন্নত রেখে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা; পৃথিবীতে শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা ইত্যাদি।

কোরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। এটি সর্বশেষ। মহান আল্লাহ কোরআনে ভাল-মন্দ দু'টি পথ নানাভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সত্য ও সরল পথ বুঝতে সহায়তা করেছেন। যে তা বুঝতে সক্ষম হবে এবং পালন করবে সে নিজেরই মঙ্গল ও প্রশান্তির জন্য করবে। যে তা করতে ব্যার্থ হবে সে নিজেরই অনিষ্ট করবে, কিংবা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। তেমন মানুষ সমাজকেও অশান্ত করে তুলতে পারে। যেটি ঘুরে-ফিরে আবার নিজের, নিজেদের বা প্রজন্মের ঘাড়ে এসে পড়বে।

সরল পথের বিচ্যুত আচরণকে প্রতিরোধ করা তাই সামাজিক এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যরূপে বিবেচিত। কেননা এটি সকলকেই মন্দভাবে প্রভাবিত করে। আর প্রত্যেকেরই আছে নিজেকে বা নিজেদেরকে ভাল রাখার অধিকার।

কোরআনে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তগুলি ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানুষ কখনও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভূল করে।

গোষ্ঠীগত কিংবা নিজেদের সুবিধামতো বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। কখনও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতেও ব্যার্থ হয়। যা বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

বোধসম্পন্ন মানুষদেরকে তাই কোরআনের দিক-নির্দেশনামূলক বাণীসমূহকে নিয়ে জ্ঞান-গবেষনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করতেই হবে। যথাযথ অর্থ ও সত্য তুলে ধরতে হবে। কেননা কোরআনের বাণী ভূল-শুদ্ধ নির্বিশেষে সমাজের বহু মানুষকে প্রভাবিত করে। অতএব কেবল সাধারণ অধ্যায়ন ও সুলোলিত কন্ঠে আবৃতি করাই যথেষ্ট নয়। বুঝতে হবে কোরআনের বক্তব্যের মর্মার্থ। মানবসমাজকেই সময়ের সাথে বিষয়গুলির প্রযোজ্য অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে।

সরল পথে চলার জন্য যা করতে হবে এবং যা পরিহার করে চলতে হবে, কোরআনে তার সুস্পষ্ট কিছু দিক-নির্দেশনা আছে। সেখান থেকেও সরল পথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। নিচে কোরআন থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। বলা হচ্ছে,

“বল: এসো, আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই যেগুলি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার কর না (এর ক্ষতিকর দিক আছে যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে, কিংবা লেখকের ‘আইডিয়াস এন ভিউস’ বইয়ের ‘একটি ভ্রম সংশোধন’ লেখাটি দ্রষ্টব্য); তোমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে, দারিদ্রের কারণে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমি তোমাদের ও তাদের জন্য জীবিকা সরবরাহ করি (আল্লাহ জীবিকা সরবরাহ করেন এর অর্থ এই নয় যে তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে বাজার করে দিয়ে আসবেন। কথাগুলির অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে হবে। জগতের সকল প্রাণীর জীবিকা আল্লাহই সরবরাহ করেন। সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা মানুষকে গড়ে তুলতে হবে এবং সে কারণে জাগতিক সুশাসনের বিষয়গুলি মানুষকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষ সেখানেই অনিয়ম করে। একদিন সে কারণেও মানুষকে জবাবদিহি হতে হবে);

প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য হোক ব্যাভিচারের কাছেও যেও না, যে জীবনকে আল্লাহ পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন সে জীবনকে হত্যা কর না,

কেবলমাত্র বিচারের ক্ষেত্র ব্যাতিত। এ সবই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না, কেবলমাত্র তাদের জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাতিত; যে পর্যন্ত না তারা উপযুক্তভাবে বয়:প্রাপ্ত হয়। ন্যায্যতার সঙ্গে পরিপূর্ণ পরিমাপ ও পূর্ণ ওজন দাও।

আমি কারও প্রতিই তার সাধ্যের অতীত কাজ ও দায়িত্ব অর্পণ করি না। যখন তোমরা কোন কথা দাও তখন তার প্রতি সুবিচার কর যদি সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর প্রতি করা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

এসবই তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা স্মরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে: 'এটিই আমার সরল পথ'। অতএব এ পথ অনুসরণ কর। অন্য পথ অবলম্বন কর না। তাহলে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এটিই তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার।" (আল-কোরআন ৬:১৫১-১৫৩)

সরল পথ বোঝার সুবিধার্থে এটি কেবল একটি দৃষ্টান্ত বা দিক-নির্দেশনামূলক উদাহরণ মাত্র যা কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে। যেখানে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। জগতের সব বিষয়ের দিক-নির্দেশনা কি এখানে আছে? নিশ্চয়ই না এবং সেটি সম্ভবও না।

বস্তুত Guidance বা দিক-নির্দেশনা সকল বিষয়ের খুটিনাটি বিস্তারীত তুলে ধরে না। দিক-নির্দেশনার কাজ হচ্ছে চলার পথের মূল দিকটিকে নির্দেশ করে দেয়া বা বুঝতে সহায়তা করা যেন মানুষ নিজেরাই সকল ক্ষেত্রে সঠিক পথটি চিনে নিতে পারে। পথচ্যূত না হয়। সকল দিক-নির্দেশনাই মন্দ কাজ বর্জন এবং সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে বলে। কোরআনও তাই করেছে। মন্দ কাজ বর্জন এবং সত্য ও সুন্দরের পথে চলাই হচ্ছে সরল পথে চলা।

সত্যি বলতে এক বাক্যে বা খুব সহজেই সরল পথ সম্পর্কে বলে দেয়া সম্ভব না। নিচে এ বিষয়ে আরও কিছু ধারণা তুলে ধরা হল যা বিষয়টিকে যথাযথভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

এক অর্থে সরল পথ হচ্ছে সত্যের পথ। অর্থাৎ একেবারে সঠিক বা যথাযথ পথ। চলার যে পথ বা সূত্রটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একেবারেই যথার্থ সেটিই হচ্ছে সত্যের পথ। সঠিক বা সত্যের পথই শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। শান্তি প্রতিষ্ঠাই মূখ্য বিবেচ্য। তাই সত্যের পথই হচ্ছে সরল পথ। যে পথের ভেতরে কোন কূট-কৌশল বা কোন জটিলতা নেই।

জীবন ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা মূল বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্য স্থিতিশীলতা তথা শান্তি বজায় রাখে। কিন্তু ন্যায্যতা বা ন্যায়ের উপস্থিতি ভিন্ন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দাড়িপাল্লায় যেমন ন্যায্যতা রক্ষিত হলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় বা নিশ্চিত হয় বিষয়টি তেমন। অতএব ন্যায়ের পথই হচ্ছে ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী। এটিই শান্তির পথ। অতএব ন্যায়ের পথই হচ্ছে সবচাইতে সরল পথ যা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

উদাহরণস্বরূপ প্রকৃতির কথা বলা যেতে পারে। প্রকৃতি যথাযথ সূত্রের পথ ধরে চলে। অর্থাৎ সত্যের পথে চলে। তাই আমরা প্রকৃতির মাঝে শান্তিতে বসবাস করি। প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। যেখানে যতটুকু প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য সে ন্যায্যতা রক্ষা করে চলে। প্রকৃতি আল্লাহর সৃষ্ট নিয়ম মেনে চলে। শান্তি বজায় রেখে চলে।

প্রকৃতি আছে এ দেহের ভেতরে; আছে বাহিরে। প্রকৃতি ও পরিবেশের ছন্দ বুঝে চলা শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক। প্রকৃতির ছন্দ বুঝে চলা তাই মানুষের দায়িত্বশীল আচরণের মধ্যে পড়ে। এর সাথেই আছে সমর্পনের সম্পর্ক। কেননা প্রকৃতি ও পরিবেশের মাঝেই থাকে বিধাতার ইংগীতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে মানুষের জন্য সরল পথ হচ্ছে আল্লাহতে সমর্পনের পথ। সমর্পন পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বুঝে চলে। সমর্পিত আত্মা সত্য-ন্যায় তথা প্রকৃতির প্রদর্শিত পথে নিজেকে সমর্পন করে চলে। বিধাতার বিধানের অনুগামী হয়ে চলে। বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পনের পথ প্রশস্ত করে দেন। ... আর এটিই তোমার পালনকর্তার সরল

পথ। ... তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস।” (আল-কোরআন ৬:১২৫-১২৭)

সরল পথ হচ্ছে সূক্ষ্ণ ও জটিল এমন কোন পরিকল্পনা না করা যা প্রকৃতি ও পরিবেশকে পরোক্ষভাবে হলেও বিচলিত করে। যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে। অতএব প্রকৃতি ও চারপাশের পরিবেশকে তার মতো চলতে দেয়া এবং নিজে তার সাথে তাল-লয়-ছন্দ বজায় রেখে চলতে পারাই হচ্ছে সমর্পন। এটিই হচ্ছে সরল পথের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সমর্পনই হচ্ছে শান্তির পথ। এটিই জগতের সকল মানুষের জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এটিকেই ইসলাম বলা হয়। সে অর্থেই ইসলাম সকলের জন্য মনোনীত ধর্ম। গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। বিধাতায় সমর্পনের কথা বলা হয়েছে। এটিই মানবের জন্য একমাত্র চিরন্তন সত্য বা সনাতন ধর্ম।

নদীর অতি তীব্র ঘুর্ণায়মান স্রোতও যেমন অন্তরস্ত সবকিছুকে কোনরূপ সংঘর্ষ ব্যাতিতই নিরাপদে ও যথাযথভাবে তার নির্দিষ্ট পথে বা গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সমর্পন বিষয়টি তেমন। সমর্পন হচ্ছে প্রকান্ড প্রকৃতির সে প্রবাহে নিজেকে সঁপে দেয়া। আল্লাহতে সমর্পন মানুষকে সেভাবেই নিরাপদে লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহতে সমর্পনই হচ্ছে সবচাইতে সরল পথ।

স্রোতের বিপরীতে চলা যায় না কিংবা চলতে চাইলেও অযথা সময় নষ্ট ও শক্তির ক্ষয় বা অপচয় হয়। তথাপি লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না বা প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। তবে একইসাথে এটিও বুঝতে হবে যে এর অর্থ গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয়াও নয়। সে কারণেই বলা হয় যে সমর্পন বা সরল পথ বিষয়টি বোঝা খুব একটা সহজও নয়।

উল্লেখ্য যে, প্রকৃতি ও পরিবেশের দুর্যোগ মোকাবেলার সমাধানে মানুষ নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেই পারে। কিন্তু এমন কোন জটিল বা কুটিল পরিকল্পনা না করা যা কেবল গোষ্ঠীগত হীন স্বার্থকে বিবেচনা করে করা হয় এবং সামগ্রীক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যার সাথে সম্পৃক্ত মানুষের ভাল-মন্দের কোন বিচার-বিবেচনা নেই।

উন্নয়নের জন্য করা কোন পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সেটি যেন প্রকৃতি ও পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদেও কোনরূপ বিরূপ প্রভাব না ফেলে এবং কারও ক্ষতির

কারণ না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয়গুলি সমর্পন বা সরল পথের সামগ্রীক, বৃহত্তর বা বৈশ্বিক পরিসরের ভাবনা থেকে বলা হচ্ছে।

সরল পথের ভাবনার বিষয়টি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে আছে তেমনি বৃহত্তর, সামষ্ঠিক বা সামগ্রীক ভাবনায়েও সরল পথকে বিবেচনায় নেয়ার আছে। এর একটি বৈশ্বিক এমনকি মহাজাগতিক দিকও আছে। এগুলি একটি একটির সাথে সম্পর্কিত। একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে কাজ করে। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। সূক্ষ সংযোগ রক্ষা করে চলে। একটির অবর্তমানে অপরটি পূর্ণতা পায় না।

স্বল্প বাক্যে বিষয়টিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সরল পথ হচ্ছে মন্দ পথ পরিহার করে চলা। সূক্ষ কূট-কৌশলের খেলা বা জটিল পথ বর্জন করে চলা। একইসাথে নিয়মের মধ্যে মন্দের অনুপ্রবেশ রোধ ও তাকে প্রতিহত করা। সহজ-সরল পথের ধারণা একেবারেই খুব সহজও নয়। খুব সহজভাবে এটিকে এক কথায় বলে দেয়া সম্ভব না।

সরল পথের আছে নানান দিক ও হিসেব-নিকেশ। প্রকৃতি ও পরিবেশের নানান বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে পরিশেষে যে পথটি বের হয়ে আসে সেটিই হচ্ছে সবচাইতে সহজ, সরল ও তুলনামূলকভাবে জটিলতামুক্ত সোজাপথ। অন্তত সে সময়টুকুর জন্য যখন কোন পথ বেছে নিতে হয়।

আগ্নেয়গিরির লাভা যখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সে সবচেয়ে সরল পথে আসে। সরল পথকে বোঝাবার জন্য এটি একটি উপমা মাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতির পথে চলতে গিয়ে নানান বাঁধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত কিংবা প্রতিরোধ পেরিয়ে সে সবচেয়ে যে সহজ পথটি খুঁজে পায় সে পথ দিয়েই বেরিয়ে আসে। সেটিই সে সময় বা মুহূর্তের জন্য সবচাইতে সহজ ও সরল পথ। কোথাও আটকে গেলে বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে বের হয়ে আসার সবচেয়ে সহজ বা উত্তম পথটিই হচ্ছে সে সময়ের জন্য 'সরল পথ'। বিষয়টিকে বোঝাবার সুবিধার্থে এটি অনেক উদাহরণের কেবল একটি উদাহরণ মাত্র।

মানুষের ক্ষেত্রে হীন 'স্বার্থ-চিন্তা' পরিহার করে প্রকৃতি ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের পরেও যে পথটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সবচেয়ে যথার্থ বিবেচিত হয় সেটিই হচ্ছে তার জন্য সরল পথ। সময়ের সর্বোত্তম পথ ও পন্থাই হচ্ছে 'সরল পথ'।

সরল পথ ও এর বিপরীত পথ সম্পর্কে ওপরে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানেই এ ধারণার শেষ নয়। এর আছে নানান দিক ও হিসেব-নিকেশ।

সহজ-সরল পথ হচ্ছে মানুষের মুক্তির অনুকূল পথ। সহজ-সরল পথের অনুসরণ সামাজিক ও মানুষের পারস্পারিক জীবনে প্রশান্তি এনে দিতে পারে। মানুষকে অহমবোধ পরিত্যাগ করা থেকে শুরু করে যে কোন মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। এটি একটি স্বর্গীয় জীবনাচরণ। কিন্তু মানুষের নিজেদের চরিত্র ও পার্থিব জীবনের আকর্ষন মানুষকে জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। মানুষ স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করতে পারে না। এ বন্ধনই মূলত সরল পথে চলা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয়।

মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে স্বার্থ-চিন্তা বা কোন কামনা বা বাসনা। স্বার্থ-চিন্তা ও কামনা-বাসনা সরল পথে চলার বিপরীতে মানুষের ওপর নেগেটিভ ফোর্স হয়ে কাজ করে। অথচ সরল পথে চলতে জানলে পার্থিব জীবনই হতে পারে স্বর্গীয় জীবন। চির সুখ ও শান্তি এখানেই ধরা দিতে পারে! তাই গীতায় বলা হয়েছে,

“অহমবোধ শূন্য, নির্মোহ, আসক্তিমুক্ত, নিত্য আধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন, কামনা-বাসনা বিবর্জিত, সুখ-দুঃখ নামক দ্বন্দ্বসমুহ থেকে মুক্ত বিবেকী ব্যাক্তিগণই তেমন অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। কিংবা যে জানে যে, কিরূপে পরমার্থের কাছে সমর্পন করতে হয় সেই তেমন স্বর্গরাজ্য তথা শান্তি লাভ করে।” (গীতা ১৫:৫)

খুব সহজেই মানুষের পক্ষে ওপরোক্ত গুণসমুহে গুণান্বিত হয়ে সরল পথে চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই তেমন অব্যয় অবস্থা বা স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তিও ঘটে না। শান্তির দেখাও মেলে না।

মানুষ হচ্ছে এমন এক যৌগিক উপাদান যা বহু বহু ধর্ম সম্বলিত মৌলিক উপাদানসমুহের সমন্বয়ে গঠিত। এক একজন মানুষ গড়ে ওঠে এক এক প্রকারের উপাদানসমুহের সংমিশ্রনে। মৌলিক উপাদানসমুহের এক একটির চরিত্র, বৈশিষ্ট বা ধর্ম এক এক প্রকারের। মানুষের ওপরে তার গঠনগত প্রতিটি উপাদানের ধর্ম প্রভাব রাখবেই। তাই একেক মানুষ একেক রকম চরিত্রের হয়ে থাকে। কেউ দৈব স্বভাব বিশিষ্ট হয়, কেউ হয় অসূর স্বভাবের।

যে তার ইচ্ছেতে যেমন সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করে গড়ে ওঠে সে তেমন প্রকৃতিরই হয়। মানুষ তার গড়ে ওঠার গঠনগত উপাদানসমুহের গুণাগুণ বা ধর্মসমুহকে পরিত্যাগ করতে পারে না। তাই সরল পথে চলতে পারে না। সেটি করতে পারা অত্যান্ত কঠিন কাজ। সহজাতভাবে গড়ে তোলা নিজের চরিত্র ও জগতের আকর্ষন দুটোই এ পথে বাঁধা হয়ে দেখা দেয়। তবে সেটিও সম্ভব।

'আল-কোরআন' হচ্ছে সেই Exit Plan বা পরিকল্পনা সম্বলিত গ্রন্থ যা মানুষকে এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখায়। এর জন্য আল্লাহতে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। কর্মের ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে 'স্বার্থ-চিন্তা' পরিত্যাগ করে সৃষ্টির কল্যাণে তথা আল্লাহর ভাবনায় কাজ করতে হবে।

সাধনা ভিন্ন সত্যের সে জ্ঞান ও গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। তার জন্য সাধনাও হতে হবে আন্তরীক। 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও' এ প্রার্থনা সে সাধনারই অংশ। সমগ্র গীতায় এ প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত সর্বত্র একই পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এক বাক্যে সরল পথ বা সমর্পন সম্পর্কে বলে দেয়া সম্ভব নয়। এর জন্য অধ্যায়ন, অধ্যাবসায়, শিক্ষা, গবেষনা, জ্ঞানের চর্চার পরেও সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে প্রকৃতি ও পরিবেশকে গভীর মনযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির ইংগিত বা নিদর্শনসমুহকে বুঝতে হবে। সার্বিক বিষয়গুলিকে অনুধাবন করতে হবে। তার সঙ্গে তাল-লয় ঠিক রেখে চলতে হবে। সময়ের সাথে বিষয়গুলিকে বা নিয়ম-বিধি-বিধানসমুহকে ঝালিয়ে নিতে হবে।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাল-লয় ঠিক রেখে চলতে গিয়েও 'ন্যায়ের পথ' পরিহার করা যাবে না। আর সে কারণেই জীবনে এত এত কর্মযজ্ঞ! এত সংগ্রাম ও এত কর্ম প্রচেষ্টা! নয়ত গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিলেই সমর্পন হয়ে যেত বা সরল পথে চলা বলে বিবেচিত হত।

বস্তুত জীবন চলার পথে ন্যায় বা ন্যায্যতাকে সমুন্নত রাখতে গিয়েই জীবনে যত সংগ্রাম করতে হয়। ন্যায়ের পথই হচ্ছে সরল পথ। কিন্তু স্বার্থ চিন্তা থেকে উদ্ভূত অন্যায় কর্ম সে পথে চলার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যূত করে দেয়। এখানেই মানুষকে সত্যিকারের পরীক্ষায় অবতীর্ণ

হতে হয়। এ প্রক্রিয়াতেই আল্লাহ মানুষের সত্যনিষ্ঠতাকে পরীক্ষা করেন। তাই বলা হয়েছে,

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না আমি জানি তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) অব্যাহতভাবে কঠোর প্রচেষ্টা/সংগ্রাম করে যাচ্ছ এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করে যাচ্ছ এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের কর্ম বৃত্তান্তসমূহ যাচাই করি।" (আল-কোরআন ৪৭:৩১)

"জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" (আল-কোরআন ৮:২৮)

"আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করি এবং আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসবে।" (আল-কোরআন ২১:৩৫)

বস্তুত জাগতিক সকল প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও ন্যায়কে সমুন্নত রাখাই সরল পথে চলার মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের মূখ্য করণীয়। যা পরিবেশে ভারসাম্য তথা স্থিতিশীলতা বা শান্তি বজায় রাখে। সত্যিকার অর্থে এখানেই সরল পথে চলার গুরুত্ব ও মহাত্ম নিহিত। অন্যথায় সরল পথে চলার পৃথক কোন গুরুত্বই থাকত না। সে কারণেই কোরআনের প্রারম্ভে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ এক কঠিন সাধনা!

আল্লাহতে যথাজ্ঞানে সমর্পন করে চলতে পারাই হচ্ছে সরল পথে চলা। অথচ আল্লাহকে কেউ দেখেও না, জানেও না। এমনকি যথাযথভাবে বোঝেও না। তাহলে মানুষ সমর্পন করবে কোথায় এবং কিভাবে?

আল্লাহতে সমর্পন বলতে আল্লাহর ইচ্ছে ও দিক-নির্দেশনায় সমর্পন করাকে বোঝায়। আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনাকে তাই যথাযথভাবে বুঝতে হবে। কোথায় পাবে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনাকে?

ধর্ম বা শাস্ত্র গ্রন্থসমুহ এ বিষয়ে বিধাতার নির্দেশনা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে। তবে তার যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহর নির্দেশনাসমুহকে জেনে-বুঝে যথাযথভাবে উপলব্ধিতে আনতে হবে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ আল্লাহর নিদর্শনসমুহকে আমাদের সম্মুখে তুলে করে। সে অর্থে প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে বিধাতার প্রতিনিধিত্ব করে। আল্লাহর ইচ্ছেকে বুঝতে সহায়তা করে। প্রকৃতিকে তাই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনসমুহ এবং তোমাদের সৃষ্টিতে ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর মাঝেও রয়েছে নিদর্শনাবলী।" (আল-কোরআন ৪৫:৩-৪)

সত্যি বলতে, এক বাক্যে বা স্বল্প কথায় ওপরে আলোচিত বিষয়গুলির বিষয়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করা বা সরল পথ বা সমর্পন সম্পর্কে বলে দেয়া সহজ নয়। যেমন এটিও একটি পথ যে, আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে সম্মিলিত মানবের হৃদয়ের স্পন্দনে। এটি কেমন কথা? কিভাবে সেটি জানা সম্ভব?

তার জন্য আম-জনতার মনের কথা বা অনুভূতিগুলিকে জানতে ও বুঝতে হবে। সেগুলিকে তুলে আনতে হবে। কিভাবে? ইভিএমের মাধ্যমে? মানবসমাজকেই বিষয়গুলি ঠিক করতে হবে। ছল-চাতুরতার আশ্রয় না নিয়ে কিভাবে যথাযথভাবে কাজগুলি করা যায় গবেষনা করে বের করতে হবে। সরল পথে চলার পথ আবিস্কার করতে হবে!

সম্মিলিত মানবের ইচ্ছেও কিন্তু কখনও কখনও ভূল করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও আছে। অতএব সবদিক বিচার-বিবেচনা করেই পথের সন্ধান করতে হবে। অতঃপর গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কৃত কর্মের জন্য বিচার দিবসের মুখোমুখী হতে হবে। অতএব সকল দিক বিবেচনা করে সাবধানতা অবলম্বন করে চলার বিকল্প নেই। সরল পথ খুঁজে পাওয়া ও সে পথে চলতে পারা খুব সহজ ও সরলও নয়। কেবল অন্ধ ইচ্ছের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাড়ান যাবে না।

উল্লেখ্য যে, নিভৃতে একাকী এবাদত করাই কেবল ধর্ম-কর্ম নয়। এর সাথে আছে জীবনের সম্পর্ক। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ পরমের এবাদত করে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে,

"যেখান থেকে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি ও কর্ম প্রচেষ্টার শুরু; যার দ্বারা এই সমস্তকিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, মানুষ নিজ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁর অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৬)

মানুষ তার নিজ নিজ কর্মে সত্যনিষ্ঠ থেকেও আল্লাহর এবাদত করে। কিন্তু যখন যথাযথ জ্ঞানে কোন একটি বিষয়কে বুঝতে ব্যার্থ হয় তখন সেটিকে দুরে সরিয়ে রাখে। তাই ধর্মকে জীবন থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। না এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঠিক সংস্কার সাধন করে প্রচার-প্রসার করেছে, না একে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। অথচ সমাজ পরিচালনায় এ বিজ্ঞানের আছে বিশাল প্রভাব!

যে পরিবেশে মানুষ মনের কথা নিজের মতো করে বলতে পারে না বা প্রকাশ করতে পারে না তখন সেটিও সরল পথের বিচ্যুতি থেকে ঘটে। মানুষের নিজেদেরকেই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে কোথায় কোথায় তেমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। সেটি ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ, বিবিধ প্রতিষ্ঠান এবং দেশ থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। অতঃপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বস্তুত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রই সত্যকে জানে ও বোঝে। এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয় না। কামার-কুমার, তাতী-জেলে থেকে শুরু করে সকল জাগ্রত অন্তর এমনকি শিশুও সত্যটি বুঝতে পারে। সেভাবেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের মর্মার্থের বাণী সকল হৃদয়ে/অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে দেয়া আছে। কিন্তু মানুষ সত্যের পক্ষ অবলম্বন করবে কি করবে না সেটি তাদের নিজের বা নিজেদের বিবেচ্য বিষয়। সে কারণেই অর্থাৎ জাগতিক বাসনা নিয়ে অতি ভাবনা না ভেবে সত্যের পথ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধকরণের জন্যই আল্লাহ ও পরকাল তথা বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপনে সকলকে আহবান করা হয়ে থাকে।

'হে আল্লাহ! আমাদের সরল পথ দেখাও!' এ প্রার্থনা মানুষকে প্রতিবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাকে সরল পথে চলতে হবে। যেমন বিশ্বাস রাখতে হবে যে- আল্লাহ সরল পথ প্রদর্শন করবেন, তেমনি মানুষের নিজেদেরকেও সত্য ও সঠিক পথে চলার উপায়ের সন্ধান করে যেতে হবে। বস্তুত মানুষের

ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ; যা নিজ নিজ ক্ষেত্রে জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে অনুসন্ধিৎসু মন বা বোধসম্পন্ন মানুষেরা করে থাকেন। সাধারণেরা তা অনুসরণ করে। বলা হচ্ছে,

“যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে এটি (কোরআন) সুস্পষ্ট বাণী/নিদর্শন।” (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

বোধসম্পন্ন মানুষ বিধাতার ইচ্ছে ও নির্দেশনার ইংগিত পান ভেতর থেকে- অন্তর থেকে থেকে। তাই নতুন নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় অবিরত সরল পথে চলার উপায়ের সন্ধান করে যেতে হবে নিজেদেরকেই।

আল্লাহ মানুষকে ভেতর-বাহির সবদিক থেকে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন!! তিনি আছেন ভেতরে, হৃদয়ে। আবার বাহিরে চারপাশে। আছেন পরিবেশ ও প্রকৃতিতে। মানুষকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন; আবার প্ররোচিতও করেন। প্ররোচনা মন্দ অর্থে। সেটিও ভালর জন্য।

হৃদয়ের উদ্বুদ্ধকরণের মাঝে আছে উচ্ছাস! আছে স্বতঃস্ফূর্ততা ও ইচ্ছে। ইচ্ছে সচলতা দান করে। দেহে গতি প্রবাহিত হয়। মানুষ আচমকাই চেতনাসম্পন্ন ও জাগ্রত হয়ে ওঠে। দিগ্বিদিক ছুটে চলার শক্তি পায়। এটিই ‘প্রাণশক্তি’! এ শক্তি প্রবল হয়ে টানে। এক কথায় হৃদয়ের উদ্বুদ্ধকরণের মাঝে থাকে মরণশীলের কর্মচাঞ্চল্য বা ‘জীবন’। জীবনের এ উচ্ছাস ও ইচ্ছে মানুষকে চলার পথ প্রদর্শন করে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কি করতে হবে, কোনদিকে যেতে হবে মানুষ ভেতর থেকে তাড়না অনুভব করে। নির্দেশনা পায়।

উচ্ছাস-উচ্ছলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা তথা ‘প্রাণশক্তি’ বা ‘জীবন’ মানুষকে সরল পথে চলার নিশ্চয়তা দেয় না। সরল পথে চলা এতটাই সহজ না। হৃদয় থেকে উৎসারিত ‘জীবন’ অন্ধ। সে ভাল-মন্দ বোঝে না। সে কেবল চলতে উদ্বুদ্ধ করে; সচলতা দান করে; গতির সঞ্চার করে; যেদিকেই টানে প্রবল হয়ে টানে। ভাল পথে টানে, মন্দ পথেও টানে। অতএব হৃদয়ের নির্দেশনার অনুসরণে জীবন বিপদজনক ও ভয়ঙ্করও হয়ে উঠতে পারে।

হৃদয় তথা ‘জীবন’ থেকে উৎসারিত নির্দেশনাকে তাই সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হয়। সরল পথে চলতে হলে ‘হৃদয়ের উদ্বুদ্ধতা’ বা ‘নির্দেশনা’কে যথাযথ জ্ঞানে চালাতে হয়। সরল বা সমর্পনের পথে চলতে হলে তাই ‘জীবন’

বা 'প্রাণশক্তি'র সাথে প্রয়োজন হচ্ছে ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপনের 'জ্ঞান'। ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুধাবনের বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল ক্ষেত্রে সে অনুধাবনের বিষয়টি খুব সহজও নয়। তাই বলা হয়েছে,

"মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষণ করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

যথাযথ বা সত্য ও সঠিক পথের জ্ঞান ভিন্ন কেবল হৃদয়ের উদ্বুদ্ধতায় বা নির্দেশনায় জীবন মন্দ পথেও প্রবল হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে মূর্খতার এমন অনেক উদাহরণ আছে। নেতৃত্ব ছিল। অনুসারীদের মাঝে নির্দেশনা পালন করার উচ্ছাস ছিল। ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রাণশক্তি। সবই ছিল। কিন্তু ছিল না কেবল সঠিক জ্ঞান। এ পৃথিবী তাই অনেক নৃশংশ ও বর্বর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এসব থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। 'হৃদয়ের বাণী' তথা 'ইচ্ছে'র সাথে তাই 'জ্ঞান'কে কাজে লাগাতে হবে। সহজাত ধর্মের পাশাপাশি তাই 'আরোপিত ধর্মে'রও প্রয়োজনীয়তা আছে [আরোপিত ধর্ম বিষয়ে লেখকের 'সত্য' বই দ্রষ্টব্য]।

বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে যে 'অ্যাডাম' ও 'ইভ' স্বর্গীয় উদ্যানে আনন্দে ছিল। উদ্যানে দু'টি বিশেষ গাছ ছিল। গাছ দু'টির একটিতে ছিল 'জীবন' এবং অপরটিতে ছিল ভাল ও মন্দের 'জ্ঞান'। গড দ্বিতীয় গাছের ফল খেতে উভয়কে বারণ করে দিলেন।

বাগানে বিচরণকৃত প্রাণীকুলে ধূর্ত ছিল 'সরীসৃপ'। সে নিষিদ্ধ ফল খেতে তাদেরকে প্ররোচিত করল। বলল, যদি তোমরা এ গাছের ফল খাও তবে তোমরা গডের সমপর্যায়ের ভাল ও মন্দের 'জ্ঞান' প্রাপ্ত হবে। একটি গাছে আছে 'জীবন' এবং অপরটিতে আছে 'জ্ঞান'। সে জ্ঞান গডের সমপর্যায়ের!

মানব 'হৃদয়ে' আছে 'জীবন'। সেখানে আছে জীবনের উচ্ছাস ও গতি। 'মস্তিষ্কে' আছে 'জ্ঞান'। দেহে দু'টি বৃক্ষ দু'টি বিষয়কে ধারণ করে আছে। অপরদিকে আছে প্রকৃতি, পরিবেশ ও রিপুর তাড়না বা প্ররোচনা। জড়-জগতের যেসব শর্তের মধ্যে জীব-সত্বাসমুহ বাঁধা পড়ে আছে।

ঘাত-প্রতিঘাতের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মাঝে 'জীবন' ও 'জ্ঞান' দু'য়ের সঠিক সমন্বয় ও ব্যাবহারই পারে মানুষকে সরল পথে চালনা করতে; জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। সে কারণে প্রত্যেকের ভেতরে 'ইচ্ছে' বা 'জীবনী শক্তি'কে 'জ্ঞানের' সাথে সমন্বয় সাধন করে চালাতে হবে। দু'টোই আল্লাহর নিকট থেকে আসে। দু'টোই আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ।

শাস্ত্র বা ঐশী গ্রন্থসমুহ বিষয়ভিত্তিক কোন গ্রন্থ নয়। এগুলি দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। কেবল শাব্দিক অর্থই নয়, এগুলি থেকে মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে এবং মানুষকেই তার মর্ম অর্থ উদ্ধার করে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সমগ্র গীতায় জাগতিক এই বন্ধন মুক্তির পথ সম্পর্কেই ধারণা দেয়া হয়েছে।

সরল পথে চলতে হলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পেতে হবে। যা সত্য ও সঠিক পথে চলার বিপরীতে শক্তি প্রয়োগ করে বা নেগেটিভ ফোর্স হয়ে কাজ করে এবং মানুষকে বিচলিত করে। সরল বা সমর্পনের পথে চলতে হলে মানুষকে তাই 'বোধসম্পন্ন' হতে হবে।

হৃদয়ের বাণী বা কথা শ্রবন করতে হবে। জীবন থেকে উৎসারিত উদ্বুদ্ধকরণকে বুঝতে হবে। সেখানে 'ইচ্ছে' ও 'প্ররোচনা' দু'টোই আছে। প্ররোচনা মন্দ অর্থে। এটির দায়ভার প্রতীকী শয়তানের ওপর। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য।

সরল পথগামীদের আল্লাহ তাদের যথাযথ প্রাপ্য বা পুরস্কার প্রদান করবেন। যদি সে ব্যাবস্থা না থাকে তবে মানুষের ভাল পথে চলা কোন মূল্য বহন করবে না। অতএব বিষয়গুলিতে বিশ্বাস রাখতে হবে। বিশ্বাসে ভর করে চলতে হবে। দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় জগত পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হবে। বলা হচ্ছে,

".. আল্লাহ ভালদের থেকে দুষ্টদেরকে পৃথক করবেন। দুষ্টদের সকলকে তিনি এক এক করে সমবেত করবেন এবং নরকে প্রেরণ করবেন। তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-কোরআন ৮:৩৭)

সরল পথ বিচ্যুতরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাহিরের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং নিজ অন্তঃরস্ত প্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়না বা প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে হৃদয় নিঃসৃত

‘ইচ্ছে’কে তাই ‘জ্ঞান’ নামক অস্ত্র দ্বারা শানিত করে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“অজ্ঞতার কারণে তোমার হৃদয়ে যে সংশয়ের আবির্ভাব হয়েছে, জ্ঞান নামক অস্ত্র দ্বারা তাকে ছিন্ন কর।” (গীতা ৪:৪২)

সরল পথে চলতে হলে হৃদয় নিঃসৃত ‘ইচ্ছে’কে তাই ‘জ্ঞান’ নামক অস্ত্র দ্বারা বিচার-বিবেচনা ও যাচাই-বাছাই করে সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে।

‘হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও’ অর্থাৎ সরল পথে চলাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য যা অর্জন করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়ার মানসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। বস্তুত লক্ষ্য তো মানুষের নিজেদেরকেই অর্জন করে নিতে হবে। তবে প্রার্থনা লক্ষ্য অর্জনকে সম্ভব করে তোলে। কিভাবে সম্ভব করে তোলে এ প্রসঙ্গে সেটিও বোঝার বা ব্যাখ্যা করার আছে। তাই এ বিষয়েও নিচে কিছু আলোচনার অবতারণা করা হল।

ধারণায় আল্লাহ বিরাজ করেন সর্বত্র। আমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি- ধারণা বা কল্পনায় তাঁকে আমরা উচ্চাকাশে কল্পনা করতে পারি। চারপাশে বিরাজমান ভাবি। আবার হৃদয়ে অনুভব করি।

হৃদয়ে আল্লাহকে অনুভবের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়ে সঠিকভাবে সংযোগ স্থাপন করাতে পারলে প্রার্থনা কাজ দেবে।

যখন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি সত্যিকার অর্থে কার্যকরভাবে সে প্রার্থনা করি মূলত নিজের কাছে। কেননা আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। কৃত প্রার্থনা কার্যকরভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে মূলত নিজেরই সাথে। গোপনে নিজের ভেতরে। অন্তরের গভীরে। সেখানেই তিনি। আন্তরীক হয়ে প্রত্যাশা করা হলেই কেবল এভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়।

বস্তুত প্রয়োজন অনুভূত হলেই মানুষ কিছু একটা আন্তরীকতার সাথে চায় বা প্রত্যাশা করে। যেমন পিপাসা পেলে পানি চায়। এ চাওয়াটিই হচ্ছে যাঞ্চা করা বা প্রার্থনা। এটি ভিক্ষে চাওয়া নয়। যা যাঞ্চা করা হয় বস্তুত তা ‘চাহিদা’ বা প্রয়োজনের প্রকাশ। প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদাকে আল্লাহর কাছে হাজির করে, প্রকাশ করে বা জানান দেয়।

দেহ ও মনে অনুভূত প্রয়োজন বা এ চাহিদাটিই লক্ষ্যে পরিণত হয়। এভাবেই বিধাতা জীবসত্বাসমুহের নির্ধারণ করা লক্ষ্যের মাধ্যমে জাগতিক প্রয়োজনগুলি জেনে নেন। জগত পরিচালনা করেন।

সহজ-সরল পথের সন্ধানে যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন আমরা নিজেরাই সে পথে চলতে চাই, বা সে পথে চলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছি বা থাকি সেটি জানান দেই। কেননা আমরা সে পথে চলার গুরুত্বকে বিচার-বিশ্লেষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে বুঝতে শিখেছি। জটিল পথগুলি সম্পর্কে অবগত এবং সেগুলির বিষয়ে বিতশ্রদ্ধ। তাই এ প্রার্থনা। যেন তা অর্জন করতে পারি।

যে পথ আমরা নিজেরা প্রত্যাশা করি বা যা কিছু আমরা কামনা করি, সে পথে চলতে হয় বা তা অর্জন করে নিতে হয় মানুষের নিজেকেই। কেউ এসে কিছু করে দিয়ে যায় না। মানুষের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাই ‘লক্ষ্য স্থীর’ করা। কিন্তু লক্ষ্য স্থির হলেই তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ভেতরে প্রচন্ড শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। ‘আল্লাহর ইচ্ছে’ ভিন্ন সে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। আল্লাহর ইচ্ছেকে জাগিয়ে তুলতে হয়। আবার তাঁর সম্মতি, সাঁয় বা অনুমোদন ব্যাতিতও সে ‘ইচ্ছে’ জাগ্রত করা সম্ভব না। প্রার্থনার মাধ্যমে জীবসত্বাসমুহ তাঁর অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁর ‘ইচ্ছে’কে জাগ্রত করার চেষ্টা করে। সেখানেই মানুষের করণীয়। সে কারণেই প্রার্থনা। ‘আল্লাহর ইচ্ছে’ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যময় একটি বিষয়।

দেহে যেমন স্নায়ুগুলি কাজ করে ঠিক তেমনি দ্রুততার সাথে কিংবা তার চেয়েও অধিকতর দ্রুত গতিতে কৃত প্রার্থনা অনুমোদনদাতার কাছে পৌঁছে যায়। বলা হচ্ছে,

“তথাপি এই দেহে ভোক্তারূপ এক পরম সত্বা রয়েছেন যিনি সাক্ষী, অনুমোদনদাতা ও পালনকর্তা পরমেশ্বর। তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।” (গীতা ১৩:২৩)

আল্লাহর অনুমোদন পেলে মানুষের নির্ধারণ করা প্রাথমিক ইচ্ছে নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে অন্তরে গৃহীত হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে নিয়ত বাধা। অন্তর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বিষয়টি ‘আল্লাহর ইচ্ছে’তে পরিণত হয়ে যায়।

'আল্লাহর ইচ্ছে'র পরশ লাভ হলে মানুষের দেহ-মন শিহরীত ও পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে ওঠে। লক্ষ্য অর্জনে মানুষ নিজেই সচেষ্ট ও তৎপর হয়। সকল বাধা অতিক্রম করে ছুটে চলে। প্রার্থনার মাধ্যমে বস্তুত মানুষ নিজেই নিজেকে এভাবে সাহায্য করে। তাই বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (আল্লাহকে/নিজেকে) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।" (আল-কোরআন ২২:৪০)

আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাশক্তিধর। আল্লাহর ইচ্ছেতে যখন তাঁর সাহায্য নেমে আসে তখন মানুষ পূর্ণ মাত্রায় জেগে ওঠে!! অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে! আল্লাহর ইচ্ছে জাগ্রত হলে লক্ষ্য অর্জনে আল্লাহ সহায়ক হয়ে যান। কর্মে একাগ্রতা আসে। ভেতরে সাহসের সঞ্চার হয়। প্রাণে উচ্ছাস-উদ্যাম ও স্বতস্ফুর্ততা দেখা দেয়। মানুষ দুর্বার গতিতে ছুটে চলার শক্তি পায়।

আল্লাহ মানুষকে তার নিয়তের পথে চলতে সাহায্য করেন। মানুষের নিয়ত বা আন্তরীকভাবে করা প্রতিজ্ঞার সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততা থাকে। তাই বলা হয়,

"অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" (আল-কোরআন ২:২২৫)

অন্তরে, গোপনে বা ভেতরে মানুষ নিজেও তার নিজের করা প্রতিজ্ঞা ও কর্মের বিষয়ে নিজের কাছে জবাবদিহি করে। বস্তুত সব আল্লাহর কাছে চলে যায়। আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে তাই অযথা কিংবা কোন মন্দ কাজ করতে হয় না। সে দায় নিজের।

আল্লাহ মহান! তাঁকে যত্রতত্র টেনে আনা তাই সমীচীন নয়। আন্তরীকভাবে মানুষ যা চাইবে তিনি তা করে দেবেন। ভাল চাইলে ভাল করে দেবেন, মন্দ চাইলে সে পথেও যেতে দেবেন। কিন্তু স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আল্লাহকে সম্পৃক্ত করে কোন কিছু চাইলে বা কোন কাজ করা হলে তার জন্য একদিন জবাবদিহিও করতে হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রার্থনা থেকে সুফল পেতে হলে অবশ্যই নিজ নিজ বিশ্বাসের আলোকে আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাসী হতে হবে। অন্যথায় এটি কাজ করবে না বা সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। ধারণায় আল্লাহ এমন এক মাধ্যম যার অনুপস্থিতি মানুষকে বিশেষত বিশ্বাসীকে জাগ্রত করতে ব্যার্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রার্থনা করার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অন্তরের চাওয়া বা প্রত্যাশাই প্রার্থনা হয়ে কাজ করে। এটি নিরবে নিভৃতেও সম্পন্ন হতে পারে। কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পেতে পারে। তবে শৃংখলার স্বার্থে নিয়ম ও বিধি-বিধানসমুহেরও প্রয়োজন আছে সেটিও বুঝতে হবে।

যার মনোবৃত্তি, ইচ্ছে, নিয়ত বা লক্ষ্য হচ্ছে সঠিক ও সরল পথে চলা, প্রার্থনা তাকে সে পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রার্থনা ভেতরের ইচ্ছেকে জাগিয়ে তোলে; সক্রিয় করে তোলে। আল্লাহর ইচ্ছের পরশ পেলে বিদ্যুৎ গতিতে দৈহিক-মানসিক এমনকি পারিপার্শ্বিক সকল রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়। ভেতর উজ্জীবিত হলে প্রেরণার সৃষ্টি হয়। উচ্ছাস আসে। বুদ্ধি খুলে যায়, পথ বের হয়ে আসে। সাহস আসে, শক্তি আসে। মানুষ কর্মস্পৃহা পায়।

বস্তুত সকল সক্ষমতা মানুষের নিজের ভেতরে। কেবল জাগিয়ে তুলতে হয়। প্রর্থনা করে বসে থাকলে তাই ফল লাভ হয় না বা লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় না। মানুষের নিজেকেও সচেষ্ট হতে হয়। প্রার্থনা মানব মনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। প্রার্থনার মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। মনস্তত্বও এক অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান!

প্রার্থনাস্বরূপ উচ্চারিত বাণী বা বাক্য মানুষকে তার প্রার্থীত বিষয়ের দিকে চালনা করে। অন্তরে আওরালেও তা নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। তবে অবশ্যই সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হতে হবে। তার জন্য প্রার্থিত বিষয়টি আন্তরীকভাবে চাইতে হবে। আবার যাকে উপায় বা মাধ্যম ধরে চাইতে হবে তাঁর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখতে হবে। তাঁর ওপর ভরসা রাখাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মাত্রাকে প্রকাশ করে।

অর্থ না বুঝে প্রার্থনা করলে সেটি সাধারণত ফলদায়ক হয় না। কেননা কি চাই নিজেই বুঝি না। ফলে সেটি যথাযথভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না বা ব্যার্থ হয় তার দুর্বোধ্যতার কারণে। আবার উদাসীনতার সাথে করা

প্রার্থনাও ফলদায়ক হবে না তার আন্তরীকতার ঘাটতির কারণে। তবে সম্মিলিতভাবে করা প্রার্থনায় সেগুলিও ভূমিকা রাখে।

প্রার্থনা মানুষকে সর্বদা তার প্রত্যাশিত বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেন মানুষ ভুলে না যায় বা তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে না যায়। এটি তাকে নিয়তের পথে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আলোচ্য আয়াতের বারংবার উচ্চারণ প্রতিক্ষণে আমাদেরকে একটি সুস্থ্য সময়ের সুচিন্তিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে ব্যাস্ততার মাঝেও স্মরণ করিয়ে দেয়। লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। প্রার্থনা সচেতনতা সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে কর্ম ও আচরণে সর্বদা ক্রটিমুক্ত ও সতর্ক থাকতে তাড়িত করে।

সূরা ফাতেহায় উচ্চারিত প্রার্থনায় নিয়ত বা লক্ষ্যকে ‘সরল পথে’ চলার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। কিংবা বলা যায় যে, ফাতেহা পাঠকে সুচিন্তিতভাবে একটি নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যথাযথ পথে চলতে পারার মানসিক শক্তিকে বেগবান করার জন্য।

যখন সকলের পক্ষ থেকে সকলের জন্য এ প্রার্থনা করা হয়, তখন এটি অপরের মাঝেও সরল পথে চলার ধারণা সম্বলিত বোধকে ছড়িয়ে দেয় এবং এর গুরুত্বকে তুলে ধরে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজে কোন একজনের জটিল পথ অবলম্বনও সকলকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে বা বিচ্যুত হতে বাধ্য করে। ফলে সকলের মাঝে এ বোধ ছড়িয়ে দেয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রার্থনা প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে জগতের সকল মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করে। কেননা সকলের পক্ষ হয়ে সকলের মঙ্গল কামনায় এ প্রার্থনা করা হয়।

সত্যি বলতে মানুষের নিজেদের ক্রটির কারণেই জগতে স্বর্গীয় বিধান প্রতিষ্ঠা পায় না। স্বর্গ পেতে হলে মানুষকে সঠিক আচরণে তথা সরল পথে চলতে হবে। তাহলে জগতই হবে স্বর্গ। তাই বলা হয়েছে,

“মানুষের নিজ হাতে করা মন্দ কর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যা করেছে, তার আংশিক ফল আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তিস্বরুপ আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।” (আল-কোরআন ৩০:৪১)

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বা চাওয়া মানুষের নিজেকেই পথ খুঁজে নিতে উজ্জীবিত করে। মানুষ যখন একটি সরল পথের দিক-নির্দেশনা চেয়ে প্রার্থনা করার পর্যায়ে আসে, এর মাধ্যমে সে নিজেই পথের সন্ধান করে। চাওয়া আন্তরীক হলে মানুষ নিজেই সচেষ্ট হয়। ফলে পথের সন্ধান করে ও পথ খুঁজে পায়। মানুষ তখন 'নিজের' ওপর তথা 'আল্লাহর' ওপর ভরসাকারী হয়।

এ জ্ঞান মানুষকে নিজের ওপর বিশ্বাস সৃষ্টি করার শিক্ষা দেয়। এটাই 'আত্মবিশ্বাস'। সকল শক্তির উৎস! মানুষকে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের ওপর ভরসা করতে বলে। নিজেকে সন্মান করতে শেখায়। আত্মবিশ্বাসের ফল এসব। যেহেতু ভেতরে তিনি। অতএব মানুষ বস্তুত আল্লাহর ওপরই ভরসা করে। এ প্রার্থনা আল্লাহকে চিনতে ও বুঝতেও সহায়তা করে। বস্তুত মানুষ নিজেই নিজেকে সাহায্য করে। তিনি ভেতরেই বিরাজ করেন। তবে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে কেবল জাগ্রত অন্তর!

শয়তানের প্ররোচনা বা নেগেটিভ ফোর্স সরল পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে দেয় বা দিতে চায়। তাই এমন রীতি তথা দোয়া বা মন্ত্র পাঠের প্রচলন করা হয়েছে। শব্দগুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে।

সরল পথে চলার ও দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশায় করা এমন প্রার্থনা সুরা ফাতেহাই মানবজাতির সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেছে। সরল পথ বলে একটি পথ আছে এবং সে পথে মানুষকে চলতে হবে এবং এটিই মানুষের চলার যথাযথ পথ সূরা ফাতেহা সে বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করেছে। মানুষের চিন্তা জগতে পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরল পথে চলার বিষয়টি স্বর্গীয় বিধানের অধীন! যে বিধানে চলতে জগতের সকল মানুষ আজও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গেলেই মানুষ নোংরা রাজনীতি, ষড়যন্ত্র, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, একে অপরের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ আচরণ করা কিংবা অন্যকে ছোট করার চেষ্টা করা, কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করা এমনি নানান দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। পরিবেশের প্ররোচনা, নিজ প্রকৃতি তথা অহম বা রিপুর নানাবিধ তাড়না তাকে সহজেই প্ররোচিত করে এবং সহজ-সরল পথে চলা থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে মন্দ প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তবেই সরল পথে চলা সম্ভব হয়ে উঠবে। আল্লাহতে বিশ্বাস ও তাঁকে হাল না ধরে এ জ্ঞানের পথে স্থীর থাকা মোটেও সহজসাধ্য নয়।

সরল পথে চলাকে মানবজীবনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। মানুষকে এ লক্ষ্য অর্জন করতেই হবে। স্বর্গীয় তথা চরম ও পরম শান্তির জন্য এ পথ প্রতিষ্ঠা করার বিকল্প নেই।

সরল পথে চলার সত্যিকার সুফল পেতে হলে সকল মানুষের কাছে সরল পথ কি এবং এ পথে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে হবে।

হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-রেষারেষি, কূটচাল-ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করে সরল পথে চলতে শিখতে হবে। শুনতে সহজ বোধ হলেও বাস্তবে তেমন গুণ অর্জন করা অত্যান্ত কঠিন কাজ। এটিই সর্বোচ্চ পর্যায়ের জেহাদ, যুদ্ধ বা সংগ্রাম। সরল পথে চলতে হলে সর্বপ্রথম নিজের মন্দ প্রবৃত্তির সাথে নিজেকে জেহাদে লিপ্ত হতে হবে। সেখানে জয়ী হতে হবে। তাই বলা হয়েছে,

“অহমবোধ শূন্য, নির্মোহ, আসক্তিমুক্ত, নিত্য আধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন, কামনা-বাসনা বিবর্জিত, সুখ-দুঃখ নামক দ্বন্দ্বসমুহ থেকে মুক্ত বিবেকী ব্যাক্তিগণই তেমন অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। কিংবা যে জানে যে, কিরূপে পরমার্থের কাছে সমর্পন করতে হয় সেই তেমন স্বর্গরাজ্য তথা শান্তি লাভ করে।” (গীতা ১৫:৫)

জ্ঞান অর্জন করা, বিষয়ের ভেতরের কথা বা মূল বক্তব্য অনুধাবন করা এবং সে অনুসারে চলতে পারাটিই মূখ্য বিষয়। সত্যের জ্ঞান কোথা থেকে তুলে ধরা হয়েছে- বাইবেল, কোরআন নাকি গীতা থেকে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত জগতের কোন জ্ঞানই সত্যিকার অর্থে মানবের নিজস্ব নয়। সবই বিধাতা প্রসূত।

৬	তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, [The path of those whom Thou hast favoured.]

▪ **১.৬** তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ (The path of those whom Thou hast favoured) : ওপরে উল্লেখ করেছি যে, এ আয়াতটি সরল পথে

চলার প্রার্থনারই সম্প্রসারিত অংশ যা বিষয়টিকে আরও বিস্তারীতভাবে প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায় যে তাদেরকে তিনি সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। তারা অর্পিত জাগতিক সকল কাজ, দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করে মুক্তি লাভ করেছেন। তাদেরকে প্রদর্শিত পথের ন্যায় প্রার্থনাকারীদেরকেও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য এখানে আল্লাহর কাছে যাচ্ঞা করা হয়েছে। যেন নিজেরাও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারি বা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের আওতার মধ্যে অবস্থান করতে পারি।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ কাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন? 'তাদের পথ' বলতে এখানে কাদের পথকে বোঝান হয়েছে? বা এভাবেও বলা যায় যে, আল্লাহ কাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন?

আয়াতের এ অংশটুকুকেও দু'ভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমত: আল্লাহ কাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন? এবং দ্বিতীয়ত: কেন আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন বলে বলা হচ্ছে? এ দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলে আমরা এভাবে প্রার্থনা করার অন্তর্নিহিত কারণটি বুঝতে পারব এবং পথ খুঁজে পাব বলে আশা করি।

আল্লাহ কাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন বলে বলা হচ্ছে? ধরে নেয়া যেতে পারে যে, পৃথিবীতে যাদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নবী-পয়গম্বরদের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"... আমি যাকে ইচ্ছে তাকে জ্ঞানের মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করি। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, সচেতন।

আমি ইব্রাহীমকে দিয়েছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি এবং তার সন্তানদের মধ্যে (পথ প্রদর্শন করেছি) দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে।

এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি এবং জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে। তারা সবাই ছিল সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের

অন্তর্ভুক্ত এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে। তাদের প্রত্যেককেই আমি সৃষ্টির সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছি।

আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এমনই আল্লাহর পথ প্রদর্শন যা তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তাকে প্রদান করেন।

... তাদেরকে আমি গ্রন্থ, নির্দেশনা ও নবুয়ত দান করেছি। ... এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব তাদের পথ অনুসরণ কর। ...।" (আল-কোরআন ৬:৮৩-৯০)

অতীতে আল্লাহ যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন বা যারা আমাদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে কোরআনে তাদের সম্পর্কে এখানে একটি ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। তেমন মানুষদের মধ্যে কিছু নামের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জীবন সংগ্রামের বিস্তারীত কোন বিবরণ এখানে তুলে ধরা হয়নি। বলা যায় এখানে একটি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মাত্র। অতএব কেমন চরিত্র, কর্ম ও আচরণসম্পন্ন মানুষদেরকে অনুসরণ করতে হবে তা তাদের জীবন সংগ্রাম থেকে জানা যেতে পারে। তেমন মানুষদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানাও সরল পথে চলার পথে পাথেয় খুঁজে পাওয়ার একটি সূত্র বা উপায় হয়ে কাজ করতে পারে। তাই তাদের জীবন সম্পর্কে জানা কর্তব্যের মধ্যে পরে। কেননা সেখান থেকে সঠিক পথে চলার দিক-নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহ কাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন সে বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া গেল। অতঃপর প্রশ্ন হচ্ছে যে, কেন আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন বলে বলা হচ্ছে? তারা ছিলেন 'সৎকর্মশীল'। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই অনুগ্রহ করেন। তিনি তেমন মানুষদেরকেই পথ প্রদর্শন করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি কারও পদমর্যাদা, বংশ পরিচয় এসব বিষয়কে বিবেচনায় নেন না। তিনি 'যাকে ইচ্ছে তাকে' অনুগ্রহ করতে পারেন যদি কেউ সদগুণ সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন কেননা তারা তাদের সমসাময়িক কালে ও সমাজে সৎকর্মপরায়ন, সঠিক পথ অবলম্বনকারী ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন। তারা মানুষের মঙ্গল কামনা করেছেন। সত্য পথের পথিক ছিলেন। সে কারণে তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দকেও পরিত্যাগ করছেন।

মন্দ কর্ম ও পথের বিপক্ষে তাদের অবস্থান ছিল দৃঢ়। তারা তাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। মানুষকে তারা ভাল পথে আহবান করেছেন। দুঃস্থ-মানবতার সেবা করেছেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা ছিলেন এক একটি আদর্শ ও নেতৃস্থানীয়। ছিলেন সম্মানের আসনে আসীন। তাই উদাহরণ হিসেবে তাদের নাম এসেছে। তাদের জীবন ও কর্ম থেকেও সত্য-সঠিক, সহজ ও সরল পথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ওপরের বক্তব্য থেকে বলা যেতে পারে যে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন যারা সত্য, ন্যায় ও ভাল পথে চলেছেন। যথাসাধ্য অন্যায় ও মন্দ কাজ বর্জন করে চলার চেষ্টা করেছেন এবং সকলকে সেভাবে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের কর্ম, ত্যাগ-তীতিক্ষাময় জীবন সাধারণ মানুষের জন্য যেমন উদাহরণস্বরূপ তেমনি অনুসরণীয় ও শিক্ষনীয়।

আয়াতে তাই তাদের পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে পারার মানসিক শক্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এটি প্রার্থনাকারীর আন্তরীক ইচ্ছেকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনি বারবার এর উচ্চারণ উচ্চারণকারীর মনকেও সেদিকেই চালনা করে। ফলে এ প্রার্থনার উপকারীতা আছে উভয় দিক থেকে। এসবের মনস্তাত্তিক গুরুত্ব আছে।

মানবসমাজে যারা সুপথে চলেছেন বা আজও যারা সুপথে চলেন, যারা ভাল পথে সফল বলে পরবর্তীতে প্রমানিত ও গ্রহণীয় তাঁরা অপরাপরদের জন্য আদর্শস্বরূপ। তাদের পথ অনুসরণ সুপথে পরিচালনা করবে তেমনটি ধরে নেয়া স্বাভাবিক। এ প্রার্থনা আমাদেরকে সে দিক-নির্দেশনা দেয়। তবে অবশ্যই যারা ছদ্মবেশ ধারণ করে ভালরূপ পরিগ্রহ করে তারা নয়। এ বিষয়টিও বিবেচ্য হতে হবে। কেননা বর্তমান সময়ে বা সব সময়েই সমাজে এরকম কিছু মানুষ ছিল ও আছে। তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অতিরঞ্জিত ও বাস্তব বিবর্জিত ভাবনাও এক্ষেত্রে পরিহার করে চলতে হবে। তাই নিম্নোক্ত বিষয়ে ধারণা রাখা ভাল বলে মনে করি।

নবী-পয়গম্বরগনও মানুষ ছিলেন। কোন মানুষের জীবন পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত নয় কিংবা হতেও পারে না। মানবীয় দুর্বলতাজনিত ত্রুটি সকলের মাঝেই বিদ্যমান। সব মানুষ সবসময় সকল দুর্বলতাকে কাটিয়েও উঠতে পারে না। তেমন শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা

হয়েছে। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, মানবকুলের মধ্যে একমাত্র মহানবী (সাঃ) ছিলেন নিখুঁত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। ফলে কিছু খুঁত থাকা সত্বেও যারা তুলনামূলকভাবে ভাল বা নিখুঁত এখানে তাদের পথকে বোঝান হয়েছে। এমনকি তাদের সে মাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়ে আরও ভাল ও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়াতেও কোন ত্রুটি নেই যদি সম্ভব হয়।

বর্তমান সময়ে নবী-পয়গম্বরগণ আসেন না। তবে কি এখন তেমন অনুসরণীয় মানুষ নেই যাদের নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি? নামের উল্লেখ থাকাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। দিক-নির্দেশনাটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সঠিক পথ অবলম্বনকারী হতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"মহান ব্যাক্তিগণ যা যা করেন সাধারণ মানুষ তাই করে। তিনি যা প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠা করেন জগত তা অনুসরণ করে।" (গীতা ৩:২১)

আজও পৃথিবীতে অনুসরণীয় মানুষ আছে। পৃথিবী আরও কোটি কোটি বছর সচল থাকবে। যারা ভবিষ্যতে আগমন করবে তাদের মাঝেও তেমন মানুষের আগমন ঘটবে। যারা সঠিক পথে চলবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাববে, মানব কল্যাণে যারা অবদান রাখবে তারা সকলেই অনুসরণীয়। বিষয়গুলিকে সেভাবেও বুঝতে হবে। কোরআন হচ্ছে দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ যা দিক বা সূত্রটি ধরিয়ে দেয়। কিন্তু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সে পথে জ্ঞানের আলোকে বুঝে-শুনে চলতে হবে মানুষকেই।

আল্লাহ যাদের অনুগ্রহ করেছেন বস্তুত তারা সকলেই অনুসরণীয়, যদি না তারা স্পষ্টতই কোন অন্যায় বা অপরাধ করে থাকে। বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে হবে। প্রচলিত অর্থে সে মুসলিম নাও হতে পারে! তিনি কাকে তার অনুগ্রহ দান করবেন সেটি তিনিই ভাল জানেন। এক অর্থে কোন জ্ঞানই মানুষের বা ব্যাক্তির নিজের নয়। অন্তরে কে যথাযথ মুসলিম তথা যথাযথ মানুষ সেটি তিনিই ভাল জানেন।

অতীত হয়ে যাওয়া মানুষেরা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে গিয়েছেন এবং তারা আমাদের জন্য প্রেরণারও উৎস; তবে সাথে সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথাও বলতে হবে। যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে বলে দাবী করে তারা এভাবে ভাবে না এবং বলেও না কিংবা কেবল পুরোনোকেই আঁকড়ে ধরে

থাকার চেষ্টা করে। তাই এ প্রসঙ্গটি এখানে তুলে ধরা হল। সময় এসেছে কোরআনের বাণীর মর্মার্থ অনুধাবনের।

সরল পথে চলার সাথে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের একটি সম্পর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে তাই আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, যারা ভাল পথে বা ন্যায়ের পথে চলেছেন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। তারা পরবর্তীদের জন্য অনুসরণীয় হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়বোধের ধারণায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে পার্থক্য আছে। বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। কোরআনে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত যাদের নাম উল্লেখ রয়েছে, তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থা, অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে থেকে সে আলোকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী বর্তমানে সমগ্র বিশ্বময় বিস্তৃত হয়েছে। ফলে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়গুলি এখন এখনকার সময়, ভৌগলিক অবস্থা, অবস্থান ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিবেচনা করতে হবে।

আল্লাহর সৃষ্টি সূর্য্যও যেমন জগতের সব স্থানে একই সময়ে সমভাবে আলো বিতরণ করে না, তেমনি ভাল-মন্দের ধারণা প্রচলিত ব্যবস্থায় স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই রকম নয়। আর এ সবই মানব মস্তিষ্কের গ্রহণ করে নেয়া বা না নেয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

আদম-হাওয়া স্বর্গে নগ্ন ছিলেন। এটি কি ভাল না মন্দ? ব্যাক্তিক, মানসিক ও সামাজিক মস্তিষ্কে কোন একটি বিষয় গ্রহণ করে নেয়া বা না নেয়ার সাথে ভাল-মন্দের বিষয়টি সম্পর্কিত। যদি না সেটি স্পষ্টতই কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। আর বিশৃংখলা কিছু মানুষই সৃষ্টি করে। বরং তাদেরকে সঠিক শিক্ষায় গড়ে তোলা অধিক জরুরী।

আল্লাহ নিজেই মানবকে এভাবে নানাবিধ পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে শিক্ষা-সংস্কৃতি, চর্চা, প্রথা ইত্যাদি নানান কারণে বিভিন্ন ধারণা ও সঙ্গা পার্থক্যপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব ভাল-মন্দের ধারণা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়গুলিকে সমাজ-সংস্কৃতির আলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে এবং ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধন করতে হবে যদি প্রয়োজন

হয়। যেন কোন নিয়মের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামগ্রীক উন্নয়নকে ব্যাহত না করে।

শাব্দিক অর্থ ধরে নিয়ে কোন বিষয়ে অনড় হয়ে পড়ে থাকা যাবে না। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে ভূক্তভোগীর কষ্ট লাঘব হল কি-না, ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেল কিনা, সামষ্ঠিক মানব অন্তর তুষ্ট হল কিনা। তা না হলে আল্লাহ-কোরআন-ধর্ম বিতর্কিত হতে হতে এক সময় এর ধারক-বাহকেরা হারিয়ে যাবে।

একথাও ভূলে গেলে চলবে না যে, কিছু ভাল ও মন্দ কাজ আছে যা সর্বক্ষেত্রেই ভাল বা মন্দ হিসেবে পরিচিত। যেমন সত্য বলা, সৎ পথে চলা সর্বসময়ে সর্বক্ষেত্রেই ভাল বলে বিবেচিত। মিথ্যে বলা, মানুষ হত্যা করা, ধর্ষন করা, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করা এগুলি সর্বক্ষেত্রেই মন্দ হিসেবে বিবেচিত। অতএব ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার ক্ষেত্রে এমনিভাবে সকল বিষয়কেই বিবেচনায় নিতে হবে।

কথাগুলি বিশেষভাবে বলা হল এ কারণে যে, কোন একটি নিয়ম সর্বত্র সমভাবে চাপিয়ে দেয়া যায় না, আবার প্রযোজ্যও হতে পারে না। সকল নিয়ম মানুষের জন্য। মানুষের সুবিধার জন্য। ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সমাজে শৃংখলা বিধানের জন্য। অতএব স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় নিয়মটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তাই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করারও প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র কোন গ্রন্থের শাব্দিক উচ্চারণ বিবেচনায় নিয়ে আমরা যেন অবিবেচকের মতো কোন সিদ্ধান্ত না নেই। যেমনটি বর্তমান সমাজে সচরাচর হতে দেখা যায়।

কিছু লোক এসবের সুবিধা নেয়। ক্ষণস্থায়ী দু'দিনের দুনিয়ায় তারা নিজেদেরকে সাংগঠনিকভাবে ক্ষমতাশালীরূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং ধর্মকেও বিতর্কিত করে। শক্তি ও সত্য যে এক বিষয় নয় সেটি বুঝতে হবে। মর্মার্থকে বিবেচনায় নিতে হবে গুরুত্বের সাথে। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলি এখানে বলে রাখা হল যা পরবর্তীতে কোরআনের আরও কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সময়ে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হবে।

স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতার কারণে নিয়মের পরিবর্তন হতে পারে এবং সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল সূত্রটিই হল দিক-নির্দেশনার মূল। যেটি সার্বজনীন ও শাশ্বত। আর সেটি হল ন্যায়ের পথ, কল্যাণের পথ, সত্যের পথ সর্বপরি অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও ভূক্তভোগীর কষ্ট ও দুর্ভোগের লাঘব।

কোরআন যাদেরকে অনুসরণীয় বা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত বলে আখ্যায়িত করেছে তারা যদি ন্যায়ের পথ অবলম্বন না করত তবে তারা অনুসরণীয় হত না। ন্যায়টিই আসল ও মূল সূত্র।

আল্লাহ অতীতেও যুগে যুগে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত মানুষ প্রেরণ করেছেন, আজও করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তারা সকলেই অপরাপরদের জন্য অনুসরণীয়। তারা অনুসরণীয় কারণ তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলেছেন, চলেন এবং চলবেন- তাই। অতএব স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় ন্যায় প্রতিষ্ঠাই মুখ্য। উচ্চারিত কোন শব্দই একমাত্র প্রযোজ্য সূত্র নয়।

স্থান, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় যা ভাল ও কল্যাণকর, যা সমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরল পথকে বিবেচনা করতে হবে। উন্নত কোন চিন্তাধারা যদি পশ্চাৎপদ কোন সমাজে প্রবেশ করে, প্রাথমিক পর্যায়ে তা সমাজকে অশান্ত করে। তাই সে পরিবর্তনটি হতে হবে ধীর প্রক্রিয়ায়। যেন তা মানুষের জ্ঞানে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। মানুষের কাছে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে যেন তা গ্রহণযোগ্য হয়। তেমন পদক্ষেপই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এর বিপরীত আচরণও হবে সরল পথের বিরুদ্ধ বা বিচ্যুত আচরণ যা পরিবেশ ও প্রকৃতি গ্রহণ করেনা। উপরন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

অতএব কেবল সত্য প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। সেটিকেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে সত্যের পথ অবলম্বন করে। অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানসম্মতভাবে যথাযথ উপায়ে। সমাজের গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়ে। বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল এজন্য যে, ব্যাক্তিক ও সামাজিক চিন্তা-ধারার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সরল পথের ধারণার একটি সম্পর্ক আছে। এ বিষয়ে এখানে এতটুকু আলোচনাই যথাযথ মনে করি।

৭	তাদের পথ নয়- যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং তাদের পথও

	নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। [Not (the path) of those who earn Thine anger nor of those who go astray.]

▪ **১.৭** তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (Not the path of those who earn Thine anger nor of those who go astray) : ওপরে উল্লেখ করেছি যে, এ আয়াতটি সরল পথের প্রার্থনারই বাড়তি সংযোজন যা বিষয়টিকে আরও বিস্তারীতভাবে প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের পথে পরিচালিত কর যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যারা অনুগ্রহ লাভ করেছে বা অনুসরণীয় তাদের বিষয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এবার যারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথে পরিচালিত কর না। তবেই আমরা সরল পথে পরিচালিত হতে পারব।

উল্লেখ্য যে, তারাই আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব পথভ্রষ্টরাই আল্লাহর ক্রোধ অর্জনকারী। প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা কারা যারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে? কারা পথভ্রষ্ট হয়েছে? কি ছিল তাদের আচার-আচরণ ও কর্ম? সেখান থেকেও সরল পথে চলার দিক-নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

কোরআন অধ্যায়ন থেকে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারীতভাবে জানা যাবে। সমগ্র কোরআনে এমন অনেক ব্যাক্তি, সমাজ ও গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যারা ছিল পথভ্রষ্ট। তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর, তবে একই সঙ্গে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (আল-কোরআন ৫:৯৮)

আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যও সরল পথে চলা আবশ্যক। যদিও আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু তথাপি শাস্তি প্রাপ্তির যারা উপযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে তিনি নির্দয়। এ কঠোরতা ভূলপথগামীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য। এ কঠোরতা অপরাপরদের সুপথে চালনা করার জন্য। এ কঠোরতা ন্যায্যতা

প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহর সেই কঠিন শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকার জন্য তাঁর কাছে এমন প্রার্থনা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা যেতে পরে। ফেরাউন ছিল এক ত্রাসের নাম। ক্ষমতায় থেকে সে নিরীহ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল। সে এতটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল যে, কেবলমাত্র একটি উদাহরণ থেকেই তার নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও নির্জ্ঞানতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

সে যাদেরকে তার সম্ভাব্য হুমকিস্বরূপ মনে করেছিল তাদের নবজাতক পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করার রাজকীয় ফরমান জারি করেছিল। কিন্তু কন্যা-সন্তানেরা এ ফরমানের আওতার বাইরে ছিল। অজ্ঞতা তাকে কতটা ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল তা কেবল এ একটি উদাহরণ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে! বস্তুত সে ইসরাইলের সন্তান তথা ইহুদি সম্প্রদায়ের নবজাতক পুত্রদেরকে হত্যা করার আদেশ জারি করেছিল। সে ও তার দলবল মিশরে ইহুদিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করেছিল। আল্লাহ তার দম্ভকে চুরমার করে দিয়েছিলেন এবং পরকালেও সে শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে বলে বলা হয়েছে।

নূহ (আঃ), আ'দ, সামুদ কিংবা লূতের সম্প্রদায়ের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যারা তাদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস হয়েছিল। ফলে তাদের সম্পর্কেও বিস্তারীত জানা কর্তব্য। একটা জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সামষ্ঠিক কেমন কর্ম ও আচরণ আল্লাহর ক্রোধের কারণ হতে পারে, কেমন কর্ম ও আচরণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, কেমন কর্ম মানুষকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়- এদের কর্মকান্ড, আচার-আচরণ থেকে তা জানা সম্ভব। এভাবেও বলা যেতে পারে যে কেমন কর্ম, আচরণ ও পথ পরিহার করে চলতে হবে এদের ইতিহাস থেকে সে পথ নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব।

যারা মন্দ ও অন্যায়ের পথে চলে এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও জ্ঞান বিবর্জিত কর্মকান্ড করে বস্তুত তারাই পথভ্রষ্ট। তারাই সরল পথ থেকে বিচ্যুত। তারাই আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়। তাদের কর্মকান্ড সমাজে তথা সৃষ্টিতে পরিবেশের সকল রকম ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে।

মহাভারতেও তেমন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যাদের কর্মকান্ড সৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হতে পারে। বস্তুত এরা বিধাতা প্রদর্শিত যথাযথ দিক-নির্দেশনায় সমর্পিত নয়। অহমবোধ তাদেরকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। নিজেদের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না।

উল্লেখ্য যে, এখানে ভাল-মন্দের তালিকা প্রণয়ন করে আল্লাহর দিক থেকে কোন প্রকার দিক-নির্দেশনা চাওয়া হয়নি এবং সেটি সম্ভবও না। ভাল-মন্দের আছে নানান হিসেব-নিকেশ। স্থান-কাল-পাত্রের সাথেও এর সম্পর্ক আছে। তাই এক কথায় বিষয়টিকে প্রকাশ করতে গেলে এভাবে বলাই শ্রেয় যে, হে আল্লাহ! যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে, তা সে যে স্থানে বা কালেই হোক না কেন তদের পথে পরিচালিত কর এবং যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথে নয়।

প্রার্থনার এ ধরণ স্থান-কাল-পাত্রকেও বিবেচনায় নেয়। কেননা সব সমাজেই ভাল-মন্দ আছে যদিও সমাজ থেকে সমাজে ভাল-মন্দ বিবেচনায় তারতম্য আছে। এটি সে বিষয়টিকেও স্বীকৃতি দেয়। সবদিক বিবেচনায় চলার পথটি সমসাময়িক সময়ে ও সমাজে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়সম্মত হয়েছে কিনা, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা সে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখে।

সূরা ফাতেহা একটি প্রার্থনা। সাধারণভাবে মানুষ বোঝে বা ভাবে যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহই দেবেন। সত্যি বলতে আল্লাহই দেন যিনি শক্তিদাতা। যিনি ভেতরে বিরাজ করেন। কিন্তু মানুষ যেভাবে পাওয়ার প্রত্যাশা করে আল্লাহ সাধারণত সেভাবে দেন না। যে হৃদয় আল্লাহর সংস্পর্শে থাকে প্রার্থনা সে হৃদয় বা ভেতরকে অর্থাৎ নিজেকে সক্রিয় করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র।

প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মানুষ ভেতরকে বা নিজেকে প্রার্থিত বিষয়ের দিকে সক্রিয় করে তোলে। মানুষ যখন দারুণভাবে নিজেকে উদ্দীপ্ত বা সক্রিয় করতে সক্ষম হয় তখনই আল্লাহর সহায়তা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ সহায়ক হয়ে যান। প্রার্থিত বিষয় বা বস্তু অর্জন করার শক্তিদান করেন।

মানুষের নিজেকেই সব করতে হয়। কিন্তু আল্লাহকে জাগরুকভাবে পাশে পেতে হয়। আল্লাহকে পাশে পেলে মানুষের নিজস্বতা বা স্বকীয়তা ফুটে ওঠে। প্রার্থনা হিসেবে সূরা ফাতেহা সে কাজটিই করে। নিজেকে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত হতে সহায়তা করে। নিজের ভেতরে চেতনে কিংবা অবচেতনে বিদ্যমান সত্যিকারের রূপটিকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। অতঃপর আল্লাহ সে পথে মানুষকে চালনা করে নিয়ে যান। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা সত্য ও আন্তরীক হলেই কেবল সেটি অর্জন করা সম্ভব।

সুচিন্তিতভাবে উপস্থাপিত এ প্রার্থনা মানব জাতির জন্য ইংগিতপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হয়েও কাজ করে। মানুষকে কোন পথে চলতে হবে, কিভাবে বা কি কি বিষয় বিবেচনায় রেখে চলতে হবে সূরা ফাতেহার পাঠ মানুষের ভাবনায় সে বিষয়গুলিকে তুলে ধরে বা বলা যায় যে তেমন পথ প্রদর্শন করে।

প্রার্থনায় যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মানুষকে সে পথ অনুসরণ করে চলতে হবে। অর্থৎ সরল পথে চলতে হবে। এটিই লক্ষ্য। তবে তৎপূর্বে সরল পথ, সূরার মর্ম অর্থ ও বাস্তব জীবনে তা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা নিজেদেরকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। সে পথে চলার গুরুত্বকে মানবসমাজে তুলে ধরতে হবে এবং সকলকে সে পথে চলতে আহবান করতে হবে। কেননা স্বল্প সংখ্যকের মন্দ পথে চলাও সমাজের সুষ্ঠ পরিবেশকে নষ্ট করে।

সত্যিকার অর্থে কোন দিক-নির্দেশনার অনুপস্থিতিই কেবল দিক-নির্দেশনার গুরুত্বকে অনুধাবন করিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ মানুষকে তেমন দিশেহারা অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি দিশেহারা মানুষকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন। সরল পথ বলে একটি পথ আছে সেটি বুঝতে সহায়তা করেছেন। মানুষকে সে পথে চলতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

সূরার প্রারম্ভিক আয়াতটি আমাদেরকে সকল কাজে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করার শিক্ষা দেয়; যিনি দয়াময়। যা আসে সকল বিচার-বিশ্লেষণ শেষে জ্ঞান, যুক্তি এবং এমনকি বাস্তবতা থেকেও।

নিজ অহমবোধ পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয় এ আয়াত। প্রতিটি মানুষের সকল কাজের সকল কৃতিত্ব আল্লাহর সমীপে সমর্পন করে মানবজগতকে হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত রাখার দিক-নির্দেশনা দেয়। আল্লাহর কাছে সকলের সকল কর্মের

কৃতিত্বকে সমর্পনের কথা বলে। তাই 'পরম করুণাময়, দয়াময়' 'আল্লাহর নামে' সবকিছুর শুরু বা সূচনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এটি একটি শিষ্ঠাচারেরও শিক্ষা দেয় যে কার নামে, কিভাবে সকল কাজের শুরু বা শুভ সূচনা করতে হবে। এ আয়াত মানুষকে আচরণে নম্রতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়।

'আল্লাহর নামে' কথাটি উচ্চারণের যেমন জ্ঞানসম্মত কারণ আছে, তেমনি মানবজীবন তথা বাস্তবজীবনে এর উচ্চারণের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ও ভূমিকাও আছে। এর মনস্তাত্বিক যথেষ্ট ভাল ও প্রয়োজনীয় দিক আছে। মনস্তত্বও বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ বাণীর উচ্চারণ আত্মিক ও মানসিক থেকে শুরু করে সকল কর্ম ও আচরণে মানুষের ওপর বাস্তবেও গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

আল্লাহ থেকে বিচ্যূতি মানবজীবনকে উদ্ভ্রান্ত ও লক্ষ্যবিহীন করে দিতে পারে। জীবন ও জগতকে অর্থবিহীন মনে হতে পারে। ফলশ্রুতিতে জীবনে হতাশা নেমে আসতে পারে। আত্মহত্যার মতো প্রবণতারও সৃষ্টি হতে পারে। যা আল্লাহর ধারণার বিদ্যমানতার কারণে অনেকেই আজ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহই সর্বশেষ ভরসাস্থল হয়ে কাজ করেন।

বিচলিত ও উদ্ভ্রান্ত মানব মন, মানস ও জীবনে 'কোরআন' বা শাস্ত্র গ্রন্থসমুহ সত্যিকার অর্থেই 'আলোর পথের দিশা'। তাই বলা হয়েছে,

"আল্লাহ .. বিশ্বাসীদের জন্য এমন আলোর পথের দিশা দেবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে ..।" (আল-কোরআন ৫৭:২৮)

গীতায় বলা হয়েছে, "ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয়ে বিরাজ করে, জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকারকে আমি দুর করি।" (গীতা ১০:১১)

জ্ঞান থেকে উৎসারিত আল্লাহর ধারণা এবং তাকে কেন্দ্র করে পথ চলা মানবজাতিকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং একটি যথাযথ রূপরেখার পথে পরিচালিত হতে সহায়তা করেছে। ভূল-ভ্রান্তি তথা আঁধারের পথ পেরিয়ে আলোর পথের দিশা দেখিয়েছে।

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জগতসমুহের অধিকর্তা'- এটি মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতাকে প্রকাশ করে! জাগতিক সকল কর্মকান্ডের বিচার-বিশ্লেষণ শেষে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। যারা এ উপলব্ধিতে পৌঁছেছে তারা সৃষ্টিকে নিয়ে ভেবেছে, সকল কর্মকান্ডের পেছনের কারণ নিয়ে ভেবেছে, অতঃপর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জগতের সকল কারণের কারণ তিনি একজনা; যাকে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকি। তিনিই 'আল্লাহ'।

এ বাণী এ শিক্ষা দেয় যে, সকলের সকল কর্মকান্ডের সর্বশেষ কৃতিত্ব ঘুরে-ফিরে আল্লাহর কাছে। আল্লাহ হচ্ছেন সকল কারণের কারণ। তাঁকে কেন্দ্র করে জগতের সকল কিছু আবর্তিত। তিনিই সকল কিছুর উৎস। আবার তাঁর কাছেই সবকিছুর সমাপ্তি। তিনি ভিন্ন সকল অস্তিত্বই মিথ্যে। অতএব সকল প্রসংশা তারই প্রাপ্য। মানুষের কর্তব্য কেবলমাত্র তাঁর উপাসনা করা। মানুষ নিজ নিজ কর্মে সত্যনিষ্ঠ থেকে এ উপাসনা পালন করতে পারে। সে দিক-নির্দেশনা দেয় এ আয়াত।

নিজ কৃতিত্বের দাবীদার মানুষ জগত সংসারে অনেক অশান্তি সৃষ্টির কারণ। যারা এমন জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হতে পেরেছে তারাই বোধসম্পন্ন মানুষ। এমন বোধের কারণে তারা অহমবোধশূন্য। এ বাণী সমাজ থেকে অহমবোধ দূরীকরণে ভূমিকা রাখে। মানুষের কর্মকে অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলতে এবং জগত-সংসারে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীকরণেও ভূমিকা রাখে এ বাণীর উচ্চারণ। নিজ অহমকে শুরুতেই দমন করতে শেখায়। অপরের ঈর্ষার কারণ হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং শান্তির পথ প্রদর্শন করে। সূরা ফাতেহা মানুষকে এমন বোধে উন্নীত হতে সহায়তা করে। যা সকল জ্ঞানের উর্ধ্বের জ্ঞান। এ জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর কাছে সমর্পনের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেয়। তাই সবকিছু আল্লাহর নামে শুরু ও সম্পন্ন করার শিক্ষা দেয় এ আয়াত। প্রতিনিয়ত এর উচ্চারণ বিষয়টিকে স্মরণও করিয়ে দেয়। মানবের সকল কর্মের কৃতিত্ব পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর কাছে সমর্পনের শিক্ষা দেয় সূরা ফাতেহা।

জগতের সকল মানুষের জন্য সত্য, সঠিক ও যথাযথ ধর্ম হচ্ছে নিজ নিজ বিশ্বাসজনিত আল্লাহতে 'সমর্পন'। এটিই ইসলাম। শান্তির পথ। সকল ধর্মের মর্মবাণী। ভূল ও কুসংস্কারের অংশগুলি সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই পরিত্যজ্য।

'তিনিই করুণাময়, তিনিই দয়াময়'- সূরা ফাতেহা আল্লাহ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। আল্লাহ কে বা কি কেউ জানে না। আল্লাহকে সকলেই চেনে-জানে তাঁর বিবিধ গুণের নামে বা মাধ্যমে। অগনিত গুণের সমন্বয়ে সমন্বিত আল্লাহ। জগতের সকল গুণের উৎস তিনি। অসংখ্য গুণ থাকা সত্বেও সব কিছুকে ছাড়িয়ে তিনি 'দয়াময়'।

এ ধারণা ও বিশ্বাস মানুষকে অন্ধকারে আশার আলো প্রদর্শন করে। ভূল-ভ্রান্তি সত্বেও আল্লাহর দয়া মানুষকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ধারণা মানুষের জন্য এক পরম আশ্রয়ের স্থান! মানুষের প্রশান্তির কারণ ও জগতে টিকে থাকার একমাত্র ভরসা। সূরা ফাতেহা মানুষকে বিশ্বাসী হয়ে শান্তি লাভের উপায় প্রদর্শন করে এবং এ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে।

অজানা-অচেনা প্রকান্ড মহাবিশ্বে একাকী মানবজাতি। রক্ষাকর্তাবিহীন। কিন্তু ধারণায় আল্লাহকে সহায় ও অবলম্বন ধরে বুকে আশা ও সাহস নিয়ে পথ চলার উপায় প্রদর্শন করে এ বাণী। তাই দয়াময় ও রক্ষাকর্তা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখতে দিক-নির্দেশনা দেয় এ আয়াত।

সূরা ফাতেহা মানবজাতির সামনে একটি বিচার দিবস সম্পর্কে ধারণা দেয়। বিচার দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। বিচার দিবসে সকলকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া হবে। কারও প্রতি তিল পরিমাণ অন্যায় করা হবে না। এ ধারণাই মানুষকে সৎ পথে চলতে ও মন্দ পথ পরিহার করে চলতে প্রেরণা হয়ে কাজ করে। সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে অনুপ্রাণীত করে। সমাজে ন্যায্যতার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে প্রতিহত করতে বলে।

আমরা (শুধুমাত্র) তোমারই উপাসনা করি; আমরা (কেবলমাত্র) তোমার সাহায্যই যাচ্ঞা করি। এ ধারণা অন্য কারও মুখাপেক্ষি হতে বারণ করে। কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে বলে। আল্লাহকে মানুষ পাবে কোথায়? বস্তুত আল্লাহর নাম নিয়ে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের সমস্যার সমাধান নিজেকেই করতে হয়। এ ধারণা নিজের পায়ে নিজেকে দাড়াতে শিক্ষা দেয়। যেখান থেকে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। বস্তুত আত্মবিশ্বাসীই হচ্ছে আল্লাহতে প্রকৃত ভরসাকারী।

'আমাদের সরল পথ দেখাও'- সূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে সহজ-সরল ও সঠিক পথে চলার উপায় সন্ধান করে। আল্লাহ নিজের

ভেতরে বিরাজমান। আল্লাহর কাছে যে এ প্রার্থনা করে, সে জগতের জটিল পথগুলির বিষয়ে অবগত এবং সেসব পথের প্রতি বিতশ্রদ্ধ বলা যেতে পারে। তাই সে সরল পথের সন্ধান করে।

আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান করার অর্থ হল নিজেকেই জাগরিত করে তোলা এবং নিজেই পথের সন্ধান করা। যখন মানুষ নিজে পথের সন্ধান করে তখন সে পথ খুঁজে পায়। ভেতরে ও বাইরে আল্লাহ সহায়ক হয়ে কাজ করেন।

সূরা ফাতেহা প্রতিটি কর্মে ও ক্ষেত্রে মানুষকে সন্ধানি হতে প্রেরণা জোগায়। দৈবক্রমে কিছু পেয়ে গেলে সেটি বিধাতা প্রদত্ত সৌভাগ্য বলা যেতে পারে! সে সুপ্ত বাসনাও মনের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখে।

এ প্রার্থনা অহঙ্কার প্রদর্শন, পরচর্চা-পরনিন্দা সকল প্রকারের মন্দ কাজ, ষড়যন্ত্র, কূট-কৌশল, সন্দেহ ও জটিলতাযুক্ত পথ পরিহার করে যথাযথতার সাথে মানুষের নিজেকে কর্মে নিয়োজিত হতে অনুপ্রেরণা দেয়, কিংবা বলা যেতে পারে যে তেমন মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে কাজ করে। তাই সকলেরই এ নিয়তের পথে চলা বাঞ্ছনীয়।

একজনের মন্দ পথে চলা অপরকেও সে পথে কিংবা সংঘর্ষের বা যন্ত্রনার পথে টেনে নিয়ে যায়। তাই এ বোধের জাগরণে এ বাণীর প্রচার ও প্রসার অতীব গুরুত্বপূর্ণ; অবশ্যই যথাযথ অর্থ অনুধাবনের সাথে।

বিচার দিবসে মানুষ যেন আল্লাহর অতি সূক্ষ বিচারের সমুহ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে এটি তারও একটি আকুঁতি। এ প্রার্থনা উষ্চারণ করার অর্থ হল প্রার্থনাকারী আল্লাহ ও বিচার দিবসে বিশ্বাস করে। সে তার কর্মের পরিণতির বিষয়ে সচেতন এবং সে কারণে নিজেই নিজেকে সুপথে চালনা করতে উদ্বুদ্ধ ও ইচ্ছুক। তাই সরল পথের সন্ধান করে।

সরল পথ বা সমর্পনের পথকে চিনে নিতে মানুষকে অনুপ্রাণীত করে সূরা ফাতেহা। এ প্রার্থনা গভীরভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্যকে বোঝার চেষ্টা করা অতঃপর ভাল পথে চলতে অনুপ্রাণীত করে।

গভীর মনযোগের সঙ্গে সূরা ফাতেহার পাঠ মানুষকে মন্দের কু-ফল ও ভাল হয়ে চলার সুফল বা প্রয়োজনীয়তাকে বুঝতে সহায়তা করে। সে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে। সূরা ফাতেহার পাঠ বা এ জ্ঞান ভেতরকে জাগ্রত করে তোলে এবং সর্বদা সচেতন রাখে। মানুষ নিজ জ্ঞান ও চেষ্টায় সঠিক পথে চলতে

সক্ষম হয়ে ওঠে। বস্তুত এর অপর অর্থ হল আল্লাহকে স্মরণে হাজির রেখে নিজেই নিজের দায়িত্ব নেয়া। ভেতরে তিনিই বিরাজ করেন।

সূরা ফাতেহার পাঠ মন্দ পথ পরিহার করে সঠিক পথে চলার মানুষের একটি প্রতিজ্ঞাও বলা যেতে পারে। বারংবার এর পঠন মানুষকে দিক-নির্দেশনার বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ভাল পথে চলতে অনুপ্রাণীতও করে। জেনে-বুঝে ও সত্যিকারভাবে বিষয়গুলিকে স্মরণ করে যে এ সূরা পাঠ করে, বস্তুত সে নিজেই সঠিক-সরল পথে চলার চেষ্টা করে। সঠিক পথে চলার এটি তার নিজের ইচ্ছে ও বোধের একটি বহিঃপ্রকাশও বলা যেতে পারে। কোন বিষয়ে যার নিজের চেষ্টা আছে বা থাকে আল্লাহ তাকে সহায়তা করেন। যে আল্লাহ তার নিজের ভেতরেই বিরাজ করেন। অর্থাৎ সে ভেতর থেকে তথা নিজ থেকেই সহায়তা পায়।

সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ কোরআনের বা দর্শনের সার বক্তব্যকে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছে বলা যায়। বিভ্রান্ত মানুষের যথাযথ পথে ফিরে আসা, সঠিক পথে চলা ও তাতে দৃঢ় থাকার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেয় সূরা ফাতেহা এবং একই সাথে প্রেরণা হয়েও কাজ করে। সূরা ফাতেহা এমন এক প্রার্থনা পদ্ধতি যা বিশ্বাসী প্রার্থনাকারীকে আপনা থেকে তার প্রদর্শিত পথে চালনা করে নিয়ে যায়।

যে এ প্রার্থনা করবে সে বিশ্বাসী হয়েই করবে। এ দর্শনে যে বিশ্বাসী হবে- ধরে নেয়া যায় যে সে মন্দ পথে পা বাড়াবে না। নিজেই নিজেকে রক্ষা করে চলবে। এতে প্রতিটি ব্যাক্তি যেমন নিজ চরিত্রকে সংশোধন করে নেবে, তেমনি প্রতিটি ব্যাক্তি থেকে সমাজ ও সমষ্ঠিও উপকৃত হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। এমনই 'ইসলাম' এর দর্শন। 'ইসলাম' তাই 'শান্তির ধর্ম'। যা আসে আল্লাহর প্রতি 'সমর্পন' থেকে। সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহতে 'সমর্পন'ই ইসলাম।

কিরূপে আল্লাহতে সমর্পন করতে হবে সূরা ফাতেহা সে পথ অন্বেষনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। কোরআনে রয়েছে তার দিক-নির্দেশনা। কেবল শাব্দিক অর্থ নয়, যথাযথভাবে বিষয়গুলি মানুষকে বুঝে নিতে হবে। বিষয়গুলি জানা বা সে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে সফলভাবে তার প্রতিফলন করতে পারার মধ্যেই রয়েছে 'শান্তি'। অথচ শান্তির খোঁজে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায় কিন্তু শান্তি মিলে না।

আল্লাহতে যে সমর্পন করবে সে আল্লাহ প্রদর্শিত সহজ-সরল পথ বা প্রকৃতির বিধান মেনে চলবে। মানুষের আবিস্কার করা স্বার্থসংশ্লিষ্ট শত শত কোটি কোটি অনুশাসনের অনুসরণ পরিহার করে চলবে। ভাল কাজ করবে। এমনই 'ইসলাম' এর দর্শন।

নিচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল যা বিধাতায় বা আল্লাহতে সমর্পনের গুরুত্বকে বুঝে নিতে কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীদের সহায়তা করবে। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

"নিঃসন্দেহে! আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

অপরদিকে গীতায় বলা হয়েছে, "নানারূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি .. সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।" (গীতা ১৮:৬৬)

সূরা আল-বাকারা

(Sura Al-Bakara)

যথাযথ বিশ্লেষণ : সূরা আল-বাকারা

(আয়াত ১-১৪৩)

সূরা আল-বাকারা; সূরা নং ২, আয়াত-২৮৬; মদীনায় অবতীর্ণ। ইংরেজীতে সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে 'The Cow, The Heifer, The Calf' শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা অর্থ 'গরু' বা 'বাছুর'। সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নং আয়াতে বর্ণিত গরু বা গাভী সম্পর্কিত একটি ঘটনা থেকে নামটি নেয়া হয়েছে।

সূরার ১ থেকে ২০ পর্যন্ত আয়াতে কোরআনকে মানবজাতির জন্য একটি দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থরূপে ঘোষনা করা হয়েছে। বিশ্বাসের শর্তসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে মানুষের তিনটি প্রকার তথা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও হঠকার বা মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২১ থেকে ২৯ নং আয়াতে মানবজাতিকে স্বেচ্ছায় কোরআনের দিক-নির্দেশনাকে গ্রহণের এবং আল্লাহর প্রতি সমর্পনের আহবান জানান হয়েছে।

৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত আয়াতে মানব সৃষ্টি তথা আদম-হাওয়া সম্পর্কিত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি সমর্পনই যথার্থ পথ সেটি তুলে ধরা হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশনা অমান্যতার পরিণতি বুঝতে সহায়তা করা হয়েছে।

৪০ থেকে ১২০ পর্যন্ত আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে ইসরাইলের সন্তানদেরকে কোরআনের দিক-নির্দেশনা অনুসরণের জন্য আহবান জানান হয়েছে। তাদের পূর্বের ও বর্তমানের কীর্তিকলাপ, কর্ম ও আচরণ ও নীতি-নৈতিকতার স্খলনজনিত বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর দিক-নির্দেশনা থেকে বিচ্যুতিই তাদের পদস্খলনের কারণ সে বিষয়গুলি স্পষ্ট করা হয়েছে।

১২১ থেকে ১৪১ পর্যন্ত আয়াতে ইসরাইলের সন্তানদেরকে মোহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত পথ অনুসরণে উৎসাহিত করা হয়েছে। যিনি আল্লাহর দিক থেকে একই দিক-নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন যা তাদের নবী মুসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন। উপরন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রদর্শিত পথেরই অনুসারী এবং

তারই বংশের ধারার উত্তরসূরী যে ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইসরাইলের সন্তানেরাও তাদের পূর্ব-পুরুষ হিসেবে অতি সন্মানের চোখে দেখে এবং নবীরূপে গণ্য করে। তিনিই কা'বা ঘর নির্মান করেছেন সে আলোচনাও এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা তাঁর নির্মিত উপাসনা গৃহই মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কেবলারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেন এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।

১৪২ থেকে ১৫২ পর্যন্ত আয়াতে জেরুজালেমে অবস্থিত টেম্পল বা ইহুদিদের কেবলার দিক থেকে মক্কার কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যে বিষয়টিকে ইসরাইলি বা ইহুদিদের থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি প্রতীকস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। ইহুদিদের এ পরিণতি বা অধঃপতনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ প্রদর্শিত পথ থেকে তাদের বিচ্যুতি ও তাদের নৈতিক স্খলন। সূরার ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করে ১৫২ নং আয়াত পর্যন্ত পর্যন্ত সামগ্রীক আলোচনায় এ বিষয়গুলিই উঠে এসেছে।

১৫৩ থেকে ২৫১ নং আয়াত পর্যন্ত নেতৃত্ব পরিবর্তনের ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাস্তবসম্মত দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, জেহাদ, আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা, আল্লাহর নির্দেশনা যথাযথতার সঙ্গে পালন করা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে এ পর্যায়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সাংগঠনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধনের প্রয়োজনে নানাবিধ আইন-কানুন, বিধি-বিধানসমুহের দিক-নির্দেশনা রয়েছে এ অংশে।

ক্ষতিকর বিষয়সমুহ যেমন মদ্যপান, জুয়া খেলা, সূদে অর্থ লগ্নি করা ইত্যাদি যা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সংহতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৫২ থেকে ২৬০ পর্যন্ত আয়াতে সুনির্দিষ্টভাবে সূদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূদখোরদেরকে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ সূদের কারবারকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন।

পৃথিবীর সকল অনিষ্টের সাথে এ বিষয়টি জড়িয়ে আছে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, তিনি সব করতে পারেন সে বিষয়ে কিছু উদাহরণও উদ্ধৃত হয়েছে।

২৬১ থেকে ২৮৩ পর্যন্ত আয়াতে সূদে অর্থ খাটানোর পরিবর্তে আল্লাহকে সন্তুষ্টকরণে আল্লাহর পথে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং দৈনন্দিন ব্যাবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে সততা বজায় রাখতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২৮৪ থেকে ২৮৬ নং পর্যন্ত আয়াতে সূরার প্রথমদিকে উদ্ধৃত বিশ্বাসের মৌলিক শর্তাবলি পুনরুল্লেখ করা হয়েছে এবং গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

সবশেষে হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে মুসলমানদের গুরু দায়িত্ব যথাযথতার সাথে পালনে এবং অশুভ শক্তির বিপক্ষে বিজয়ের প্রত্যাশায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে সূরার সমাপ্তি করা হয়েছে।

ইসলামের প্রচার-প্রসারকালীন সময়ে মুসলমানদেরকে যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে সে প্রেক্ষিতে এ প্রার্থনা ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষনস্বরুপ। এ প্রার্থনা বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করে। তাদের ধৈর্য্যধারণের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দেয়। আশার আলো দেখায়। তাদেরকে উজ্জীবিত করে। সতর্ক ও সচেতন হতে সহায়তা করে। ভূল-ভ্রান্তি করার হাত থেকে রক্ষা করে। মানসিকভাবে বলিয়ান করে তোলে এবং অনুভবে আল্লাহর নৈকট্যকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা বিশ্বাসীদের সকল শক্তির উৎস!

সূরা বাকারায় কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ওপরে সে বিষয়ে একটি ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। তবে ওপরোক্ত বিষয়সমূহ সূরার আলোচনায় কেন প্রাধান্য পেয়েছে সে বিষয়েও পাঠকের একটি সাধারণ ধারণা থাকা আবশ্যক। নিচে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

- মহানবী (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কায় ইসলামের বাণী প্রচারের কাজ শুরু করেন। এ সময়ে তাঁর কাছে কোরআনের যে সকল বাণী বা সূরা অবতীর্ণ হয় সেগুলি মাক্কী সূরা নামে পরিচিত। মাক্কী সূরাসমূহ সাধারণত মক্কার কুরাইশ মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি যেমন আল্লাহর একত্ব, নবুয়ত, ঐশী বাণী, পরকাল,

ফেরেশতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তাদের তেমন কোন পূর্বধারণা ছিল না। তাই এ সময়ে অবতীর্ণ সূরা সমুহে এসব বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মহানবী (সাঃ) তাঁর নিজভূমে শত্রুতার মুখোমুখী হন। ফলে দেশ ত্যাগ বা হিজরত করে মক্কা ছেড়ে মদীনায় আশ্রয় নেন। মদীনায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। এ সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমুহে তাই ইহুদি বা ইসরাইলের সন্তানদের প্রসঙ্গও আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমুহ মাদানী সূরা নামে পরিচিত। সূরা বাকারা একটি মাদানী সূরা।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ইসরাইলি বা ইহুদিদের পূর্ব ধারণা ছিল। তাদের নবী মুসা (আঃ)-ও 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্বের বাণী প্রচার করে গেছেন যা মোহাম্মদ (সাঃ) প্রচার করেছেন। বস্তুত তারাও মুসলিম এবং ইসলামই তাদের ধর্ম। সত্যি বলতে জগতের সকল মানুষের একমাত্র সনাতন বা চিরন্তন সত্য ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহতে বা ঈশ্বরে সমর্পন (Surrender to Allah)। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত মানুষদের কাছে একই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন কোন ঔষধের জেনেরিক নাম (Generic Name) একই, কিন্তু ট্রেড বা ব্র্যান্ড এর নাম (Trade or Brand Name) ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে বিষয়টি তেমন।

কালের বিবর্তনে ইহুদিরা অনেক ভ্রান্ত রীতি-নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। যার অনেক কিছুই তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ বা তাওরাতও সমর্থন করে না। কেবল তাই নয়, বাইবেলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও তারা নিজেদের মনগড়া অনেক বিষয় পরবর্তীতে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তাদের বিশ্বাস, নৈতিকতা, আচার-আচরণ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল।

পরিতাপের বিষয় এই যে, তারা তাদের এসব বিচ্যুত আচার-আচরণে কেবল তৃপ্তই ছিল না, উপরন্তু তারা সঠিক পথে আছে মনে করে নিজেদেরকে তাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতও রেখেছিল। অথচ তারা ভূল পথে ছিল। কোন প্রকার সংস্কার কার্যক্রমকে তারা গ্রহণ করার মতো ছিল না। ফলে যারাই তাদেরকে সঠিক পথে আহবান করেছে তারাই তাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে যদিও তারা 'মুসলিম' কিন্তু তারা ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। আল্লাহকে ভূলে ও পরিত্যাগ করে তারা ধন-সম্পদ ও

লোভ-লালসার পূঁজারীতে পরিণত হয়ে। তারা তাদের মূল নাম 'মুসলিম' পরিত্যাগ করে 'ইহুদি' বা 'জিউস' নাম পরিগ্রহ করে এবং ধর্ম বিষয়টিকে তাদের একচ্ছত্র অধিকারভূক্ত বিষয় বলে মনে করতে শুরু করে।

মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য আহবান করেন তখন এমনই ছিল তাদের অবস্থা। সে কারণেই সূরার প্রায় এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে।

সূরায় তাদের ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে, তাদের নৈতিকতার স্খলনজনিত বিষয়সমুহ তুলে ধরা হয়েছে, তাদের ধর্মীয় বিচ্যুতির বিষয়সমুহ আলোচনা করা হয়েছে; পাশাপাশি সঠিক ধর্ম ও উচ্চমানের নৈতিকতায় ফিরে আসার জন্য আহবান করা হয়েছে এবং ইসলাম প্রচারে মহানবী (সাঃ) এর সহগামী হতে আহবান করা হয়েছে। এসব কারণে সূরার আলোচনায় তাদের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

- নির্যাতিত মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মদীনায় এসে আশ্রয় নিতে শুরু করে। বহিরাগতরা 'আনসার' তথা স্থানীয় সমর্থকদের সহায়তায় মদীনায় বসতিও স্থাপন করে।

বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতি বজায় রাখা ও তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবতই এ সময়ে কোরআনের সূরাসমুহে পরিবর্তন আসে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমুহে ইসলামের মৌলিক দিকগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি অনুসারীদের নৈতিক প্রশিক্ষনের বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এ সময়ে অবতীর্ণ সূরাসমুহে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত বিধি-বিধান ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়। সময়ের প্রেক্ষাপটে যা ছিল প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ মাক্কী সূরা ও মদীনায় অবতীর্ণ মাদানী সূরায় মূলত এখানেই পার্থক্য।

- মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের পর মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার টানাপোড়েন একটি নতুন মাত্রা লাভ করে। ইতিপূর্বে বিশ্বাসীরা নিজ নিজ গোষ্ঠীতে ইসলাম প্রচার করত এবং বিরোধীদেরকে নিজেদের মতো করে

মোকাবেলা করত। কিন্তু মদীনায় সমগ্র আরব ভূমি থেকে মুসলিমদের সমাগম ঘটে। তারা একটি একক গোষ্ঠীরূপে বসতি স্থাপন করে এবং শহর কেন্দ্রিক একটি ছোট্ট রাষ্ট্র ব্যাবস্থা গড়ে তোলে। ফলে মদীনায় অবস্থার পরিবর্তন সূচীত হয়। একটি একক সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের টিকে থাকা এখানে কঠিন সংগ্রামে পরিণত হয়।

অনৈসলামিক সমগ্র আরব বিশ্ব এ জাগরণের বিপক্ষে একত্রিত হয়। তারা মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ অবস্থায় দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করা ও টিকে থাকার সংগ্রামে বিশ্বাসীদের জন্য দিক-নির্দেশনা আসে। আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা, সাহসিকতা, অসম ধৈর্য্য ও যে কোন প্রকার সশস্ত্র পরিস্থিতি মোকাবেলা করার প্রস্তুতি বিষয়ে তাই সূরায় আলোচনা উঠে আসে। সময়ের প্রেক্ষাপটে যা ছিল ভীষনভাবে প্রয়োজনীয়।

- তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামের ইতিহাসে নতুন ধরণের এক সমস্যার আবির্ভাব ঘটে। বিশ্বাসীদের মাঝে হঠকার বা মোনাফেকদের আবির্ভাব ঘটে। এদেরকে মোকাবেলা করতে হয়।

মক্কার হঠকারদের মধ্যে একদল ছিল যারা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করত, কিন্তু তা মেনে চলতে এবং এ কারণে তাদের পার্থিব স্বার্থ ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের ফলে যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে তারা সেটিও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

অপরদিকে মদীনার হঠকারদের মধ্যে ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য একদল বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

হঠকারদের মধ্যে আরেকদল ছিল যাদের বসবাসের স্থান মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ফলে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মুসলমানদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়। আবার তারা শত্রু পক্ষের সাথেও সম্পর্ক বজায় রেখে চলত। কেননা যদি শত্রুপক্ষ বিজয় লাভ করে তবে সেক্ষেত্রেও তাদের স্বার্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে বলে তারা মনে করত।

আবার এক প্রকার হঠকার ছিল ইসলামের প্রতি যাদের সত্যিকারের আন্তরিক টান ছিল না, কিন্তু তারা তাদের গোষ্ঠীর অপরাপরদের সাথে বিশ্বাসীদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

একদল এমনও ছিল যারা জ্ঞানত ইসলামের সত্যতা ও যথাযথতার বিষয়ে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের পুরোনো রীতি-নীতি, কুসংস্কার, নিজেদের উচ্চাকাংখা ইত্যাদি পরিত্যাগ করার মতো নৈতিক জোর রাখত না। ইসলামের নৈতিক মান বজায় রাখা ও এ পথে নিজেদের জীবন ও সহায়-সম্পদ উৎসর্গ করার মতো মনোবৃত্তি তাদের ছিল না।

সূরায় তাই হঠকারদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে ও করণীয় বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা সূরায় অবতীর্ণ বিষয়সমুহের যথার্থতা অনুধাবনে সহায়ক হবে।

পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর নামে।

আয়াত নং	অবতীর্ণ বাণী (The Revelation)
১	আলিফ লাম মীম। (Alif Lam Mim)

■ **২.১** আলিফ লাম মীম : 'আলিফ লাম মীম'। সূরার প্রথমে বর্ণের এরূপ ব্যাবহারকে অনেকে সূরার নামরূপে বিবেচনা করেছেন। কেউ মনে করেন এগুলি আল্লাহর নাম। আবার কেউ এগুলিকে আল্লাহর নামে কৃত শপথ বলে মনে করেন। অনেকে মনে করেন এগুলির অর্থ এত ব্যাপক ও রহস্যপূর্ণ যে এর অর্থ আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানেন না।

কোরআন যে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে তৎকালীন ও তার পূর্ববর্তী সময়ে আরবী সাহিত্যেও এ ধরনের বর্ণের ব্যাবহারের প্রচলন ছিল। এমন কি আরবী গদ্য-পদ্যেও বর্ণের এরূপ ব্যাবহার দেখা যায়। সময়ের সাথে সাথে এর ব্যাবহারের প্রচলন উঠে যায়। ফলে বর্তমানে এর যথার্থ অর্থ ও গুরুত্ব উদঘাটন করার কাজটি সহজসাধ্য নয় বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে নিচের আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য,

"তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ), যেখানে বাণীসমুহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলি গ্রন্থের 'মূলভিত্তি' এবং কতগুলি 'রূপক'। যাদের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াসে রূপকের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। আল্লাহ ব্যাতিত সেসবের ব্যাখ্যা কেউ জানে না। তবে যারা জ্ঞানসম্পন্ন তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি বিশ্বাস এনেছি; এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।' কেবলমাত্র বোধসম্পন্ন মানুষই সত্যিকার অর্থে বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।" (আল-কোরআন ৩:৭)

কোরআনে অবতীর্ণ বাণীসমুহের মধ্যে কতগুলি আছে যেগুলি সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। সেগুলিকে গ্রন্থের 'মূলভিত্তি' নামে বলা হয়েছে।

আরবীতে যা ‘মুহকামাত’ বা ‘সুস্পষ্ট’ আয়াত নামে পরিচিত। অন্যদিকে যেসব বাণীর অর্থে অস্পষ্টতা আছে অর্থাৎ যেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নানারকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেসব আয়াতকে ‘রূপক’ বা ‘প্রতীকী’ বলা হয়েছে। আরবীতে যা ‘মুতাশাবিহাত’ বা ‘অস্পষ্ট’ আয়াত নামে পরিচিত। যেমন- সৃষ্টি সম্পর্কিত বাণীসমুহকে রূপকের অন্তর্ভূক্ত বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে এসবের ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের অপ্রয়োজনীয় চেষ্টা না করাই শ্রেয়।

উদ্ধৃত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ‘যারা জ্ঞানসম্পন্ন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস এনেছি; এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।’ অর্থাৎ যারা এতটুকু জ্ঞান ধারণ করে যে জগত পরিচালনায় শৃংখলার স্বার্থে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা অতীব প্রয়োজনীয় তারা এ বাণী সে কারণেই অন্তরে ধারণ করে এবং বিশ্বাস করে। কেননা জ্ঞানই তাদেরকে বলে দেয় যে, এ বিশ্বাস জাগতিক কল্যাণার্থেই প্রয়োজনীয়। বিশ্বাসই কর্মে সফলতা এনে দেয়।

তবে কি সন্ধান-অনুসন্ধান, গবেষনা কার্যক্রম এ জগতে থেমে থাকবে? মানুষ কি অজানাকে জানার চেষ্টা করবে না? অন্ধভাবে কেবল বিশ্বাস করবে?

মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টা করবেই। এ বৈশিষ্টও আল্লাহই মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাই বোধসম্পন্ন কিছু মানুষ অবশ্যই এসব নিয়ে কাজ করবে। তারা বিষয়ের ওপর পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ। তারা কেউ বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক বা গবেষক। আয়াতে সে বিষয়েও ইংগিত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘কেবলমাত্র বোধসম্পন্ন মানুষই সত্যিকার অর্থে বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে।’ অতএব জ্ঞান ও বোধসম্পন্নদের এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার অনুমতি আছে।

তবে একই সাথে যে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে তা হলো যেন জ্ঞান-বিবর্জিত, আজগুবি ও অপ্রয়োজনীয় চিন্তা-ভাবনা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে না পড়ে।

➢ (আয়াত ২-৫) আল-কোরআন (Quran) হচ্ছে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করার যথাযথ দিক-নির্দেশনা (Guidance)। এটি সমগ্র

মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য আল্লাহ প্রদর্শিত পথ। কিন্তু এ পথ-নির্দেশনা থেকে উপকার পেতে হলে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে এ শর্তসমুহে যারাই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস রাখে তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত। তারাই বিশ্বাসী (Believer)।

আয়াত নং ২ থেকে ৫ এ বিশ্বাস (Belief) এর শর্তসমুহ উদ্ধৃত হয়েছে এবং আল্লাহতে ভরসাকারী বিশ্বাসীদেরকেই সফল (Successful) বলা হয়েছে।

২	এই সেই গ্রন্থ, যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ-প্রদর্শনকারী, তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে, (This is the Scripture whereof there is no doubt, a guidance unto those who ward off (evil)) (Refferance for English version: http://www.quranexplorer.com/quran/)
৩	যারা 'না দেখা' বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও আমি যে জীবনোপকরণ প্রদান করি তা থেকে ব্যায় করে (Who believe in the Unseen, and establish worship, and spend of that We have bestowed upon them;)
৪	এবং যারা বিশ্বাস করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরকালের বিষয়ে বিশ্বাস যাদের নিশ্চিত। (And who believe in that which is revealed unto thee (Muhammad) and that which was revealed before thee, and are certain of the Hereafter.)
৫	এরাই তাদের পালনকর্তার পথ প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে। এরাই সফল। (These depend on guidance from their Lord. These are the successful.)

▪ **২.২.১** এই সেই গ্রন্থ, যাতে কোনই সন্দেহ নেই, পথ-প্রদর্শনকারী : 'এই সেই গ্রন্থ' দ্বারা এখানে 'কোরআন' (Quran) কে বোঝান হয়েছে। কোরআনকে মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বা সঠিক পথে চলার দিক-

নির্দেশনা (Guidance) বলা হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, কোরআন যে সঠিক পথে চলার দিক-নির্দেশনা এ বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

জীবন ও জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন। তিনি জানেন কিভাবে মানুষকে পরিচালনা করতে হবে। তিনি জানেন কিভাবে মানুষ পরিচালিত হলে সুশৃংখলভাবে সবকিছু পরিচালিত হবে।

আল্লাহ তাই মানুষের জন্য পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। 'কোরআন' হচ্ছে সেই পথ-নির্দেশনা। সঠিকভাবে যন্ত্র পরিচালনা করার জন্য তার সঙ্গে যেমন ম্যানুয়াল দেয়া হয় বিষয়টি তেমন। জীবন ও জগতকে সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণভাবে চলমান রাখাই এর আপাত লক্ষ্য। মানবজাতি সঠিকভাবে পরিচালিত হলে সৃষ্টি তার আপন লক্ষ্যের দিকেই ধাবিত হবে।

মানুষের নিজেদেরকেই গ্রন্থে প্রদর্শিত পথসমুহকে বুঝে নিতে হবে। সে জন্য গভীর মনযোগের সাথে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। কোরআনের বক্তব্যসমুহকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

অপরদিকে নির্দেশনার যথাযথ পরিপালনের দায়িত্বও মানুষের নিজেদের। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ মানুষের সুবিধার্থে তাঁর সুস্পষ্ট ও ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। তিনি যেমন গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, তেমনি পথ প্রদর্শন করেছেন তাঁর সকল সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতিতেও রয়েছে তাঁর নিদর্শন। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মই অর্থবহ।

বলা হচ্ছে, এই সেই গ্রন্থ ... পথ-প্রদর্শনকারী ...। প্রশ্ন হচ্ছে, আল-কোরআনকেই কেন মানবজাতির জন্য সঠিক পথের প্রদর্শক বা 'দিক-নির্দেশনা' বলা হচ্ছে? কোরআন আগমনের পূর্বে কি তবে মানবজাতির জন্য পথ চলার কোন দিক-নির্দেশনা ছিল না? তখন তাহলে মানুষ কিভাবে চলেছে? কোন দিক-নির্দেশনাকে অনুসরণ করেছে? দিক-নির্দেশনা বলতে কি বুঝায়? কিভাবে একটি দিক-নির্দেশনাকে গ্রহণ করে নিতে হবে? সঠিক দিক-নির্দেশনাই বা কোনটি? দিক-নির্দেশনার আওতা কতদুর বিস্তৃত হওয়া উচিত? কোরআনকে মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশনারূপে ঘোষনা করার সাথে সাথে এমনি অনেক প্রশ্ন মানব মনে উদীত হওয়া অমূলক নয়।

প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানুষের দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন-প্রবাহ অব্যাহত ছিল। মানুষকে আহার সংগ্রহ করতে ছুটে বেরাতে হয়েছে। প্রকৃতি যেভাবে আকৃষ্ট করেছে, কিংবা জৈবিক তাড়না যেভাবে ছুটতে বলেছে মানবজীবন সেভাবে পরিচালিত হয়েছে।

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এমনভাবে যে সে প্রকৃতি সৃষ্ট নানান ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় ছুটে চলতে বাধ্য। বস্তুত মানুষ চলেনি। তাকে প্রাকৃতিক ও জৈবিকভাবে প্রলুব্ধ বা তাড়িত করে চালান হয়েছে। এটি হচ্ছে মানুষের সহজাত ধর্মকে কাজে লাগিয়ে তাকে চালনা করা। এভাবেই তার পথ চলার শুরু। এ ব্যাবস্থাই চলার পথের প্রাথমিক দিক-নির্দেশনারূপে কাজ করেছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“প্রকৃতিজাত গুণের কারণে সকলে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য।” (গীতা ৩:৫)

যতদুর বোঝা যায় পশু-পাখিও এভাবেই চালিত হয়। এ ব্যাবস্থায় জীবের সহজাত প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রবল। জ্ঞান-বুদ্ধি বা যুক্তির প্রভাব কম।

এভাবে চলতে গিয়ে মানুষ রিপুর তাড়নায় কখনও উদ্ভ্রান্তের ন্যায় আচরণ করেছে। লোভ কিংবা পাওয়ার বাসনা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। মন যা করতে চেয়েছে, যা পেতে চেয়েছে সে তাড়না থেকে ছুটে চলেছে। কিছু একটা প্রাপ্তির নেশায় ছুটেছে। অহমবোধ থেকে সৃষ্ট নানান প্রবৃত্তির কারণেও ছুটেছে। সহজাত প্রবৃত্তি তার ওপর ভীষনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এসব করতে গিয়ে লুটতরাজ, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শুরু করে নানান ব্যাস্ততা ও কাজের সৃষ্টি হয়েছে। সেভাবে দায়িত্ববোধের ধারণাও সঞ্চারিত হয়েছে।

কি করছে, কেন করছে এসবের সর্বশেষ কোন লক্ষ্য জানা ছিল না মানুষের। তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া বা মনের ইচ্ছেটাই ছিল মূল বা প্রবল। পার্থিব জীবনের প্রাপ্তিটাই সর্বশেষ। দৃষ্টি ছিল অতীব সংকীর্ণ। দায়িত্ববোধ যা অনুভব করেছে বা সঞ্চারিত হয়েছে সেটিও সেই সংকীর্ণ ভাবনার আবর্তেই আবদ্ধ ছিল। বিভ্রান্তির আবর্তে আবর্তীত ছিল মানবজীবন। মানুষ সুদুরের পথ দেখতে শেখেনি। জীবনের কোন সর্বশেষ লক্ষ্য বা পরিণতি সম্পর্কে ধারণা ছিল না মানুষের। অনেক অনেক দিন আগের কথা এসব।

পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ভাবনাশীল মানুষ মানুষের এতসব কর্মকাণ্ডের প্রকৃত লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। অনেক ধারণা জন্ম নিয়েছে। কতগুলি রূপকথার গল্পের মতো। পৃথিবীর এক এক প্রান্তে এক এক রকমের ধারণা জন্ম নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে কিছুই খুঁজে পায়নি মানুষ। মানবজীবন ও জগত সম্পর্কে বাস্তবসম্মত পরিপূর্ণ কোন লক্ষ্য বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারেনি মানুষ।

দেশে দেশে, যুগে যুগে কিছু খণ্ডচিত্র বিদ্যমান ছিল সত্য, কিন্তু সেগুলি শক্তভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়নি নিজস্ব ত্রুটির কারণে। বিশেষত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাবজনিত ত্রুটির কারণে। ফলে সুনিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে কল্প-কাহিনী ও কু-সংস্কারমুক্ত পূর্ণাঙ্গ কোন রূপরেখা তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। কোন ধারণাই কোরআন প্রদর্শিত পথের সমতুল্য এত পরিচ্ছন্ন ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অন্তত কোরআনের বার্তায় বিশ্বাসীগন তাই বিশ্বাস করে।

এ তো গেল কোরআনের বার্তায় বিশ্বাসীদের কথা। তারা তো বিশ্বাস করবেই। কেননা এক কথায় তারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী।

যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী নয় কিংবা যাদের মনে কোরআনের ওপরোক্ত দাবীর সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাদেরকেও আহবান করা হচ্ছে যে, চাইলে তারাও এ দাবীর সত্যতার বিষয়টি যাচাই করে নিতে পারে। কোরআন যে সবচাইতে পরিচ্ছন্ন ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি দর্শন তবেই তারা সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারবে। আল্লাহর ঘোষণার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে।

ধর্ম নির্বিশেষে কোরআন হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক। কেননা এটি সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত অথচ বাস্তব বিবর্জিতও নয়। আর সত্য ও ন্যায়ই হচ্ছে জগতে একমাত্র বিষয় যা পথ-নির্দেশনা হিসেবে সকল মানুষের অন্তর দ্বারাও স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে থাকে।

কোরআন জীবন ও জগত সম্পর্কে যুক্তি হিসেবে উত্তম ও পরিপূর্ণ রূপরেখা মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। পারলৌকিক জীবনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনকেও পরিহার করেনি। এতে অবাস্তব ও কোন প্রকার কল্প-কাহিনী নেই। যা তুলে ধরা হয়েছে তা সর্বাধিক ন্যায়সম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এটি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য যথার্থ পথ-প্রদর্শনমূলক গ্রন্থ।

কোরআন যে সর্বাধিক ন্যায়সম্মত পথ-প্রদর্শনকারী একটি গ্রন্থ এ দাবীর সত্যতা কেবল কোরআনের আয়াতসমুহের যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং এ গ্রন্থে সে চেষ্টাই করা হবে। বলা হচ্ছে,

"(হে মোহাম্মদ) তারা তোমার কাছে এমন কোন দৃষ্টান্ত বা সমস্যা উত্থাপন করে না বা নিয়ে আসে না (যার প্রেক্ষিতে) আমি তোমাকে সত্য বা সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান না করি (কোরআনের মাধ্যমে)।" (আল-কোরআন ২৫:৩৩)

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কেবল এ এক জীবনকে নিয়েই কোরআন ভাবনা তুলে ধরেনি। রিলে রেইসের মতো সমগ্র মানবজীবনকে নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে কোরআন। প্রথম মানব থেকে শুরু করে শেষ দিবসের শেষ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই একে অন্যের সাথে এক আদি মাতা-পিতা, রক্ত কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের জালে সম্পর্কিত। আবার কর্মের মাধ্যমে প্রত্যেকে একের কর্মের দ্বারা অপরে প্রভাবিত ও সম্পর্কযুক্ত। এটি জীবনের আরও একটি দিক। ফলে জীবনকে খণ্ডিত নয় পরিপূর্ণরূপে দেখতে শিখিয়েছে কোরআন। মানুষের করণীয়রূপে পৃথিবীর অগ্রগতি প্রথম মানব থেকে শুরু করে শেষ মানব পর্যন্ত একসূত্রে গাঁথা সে ধারণাকে সমুন্নত করেছে কোরআন। কোরআন জীবন ও জগত সম্পর্কে কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা উপস্থাপন করেনি। প্রদর্শিত পথের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য রূপরেখা তুলে ধরেছে বাস্তবসম্মত উপায়ে।

কোরআন কেবল রূপরেখাই তুলে ধরেনি। কিভাবে তার বাস্তবায়ন হবে সে দিক-নির্দেশনাও দিয়েছে। ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক জীবনে তার বাস্তবায়নও করে দেখিয়েছে। কতটুকু কর্মকাণ্ড বাধ্যতামূলক হলে সম্পূর্ণ বিষয়টি ধরে রাখা সম্ভব হবে সেটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিষয়সমুহ নিয়ে যারা ভাববার চেষ্টা করবে, নিঃসন্দেহে তারা এ দিক-নির্দেশনার পারস্পরিক সম্পর্কগুলি অনুধাবন করে অভিভূত হবে!

মানবের ভেতরের চোখকে খুলে দেয়ার জন্য পথ-প্রদর্শকরূপে কোরআনের জ্ঞান অপরিহার্য। বিশেষত এর দর্শনের দিকটি। অন্তত বিশ্বাসী তাই বিশ্বাস করে। বিশ্বাসীদের সবাই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে না। যারা জ্ঞানসম্পন্ন তারা

এর যৌক্তিকতা, সত্যাসত্য, ন্যায়পরায়নতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করেই বিশ্বাস করে। কিছু মানুষ অপরকে অনুসরণ করে। সেটিও পরিপূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয় তাও বলা যাবে না। জগতের সব মানুষই দার্শনিক নয়। আবার সবাই দার্শনিক হলে অনুসারী হবে কে? কাজ করবে কে?

যারা বিশ্বাসী নয় তাদেরকেও কোরআনের বার্তার সত্যতা বুঝতে হলে সত্য সন্ধানের ইচ্ছে নিয়ে, মনের সকল সংকীর্ণতা পরিহার করে, উদার মানসিকতা নিয়ে মুক্তভাবে কোরআন অধ্যায়ন করে বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে নিতে হবে। অন্তরে বিদ্বেষ পুষে রেখে সত্য অনুধাবন করা যায় না।

কোরআন মানুষের সৃষ্টি থেকে শুরু করে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী পারলৌকিক জীবন সম্পর্কেও একটি পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরে। মানব জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে উপস্থাপন করে। যার পূর্বে মানব জীবনের পরিপূর্ণ লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষ এমনিভাবে অবগত ছিল না। মানবজীবন ছিল লক্ষ্যবিহীন ও উদ্ভ্রান্তের ন্যায়। কোরআন মানবের সামগ্রীক জীবন অর্থাৎ ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন পর্যন্ত তুলে ধরে। সে কারণেই এটি মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ পথ-প্রদর্শক।

ছেড়ে যাওয়া সঙ্গী-সাথীদের আবার ফিরে পাবার আশা জাগ্রত করে কোরআনের দর্শন। জীবন হতাশার প্রতীয়মান হয় না। ভেতরে প্রাণশক্তি সরবরাহ করে। বলা হচ্ছে,

"যারা বিশ্বাসী এবং যাদের সন্তানেরা বিশ্বাসের সঙ্গে তাদেরকে অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব...।" (আল-কোরআন ৫২:২১)

কোরআনের দর্শন ভাল মানুষের অন্তরে আশা জাগ্রত করে। জীবন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। জীবনকে সুশৃংখল ও আশাপ্রদ করে গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছে কোরআন।

জীবনের সামগ্রীক রূপরেখার লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কোরআন দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডকে মোটেও উপেক্ষা করেনি। সেক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ পথ-নির্দেশ করেছে। উপাসনার নানাবিধ আয়োজনের মাধ্যমে

নিয়মবদ্ধ সুশৃংখল জীবন উপহার দিয়েছে। সহায়তা করেছে বিভ্রান্তির জালে আটকে থাকা মানুষকে মুক্ত হতে।

নিজের ওপর যার নিয়ন্ত্রন আছে, যে নিজের চলার পথের ছক নিজে আঁকতে জানে তেমন মানুষ সমাজে ক'জন? বৃহৎ জনগোষ্ঠির পথ চলার জন্য নিয়ম বা বিধি-বিধানের অনুসরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোরআন প্রদর্শিত পথের অনুসরণ তথা বিধি-বিধানের পরিপালন জীবনকে প্রতি মূহুর্তে উজ্জীবিত, প্রাণবন্ত ও শৃংখলাবদ্ধ করে ধরে রাখতে সহায়তা করে। মানবজীবনে বা সামাজিক জীবনে এসবের অনেক বড় ভূমিকা আছে।

এটিও সত্য যে, কেবল রীতি-নীতির অন্ধ অনুসরণই মুখ্য নয়। রীতি-নীতির অনুসরণের পেছনে কারণ আছে; আছে দর্শন। সেসবকেও বিবেচনায় নিতে হবে। তবে সার্বিক ও বৃহত্তর মঙ্গলের কথা বিবেচনায় রেখে নিয়ম-বিধির পরিপালনও গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীতে কেবল আইনষ্টাইন জাতীয় লোকেরাই বসবাস করে না। এখানে সাধারণ মানুষও আছে। যারা কাউকে পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলতে চায়। বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"... সৃষ্টি সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে হলেও নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। মহান ব্যাক্তিগণ যা ... প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠা করেন জগত তা অনুসরণ করে।" (গীতা ৩:২১)

বর্তমান সময়ে খুব সহজেই মানুষ দিক-নির্দেশনারূপে বিবিধ দর্শন ও তার ভেতরের বিষয়বলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারছে। ফলে এসবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু এখন থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন এত অগ্রসর ছিল না, মানুষের সামনে যখন বিবিধ দর্শনের ধারণাপ্রসূত জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না, উদ্ভ্রান্ত-লক্ষ্যবিহীন মানবজীবনে এ পথ-নির্দেশনাগুলি পথ দেখিয়ে মানবজাতিকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

সঠিক দিক-নির্দেশনার অনুপস্থিতিই কেবল একটি দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে যথাযথভাবে অনুভব করিয়ে দিতে পারে। যদিও এখন আর সেটি সম্ভব নয়। কেননা ধারণাগুলি সম্পর্কে মানুষ এখন অবগত।

ফলে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের পরিবর্তে মানুষ এখন বরং এসবের সমালোচনা করার বিষয়গুলিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। একজন ব্যাক্তিকে যে হাটা-চলা বা কথা বলতে শেখায়, একসময় সেই তার সবচেয়ে বড় সমালোচকে পরিণত হয় বিষয়টি তেমন। দিক-নির্দেশনার গুরুত্বকে অনুধাবন করার সুবিধার্থে কোরআন প্রদত্ত ধারণার অবর্তমানতাকে তাই এখন কল্পনায় অনুধাবন করে নিতে হবে।

কোরআন উদ্দেশ্যবিহীন, উচ্ছৃংখল ও উদ্ভ্রান্ত মানবজীবনকে করেছে সুশৃংখল। লক্ষ্যবিহীন মানবজীবনকে করেছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবমান। ব্যাক্তিক জীবন থেকে শুরু করে মানবজীবনের সামষ্ঠিক জীবন পর্যন্ত কোরআন এক অপরিহার্য্য পথ-প্রদর্শক!

মানুষ চাইলে কোন একটি বিষয়কে ইচ্ছেকৃতভাবে সঠিক প্রমাণ করতে পারে। আবার চাইলে ইচ্ছেকৃতভাবে সেটিকে ভূলও প্রমাণ করা সম্ভব। ফলে ভেতরের নিয়ত বা ইচ্ছেটি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোন কিছু থেকে ভালটি সন্ধান করে বের করে আনা ও তার পরিপালন করা মানুষের নিজের দায়িত্ব।

বড় বিষয় হচ্ছে, ভূল কিংবা সঠিক কোনটিই ইচ্ছেকৃতভাবে তুলে না ধরে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করা। সেটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটিই সবচাইতে দায়িত্বশীল আচরণ। এখানে সে দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা সত্যসহ আগমন করে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে জানে ও বিশ্বাস করে তারাই দায়িত্বশীল।" (আল-কোরআন ৩৯:৩৩)

হাজার বছর পূর্বে কোরআন ঘোষনা করেছে যে, 'কোরআন' সমগ্র মানবজাতির জন্য 'পথ-প্রদর্শক'। কোরআন যে ধারণার অবতারণা করেছে আজও কেউ বা কোন দর্শন তা খণ্ডাতে পারেনি। তাই এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশনা। এ দর্শন 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত'।

বিভ্রান্তির আবর্তে ছুটে চলার প্রবণতা আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি মানুষের। আজকের সমাজেও বিভ্রান্তির চিত্র বিদ্যমান। হয়তবা ধরণ পাল্টেছে। দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি। কোরআন কেবলমাত্র দিক-নির্দেশনাই নয়, এ এক প্রেরণা! সঠিক পথে চলতে মানুষকে উজ্জীবিত ও

অনুপ্রাণীত করে। সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতির্ষ্ঠিত থাকতে যুক্তির ভিত্তি দাড় করিয়ে দেয়। ভেতরে সাহস ও প্রাণের সঞ্চার করে। দিক-নির্দেশনার এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আল্লাহর ধারণা তথা এক আল্লাহর ধারণা, কর্মের কারণে তাঁর কাছে সকলের জবাবদিহিতার ধারণা সমগ্র মানব জীবনের জন্য যে কোন বিবেচনায় কল্যাণকর ও যৌক্তিক। যথেচ্ছাচার মানবজীবনের লাগাম টেনে ধরার জন্য এক উত্তম উপায়। ব্যাক্তিক ও সমাজ জীবনকে এসব ধারণা ভীষনভাবে প্রভাবিত করে। সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এগুলি সহায়ক। এসবের মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তো কোরআন মানবজাতির জন্য সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা!

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অতি প্রাপ্তি ও অতি ভোগের আদৌ কি কোন মূল্য আছে? পথ-নির্দেশনা সে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে চিন্তা জগতকে কোরআনের বার্তা ভীষনভাবে নাড়া দিয়ে যায়। অতঃপর কি? সেটি ভাবতে শেখায়। জীবন ও জগতের সামগ্রীক লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রতিটি জীবনের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয়। কোরআন সুন্দর, সুশৃংখল ও ন্যায়পরায়ন সমাজ ও মানবজীবন কিভাবে গড়ে তোলা যায় এবং তা ধরে রাখা যায় তার দিক-নির্দেশনা দেয়। তাই তো কোরআন মানবের পথ চলার সর্বোত্তম পাথেয়!

কোরআনের আরও একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, কোরআন মানব সমাজে যে বক্তব্যটি তুলে ধরবে সে একই বক্তব্য অন্য হাজারও মানুষ তুলে ধরলেও সে গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এটিকে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতএব ভাল কাজে একে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

এই সেই গ্রন্থ যাতে কোনই সন্দেহ নেই ...। বাণী প্রেরণকারী নিশ্চিত জ্ঞানে জানেন যে, যে পথ কোরআনে প্রদর্শন করা হয়েছে সেটি সঠিক এবং এর কোন বিকল্প নেই। যত বিশ্লেষণই করা হোক না কেন পরিশেষে এ পথেই মানুষকে ফিরে আসতে হবে। ফিরে আসতে হবে নিজেদের কল্যাণের জন্যই। তিনি ভাল-মন্দ সুদুরের পরিণতিও জানেন। তাই এ পথ যে যথাযথ সেটি

দৃঢ়তার সঙ্গে এভাবে ঘোষনা করেছেন যে, 'যাতে কোনই সন্দেহ নেই'। বলা হচ্ছে,

"... একটি ভাল বাণী হল একটি ভাল বৃক্ষের মতো। তার শেকড় মজবুত ... আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় বাণী দ্বারা নিশ্চিত করেন ...।" (আল-কোরআন ১৪:২৪,২৭)

একজন বিশ্বাসীর কাছে এ ঘোষনা অবশ্যই গুরুত্ববহ। আল্লাহ প্রদত্ত দ্ব্যার্থহীন ও সুস্পষ্ট বক্তব্য তাকে এর প্রতি সন্দেহাতীতভাবে দৃঢ় রাখতে ভূমিকা রাখে।

এর সত্যতা ও যথার্থতা বিষয়ে মনের মধ্যে যদি কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ থাকে তবে সেটিকে প্রথমেই মন থেকে দুর করে নিতে হবে। পরবর্তী অনেক অর্জন কোরআনের বাণীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার ওপরই নির্ভর করে। অতএব বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

এ কথাও সত্য যে, যৌক্তিক কোন ভিত্তি ছাড়া বিশ্বাস জন্মানো সম্ভব নয়। আবার জ্ঞান ভিন্ন যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। যেভাবেই হোক না কেন নিজ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ তাঁর দিক থেকে সত্য বক্তব্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর মানুষেরও কিছু করণীয় আছে। অর্থাৎ যথযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করা। তবেই মনের ভেতরের সন্দেহ দুর করে বিশ্বাস আনা সম্ভব হবে।

কোরআন যে নিশ্চিতভাবে মানুষের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন করে সে বিষয়টি মানুষ নিশ্চিত হতে চাইতেই পারে। বিশেষভাবে যারা এতে বিশ্বাসী নয় তারা। এতে দোষের কিছু নেই। আল্লাহই মানুষকে তেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে সে ভূল-শুদ্ধ চিনে নিতে পারে।

সন্দেহ বিশ্বাসে চির ধরায়। বিশ্বাসে ঘাটতি থাকলে কেবল কোরআন নয়, কোন সূত্রই কাজ করবে না। আল্লাহ মানব মনের সন্দেহের সম্ভাবনাকে একেবারেই অবজ্ঞা করেননি। কোরআন সে সত্যের স্বীকৃতি দেয়। তাই প্রথমেই মানব মনে সন্দেহের সম্ভাবনার বিষয়টিকে মেনে নিয়ে সেটিকে দুর করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাক্যটি উচ্চারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্বাসীকে নিয়ে আপাত খুব একটা সমস্যা নেই। কিন্তু অপরাপর বা সন্দেহপ্রবণদের জন্য বিষয়টি নিয়ে ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। তাদেরকে অবজ্ঞা করা যাবে না। কেননা কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আজ যারা কোরআনের বার্তায় বিশ্বাসী একসময় তাদের পূর্বপুরুষেরাও এ বার্তায় বিশ্বাসহীন ছিল। তারা এমনকি এসব জ্ঞানের সাথে পরিচিতও ছিল না। ফলে বর্তমানের অবিশ্বাসী ও সন্দেহপ্রবণদেরকেও সত্য ও সঠিক পথে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

জোর-জবরদস্তী নয়; ভালবাসা, মর্যাদা দান ও জ্ঞানের আলোচনার আলোকে সেটি করতে হবে। কোরআনেই এ বিষয়ে এভাবে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে,

"তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের আলোকে, যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়।" (আল-কোরআন ১৬:১২৫)

কোরআনের বার্তায় যারা সন্দেহ পোষণ করে তাদের সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ কোথায় সর্বপ্রথমে সেটি জানতে ও বুঝতে হবে। তার উত্তরই বা কি হতে পারে নিজেদেরকেও এর সত্যাসত্যের বিষয়টি যথাযথ জ্ঞানের আলোকে খুঁজে পেতে হবে। সত্যকে জানা ও বোঝার স্বার্থে দুটো বিষয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সন্দেহপোষনকারীদের সন্দেহের সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে এবং এর সঠিক উত্তরই বা কি?

মানব মনে সন্দেহ আসা অপরাধ নয়। সন্দেহ আনতে না চাইলেও সন্দেহ আপনা থেকে এসে যায়। অপরাধ হচ্ছে, না জেনে-বুঝে ভাল কোন কিছুর বিরোধীতা করা। কিংবা তার প্রচার-প্রসারে বাধা প্রদান করা ও অপপ্রচার করা।

সন্দেহের এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কি? উপায় হচ্ছে, কোরআন যে সকল ক্ষেত্রেই সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও ভাল পথ প্রদর্শন করে এবং এর মধ্যে ছল-চাতুরী বা কোন প্রকারের অসততার স্থান নেই সেটি যথাযথ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে তুলে ধরা। এর মধ্যে আজগুবি, অবাস্তব বা কল্পণাপ্রসূত কোন বিষয় নেই। তখনই সন্দেহপ্রবণ মানুষ বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারবে। তাই এভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে,

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং যার মধ্যে কোন প্রকার অসততার স্থান নেই।” (আল-কোরআন ১৮:১)

কোরআনে অযথার্থতা, অন্যায়, অসত্য, কুসংস্কার ইত্যাদির কোন স্থান নেই। এ বিষয়ে জানতে, বুঝতে ও নিশ্চিত হতে হলে কোরআনকে জানতে হবে। অনুসন্ধানি মন নিয়ে অধ্যায়ন করতে হবে। এর বিকল্প নেই। তবে কেবল অধ্যায়নই যথেষ্ট নয়। এর প্রতিটি বক্তব্যকে যথার্থভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারা ও সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থে বিষয়গুলিকে সে আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। বিশ্লেষনাত্মক এ গ্রন্থ রচনার এটি একটি মূল লক্ষ্য। অন্যথায় বাজারে তো প্রচুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ আছে।

ভূল বক্তব্য, ভূল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা, কু-সংস্কার ইত্যাদি মানুষকে আলোর পথ থেকে দুরে সরিয়ে দেয়। বিশেষত সেসব মানুষদেরকে যারা কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বক্তব্য এবং ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষনে কোরআনের ব্যাবহারকে অপছন্দ করে। কোরআনের বাণীসমুহের তেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাদেরকে উদ্দীপ্ত বা অনুপ্রাণীত করতে পারে না। উপরন্তু তারা নিজেরাও এর যথাযথ বিশ্লেষণ দাড় করাতে ব্যার্থ। তাই পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে গমন করে।

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেউ যেন ক্ষুদ্র স্বার্থ অর্জনে ভূল বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষকে বিপথে চালনা করতে না পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন থাকা আবশ্যক। কোরআনের এমন ব্যাবহারের বিষয়ে শুরু থেকে কোরআন সচেতন। তাই কোরআনের অবতীর্ণকালীন সময়েও এভাবে বলা হয়েছে যে,

“ক্ষুদ্র মূল্যের বিনিময়ে আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অবজ্ঞা কর না এবং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর।” (আল-কোরআন ২:৪১)

কোরআনের বাণীর বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হতে হলে কোরআন সম্পর্কে কতগুলি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। যেমন- কোরআন কি সত্যিই প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও ভাল পথের দিক-নির্দেশনা দেয়? এর মাঝে কি ছল-চাতুরীর কোন স্থান আছে? এর মাঝে কলুষতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা বা কুসংস্কারের কোন

স্থান আছে কি? এর বক্তব্যে কি যথার্থতা ও সাজুয্যোতা আছে? এর মধ্যে কি কেবলি আজগুবি কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা আছে নাকি যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা আছে ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব হলে কোরআনের বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মানব মন সেক্ষেত্রে একে গ্রহণ করে নিতে সন্দেহমুক্ত হতে পারে।

কোরআন নিজে ঘোষণা করছে বা বলা যায় সততার সঙ্গে মানুষকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করছে যে, এর নির্দেশিত পথের সঠিকতা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেউ যদি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে না পারে তবে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেটি থেকে বের হয়ে আসতে হবে; কিন্তু কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষন করে নয়।

▪ দিক-নির্দেশনার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রসঙ্গ : একজন মাতা কে? কিংবা একজন পিতা কি? শিক্ষক-শিক্ষিকা কি? তাদের ধর ও প্রাণকে যদি বিবেচনায় না নেই তবে মাতা, পিতা কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকা এই মানুষগুলি শুধুই এক একটি মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্ক কি? মস্তিষ্ক হচ্ছে জ্ঞানের আধার বা ধারক, কিংবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে মস্তিষ্কই হচ্ছে পুস্তক, কিতাব, গ্রন্থ বা কোরআন। সেখানেই সব নির্দেশনা লিখিত বা সংরক্ষিত আছে।

সম্পর্কের বিবেচনায় মাতা-পিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকা যে নামেই মানুষকে চিহ্নিত করি না কেন, জগতের সকল মানুষই ধর ও প্রাণ বাদ দিলে বস্তুত এক একটি মস্তিষ্ক তথা জ্ঞানের ধারক।

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। একটি জীবন তথা মস্তিষ্ক বা কিতাব জীবদ্দশায় তার অর্জিত বা সংরক্ষিত জ্ঞান পরিবহন করে নিয়ে যায় অন্য একটি জীবনে। যেমন তার সন্তান-সন্ততি কিংবা ছাত্র-ছাত্রীর মস্তিষ্কে। সন্তান-সন্ততি ও ছাত্র-ছাত্রী প্রাপ্ত সেই জ্ঞান অনুসরণ করে চলে। এমনিভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পূর্বতন মস্তিষ্কের তথা গ্রন্থের বা পথ-প্রদর্শকের দেখান পথ ধরেই জীবন এগুতে থাকে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে যায়, তেমনি এ জগতে জীব সত্ত্বাসমূহ দেহান্তরকালেও এক দেহ থেকে অন্য দেহে তার জীবনের ধারণাগুলি বয়ে নিয়ে যায়।” (গীতা ১৫:৮)

পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে সন্তান-সন্ততি বা পরবর্তী প্রজন্ম বা একটি নতুন জীবন তার মাতা-পিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার দেয়া জ্ঞান সহ আরও জ্ঞান প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে অর্জন করে। একদিন সেই নতুন জীবন মাতা-পিতা বা শিক্ষকের চেয়েও অধিক জ্ঞানকে ধারণ করে। নতুন জীবন এমনসব জ্ঞান আহরণ করে যা মাতা-পিতা কিংবা শিক্ষক-শিক্ষিকার ভান্ডারেও ছিল না। অতঃপর মাতা-পিতা ও শিক্ষকের মস্তিষ্কও এক সময় পরবর্তী জীবন বা প্রজন্মের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরে। নতুন প্রজন্মের জ্ঞানে জগত পরিচালিত হয়। তথাপি সন্তানেরা মাতা-পিতা বা শিক্ষকের কাছে এসে তাদের পক্ষপুট নত করে দেয়। কেননা তারাই মূল পথ-প্রদর্শক। তাদের আশির্বাদেই তারা এ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাদের সন্মান সর্বোচ্চ। বিধাতার নির্দেশনাও তদ্রুপ। এমনিভাবে বিধাতাই সকল দিক-নির্দেশনাই মূল উৎস।

জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ বহুদুর অগ্রসর হয়েছে [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.৩.৩, ২.৫, ২.২৯.৩, ২.২৯.৪, ২.৩০]। তবুও বাইবেল, কোরআন, গীতা এগুলিই মানবজাতির জন্য মূল পথ-প্রদর্শক। মানুষ এখন বিজ্ঞানের দেখান পথে চলবে। তথাপি বাইবেল, কোরআন কিংবা গীতার কাছে এসে মাথা নত করে দেবে। তাদের স্থান সবার ওপরে। বিজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে চললেও এসব গ্রন্থ কখনই ছোট হয়ে যাবে না। তাদের পথ প্রদর্শনকে অস্বীকার করাও হবে না। বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে হবে।

অতি আবেগে বর্তমানে চলতে গিয়ে পুরোনোকে অপ্রয়োজনে সর্বত্র টেনে আনা কখনও কখনও অনর্থক। এখন চলতে হবে এখনকার জ্ঞানে। তথাপি পূর্বতনদের মর্যাদা যথাস্থানেই থাকবে। এমনিভাবে বাইবেল, কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক তথা বিধাতা প্রদত্ত মৌলিক দিক-নির্দেশনাই সকল দিক-নির্দেশনার উৎস। কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হল যেন মানুষ এসব বিষয় নিয়ে ভূলভাবে অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে।

■ পথ-প্রদর্শকরূপে কোরআনের বাণীর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা' প্রসঙ্গ : কোরআনের সূরা ও আয়াতসমুহ অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কিছু প্রেক্ষাপট আছে যাকে 'শানে-নুযুল' বলা হয়। সে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কোরআনের আয়াতসমুহ অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কোরআনের বাণীর 'সার্বজনীনতা' ও 'শাশ্বততা'রও একটি দিক আছে। এ গ্রন্থ রচনায় কোরআনের 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র বিষয় দু'টিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রন্থে কোরআনের বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা এ ধারণা দু'টিকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে। ফলে এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

পথ-প্রদর্শক বা ভাল-মন্দের দিক-নির্দেশকরূপে কোরআন কোন একটি দল বা গোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়নি। এটি অবতীর্ণ হয়েছে সকল মানুষের জন্য। ফলে এর বাণী 'সার্বজনীন'। আবার এটি মানবজাতিকে চিরদিনই পথ প্রদর্শন করে যাবে। ফলে এর বাণী বা বক্তব্য 'শাশ্বত'।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন কোরআনের বাণীকে 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত' বলা হচ্ছে? কেন সর্বকালে সকল মানবের জন্য এটিকে একটি প্রযোজ্য দিক-নির্দেশনারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে? কোরআনের বাণীর সার্বজনীনতা ও শাশ্বততার ধরণ বা প্রকৃতিটাই বা কি বা কেমন? এর আওতা কতদুর হবে? বিষয়গুলি বোঝার আছে।

বিশ্বজগত অনেক বড়। এর পূর্বাপর সময় সম্পর্কেও মানুষের যথাযথ ধারণা নেই। জীবন ও জগতের বিষয়সমূহও অন্তহীন! সময়ের সাথে পৃথিবীর নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একই নিয়ম কি সর্বত্র সকলের জন্য চিরকাল বিদ্যমান থাকতে পারে বা প্রযোজ্য হবে? বিষয়গুলি বোঝার আছে।

পথ-প্রদর্শনকারীরূপে কোরআনের বাণীর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র ধারণাটিকে কিভাবে বুঝতে হবে সে বিষয়টি সর্বপ্রথম সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে বলে মনে করি।

অপ্রয়োজনীয়ভাবে যত্রতত্র কোরআনকে টেনে এনে তার সাথে কোরআনের বক্তব্যের সাযুজ্যতা খুঁজে পাওয়ার মনোবৃত্তি পরিহার করতে হবে। এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনে ব্যার্থ হলে বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে কোরআনের ব্যাখ্যাদানকারীরা ধীরে ধীরে নিরবে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কু-

তর্ক সৃষ্টি হবে। একদল বলপূর্বক সবকিছুর মধ্যে কোরআনের শাব্দিক বার্তার উপস্থিতি খুঁজে পাবে, অন্যদল বিরোধীতার জন্য হলেও সবকিছু থেকে একে ছুড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে। ফলে সত্যের চেয়েও অধিক গুরুত্ব পাবে দু'টি পক্ষের অহম ও জাগতিক রেষারেষি।

কোরআনের বাণী 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত' কথাটি সঠিক। কিন্তু সেটি কিভাবে সঠিক সেটি সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে এবং সে কারণে কিছু কিছু ভূল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের কারণে বিষয়গুলি তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে কিংবা বিতর্কিত হতে চলেছে। কিংবা বলা যায় যে সকল মানুষকে তা সঠিকভাবে অনুপ্রাণীত করতে পারছে না। অন্ধ ভালবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে অনেকে যে কোন প্রকারে কোরআনের শাব্দিক বার্তাকে সর্বত্র সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। অথচ সঠিক জ্ঞানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিষয়গুলির মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হলে যে কোন প্রকারে এর বক্তব্যকে সর্বত্র সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করার আদৌ যে কোন প্রয়োজন নেই সেটি বোঝা সহজ হবে।

পথ-প্রদর্শনকারীরূপে কোরআনের আলোচনায় ওপরের প্রসংগটি কেন টানা হল? এর বাস্তব কারণ আছে। কিছু মানুষ পদার্থ, রসায়ন থেকে শুরু করে মহাজাগতিক সমস্ত বিষয় বস্তুতে এমন কি বইয়ের পাতায়-পাতায়, প্রতিটি লাইনে-লাইনে, অক্ষরে-অক্ষরে কোরআনের নির্দেশনা যে কোন প্রকারে হলেও খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে এবং তারা খুঁজেও পায়। তবে তারা আগে পায় না; বিজ্ঞান কিছু একটা পাওয়ার পরে খুঁজে পায়। তারা এটি করে অন্তরের অন্ধ ভালবাসাকে উর্ধ্বে স্থান দিতে গিয়ে, নয়ত প্রতিপক্ষকে নিচে নামাতে গিয়ে। প্রতিপক্ষও একই আচরণটি করে বিপরীতভাবে। ফলে বাস্তব সত্য থেকে যায় অধরা। জ্ঞানসম্মত আলোচনাও আর হয় না।

এর ফলে যারা সত্যকে সন্ধান করতে চায় তারা সব পক্ষের সহযোগীতা-সহমর্মীতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। তাদেরকে কাজ করতে হয় নিভৃতে, একাকী। কখনও বরণ করে নিতে হয় উভয় পক্ষের ধিক্কার। আসল সত্য জন-মানুষের সামনে উঠে আসতে পারে না।

কোরআনের বাণীসমুহের 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে হলে ব্যাকরণ বইয়ের মতো কেবল শাব্দিক কিংবা বুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে

নয়, এর বক্তব্যের মর্মকথা অনুধাবন করতে হবে। সেজন্য কোরআনকে যথাযথভাবে অধ্যায়ন ও এর বার্তাসমুহের সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে। সে প্রচেষ্টা থেকেই এ গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায়। বিবিধ বাণী বা আয়াতের বিশ্লেষনাত্মক আলোচনাকালে বিষয়গুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে উঠে আসবে।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের সমস্যা এক নয়। সমাধানও এক নয় বা হতে পারে না। সংস্কৃতিতেও পার্থক্য আছে। আছে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণায়েও পার্থক্য। বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

স্বয়ং আল্লাহর সৃষ্ট সূর্য্য যেমন জগতের সব স্থানে একই সময়ে সমভাবে আলো বিতরণ করে না, তেমনি ভাল-মন্দের ধারণা থেকে শুরু করে সমস্যা ও সমাধানের পথও স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই রকম নয়। আর এ সবই মানব মস্তিষ্ক দ্বারা কোন একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নেয়া বা না নেয়ার সাথে সম্পর্কিত বিষয় সেটিও বুঝতে হবে।

শিক্ষা-দীক্ষা, চর্চ্চা থেকে শুরু করে প্রথাগত ও নানান কারণে এসব বিষয় পার্থক্যপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোন একটি নিয়ম সর্বত্র সমভাবে চাপিয়ে দেয়া যায় না, আবার প্রযোজ্যও হতে পারে না। ফলে কোরআনের মতো পথ প্রদর্শনকারী বা দিক-নির্দেশনা যা কিনা সমগ্র মানবজাতির জন্য এসেছে এবং যা চিরদিনের জন্য বলবৎ থাকবে সেটি অবশ্যই অনমনীয় নয় বা হতে পারে না। আবার সেটি অনমনীয়ও বটে। তবে কখন, কোথায়, কিভাবে সেটিও বুঝতে হবে।

জগতের সর্বত্র সকল মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের খুটিনাটি বিষয়ের কেইস টু কেইস সুনির্দিষ্টি সমাধান কোরআন দেয় না বা দিতে পারে না। বিষয়টিকে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করাও বাঞ্চনীয় নয়। ওপরে উল্লেখ করেছি যে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের সমস্যা যেমন এক নয়, আবার জীবন-যাপন প্রণালীও একরকম নয়। পথ-প্রদর্শকরূপে কোরআন বস্তুত প্রতিটি বিষয় নয় বরং সার্বিক বিষয়ের মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়। যে মূলনীতি 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন'। মানুষকে তার করণীয় নির্ধারণ সে মূলনীতির আলোকে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিষয়গুলিকে সেভাবে ভাবতে ও বুঝতে হবে।

চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে একটি সমস্যার কি সমাধান দেয়া হয়েছিল হুবহু সেটিই একমাত্র সমাধান নয়। আবার সেটি আজকের সমাধান নাও হতে পারে। সে সময়ের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন ন্যায্যতার ভিত্তিতে সে সমাধান দেয়া হয়েছিল সে বিষয়টি বিবেচ্য। আর সে কারণেই এটি 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন' দিক-নির্দেশনা। অর্থাৎ দিক-নির্দেশনা সমস্যা সমাধানের মূলনীতি সম্পর্কে বলে। প্রতিটি সমস্যার সমাধান পৃথকভাবে বলে না। তবে প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে মূলনীতি পরিপালন করা হয়েছে কি-না সেটি যাচাই করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কোন অবকাশ নেই। তাই একই সাথে এটি অনমনীয়ও বটে। অর্থাৎ মূলনীতি পরিপালনের বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে অনমনীয়।

স্থান-কাল ও পাত্রের ভিন্নতার কারণে নিয়মের পরিবর্তন হতে পারে এবং সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল সূত্রটিই হল দিক-নির্দেশনার মূল যেটি 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত'। আর সেটি হল ন্যায়ের পথ; কল্যাণের পথ; সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ। অত্যাচারীর উৎপীড়ন থেকে ভূক্তভোগীর দুঃখ লাঘবের পথ। ন্যায়টিই আসল বা মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। এটিই মূল সূত্র। কোরআন সর্বক্ষেত্রে সেটিই শিক্ষা দিয়েছে। আর এটিই কেবল 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন' বিবেচ্য বিষয় হতে পারে।

সবদিক বিবেচনায় চলার পথটি বা গৃহিত সিদ্ধান্তটি স্থান-কাল ও পাত্রের প্রেক্ষিতে ন্যায়সম্মত হয়েছে কিনা সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। উৎপীড়িত, অত্যাচারীত ও নিঃগৃহীতের দুঃখ লাঘব হয়েছে কি-না সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এগুলিই কোরআনের 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত' দিক-নির্দেশনা। হুবহু শাব্দিক অর্থপ্রসূত কোন সমাধান 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত' নয় বা হতে পারে না; যেটি কোন সুনির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কোন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছে। কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

কোরআন যে সময়ে ও যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমুহ সে সময় ও পরিবেশকে বিবেচনা করে নেয়া হয়েছে। এটিও কোরআন প্রদত্ত দিক-নির্দেশনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সময় ও পরিবেশকে বিবেচনা করে। কিন্তু এর 'সার্বজনীনতা'

ও 'শাশ্বততা'র দিকটি হচ্ছে সময়, পরিবেশ ও সমস্যার আলোকে হলেও সর্বোচ্চ ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে হবে। এটিই কোরআনের মূল দিক-নির্দেশনা।

ওপরোক্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে কোরআনে যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কোরআনের বাণীসমূহ এমনকি প্রতিটি বাণীর মধ্যে এর শব্দের প্রয়োগ গভীর মনযোগের সাথে অধ্যায়ন করে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে এ বক্তব্যের স্বপক্ষে উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়গুলি বিশ্লেষনাত্মকভাবে তুলে ধরা হবে।

কোরআনে অনেক বিষয়ে যেসব সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে অনেকে তার শাব্দিক অর্থ ধরে হুবহু পালন করার কথা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটি সঠিক কাজ নয়। দেখতে হবে তেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের কারণটি কি ছিল। কোরআন স্থান, কাল, পাত্র, সংস্কৃতি, পরিবেশ সবকিছুকে বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানে সর্বোত্তম উপায় প্রদর্শন করেছে বা সমাধান দিয়েছে। সর্বক্ষেত্রে ন্যায়কে সমুন্নত রেখেছে। এটিই কোরআনের শিক্ষা। কোরআন এ পথই প্রদর্শন করে; অর্থাৎ ন্যায় ও ন্যায্যতাকে সমুন্নত রাখা।

অতএব বর্তমানকালেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেটি ন্যায় বিবেচ্য হবে সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে। তৎকালীন সময়ে প্রদত্ত হুবহু সমাধানটিই একমাত্র সমাধান নয়। স্থান, কাল, পাত্র, সংস্কৃতি সবকিছুকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠি দ্বারা সমাধানটি ন্যায্য বিবেচ্য হতে হবে। ভূক্তভোগী ও সাধারণ মানুষকে তাতে তৃপ্ত ও তুষ্ট হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ তালাকের [তালাক দ্রষ্টব্য ২:২২৬] বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে সময়ে আধুনিককালের ব্যাবস্থাপনা ছিল না, আবার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্তমানের মতো ছিল না সে সময়ে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সর্বাধুনিক, সর্বোত্তম ও ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। যখন উন্নত ব্যাবস্থা ছিল না কোরআন তখন সবচেয়ে উন্নত ব্যাবস্থা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছে এবং সে উন্নত ব্যাবস্থাও আবার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে দেয়া হয়েছে। তা না হলে সমাজের মানুষের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হত না।

কোরআন এ শিক্ষাই দেয় যে, সময় বা যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোত্তম পন্থাকে অবলম্বন করতে হবে। হবহু যেটি বলা হয়েছে কেবল সেটিই একমাত্র সমাধান নয়। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ন্যায়সম্মত ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে 'হবহু যেটি বলা হয়েছে' সেটিও সমাধানের একটি পথ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। এটিও একটি দিক-নির্দেশনা।

এ প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের বিষয়টিও উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় কোরআন ন্যায়সম্মত সমাধানের পথ প্রদর্শন করেছে। যা মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেতে পেরেছে। এখন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অতএব বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ন্যায়সম্মত সমাধান মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। কোরআনের মৌলিক দিক-নির্দেশনা হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় সমস্যার সবচেয়ে ন্যায়সম্মত সমাধান করা। ন্যায়টিই মৌলিক দিক-নির্দেশনা। হুবহু শাব্দিক অর্থ নয়। যে সমাধানে ভূক্তভোগী মানবের অন্তর শান্ত হয় না সেটি কোন সমাধানই নয়। কিছু মানুষের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনড় মনোবৃত্তি কোরআনের প্রতি মানুষকে বিতশ্রদ্ধ করে তুলছে। তারা নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থে কোরআনের মতো একটি মহিমান্বিত গ্রন্থকেও মানব সমাজে অপাংক্তেয় করে তুলছে নির্বিচারে। অথচ নিজেদেরকে কোরআনের একমাত্র ধারক-বাহক বলেও বিবেচনা করছে। যদিও সেটি তাদের নিজেদের দাবী। তবে বিরোধীতাকারীরাও তাদের কর্ম ও আচরণ দ্বারা তাদের সে দাবীকে স্বীকৃতি দিচ্ছে বা গ্রহণ করে নিচ্ছে।

আজকের দিনের প্রয়োজনে যেটি উত্তম সেটিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। আরও উন্নত ব্যাবস্থা গ্রহণ করায় কোরআনের শিক্ষায় কোন বাধা নেই। বস্তুত একটি গদ-বাধা নিয়ম ধরে রাখার মধ্যে আল্লাহতায়ালার কোন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি নেই। এতবড় বিশ্ব জগতের যিনি অধিশ্বর, তিনি কেন অযাচিতভাবে একটি নিয়মের বিষয়ে অনড় হয়ে পড়ে থাকবেন? তাতে তাঁর প্রয়োজনীয়তা কি? তাঁর সৃষ্ট মানুষও তো তার সৃষ্টির পরিচালনায় এমন বোকামি করে না! আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতিও তো স্থান-কাল ও পরিবেশের সাথে সাথে নিয়ম-কানুন ও রূপ পরিবর্তন করে। আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতিই তো তার প্রমাণ। প্রকৃতিতেও আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

এমনকি কোরআনের আয়াতও প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার উত্তরাধিকার, সূদ, মদ-জুয়া সম্পর্কিত কিছু আয়াত পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। সহজ থেকে কঠিনতর হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২:১০৬)

কোরআন বলছে পূর্বের গ্রন্থসমূহ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ। আবার এ গ্রন্থ অর্থাৎ কোরআনও আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থ। একই আল্লাহ কিরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বার্তা প্রেরণ করেন? ইসরাইলিদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ ওপরোক্ত বার্তা অবতীর্ণ করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ যুগোপযোগী করে তাঁর বার্তা নবায়ন করে প্রেরণ করেছেন। এটি করেছেন মানুষ ও পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে; যে পরিবর্তনের সংঘটক তিনি নিজেই। সে শর্তেই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ মানুষকে সকল সময়ে সকল ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উত্তম পথ গ্রহনের উপায় প্রদর্শন করেছেন এবং একই সাথে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুত কোরআনে উল্লেখিত তালাকের নিয়ম বা উত্তরাধিকারের নিয়ম ধরে রাখার সাথে মহান আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ম পালন করা বা না করার সাথে স্বর্গ-নরক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিরও কোন সম্পর্ক নেই বা থাকতে পারে না। যিনি এত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর এমন একটি বিষয় নিয়ে তিনি কেন মাথা ঘামাতে যাবেন? তাতে তাঁর লাভ বা ক্ষতি কি?

বস্তুত এগুলি মানবীয় ও জাগতিক সমস্যা। এ সকল সমস্যার সময়োপযোগী সমাধানের জন্য তিনি মানুষকে কিছু উপায় প্রদর্শন করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষকে এ শিক্ষাই দান করেছেন যে, মানুষ যেন তার ক্রমোন্নতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে আরও সুন্দর ও সময়োপযোগী সমাধান খুঁজে নিতে পারে। এটি তারই অনুমোদনের একটি উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, পারিবারিক বিষয় সম্পর্কিত সমস্যাসমুহের সমাধানের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে এমন কি ধর্ম নির্বিশেষেও নারীরা ভীষনভাবে নির্যাতিত ও

ন্যায়বিচার বঞ্চিত ছিল। তেমন কঠিন অবস্থার প্রেক্ষিতে কোরআন সময়োপযোগী, ন্যায়সম্মত ও যথাযথ নিয়ম প্রবর্তনের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছে।

কোরআন আর্থ-সামাজিক নানাবিধ নির্যাতন থেকে নারীদের মুক্তির জন্য পথ প্রদর্শন করেছে। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যে পথ মানুষকে নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে এসেছে সেটি যেন আবার কোন কালে নির্যাতনের কারণ হয়ে না দাড়ায় সে বিষয়টিকেও বিবেচনায় নিতে হবে। নিয়মটি আদৌ মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। প্রয়োজনে সেটিকে যুগের সাথে তাল রেখে পরিবর্তন করে নেয়াটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আল্লাহ একবারে সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন না? উত্তর হচ্ছে, তিনি তো একবারে মানুষকে আজকের অবস্থায় সৃষ্টি করেন নি। আদিম অবস্থা থেকে তাকে ধীরে ধীরে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছেন। এমনই বিবর্তন প্রক্রিয়া। মানুষকে তার ধারণ ক্ষমতার বাইরে তিনি কোন বোঝা চাপিয়ে দেন না। বলা হচ্ছে,

"... আমি কারও প্রতিই তার সাধ্যের অতীত কাজ ও দায়িত্ব অর্পণ করি না। ...।" (আল-কোরআন ৬:১৫২)

প্রথম মানবের মস্তিষ্কে তিনি কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান দেন নাই। ধারণ ক্ষমতার বাইরে তিনি বোঝা অর্পন করেন না। সবকিছুর প্রক্রিয়া আছে। ক্রমে সম্পন্ন হয়। সমস্যা সমাধানের পথও তাই সময়োপযোগী করে প্রদান করা হয়েছে। অতএব বুঝতে হবে যে, কেবল শাব্দিক অর্থই কোরআনের পথ প্রদর্শন নয়। কোরআনের প্রদর্শিত পথ শাব্দিক অর্থের অন্তর্নিহিতে বিদ্যমান। আর সেটি হচ্ছে, সকল দিক বিবেচনায় যে কোন প্রকারে ভূক্তভোগীর কষ্ট লাঘব করা। কোন সূক্ষ্ম কারচুপির স্থান নেই এখানে। আর এখানেই তার দিক-নির্দেশনার 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র রহস্য নিহিত এবং এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোরআনে অনেক উদাহরণ আছে।

শাব্দিক অর্থকে কাজে লাগিয়ে নিয়মের বেড়াজালে ফেলে নানাবিধ অনৈতিক সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করা হয়। সে জন্য শব্দের পবিত্রতার ওপর জোর দেয়া হয়। পূর্বের গ্রন্থের অনুসারীরাও অতীতে তেমন কাজ করেছে। সে কথা

কোরআনেও বলা হয়েছে। নিয়মের নামে সেসব অনিয়মকে দুর করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলি পরিত্যাজ্য।

উদাহরণস্বরূপ এভাবেও ভাবা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে বলেছেন বা উৎসাহিত করেছেন। এটি মানুষের কর্মের একটি মূল বা মৌলিক দিক। এটি কোরআনের দিক-নির্দেশনা। এর সাথে আল্লাহকে চেনা, জানা, উপলব্ধি করা ও নিজেকে চেনার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এটিই প্রদর্শিত পথ যা মানুষকে পরবর্তী কাজসমুহ কোন দিকে করতে হবে তার দিক-নির্দেশনা দেয়। কিন্তু সে পথে গমনাগমনের খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়গুলি মানুষের করণীয়। সেখানে কোরআনকে অযাচিতভাবে টেনে আনার প্রয়োজন নেই। মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে সে কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারে। ফলে পদার্থ, রসায়ন প্রতিটি বিষয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোরআনের সাজুয্যতা খুঁজে পেলে ভাল, তবে সেটি করার আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? চলতে পথে মানুষকেই পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে যথাযথভাবে কাজ করতে হবে। কোরআন সে দিক-নির্দেশনা দেয়। বিজ্ঞান সে কাজ করছে। বিজ্ঞানের কাজ কোরআনের তথা আল্লাহর নির্দেশনার বাইরের কোন কাজ নয়!

ওপরের উদাহরণটি কেন তুলে ধরা হল? এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যে, এক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে অজানাকে সন্ধান করার অনুমতি বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষ সে কাজে বা সৃষ্টির রহস্যের সন্ধানে রত আছে কিনা সেটিই মূখ্য বিবেচ্য। অর্থাৎ মানুষ কোরআনের মৌলিক যে দিক-নির্দেশনা সে নির্দেশনা মতো কাজ করছে নাকি পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছে সেটি দেখার বিষয়। এতটুকু সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে কোরআনের প্রদর্শিত পথেই মানুষ রয়েছে বলে বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ তাকে চলার পথের যে দিকটিকে বাৎলে দেয়া হয়েছে সে সেদিকে আছে। এ বিবেচনাটিই কোরআনের দিক-নির্দেশনার ‘সার্বজনীনতা’ ও ‘শাশ্বততা’কে বজায় রাখে।

‘শাব্দিক’ কিংবা ‘বাক্যিক’ অর্থে অনড় থেকে কোরআনের শাশ্বততা ও সার্বজনীনতাকে বজায় রাখা যায় না। বিশ্ব জগতে অনেক বড় ও জটিল অংক আছে। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোরআনে খুটিনাটি সব সমস্যার সমাধান খোঁজা

ঠিক না। তবে এ বক্তব্যটিও ঠিক যে কোরআনে সব সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু কিভাবে সেটিও বুঝতে হবে।

কোরআন ন্যায্যতার কথা বলে। এর সমস্ত দিক-নির্দেশনা এই ন্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তীত। এর সাথে আছে সত্যের সম্পর্ক। আল্লাহর সৃষ্টির কণায়-কণায়, অণুতে-পরমাণুতে, প্রতিটি পরতে-পরতে ন্যায্যতার বিষয়টি সম্পর্কিত। ন্যায় ও সাম্য ভারসাম্য বজায় রাখে। ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীলতা শান্তি বা প্রশান্তির অপর নাম! 'ওম শান্তি'। এটিকে প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠিত রাখাই সকলের ও সকল ধর্মের লক্ষ্য।

জীবন ও জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাই ন্যায্যতা সৃষ্টির কথা বলে কোরআন। জগতকে শান্তিময় করে গড়ে তোলার দিক প্রদর্শন করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। আর সে অর্থেই সকল সমস্যার সমাধানের দিক-নির্দেশনা রয়েছে কোরআনে!

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোরআন কেবলমাত্র দিক-নির্দেশনাই নয়। মানুষের চলার পথে এক অতুলনীয় 'প্রেরণা' হয়ে কাজ করে কোরআন! জগতে এমন কিছু নেই যা ন্যায় পথে চলতে মানুষকে কোরআনের চেয়ে অধিক উজ্জীবিত করতে পারে।

কোরআনের 'সার্বজনীনতা' ও 'শাশ্বততা'র আলোচনায় উদাহরণস্বরূপ ওপরে তালাক ও উত্তরাধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আরও অনেক বিষয় আছে যা উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। তবে এখানে আর উদাহরণ তুলে না ধরে যথাস্থানে বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বলা উত্তম বলে মনে করি।

দিক-নির্দেশনার আরও একটি দিক আছে। কোরআনে মানবজাতির চলার সঠিক পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে কোরআনের ভেতরে উদ্ধৃত পথ-নির্দেশনা ছাড়াও এর অবতীর্ণতার বাস্তবতাও কিছু দিক নির্দেশ করে। যেমন একটু ভিন্নভাবে যদি বিষয়টি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে, কোরআন একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে সে দক্ষিন আমেরিকা কিংবা জাপান এর ইতিহাস আলোচনা করেনি। তার আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে কানান, আরব, মিশর এ সকল অঞ্চলসমূহ। আছে ইহুদি জাতি, খ্রীষ্টান জাতি ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত আলোচনা। অর্থাৎ পথ-প্রদর্শকরূপে কোরআন এটিও নির্দেশ করে যে, প্রত্যেককেই তার নিজস্ব অবস্থা অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে ও

গুরুত্ব দিয়ে পথ চলতে হবে। দিক-নির্দেশনাকে সে আলোকে বিবেচনা করে বুঝতে হবে। আবার-

কোরআন একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সে আলোকে এর ভেতরের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। ফলে এর সার্বজনীনতার শিক্ষাটি হচ্ছে প্রত্যেককেই তার নিজস্ব পরিবেশ, সময়, অবস্থা, অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। যেমন কোরআন নিজেও পৃথিবীর সব জাতিকে নিয়ে আলোচনা করেনি। একটি বংশের বা ইব্রাহীমের বংশের ধারা তথা ইসরাইল ও ইসমাইলের বংশের ধারাকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়ে মানবজাতিকে শিক্ষাদান করার চেষ্টা করেছে।

কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। ফলে সুদুর জাপানের মানুষ ইহুদিদের নিয়ে ভাবতে আগ্রহী নাও হতে পারে। তারা সে প্রয়োজন বোধ নাও করতে পারে। তাদেরকে তাদের নিজেদের পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে ও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। সারা জাহানের মানুষের পথ-নির্দেশনারূপে কোরআন তার অবতীর্ণ হওয়ার সমসাময়িক সময়ের ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে মানবজাতির জন্য বিষয়গুলি তুলে ধরেছে শিক্ষাদান করার জন্য। কেবল 'শাব্দিক' বা 'বাক্যিক' অর্থ হুবহু পালন করার জন্য নয়। তবে এটিও বুঝতে হবে যে, কোন বিষয়গুলি অবশ্যই হুবহু পালন করতে হবে। আর এখানেই মানুষের নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিচার্য্য বিষয়। ভূল করলে ফলাফল নিজেদেরকেই বহন করতে হবে।

রাসূল যা করেছেন তা পালন করা আমাদের জন্য সুন্নাত। তিনি দন্ত মাজনের জন্য মেসওয়াক ব্যাবহার করেছেন। তাই আমরাও করি। সুন্নাত পালন করি। রাসূল তলোয়ার দিয়ে ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে থেকে যুদ্ধ করেছেন। আমরা কি যুদ্ধের ময়দানে আজ সে সুন্নাত পালন করি? এখানেই মানুষের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয়। কোনটি হুবহু পালন করতে হবে এবং কোনটি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে করতে হবে সেটি বুঝতে হবে এবং এর পেছনের কারণ কি সেটিও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কেবল হুবহু কাজ করলেই হবে না।

কোরআন মানবজীবনের কিছু মৌলিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে যেগুলি 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন'। কিন্তু একটি ভূল অনুধাবন বা শিক্ষা মানুষকে ভূল পথে বহুদুর নিয়ে যেতে পারে। এটিও একটি শিক্ষা।

যারা সত্য ও ন্যায়কে বুঝতে চেষ্টা করবে না, যারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বাধাদান করবে তাদের সাথে সংগ্রাম করার দিক-নির্দেশনা রয়েছে কোরআনে। তা না হলে পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে। ইয়াকুব বা ইসরাইলের বংশকে মানবজাতির জন্য উদাহরণস্বরূপ বেছে নেয়া হয়েছে। তাদের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারকালে তারা মুখ্য বিরোধীতাকারী ছিল তাই তাদের উদাহরণ এসেছে। তাদের সঙ্গে চিরকাল যুদ্ধ কিংবা বিদ্বেষ পোষন করার জন্য নয়। চিরকাল বিদ্বেষ পোষন করে কি অর্জন হবে?

কোরআনের বাণী 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত'। কোরআন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে বলেছে; তা সে যেই করুক না কেন। কেবল ইয়াকুব বংশই নয়, এমনকি সে যদি নিজের লোকও হয়ে থাকে তবে তার বিপক্ষেও সংগ্রাম করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর পথে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদান কর, যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্নীয়-স্বজনের বিপক্ষেও যায়। ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম। অতএব তোমরা কারও জন্য ব্যাথিত হয়ো না। কেননা তাতে তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশংকা আছে। আর যদি তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হও কিংবা তাতে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবগত।" (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার দিক-নির্দেশনারূপে এর চেয়ে শক্ত ও কঠিন নির্দেশনা আর কি হতে পারে, যেখানে নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্নীয়-স্বজন, ধনী কিংবা দরিদ্র নির্বিশেষে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে?

দিক-নির্দেশনারূপে কোরআন কিছু কাজ করতে বলেছে আবার কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছে। ফলে কোরআনে সর্বমোট কতগুলি কাজ করতে বলা হয়েছে এবং কতগুলি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে এর তালিকা তৈরী করা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। তবে সমগ্র মানবজীবনের বিবেচনায় সুস্পষ্টরূপে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে কোরআনে তেমন বড় কোন তালিকা নেই। এমনকি কি কি খাবার নিষিদ্ধ তারও কোন বিশাল তালিকা নেই। বস্তুত সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার এভাবে সংখ্যা গুনে গুনে জীবন পরিচালনা করা সম্ভবও নয় এবং সেটি বাস্তবসম্মতও নয়। বরং বলা হয়েছে,

"বল: তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ হিসেবে দিয়েছেন তোমরা নিজেরাই সেগুলির কোনটিকে বিধি-সম্মত ও কোনটিকে বিধি-সম্মত নয় বলে সাব্যস্ত করেছ; বল: আল্লাহ কি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বল?" (আল-কোরআন ১০:৫৯)

ওপরোক্ত বিষয়টি এ কারণে উত্থাপন করতে হয়েছে যে, আজকাল প্রতিনিয়ত বিধি-নিষেধের এমনি অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় তালিকা প্রণয়নের বিষয় চোখে পরে। এসবের উদ্ভাবন অনর্থক। এ রকম শিক্ষা মস্তিষ্ককে অযথা ভারাক্রান্ত করে। মানুষ নিজেরাই বিধি-নিষেধের এমন তালিকা প্রণয়ন করে। দিন আসছে হয়তবা এগুলির আর প্রয়োজন হবে না। তবে মানুষ নিজ থেকে বা নিজ আগ্রহে যদি তেমনটি কামনা করে, তবে হয়তবা বিধাতা মানুষের জন্য তেমনটি অনুমোদন করে দিতেও পারেন। কেননা যার জ্ঞান যেমনটি চায় সে তেমনটিই পায়। তাইতো সঠিক ও সরল পথে চলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনি মস্তিষ্ককে আলোকিত করে না দিলে মানুষ অন্ধকারে ও জটিলতায় নিমজ্জিত হতে থাকবে।

কেবল খাদ্যের বিষয়কে বিবেচনায় নিলেও হারাম-হালালের বিশাল তালিকা তৈরী না করে মূল বক্তব্যটি কোরআনে কি বলা হয়েছে সেটিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সেটি বুঝতে সক্ষম হলে বিধি-নিষেধের এত বড় তালিকা প্রনয়নের আর প্রয়োজন হবে না। এ বিষয়টি বুঝতে পারলে সেখানেই লুকিয়ে আছে এর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র গোপন কথা। বলা হচ্ছে,

"হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত।" (আল-কোরআন ২:১৬৮)

এ জীবন ও জগত সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। খাদ্য হিসেবে কোনটি স্বাস্থ্যসম্মত ও কোনটি স্বাস্থ্যসম্মত নয় সেটি গবেষনা করে বের করা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। বর্তমানে বিজ্ঞান এমনভাবে প্রাতিষ্ঠা পেয়েছে যা পুরাকালে আজকের মতো ছিল না। বিজ্ঞানই আজ সকল ক্ষেত্রে সত্য উন্মোচনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকে। মানুষকে ধৈর্য্যের সঙ্গে বিশ্বাস রেখে প্রকৃতি ও পরিবেশের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করে সত্য সন্ধানের চেষ্টায় রত থাকতে হবে। বিশ্ব ব্যাবস্থায় এ কাজগুলি সম্পাদন করা কোন একক ব্যাক্তির কাজ নয়। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমুহের কাজ এগুলি। কোরআন সর্বকালেই যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষন, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এ পথে চলারই দিক-নির্দেশনা দেয় [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]।

সত্য হচ্ছে কিছু মানুষের জন্য হয়তবা তালিকারও প্রয়োজন আছে। কিছু মানুষ তেমনটি প্রত্যাশাও করে। যেমন বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু বিষয় সহজ করে তুলে ধরারও প্রয়োজন আছে।

বাস্তবে দর্শক যেমনটি দেখতে চায়, শুনতে চায় নির্মাতারা তেমনটিই দেখায় বা শোনায়। ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বের বিষয় দর্শক-শ্রোতা নিতে পারে না। মানুষ যেমনটি প্রত্যাশা করবে বা গ্রহণ করতে চাইবে আল্লাহও তেমনটিই দেবেন। তাই সঠিক জ্ঞানে সঠিকটি প্রত্যাশা করতে হবে। কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ভূল পথে গেলে সেটি অনুমোদিত হয়ে যেতে পারে এবং সহজ-সরল পথ সহজে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। কথাগুলির মর্ম অর্থ সহজে কারও কাছে বোধগম্য না হলে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সত্যি বলতে, কোরআনের বাণীর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র বিষয়টি নির্ভর করে এর প্রতিটি বাণী বা বক্তব্য থেকে যথাযথ অর্থটি খুঁজে নিতে পারার ওপর। সেখানে এমন কিছু মৌলিক শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা আছে যা সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র সকল সময়ে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। সেটি

বুঝতে পারলে তবেই এর বাণী 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন' বলে বিবেচিত হবে নচেৎ নয়।

কেবল 'শব্দ' কিংবা 'বাক্যে'র ওপর গুরুত্ব দিলে হবে না। গুরুত্ব দিতে হবে এর নিয়তের দিকটিতে। এর লক্ষ্যের দিকে। সে শিক্ষাটি কি? সেটি জানতে ও বুঝতে হলে কোরআনে বিবৃত ঘটনাসমুহের বিশ্লেষণ সঠিকভাবে করতে হবে এবং সেখান থেকে শিক্ষাটি বের করে নিয়ে আসতে হবে। পরবর্তীতে বিবিধ বাণীসমুহের বিশ্লেষনাত্মক আলোচনাকালে বিষয়গুলি পরিস্কার হবে বলে মনে করি।

সর্বক্ষেত্রে কোরআন ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করেছে এবং যা কিছু অন্যায়, মিথ্যে, অসুন্দর, মন্দ ও অশ্লীল সেসবকে বারণ করেছে। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। ...। বল: আমার প্রতিপালক ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন ...।" (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

ওপরে উদ্ধৃত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানা থাকলে জীবনের প্রতিটি বিষয় স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোরআনের 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন'তার মূলনীতির আলোকে সমাধান করা সহজ হয়ে যাবে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সরল পথের দিক-নির্দেশনা দেন অত্যান্ত সহজ ও সরলভাবে।

ওপরের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা মানবজীবনের মূল দিক-নির্দেশনাগুলি বলে দেয় যা 'শাশ্বত' ও 'সার্বজনীন'। কোরআন ন্যায্যতা ও ন্যায়পরায়নতার কথা বলে। ন্যায়ের পথে চলতে শেখায়, একইসাথে নির্দেশনাও দেয় ও উদ্বুদ্ধও করে। নির্যাতিতের কষ্ট লাঘব করার কথা বলে। অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রতিহত করতে বলে। এমনিভাবে এ দিক-নির্দেশনা সকল যুগের, সকল স্থানের, সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এখানেই এর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র রহস্য নিহিত। এটিই কোরআনের মূল দিক-নির্দেশনা।

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকল মানুষের জন্য এবং সকল যুগে এর বাণীর আবেদন সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা জানি যে, সাধারণত কোন ঘটনার কারণে

কোরআনের বাণীসমুহ তৎকালীন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এর বাণীসমুহ তৎকালীন সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও এ গ্রন্থের আলোচনায় বাণীসমুহকে তার 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

একটি উদাহরণ তুলে ধরে এ অংশের লেখাটি আপাতত শেষ করতে চাই। এক কৃষক তার ধান ক্ষেতে ধান রোপনের কাজে ব্যাস্ত। এমন সময় সে পথ দিয়ে একজন পথিক হেঁটে যাচ্ছিল। সে কৃষকের কাছে 'মিয়াজী বাড়ী' কোনদিকে জানতে চাইল। কৃষক তার দিকে তাকিয়ে পশ্চিমে নাক-বরাবর যেতে বলল।

দিক-নির্দেশনা পেয়ে লোকটি নাক বরাবর পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করল। চলতে গিয়ে সামনে একটি তাল গাছ দেখতে পেল। সে থমকে দাড়াল। চিন্তায় পড়ে গেল। নাক বরাবর কিভাবে যাবে? সামনে তো তাল গাছ!

বুদ্ধি বের করে তাল গাছের এপাশ দিয়ে উঠে ওপাশ দিয়ে নেমে আবার নাক বরাবর চলতে শুরু করল। দিক-নির্দেশনাকে সে হুবহু অনুসরণ করে চলেছে।

পরিবর্তনশীল বিশাল ব্রহ্মান্ডে এভাবে শাব্দিক অর্থ ধরে দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করা কখনই জ্ঞানসম্মত নয় বা হতে পারে না।

এভাবে চলা যাবে না। পরিবেশ, পরিস্থিতি, স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে চলতে হবে। তবে সঠিক দিকেই চলতে হবে। তেমনই কোরআনের পথ-নির্দেশনা।

■ **২.২.২** (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী) তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে : কোরআনকে মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক বলা হয়েছে। আবার এটিও বলা হচ্ছে যে, মানবজাতির সকলেই এ থেকে উপকার লাভ করতে পারবে না। এর অনুসরণে তারাই উপকৃত হবে যারা মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে। এটি একটি শর্ত।

ঔষধ মানুষের রোগ ভাল করে। কিন্তু ঔষধ সেবনের কিছু নিয়ম-কানুন-শর্ত আছে। ঔষধের কর্যকারীতা পূর্ণরূপে পেতে হলে নিয়ম মেনে চলতে হয়।

তাকে যথাস্থানে সংরক্ষন করতে হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবন করতে হয়। অনেক শর্ত আছে। অন্যথা হলে কার্যকারীতা লাভ করা যাবে না।

মানুষ আজ মহাকাশে গমন করছে। সে ভ্রমন করতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সফল কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণেরও কিছু পূর্বশর্ত থাকে। সুষ্ঠুভাবে একটি অফিস পরিচালনা করতেও কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়। রাজনৈতিক সমঝোতার জন্যও পক্ষ সমুহের মধ্যে শর্ত আরোপের প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারে কমান্ড দিতে হলেও কিছু লজিকাল কন্ডিশন থাকে। সকল ক্ষেত্রে সঠিক ফল অর্জন করতে হলে শর্ত পুরণ করা বাঞ্ছনীয়। শর্ত বা নিয়মের ব্যাত্যয় ফল দেবে না।

কোরআন মানুষের জন্য সঠিক পথে চলার পথ-প্রদর্শক সত্য। কিন্তু সে পথে চলতে হলেও কিছু শর্ত বা নিয়ম আছে যা মেনে চলতে হবে। যে শর্তগুলি মেনে চলতে হবে '.. তাদের জন্য যারা ..' এ কথাটির পরে আয়াতে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। শর্তগুলি পুরণ না হলে দিক-নির্দেশনা কাজ করবে না। ফলে কোন ফল লাভ হবে না। শর্তগুলির পরিপুরণ সমগ্র পথ-নির্দেশনাটিকে কার্যকারীতা দান করে।

কোরআনের দিক-নির্দেশনা থেকে উপকার পেতে হলে সর্বপ্রথম যে শর্তটিতে বিশ্বাস রাখতে হবে সেটি হচ্ছে, মানুষের নিজের ভেতরে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলার একটি চেষ্টা থাকতে হবে। তবেই সে কোরআনকে পথ-প্রদর্শকরূপে পাবে।

মন্দ পথের আকর্ষন প্রবল। মন্দ পথ ও মন্দ কর্ম মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"মন্দ ও ভাল সমান নয় যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষণ করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

গীতায় বলা হয়েছে, "অগ্নি যেমন ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পন যেমন ধুলো দ্বারা আবৃত থাকে, যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে গর্ভ, তেমনি কাম বা বাসনা তথা মন্দ ইচ্ছে দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।

কামরূপ চিরশত্রুর দ্বারা জ্ঞানীর শুদ্ধ চেতনা এভাবেই আবৃত থাকে। যা কখনই পুরণ হবার নয় এবং অগ্নির মতো দগ্ধ করে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হচ্ছে এই কামের অধিষ্ঠান স্থল। কাম এদের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে বিমোহিত করে।

অতএব তুমি ইন্দ্রিয়সমুহকে প্রথমেই দমন কর; জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর।" (গীতা ৩:৩৮-৪১)

কিন্তু মন্দ পথে চলা, মন্দ কর্ম করাকে কিভাবে বিনাশ করতে হবে? বলা হচ্ছে,

"... আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার শত্রুও। ... যে আত্মা আত্মাকে বশ করতে পারেনি আত্মা শত্রুবৎ তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়।" (গীতা ৬:৫-৬)

মন্দের আকর্ষন থাকবেই। আত্মাই হচ্ছে 'নিজ'। নিজেই নিজের বন্ধু আবার শত্রুও। যে আত্মা নিজের মন্দ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেনি সে আত্মা তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। অতএব নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজেকে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে রক্ষা করে চলার জন্য নিজের ভেতরে একটি প্রবল ইচ্ছেশক্তি সৃষ্টি করা। সত্য হচ্ছে, মন্দ কর্ম ও পথ থেকে কেউই কাউকে রক্ষা করতে পারে না। নিজেকে নিজের রক্ষা করতে হয়।

আল্লাহ প্রত্যেকের ভেতরে বিরাজ করেন। তিনি মানুষকে তার নিয়তের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যান। ভেতর থেকে প্রেরণা সৃষ্টি করেন। মানুষ যখন অন্তরের ইচ্ছের পথ ধরে চলে তখন সে তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। ফলে নিয়তের পথে সে সফল হতে পারে। অতএব নিজ প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলা হয়েছে, কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে। নিজের চেষ্টা থাকতে হবে।

কোরআনের পথ-নির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে হলে মন্দ কর্ম ও পথ পরিহার করে চলার বা ভাল পথে চলার একটি আন্তরিক বাসনা নিজের মধ্যে থাকতে হবে। মানসিক অবস্থার মধ্যে সে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। এটি একটি প্রস্তুতিমূলক কাজ যা সর্বপ্রথমে করতে হয় বা হবে।

কোরআন একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীকে ভাল পথে নিয়ে যায়। সেভাবে সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত বা সাঁজানো। ফলে নিজ থেকে যার ভাল পথে চলার ইচ্ছে থাকে সে সুফল লাভ করবে। কেননা সে নির্দেশনা মেনে চলবে। যার নিজের ইচ্ছে নেই সে নির্দেশনা পালন করবে না। স্বাভাবতই ফল লাভ হবে না।

কোরআনের দিক-নির্দেশনা ভাল পথে চলার ক্ষেত্রে একটি উছিলা হয়েও কাজ করে। কোন সঙ্গ বিপথে নিয়ে যেতে চাইলে সে পথ থেকে ফিরে আসার জন্য কোরআন ও তার নির্দেশনা উছিলা হয়ে কাজ করে। কোরআনের নির্দেশনার কারণে সঙ্গদোষ থেকে ফিরে আসার পথ সহজ হয়। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে ভাল পথে চলার জন্য এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে কাজ করে।

▪ **২.৩.১** (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য) যারা না দেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে : কোরআনের পথ-নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে কার্যকর ফল পেতে হলে সর্বপ্রথম মন্দ কর্ম বা পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলার নিজের ভেতরে একটি ইচ্ছে থাকতে হবে, কিংবা জাগ্রত করে নিতে হবে। ওপরে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য অর্জনে আরও যেসব শর্ত পালন করা বাঞ্ছনীয় তার অন্যতম হচ্ছে কিছু না দেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখা। যে কোন প্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে যা মেনে নিতে হবে বা বিশ্বাস করতে হবে। এখানে যুক্তি আরোপের কোন অবকাশ নেই। কেননা এমনই শর্ত।

এর পেছনের রহস্য তিনি জানেন যিনি তা নির্দেশ করেছেন। অনুসারীগণের তা জানা বা বোঝার খুব একটা প্রয়োজন নেই। তবে জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে কেউ যদি সেসব অনুধাবনে সক্ষম হয় সেটি ভাল। কিন্তু যে তা করতে পারবে না তাকে কেবল বিশ্বাস রাখতে হবে। সে সুফল পাবে। বিষয়টি সূত্রের মতো। সূত্রে ফেলে দিলে অংক হয়ে যাবে। কিন্তু অনেকেই জানবে না যে সূত্রটি কেন ও কিভাবে এল।

না দেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখার মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। মনস্তত্বও এক বিজ্ঞান যার সবকিছুই অতি সূক্ষ্ম সূত্র মেনে চলে। সর্বত্র সত্য বা

সূত্রের ছড়াছড়ি। কোথাও কোন অতিপ্রাকৃত বিষয় নেই। তবে কেউ যদি নিজ জ্ঞানে অতিপ্রাকৃত কিছু ভেবে নিয়ে হলেও কোরআনের নির্দেশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয় তবে ক্ষতি কি? উদ্দেশ্য অর্জনই তো উদ্দেশ্য। লক্ষ্য অর্জনই তো লক্ষ্য।

কোরআনে প্রদত্ত প্রতিটি শর্ত ও দিক-নির্দেশনা একটির সাথে অপরটি কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা। একটি অপরটির পরিপূরক। একটির পরিপালন অপরটির প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আবার একটির অভাব অপরটির কার্যকারীতাকে ক্ষুণ্ণ করে। যেমন না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন প্রথমেই অন্তরে কিছু ভয় ও আশার সঞ্চার করে। যা কোরআন প্রদত্ত সকল নির্দেশনা পরিপালন করা বা না করার পরিণতিকে ভিত্তি দান করে এবং বিষয়গুলিকে সচল করে তোলে। না দেখা বিষয়সমুহে বিশ্বাসের কারণে অপরাপর সকল নির্দেশনা পরিপালিত হয়। তবে বিশ্বাসের বিষয়সমুহ নিয়ে অতি বিশ্লেষণ কখনও এর কার্যকারীতাকেও ক্ষুন্ন করে।

রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দিলে চ্যানেল পরিবর্তন হবে। প্রথম দিন তার সত্যাসত্য বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকলেও সেটি বিশ্বাস করে চাপ দিতে হয়েছে। কেন চ্যানেল পরিবর্তন হল সেটি সকলে জানবে না বা সকলের জানার আগ্রহ থাকবে না। অনেকে আবার জানার প্রয়োজন বোধ করবে না। কেউ কেউ চাইলেও জানতে পারবে না।

সত্য হচ্ছে, না দেখা অনেক বিষয় আছে যা পেছনে ক্রিয়া করে। ক্রিয়া করে বিধায় কাজ সম্পন্ন হয়। জগতে কেবল মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্যাল বিষয়সমুহই বিদ্যমান নয়; এখানে আরও অনেক অনেক বিষয় আছে যেগুলি কাজ করে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কোরআনের বিষয়াবলীর মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অনেক এবং সেটিও এক বিজ্ঞান।

কোরআনের দর্শন অনুযায়ী না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস রাখার অর্থ হচ্ছে, মানুষ যা দেখতে পায় না অথচ কোরআন যেসবের বিদ্যমানতার ঘোষনা দিচ্ছে তার ওপর বিশ্বাস রাখা। যেমন আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করার কথা বলা হয়েছে। ঠিক যেমন সন্তানের পিতাকেও একজনের কথার ওপর বিশ্বাস রেখে বিশ্বাস করতে হয়। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে কোরআন বিশ্বাস করবে। যে কোরআন বিশ্বাস করবে সে তার বক্তব্য বিশ্বাস করবে। অতএব

কোরআন যেসব না দেখা বিষয়সমুহে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছে, যে তাতে বিশ্বাস রাখতে পারবে না বিশ্বাসের পরীক্ষায় সে সেখানেই অনুত্তীর্ণ। সে পথ-নির্দেশনা থেকে কোন ফল লাভ করতে পারবে না। আল্লাহর ওপর তার আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপিত হয়নি। এটি বিশ্বাসের একটি পরীক্ষাও। কোরআনে প্রদত্ত শর্তগুলি কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসীদের চিহ্নিতকরণে নির্ণায়ক, সহায়ক বা নির্ধারক হয়েও কাজ করে।

কোরআনে প্রদত্ত শর্তসমূহ বিশ্বাসীর বিশ্বাসের মাত্রাকে উচ্চে উন্নীত করার একটি পন্থারূপেও দেখা যেতে পারে। কোরআন নির্দেশিত বিষয়াবলীর যথার্থ পরিপালনের একটি মানসিক প্রস্তুতিরূপেও এটিকে দেখা যেতে পারে। আবার না দেখা বিষয়গুলি আল্লাহর সার্বিক ব্যাবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয়রূপেও দেখা যেতে পারে।

শর্তরূপে যেসব না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে সেসবের মধ্যে আছে- আল্লাহতে বিশ্বাস, ফেরেশতাগনে বিশ্বাস, অবতীর্ণ বাণী আল্লাহ প্রদত্ত তাতে বিশ্বাস, আল্লাহর বার্তাবাহকগণে বিশ্বাস, বিচার দিবসে বিশ্বাস, পুনরুত্থানে বিশ্বাস, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস ইত্যাদি। যা পরবর্তী আয়াতসমুহে বিধৃত হয়েছে।

না দেখা বিষয়ে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ পোষন করা যাবে না। সন্দেহ বিশ্বাসের ভিত্তিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে পথ-নির্দেশনা কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসী নিজেকে দৃঢ়তার সাথে দর্শনের প্রতিষ্ঠিত রূপরেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে অপারগ হয়ে যাবে। দর্শনের পথ অনুসরণের মাধ্যমে সে যা অর্জন করতে চাচ্ছে তাতে সফল হবে না। বস্তুত সম্পূর্ণ কাজটি বা অর্জনটি ঘুরে-ফিরে মানুষের নিজেকে করতে হয়। কিন্তু যিনি স্রষ্টা তিনি জানেন তাকে কিভাবে চালাতে হবে। তাই দিক-নির্দেশনা।

কোরআনের পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনায় না দেখা বিষয়গুলির ওপর বিশ্বাসের বড় ভূমিকা আছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা রূপরেখার এসব শর্তে বিশ্বাসের যথাযথ ভূমিকার ওপর কোরআন নির্দেশিত পথের তথা মানব জীবনের সফলতা লাভ নির্ভর করে [সফলতা দ্রষ্টব্য ২.৩.২, ২.৫]।

অন্তর যার পথ প্রদর্শনকারী প্রদত্ত শর্তে বিশ্বাসী নয় এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, তার অন্তর পথ প্রদর্শনকারী প্রদর্শিত পথের বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ নয়ত বিদ্রোহী [অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.১৬৬, ২.২৬৪.৩]। ফলে শর্ত

মানা না মানা বা শর্তে বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী দিয়েই মানুষকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় যে কাদের ওপর কোরআনের পথ-নির্দেশনা কার্যকর হবে এবং কাদের ওপর কার্যকর হবে না।

শুধু কোরআনেই নয় এমন কি গীতায়েও সন্দেহপ্রবণ, অবিশ্বাসী বা বিদ্রোহী অন্তর সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে,

"এই ধর্ম বা দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যাক্তিরা আমাকে না পেয়ে মৃত্যুময় জগত সংসারেই কেবল পরিভ্রমন করতে থাকে।" (গীতা ৯:৩)

যে অবিশ্বাসী তার ওপর কোন পথই কার্যকর হবে না। বস্তুত সকল কাজ মানুষের নিজেকেই সম্পন্ন করতে হয়। কেউ এসে কারও কাজ করে দিয়ে যায় না। যে নিজে অবিশ্বাসী বা বিরুদ্ধবাদী সে প্রদর্শিত পথে চলবে না। প্রদর্শিত পথের নির্দেশনাও সে পালন করবে না। ফলে এ পথ তার ওপর কার্যকর প্রভাব রাখতে পারবে না। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"অজ্ঞ, বিশ্বাসহীন ও সন্দেহপ্রবণ ব্যাক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। না ইহলোকে, না পরলোকে তাদের সুখ আছে।" (গীতা ৪:৪০)

তাই বলা হয়েছে, "অজ্ঞতার কারণে তোমার হৃদয়ে যে সন্দেহ বা সংশয়ের আবির্ভাব হয়েছে, জ্ঞান নামক অস্ত্র দ্বারা তাকে ছিন্ন কর।" (গীতা ৪:৪২)

বস্তুত কোন ধর্ম, পথ বা দর্শন কাজ করে না। কাজ করে প্রকৃতপক্ষে মানুষ। মানুষের নিজেকেই নিজ থেকে পথ ধরে চলতে হয়। পথ কেবলি একটি রূপরেখা মাত্র যার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। যে নিজে চলে না প্রদর্শিত নির্দিষ্ট কোন পথ তাকে চালাতে পারে না। হয়তবা তেমন একজন অন্য কোন পথে ভাল চলতে পারবে। আবার এমনও হতে পারে যে সে এ পথটিকে চিনতে, জানতে বা বুঝতে পারলে এ পথে আরও ভাল চলতে পারত। তাই পথসমুহের তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করে পথ বেছে নেয়া উত্তম ও বাঞ্ছনীয়। যেন সকলেই সত্য ও সঠিক পথটিকে খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু যাদের নিজ বিশ্বাসের যৌক্তিকতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে তারা এ পর্যালোচনায় যাবে না বা যেতে ভয় পাবে। তারা বিশ্বাসেই অন্ধ থাকতে চায়।

মন থেকে যে শর্তসমুহ গ্রহণ করে নিতে পারবে তার জন্য পথ ধরে চলা সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ মন থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে না

যদি না জ্ঞান বিষয়টির যথার্থতা বোঝাতে সক্ষম হয়। জ্ঞান যদি একবার বিষয়টি বোঝাতে পারে তবে সে সে পথে চলবেই। তখন কেবল সন্দেহ দুরীভূত হবে তাই-ই নয়, সে এটিও বুঝতে পারবে যে এর চেয়ে উত্তম কোন পথ নেই।

জ্ঞান আপনা থেকে এসে কিছু বুঝিয়ে দিয়ে যাবে না। সেখানেও মানুষের নিজেকে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের নিজেকেই কাজ করতে হবে। দৈবক্রমে ব্যাতিত কোন কিছুই আপনা থেকে হবে না যা সকল ক্ষেত্রে ঘটে না। তাই নিজেকে চেষ্টা করতে হবে।

জ্ঞান দ্বারা কোরআনকে বুঝতে ও অন্তর থেকে এ বিষয়ে সন্দেহ দুরীভূত করতে হলে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে এবং সঠিকভাবে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে কোরআন প্রকৃতপক্ষে কি বোঝাতে চেয়েছে সেটি অনুধাবন করতে হবে। এ গ্রন্থে যথাস্থানে প্রতিটি বিষয় সে আলোকে আলোচনা করা হবে।

মনের সংকীর্ণতা ও সন্দেহ দুর করে, পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হলে এ পথ-নির্দেশনা থেকে উপকার পাওয়া যাবে। তখন মানুষ নিজেই দিক-নির্দেশনা মেনে চলবে। নির্দেশনা মেনে চললে তা সফলতার মুখ দেখবে। কোরআনের দিক-নির্দেশনা উত্তম পথ প্রদর্শন করে। প্রতিটি ব্যাক্তির সে পথ-নির্দেশনা নিজের মেনে চলার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেই উত্তম কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

কোরআনে প্রদর্শিত পথ-নির্দেশনায় যে সকল দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তাকে ধরে রাখার ভিত্তি এই না দেখা বিষয়সমুহের সাথে সম্পর্কিত। আবার সেসব নির্দেশনাকে গ্রাহ্য করা বা অগ্রাহ্য করার কারণে যে ফলাফল প্রাপ্তি তার সাথেও এ না দেখা বিষয়সমুহের সম্পর্ক আছে। ফলে এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কোরআনের দর্শনের সকল কর্মকান্ডের ওপর এই না দেখা বিষয়সমুহের প্রবল প্রভাব রয়েছে।

■ **২.৩.২** এবং (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য) যারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে : না দেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস আনার পাশাপাশি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে [উপাসনা দ্রষ্টব্য ১.৪.১, ২.২১.১, ২.২১.২, ২.২৯.৩, ২.৩০, ২.৪৩, ২.১২৮.৩]। কোরআন শুধু পথ প্রদর্শন করে নাই

বা কেবল রূপরেখা দ্বার করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যায় নাই। সে রূপরেখা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তারও পথ বাৎলে দিয়েছে।

কোরআন প্রদর্শিত পথের বাস্তবায়নের সফলতা নিয়মিত উপাসনা পালনের ওপর ভীষনভাবে নির্ভর করে। এ একটি কাজ মানুষকে তার বিশ্বাসজনিত পথে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। তাই বলা হয়েছে, কোরআন তাদেরকেই পথ প্রদর্শন করে যারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে।

কোন একজন ব্যাক্তি পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করছে কি করছে না, তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হচ্ছে নির্দেশিত উপাসনাকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। যে নিয়মিত উপাসনা পালন করবে সে কোরআন নির্দেশিত সব শর্তে বিশ্বাস স্থাপন করার পরেই তা করবে। কেননা এতে যে শারীরিক, মানসিক, ধৈর্য্য ও সময়ের উৎসর্গ সাধন করতে হয় সে সেটি করতে প্রস্তুত। সে প্রকৃত বিশ্বাসী। সে নির্দেশনাও পালন করবে। বলা যেতে পারে যে সে অন্তর থেকে নিজেকে এ পথে চলতে প্রস্তুত করে চলেছে বা করেছে।

আল্লাহর নির্দেশনা পালন বা বাস্তবায়নের পথে উপাসনা একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে কাজ করে। উপাসনার নিয়মিত পরিপালন 'না দেখা' বিষয়সমুহে বিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করে। এটি বিধাতার সঙ্গে মানবের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কই দর্শনের অনুসারী বা বিশ্বাসীকে দিয়ে আল্লাহর নির্দেশনার বাস্তবায়ন ঘটায়। উপরন্তু বিধাতার প্রতি অনুরক্ত হৃদয়কে দেয় অকল্পনীয় প্রশান্তি। উপাসনার গুরুত্ব অনুধাবনের সুবিধার্থে গীতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। বলা হচ্ছে,

"গভীর বিশ্বাস সহকারে যে সর্বদা আমাতেই মগ্ন, ভক্তি সহকারে যে আমার উপাসনা করে, .. সেই আমার সঙ্গে সর্বাধিক যুক্ত।" (গীতা ৬:৪৭)

"মহাত্মাগণ আমাকে সকল সৃষ্টির কারণ অব্যয়-অক্ষয় জেনে অনন্যমনা হয়ে আমার উপাসনা করে। এইসকল ভক্তরা দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে নিরন্তর আমার গুণ-কীর্তন করে এবং ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।" (গীতা ৯:১৩-১৪)

"আমি সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ। আমা হতে সবকিছু উদ্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যে এটি অবগত, সে ভক্তি সহকারে যথাযথভাবে আমার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে এবং অন্তর দিয়ে আমার উপাসনা করে।

যারা নিয়ত ভক্ত এবং ভালবাসার সাথে আমার উপাসনা করে, তাদেরকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করি যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করে। তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের হৃদয়ে বাস করে জ্ঞানের আলো দ্বারা আমি তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দুর করি।" (গীতা ১০:৮-১১)

"ভক্তি সহকারে যে আমার উপাসনা করে সে আমাতে এবং আমিও তার হৃদয়ে তার সাথে বাস করি।" (গীতা ৯:২৯)

কিছু মানুষ কেবল সামাজিকতা রক্ষা করার জন্য উপাসনা পালন করে। তারা উপাসনা সম্পর্কিত ওপরে উদ্ধৃত ধারণাসমুহের আওতার মধ্যে পরে না। তবে অনেক সময় এভাবে পালন করতে গিয়েও অনেকের অন্তরে ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপলব্ধি আসতে পারে। ফলে এটিও একেবারে নিরর্থক নয়।

উপাসনা নিয়মিতভাবে পালন করতে হয়। এটি দর্শনের বিষয়গুলির সঙ্গে বিশ্বাসীকে সার্বক্ষণিক জড়িয়ে রাখে। উপাসনা মুখ নিঃসৃত বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে অন্তরে গ্রথিতকরণে ভূমিকা রাখে। উপাসনার মাধ্যমে আমরা আসলে কি করি? উপাসনার মাধ্যমে আমরা প্রধানত আল্লাহকে স্মরণ করি। বলা হচ্ছে,

"... আমার স্মরণার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর।" (আল-কোরআন ২০:১৪)

"সর্বদা আমাকে স্মরণ কর- আমাতে চিত্ত অর্পন কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার উপাসনা এবং আমার প্রতি তোমার আনুগত্য, শ্রদ্ধা, সন্মান প্রদর্শন কর। এইভাবে তুমি নিশ্চিতভাবে আমাকে প্রাপ্ত হবে।" (গীতা ১৮:৬৫)

সৃষ্টিকর্তাকে অন্তরে যে কেউ প্রতিক্ষণে স্মরণ করতে পারে। কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই। তাঁকে স্মরণ করার বিষয়টি ব্যাক্তির একান্তই ঐচ্ছিক বিষয়। কিন্তু নিয়মমাফিক উপাসনা পালন করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এটি পালন করতে হয়। এখানে কোন প্রকার ছাড় নেই। এখান থেকে সামান্য সময়ের বিচ্যুতি চিরদিনের জন্য পথ থেকে বিচ্যুতির কারণ হতে

পারে। এটিকে তাই সর্বদা আপোষহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে বা ধরে রাখতে হয়। তাই বলা হয়েছে,

"... নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা সম্পন্ন করতে বিশ্বাসীরা নির্দেশিত হয়েছে।" (আল-কোরআন ৪:১০৩)

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা নিয়মিত উপাসনা পালন করা এমন একটি প্রাত্যহিক করণীয় কাজ, যা মানুষকে তার বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়গুলিকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ স্মরণ বিশ্বাসীকে কোরআনের সকল নির্দেশনাগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দ পথ থেকে রক্ষায় সহায়তা করে। সুন্দরের পথে বিকশিত হতে সহায়তা করে। কেননা কোরআন তেমন পথই নির্দেশ করে। প্রাতিষ্ঠানিক উপাসনা ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীকে একটি শৃংখলার মধ্যে ধরে রাখে।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তাকে সর্বদা অন্তরে স্মরণে রাখা বা স্মরণ করা। কেননা এ একটি বিষয় দর্শন প্রদত্ত শিক্ষার অপরাপর সকল বিষয়াবলীকে সার্বক্ষণিক উদ্দীপ্ত করে রাখে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ তাই পরিপূর্ণ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে কাজ করে এবং উপাসনা সেটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে। বলা হচ্ছে,

"... নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, তবে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

এই একটি কেন্দ্রবিন্দুকে অর্থাৎ আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা সম্ভব হলে দর্শনের সকল বিষয় স্মরণের মধ্যে বিরাজ করে। নিয়মিত উপাসনা পালন করা দর্শন নির্দেশিত বিষয়াবলীকে মানুষের অভ্যাসের সঙ্গেও একীভূত করে দেয়। যখন মানুষ তেমন পর্যায়ে উন্নিত হয় তখন এর থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি বিশ্বাসীকে দৈহিক পেরিয়ে মানসিকভাবেও যন্ত্রনা দেয়। সত্যিকার বিশ্বাসী ভিন্ন এ যন্ত্রনা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। ফলে এটি বিশ্বাসীকে সম্ভাব্য বিচ্যুতি থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এটি স্বয়ংক্রীয় যন্ত্রের মতো কাজ করে। যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীকে তার দর্শনের দেখান পথে মজবুত রাখে। দর্শনের পথে কঠিনভাবে মানুষকে জুড়ে রাখার

ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এর অব্যাহত চর্চা মানুষকে আপনা থেকে দর্শনের দেখান পথে টেনে নিয়ে যায়।

বিশ্বাসীর জন্য সফলতা কেবল ইহকালের সফলতা নয় [সফলতা দ্রষ্টব্য ২.৩.১]। ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনের সফলতাকে বিশ্বাসী সফলতা বলে জানে। কেননা সে কিছু অদৃশ্যের শর্তে বিশ্বাস করে। যেমন সে পরকালে বিশ্বাস করে। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করা বিশ্বাসীর জন্য সফলতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের জন্য উপাসনা তথা সৃষ্টিকর্তার স্মরণ সর্বোত্তম পন্থা। তাই সকল ধর্মেই এর শক্তিশালী উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়।

বস্তুত জগতের সর্বত্র একইজনের একই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। তবে স্থান-কাল ও পাত্রের ভিন্নতার কারণে সে নিয়মের মধ্যে যেমন কিছু ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কিছু বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।" (আল-কোরআন ৬২:১০)

"অনন্যচিত্তে যে চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে তার কাছে আমি সহজলভ্য।" (গীতা ৮:১৪)

"আমাতে মনোনিবেশ কর। আমার প্রতি ভক্তিপ্রবণ হও। আমার উপাসনা কর। আমার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পন কর। পরিপূর্ণভাবে আমাতে নিবিষ্ট হলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।" (গীতা ৯:৩৪)

ইসলাম ধর্মে উপাসনা পালনের নির্দেশনা যখন এসেছে তখন এটি আজকের মতো এত বিস্তৃত পরিসরে জগতব্যাপী প্রতিষ্ঠা পায়নি। এটিকে জগতব্যাপি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ একটি নিয়ম মেনে জগতের সকলেই এটি পালন করবে। আজ যখন বিশ্বব্যাপি অসংখ্য মানুষ এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপের আওতার মধ্যে চলে এসেছে অর্থাৎ মানবসমাজে এটি যথাযথভাবে স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তখন এর যথাযথ পরিপালনই একে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পরে।

এক অর্থে জগতের ভাল সব কাজই উপাসনার পর্যায়ে পরে। কেননা মানুষ যথাযথতার সাথে নিজ নিজ কর্ম সম্পন্ন করার মাধ্যমেও আল্লাহরই উপাসনা করে। তাই উপাসনার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের নির্দেশনা সকল কাজের

প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের নির্দেশনা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠককে বিষয়টি স্মরণ রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কেননা পরবর্তীতেও এ ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত আরও আলোচনা আসতে পারে।

▪ **২.৩.৩** এবং (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য যারা) আমি যে জীবনোপকরণ প্রদান করি তা থেকে ব্যায় করে : আল্লাহই মানুষকে জীবন ধারণের সকল উপকরণ সরবরাহ করেন। তিনি সেখান থেকে ব্যায় করার জন্য মানুষকে নির্দেশনা দিয়েছেন। যারা তাঁর সে নির্দেশনা মেনে চলবে তাদেরকেই তিনি পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুত তারাই বিশ্বাসী। তারা প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা প্রদর্শিত পথ থেকে ফল প্রাপ্ত হয়। তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, ব্যায় বিষয়টির সাথে অর্থের সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থনীতি মানব জীবনের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে অনেক অনর্থের মূল। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিধাতার প্রেরণার পর অর্থনৈতিক প্রেরণাই মানবজীবনকে পরিচালনা করে। এটি শরীরে রক্তের প্রবাহ কিংবা অক্সিজেন সরবরাহের মতো কাজ করে। বাস্তব জীবনে মানুষের সকল কর্মকান্ড প্রধানত এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। যেহেতু বিষয়টি নিয়ে অন্য কোথাও সেভাবে আলোচনা করার সুযোগ নাও হতে পারে, তাই এ পর্যায়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরতে চাই।

মানুষ উপার্জন করে। কেউ বেশী করে, কেউ কম করে। ফলে দিনে দিনে সমাজে বৈষম্য বাড়তে থাকে। কেননা অর্থ অর্থ আনে। যার অর্থ আছে সে আরও অর্থের মালিক হয়। কিন্তু অর্থ আসবে কোথা থেকে? যাদের সামান্য অর্থ আছে সেটিও আধিক্যের দিকে জমা পড়ে। যার কম আছে সে ধীরে ধীরে শূন্যের কোঠায় চলে যেতে থাকে। এর ফলে সামাজিক জীবনে ভারসাম্য নষ্ট হয়। অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি থেকে শুরু করে অনেক কিছুর পেছনে এ অস্থিরতা দায়ী; এমনকি এ কারণে পরিশেষে সামাজিক বিপ্লব পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারে।

অর্থনীতির স্বাভাবিকতা হচ্ছে ‘মুক্ত অর্থনীতি’। কেননা এটিই একমাত্র পদ্ধতি যেটি মানুষকে স্বাভাবিকভাবে টানে। অনুপ্রাণীত করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সচল

রাখে। অন্য যে কোন পদ্ধতি স্বাভাবিক নয়। সেগুলিকে কোন নিয়ম আরোপকরণের মধ্য দিয়ে বা বলা যায় চাপ প্রয়োগ করে সচল রাখতে হয়।

যেখানে মানুষের নিজের লাভের সম্ভাবনা আছে, যেখানে কর্মঠ ও যোগ্য মানুষের অধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, লোভ যেখানে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে টেনে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগীতা আছে, যেখানে উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আছে, যেখানে সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজন আছে- সেটিই মানুষের চলার পথের স্বাভাবিক গতি। 'মুক্ত অর্থনীতি' তাই করে। জীবনে গতির সঞ্চার করে।

মুক্ত অর্থনীতির কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। মন্দ দিক আছে। মানুষকে বেছে নিতে হবে যে সে মানব মনের স্বাভাবিক ইচ্ছে ও উচ্ছাসকে প্রাধান্য দিয়ে তার অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করবে, নাকি অন্তরের ইচ্ছের ওপর চাপ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে সমতার নীতি গ্রহণ করবে। যা প্রাণের উচ্ছাস ও চাঞ্চল্যকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করে।

দু'টি পদ্ধতিরই ভাল ও মন্দ দিক আছে। তবে স্বাভাবিকত্বের দিকেই সকল প্রকৃতি টানে। তাই 'মুক্ত অর্থনীতি'কে বেছে নিলেও কোন নিয়মের মধ্য দিয়ে তার মন্দ দিকগুলিকে বশে রেখে অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

প্রতিযোগীতামূলক মুক্ত অর্থনীতিতে যোগ্য ব্যাক্তি অধিক অর্জন করে। যদিও যোগ্য শব্দটির বিষয়ে এক্ষেত্রে কিছু বিতর্ক আছে। জীবনে সকলে অনৈতিক পথ অবলম্বন করে যোগ্য হতেও চায় না। অর্থনীতিতে একজনের অধিক 'অর্জন' এর অর্থ হচ্ছে অপরের 'ঘাটতি'। অর্থাৎ যেখানে একটি 'ডেবিট' আছে সেখানে একটি 'ক্রেডিট'ও আছে। কোনদিকে অতিরিক্ত অর্থ পূঞ্জিভূত হলে অসম অবস্থার সৃষ্টি হয়। সমাজে বৈষম্য ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়। এটিই হচ্ছে মুক্ত অর্থনীতির মন্দ দিক বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। কোরআনের দিক-নির্দেশনা হচ্ছে,

"ধনৈশ্বর্য্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পূঁঞ্জীভূত না হয়।" (আল-কোরআন ৫৯:৭)

সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই কিছু একটা উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এমন উপায় যা অর্থের মালিকদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে

না, তাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না, তাদের উদ্যেক্তা হওয়ার ইচ্ছেকে অবদমিত করবে না; অপরদিকে দরীদ্রকে এমনভাবে সহায়তা করবে যেন সে নিঃস্ব হয়ে না যায়, ভিক্ষাবৃত্তিতে চলে যেতে বাধ্য না হয় এবং নিজের পায়ে দাড়াবার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়।

ওপরোক্ত উদ্দেশ্যসমুহ অর্জনে ‘যাকাত’ এর বিধান হচ্ছে তেমনই একটি উপায় (দ্রষ্টব্য ২.৩.৩)। যাকাত মুক্ত অর্থনীতিকে সমর্থন করে। আবার তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াকেও সহনশীল মাত্রায় রাখার উপায় প্রদর্শন করে। এ ব্যাবস্থা সম্পদশালীদের অসন্তুষ্ট করে না আবার অভাবগ্রস্তকেও তুষ্ট করে। এ বিধান অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা। এটি এমন এক অর্থনীতিকে সমর্থন করে যা মানবের স্বাভাবিক ইচ্ছে ও প্রত্যাশার মুক্ত অর্থনৈতিক জীবন ব্যাবস্থাকে চলমান রাখে, আবার এর মন্দ দিকগুলির রাশ টেনে ধরার চেষ্টা অব্যাহত রাখে ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় রত থাকে।

উল্লেখ্য যে, যাকাত অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য। এটি ভিক্ষে নয়। এটি দরীদ্রদের অধিকার। এ অংশ সম্পদের মালিক নিজেও ভোগ করতে পারবে না। সেটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এ অংশটুকু বস্তুত সম্পদের কথিত মালিকেরও নয়। এ অংশটুকু হচ্ছে আল্লাহর, যিনি সকলের জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত এ অংশ কাউকেই দেয়া যাবে না। এটি আল্লাহর জন্যই ব্যায় করতে হবে। কিন্তু মানুষ আল্লাহকে দেবে কিভাবে? আল্লাহকে পাবে কোথায়?

আল্লাহকে মানুষের মাঝে পাওয়া যাবে। জীবন ও জগতের মাঝেই পাওয়া যাবে। তাই তাঁর নির্দেশিত পথেই ব্যায় করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশনা হচ্ছে যাকাত প্রদান করতে হবে। দান করতে হবে। দুঃস্থ-মানবতার সেবায় তথা মানব কল্যাণে ব্যায় করতে হবে। জীবন ও জগতের সার্বিক উন্নয়নে ব্যায় করতে হবে। এগুলিই আল্লাহর পথে ব্যায় [আল্লাহর পথে ব্যায় দ্রষ্টব্য ২.১৯৫, ২.২৫৪.১, ২.২৫৪.২, ২.২৬১.১]।

মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয়ে অভাবে পতিত হয়, সে তখন তার অভাব দুর করে দেয়ার জন্য মনে মনে আল্লাহর দ্বারস্ত হয়। কামনা করে কেউ যদি তার

সাহায্যে এগিয়ে আসতো! অথচ সুখের সময় সে নিজেও দুঃস্থদেরকে ভূলে যায়। এমনই মানুষের চরিত্র। তাই আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

"মানুষ এমন যে, যখনই তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন সন্মান ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সন্মানিত করেছেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে দম্ভ প্রদর্শন করে। কিন্তু যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন তার জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংকুচিত করার মাধ্যমে তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, অকৃতজ্ঞ হয়ে বিমুখ হয়ে যায়।

না, বরং তোমরাই তোমাদের দিক থেকে ইয়াতীমকে সন্মান কর না এবং অভাবগ্রস্থকে অন্ন দানে পরস্পরকে উৎসাহীত কর না।" (আল-কোরআন ৮৯:১৫-১৮)

মানুষকে সন্মান দিতে জানতে হবে। অভাবগ্রস্তের কষ্টও অনুভব করতে হবে। কেবল মুখে বললেই হবে না। আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে তার প্রমাণও দিতে হবে। এগুলিই পরীক্ষা।

পেটে এক বেলা খাবারের মজুত শেষ হয়ে গেলে মানুষ অস্থির হয়ে যায়। যাদের দিনের পর দিন তেমনিভাবে থাকতে হয় তাদের জ্বালা বোঝার দায়িত্ব আছে সকল মানুষের। আর মানুষের তো কেবল খাবারেরই প্রয়োজন হয় না; আরও কতকিছুর প্রয়োজন আছে!

সবার সব দিন প্রজন্মান্তরে এক রকম যাবে না। আজ যার আছে গতকাল তার ছিল না, আবার আগামী দিন তার নাও থাকতে পারে। তাই বলা হয়েছে,

"তারা কি দেখে না যে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছে জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই! এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।" (আল-কোরআন ৩০:৩৭)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তার জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দেন, আবার সংকুচিতও করেন। মানুষের চোখের সামনে এমনি অসংখ্য উদাহরণ আছে। ফকির বাদশাহ হয়েছে বাদশাহ ফকির হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

"... কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে ..." (আল-কোরআন ৩১:৩৪)

গরীব আত্নীয়-স্বজন থেকে শুরু করে অভাবগ্রস্থ ও মূসাফিরদেরকে তাদের হক অর্থাৎ প্রাপ্য অংশ বা যাকাত প্রদান করার নির্দেশনা রয়েছে আল্লাহর। যাকাত দেয়া তাই সকল মানুষের কর্তব্য। বলা হচ্ছে,

"আত্নীয়-স্বজনকে তাদের হক তথা প্রাপ্য অংশ যাকাত প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মূসাফিরকেও এবং সম্পদ অপব্যায় কর না।" (আল-কোরআন ১৭:২৬)

আত্নীয়-স্বজনের দিকে যদি কেউ ফিরে না তাকায় তবে জাগতিক সম্পর্কগুলির কোন মূল্য থাকে না। কেবলমাত্র কারও বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্য সম্পর্ক ধরে রাখা একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।

সত্য হচ্ছে দুঃস্থদের দুর্দশা দীর্ঘায়িত হলে সমাজে তার নানান কুফল পড়ে। সমাজে শান্তি বিনষ্ট হয়। উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্দশাগ্রস্তদের দুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে দেয়া অন্যায় ও ক্ষতির কারণ হয়।

মানুষ যেন একের সাহায্যে অপরে এগিয়ে আসে তাই গুরুত্ব বিবেচনায় কোরআনের দর্শন যাকাতকে যথার্থই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং অবশ্য পালনীয় করেছে। কেননা কর ফাঁকি দিতে চাইলেও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ধর্ম পালন করতে অনেকেই ইচ্ছুক থাকে। যদিও কিছু মানুষ নিজেকে প্রদর্শনের জন্যও যাকাত দানে উৎসাহী থাকে। আবার কেউ পরকালের অধিক প্রাপ্তির আশায়েও যাকাত দিতে উৎসাহী হয়।

যাকাত দেয়া আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা যা অবশ্য পালনীয়। ইসলামের দর্শনের পাঁচটি মূল স্তম্ভের এটি একটি। যিনি সকল জীবের জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন নির্দেশনা প্রদানের একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁরই। তিনিই এটিকে বাধ্যতামূলক করেছেন। বলা হচ্ছে,

"অবশ্যই সমস্ত সৃষ্টি ও নির্দেশনা তাঁরই। আল্লাহ মহিমাময়, যিনি জগতসমুহের প্রতিপালক।" (আল-কোরআন ৭:৫৪)

যে আল্লাহ জগতের সকলকে আলো, বাতাস, পানি, আহার্য্য থেকে শুরু করে জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছু অফুরন্ত দান করেছেন; তিনিই

কোরআনের মাধ্যমে সম্পদশালীদেরকে নির্দেশ করছেন অভাবগ্রস্তদের জন্য তাদের অর্থ-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যায় করতে। বলা হচ্ছে,

"বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপাসনা ও অভাবগ্রস্থদের তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করা ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যই গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় (অর্থাৎ ইহুদি-খ্রীষ্টান যারা পূর্বে ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে তথা মানবসম্প্রদায়) আদিষ্ট হয় নাই। এটিই প্রকৃত ধর্ম।" (আল-কোরআন ৯৮:৫)

ধর্মের কাজ কি? ধর্মের কাজ হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও তা বজায় রাখা। সেটি যেমন ব্যাক্তির অন্তরকে শান্ত ও সুশৃংখল রাখতে ভূমিকা রাখে, তেমনি জগতকেও শান্ত ও সুশৃংখল রাখতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য জীবন ও জগতকে অশান্ত করে তোলে। ফলে শান্তি আসে না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ধর্মের মূল কাজ। তাই কেবল উপাসনাই নয়, বাস্তব জীবনে শান্তির প্রয়োজনে যাকাত প্রদানও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সত্য হচ্ছে, এগুলিও এবাদতেরই অংশ।

যারা এ কাজগুলি ভালভাবে পালন করবে বা যারা এ কাজে সহায়তা করবে পরবর্তীতে তারা পুরস্কৃত হবে। স্বর্গ লাভ করবে। ভাল কাজের জন্য ভাল ফলাফল প্রাপ্তি। এমনই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

অপরদিকে যারা ভাল কাজে সহায়ক হয়ে এগিয়ে আসবে না, কিংবা ভাল কাজকে বাধাগ্রস্ত করবে ও মন্দ কাজ করবে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এমন বাস্তব, যৌক্তিক ও মৌলিক কারণ ছাড়া মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাবস্থা করা আল্লাহতা'য়ালার আর কোন কারণ নেই।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি বাস্তব ভিত্তি বা কারণও থাকতে হবে। কর্ম সম্পাদনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধন করা। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অতএব ব্যায় করতে হবে মানব কল্যানের কথা বিবেচনা করে।

সমাজ উপকৃত হলে মানুষ নিজেরাই উপকৃত হয়। এটিই ইহকালে ভাল কাজের পুরস্কার। ইহকালে করা ভাল কাজের ফলাফল পরকালেও পুরস্কারস্বরূপ পাওয়া যাবে। এমনই দর্শনের প্রতিশ্রুতি।

অতএব কাজে আন্তরীক হতে হবে। মূল লক্ষ্য অর্জিত হতে হবে। সেদিকেও দৃষ্টি থাকতে হবে। যে কষ্টে আছে তার কষ্ট লাঘব হতে হবে। সমাজ থেকে দারীদ্র দুর হল কি-না, সমাজে নির্যাতন বন্ধ হল কি-না, মানুষের জীবন-যাপন সহজ করা গেল কিনা, ব্যায়িত অর্থ যথাযথভাবে মানুষের উপকারে বা কাজে লাগল কিনা সেসব দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হতে হবে।

পুরস্কার ও শাস্তির বার্তা দিয়ে ভাল কাজ করতে ধর্ম এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের প্রয়োজনেই সেটি করা হয়েছে। এসব নিয়ম, বিধি-বিধান সবই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার স্বার্থে করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে); যারা আল্লাহকে ভয় করে এতে তাদের দেহ শিহরীত হয়, ফলস্বরুপ তাদের দেহ ও মন আল্লাহর সতর্কবার্তায় বিনম্র হয়। এমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করেন।” (আল-কোরআন ৩৯:২৩)

যারা এ দর্শনের যৌক্তিকতায় সহমত হতে পারবে না, নিজেদের অজান্তে বা প্রচ্ছন্নে তারা বিধাতার নিকট থেকে তাদের নিজেদের প্রাপ্তির বিষয়টিকেও অস্বীকার করে। অথচ আলো, বাতাস, পানি থেকে শুরু করে নিজেদের আহারও তারা নিজেরা সৃষ্টি করে না। তারা সেটি ভূলে যায়। এরা অস্বীকারকারী; অকৃতজ্ঞ।

যারা আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে চলে তারাই বিশ্বাসী। তারাই সুপথ প্রাপ্ত। তারাই দিক-নির্দেনা অনুসরণ করে উপকৃত হয়। আল্লাহ তাদেরকেই পথ প্রদর্শন করেন। তাদের কারণেই জীবন ও জগত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এখানে না দেখা বিধাতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষকে তাই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

চিন্তাশীল অন্তর একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে এ দর্শনের বিষয়গুলি ভীষন যৌক্তিকভাবেই পারস্পর সম্পর্কযুক্ত।

অবশ্য পালনীয় যাকাত ছাড়াও এ আলোচনায় দানও অন্তর্ভূক্ত হবে। দানকেও উৎসাহিত করা হয়েছে ভাল কাজ হিসেবে। এর সবই আল্লাহর জন্য বা আল্লাহর পথে ব্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে যদি তা যথাযথ শর্ত পুরণ সাপেক্ষে পালন করা হয়। অর্থাৎ নিজের দম্ভ বা অহমিকা প্রদর্শনের জন্য না করা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের করা দানকে অর্থহীন করে দিও না, সে ব্যাক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না।” (আল-কোরআন ২:২৬৪)

ধর্ম গ্রন্থসমুহে একই সুরে বিধাতা বার্তা প্রেরণ করেছেন। শাব্দিক অর্থ দিয়ে বোঝার কারণে সাধারণ মানুষ ধর্মের মর্ম কথাগুলি বুঝতে ব্যার্থ হয়। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“দান করা কর্তব্য মনে করে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে ... যে দান করা হয় সেটিকে সাত্বিকী বলে (এটিই সত্যিকারের দান)। কিন্তু যে দান কিছু প্রতিদান বা ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ... করা হয় তাকে রাজসিক বলে। অশ্রদ্ধা ও অজ্ঞার সাথে ... যে দান করা হয় তাকে তামসিক বলা হয়।” (গীতা ১৭:২০-২২)

অন্যায় ও অনৈতিকভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে কি আল্লাহর পথে ব্যায় করা যাবে? কিংবা সেটি কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? এ প্রসঙ্গে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোরআন অধ্যায়ন থেকে যে দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অনৈতিক বা অন্যায় উপার্জনকে কোরআন কোনভাবেই স্বীকৃতি দেয় না। বরং কেউ তেমনটি করে থাকলে তাকে সে পথ থেকে ফিরে আসতে উৎসাহিত কর।

অন্যায় উপার্জন থেকে কল্যাণের পথে ব্যায় করা হলে সেটি উপকারের চেয়ে ক্ষতি করে বেশী। এটি অন্যায়করণকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যায়কে প্রাতিষ্ঠানিক শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। মানুষ মনে করে যে অন্যায় করে ভাল কাজ করলেও সেটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। এভাবে সমাজে ভূল বার্তা যায়।

অন্যায়করণ উৎসাহিত হয়। মানুষের মধ্যে অন্যায় প্রতিরোধের স্পৃহাকে এমন ধারণা বিনষ্ট করে দেয়। এভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য অন্যায়ের বিস্তার ঘটে এবং গোটা সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি পারমানবিক বোমাও এত ক্ষতি করতে পারে না একটি অন্যায় কর্মের মন্দ প্রভাব গোটা সমাজকে যেভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ধর্মের মূল লক্ষ্য অর্জনই তাতে ব্যাহত হয়।

উল্লেখ্য যে, অন্যায়ভাবে বা সূক্ষ্ম কারচুপি বা চালাকির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ থেকে প্রদত্ত দান ও যাকাত আদর্শিকভাবে গ্রহণীয় নয়।

তবে আদর্শিক অবস্থানে পৌঁছুবার জন্য হলেও মানুষ কখনও কখনও ওপরে উদ্ধৃত তেমন দান ব্যাবহারে আপাত বাধ্য হয়। বাধ্য হয় কেননা অনিয়মই বর্তমানে সমাজে নিয়মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অন্যথায় অর্থাভাবে ভাল কাজ করা ও এর প্রচার-প্রসার করা দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। অন্যায়ভাবে হলেও কিছু মানুষ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টে পূণ্যকর্মে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করছে। ফলে কিছু ভাল কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

ভাল কাজে দান করা সত্বেও তেমন মানুষের পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি একান্তই আল্লাহর বিবেচনার অধীন। কিন্তু অর্থ যেহেতু কারও নিজের বা ব্যাক্তিক নয় এবং সে অর্থ যেহেতু যে কোন প্রকারে কেউ ছিনিয়ে নিয়েছে, অতএব সে অর্থ ভাল কাজে ব্যায় করা যাবে। অন্যথায় ভাল কাজ করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

ব্যায় করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে কোরআনে সে সম্পর্কেও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হচ্ছে,

"তুমি একেবারে কৃপণ হয়ো না, আবার একেবারে অতি মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।" (আল-কোরআন ১৭:২৯)

"বিশ্বাসীরা যখন ব্যায় করে তারা অপব্যায় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের অবস্থান এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে সুদৃঢ় থাকে।" (আল-কোরআন ২৫:৬৭)

আল্লাহর পথে ব্যায় করার ক্ষেত্রে অপব্যায় কিংবা কৃপনতা কোনটিই করা উচিত নয়। এখানে অর্থ ও সম্পদের সর্বোচ্চ যথাযথ ব্যাবহার করাকে বোঝানো হয়েছে। আবার বলা হয়েছে,

"বল: আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার মাঝে মানুষ উৎফুল্ল থাকুক। কেননা এটি সম্পদ জমা করে রাখার চেয়ে উত্তম।" (আল-কোরআন ১০:৫৮)

অর্থ ও সম্পদ জমা করে রাখাকেও কোরআনের দর্শন নিরুৎসাহিত করেছে। অর্থ ও সম্পদ জমা করে রাখলে সে অর্থ মানব কল্যানে কাজে আসে না। এটি একটি বড় ধরনের অন্যায় বা অপরাধ। কেননা তা বৃহৎ ভাবনায় সামগ্রীক কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে। মানবতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কাজ মানবের বৃহত্তর কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে তা অপরাধের পর্যায়ে পরে। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দান করেছেন, যারা তা জমা করে তারা যেন মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। না এটি তাদের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর। তারা যা জমা করে পুনরুত্থান দিবসে সেটিই তাদের গলায় চিহ্ন হয়ে চিহ্নিতকরণে সহায়তা করবে।" (আল-কোরআন ৩:১৮০)

"তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য আহবান করা হয়েছে, তথাপি তোমাদের কেউ কেউ তা জমা করছে। যে জমা করছে সে মূলত তার নিজের প্রতিই অবিচার করছে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩৮)

"নরক তাকেই ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও পালিয়ে গিয়েছিল এবং সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল ও আগলিয়ে রেখেছিল।" (আল-কোরআন ৭০:১৭-১৮)

অতএব কেবল মৌলিক চাহিদা পুরণার্থেই নয়, সত্যের পথ প্রতিষ্ঠায়, তার প্রচার-প্রসারেও ব্যায় করতে হবে। সে পথে করা ব্যায়ও আল্লাহর পথে ব্যায় বলে বিবেচিত হয়।

যে সময়ে এসব বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখা সম্ভব ছিল। মাটির নিচেও মানুষ মুদ্রা লুকিয়ে রেখেছে। জমাকৃত অর্থ মানব কল্যাণে কাজে আসেনি। বর্তমানে ব্যাংকিং (Banking) ব্যাবস্থার সুবাদে

জমাকৃত বা সঞ্চিত অর্থও কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে। সত্যি বলতে বিজ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষনা সঠিক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]।

যাকাত গরীবের হক বা অধিকার। কিন্তু সম্পদশালী মনে করতে পারে যে আমার অর্জিত সম্পদ আমার। এখানে অন্যের হক আসে কিভাবে? তার অন্তর এটিকে গরীবের হক হিসেবে বিবেচনা করতে নাও চাইতে পারে। তার মনে হতে পারে গরীবের প্রতি সে করুণা করছে।

কিন্তু না। আল্লাহ বলছেন এটি গরীবের হক। এটিই সত্য। এখানে সবকিছুর পেছনে সত্য বা সূত্র কাজ করে। তাই বলা হয় এ জগত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি বা এর পেছনের যুক্তি, কারণ তথা সত্যকে বোঝার বা উদঘাটন করার চেষ্টা করি।

প্রথমত: মানুষের নিজের জীবনটাই তার নিজের না। এমনকি নিজের সৃষ্টিটিও তার নিজের না। কেউ একজন তাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে কেউ চিনি না, জানি না। তিনি আল্লাহ বা তাঁকে আল্লাহ নামে অভিহিত করা হচ্ছে। তিনি আহারের ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন। কেবল ব্যাক্তিক নয়, এখানে জাগতিকভাবে আহারের সংস্থানের বিষয়টিকে বুঝতে হবে। তিনি সবকিছু সরবরাহ করেছেন। এ জীবন কেবল বিধাতা প্রদত্ত সবকিছু ভোগ করে চলেছে। আলো-বাতাস-মাটি-পানি সবই অফুরন্তভাবে ব্যাবহার করে চলেছে বিনিময় ছাড়া। এ কারণেও আল্লাহর নির্দেশনার ভিত্তিতে সম্পদশালীর সম্পদে গরীবের হক আছে। কেননা যিনি সবকিছুর ব্যাবস্থা করেছেন, তাঁকে চিনি কিংবা না চিনি অবশ্যই নির্দেশনা দানের অধিকারী হতে পারেন একমাত্র তিনি-ই। তিনি যেভাবে যা নির্দেশ করেন সে নির্দেশনাতেই কারও হক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু আল্লাহকেই সবকিছুর হর্তাকর্তারূপে দেখা হয়, অতএব আল্লাহর নির্দেশনার কারণেই এটি গরীবের হক।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ কারও জন্য অধিক কারও জন্য কম দেননি। সকলের জন্য সমান দিয়েছেন। কিন্তু নানান নিয়মের মধ্য দিয়ে মানুষ কম-বেশী করেছে। আবার সে কম-বেশীর একটা মাত্রা থাকা উচিত। কিন্তু মানুষ সেটি মানেনি। বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি করেছে। নিয়মের মধ্যে আছে অনিয়ম।

অনিয়মের মধ্য দিয়ে যে যা অর্জন করছে, বস্তুত সে অন্যেরটা ছল-চাতুরি করে নিয়ে নিচ্ছে। ফলে একজনের অতি অর্জনের ভেতরে অপরের প্রাপ্য বা হক লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ অন্যায় ও ছল-চাতুরি না থাকলে অতি অর্জনের অংশটুকু যথাযথ প্রাপকের কাছে পৌঁছে যেত। পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বঞ্চিতকে যাকাত কিংবা দান নিতে হত না। অতএব চতুর সম্পদশালী মানুষের সম্পদের ভেতরে সহজ-সরল মানুষের হক লুকিয়ে আছে।

তৃতীয়তঃ অতি অর্জনকারীর সম্পদে যার হক আছে বিধাতা চাইলে তাকে উজ্জীবিত করে দিতে পারেন। সে তার হক ছিনিয়ে আনার চেষ্টায় রত হয়ে যাবে। জগতে হানাহানি-রক্তারক্তি শুরু হয়ে যাবে। যে সুখের জন্য অর্জন সে সুখ অর্জনকারীর জীবনে ধরা দেবে না। জগত অশান্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি একটি নিয়ম করে সকলকে শান্তিতে থাকার ব্যাবস্থা করে দিচ্ছেন। ফলে এ হক এর বাস্তবায়ন সকলের মঙ্গলের জন্য ভেবে তা পরিপালন করা জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত।

চতুর্থতঃ আল্লাহ চাইলে সম্পদশালীকে অধিক প্রতিযোগীতায় নামিয়ে দিতেন। যাদেরকে দরীদ্র মনে হচ্ছে তারাও সম্পদ অর্জনে সম্পদশালীর সাথে সমান তালে প্রতিযোগীতায় নেমে যাবে। সম্পদশালী যত সম্পদ অর্জন করে চলেছে, অতি প্রতিযোগীতার কারণে সে ততটা সম্পদ অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু তিনি একটা দলকে উজ্জীবিত না করার কারণে, কিংবা কোন উপায়ে অবদমিত করে রাখার কারণে তুলনামূলক প্রতিযোগীতাহীন মাঠে সম্পদশালী সম্পদ অর্জন করে চলেছে। সম্পদশালীকে তিনি পরীক্ষায় ফেলেছেন। সে আল্লাহর কাছে অধিক চায় কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ মেনে সে নিজে অপরকে কতটা দেয় আল্লাহ সেটি দেখেন।

এক অর্থে কাউকে দারীদ্রতা দিয়ে সম্পদশালীকে আল্লাহ তার কর্মে সহযোগীতা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাকে নিরাপদও করেছেন। দরীদ্রজন সম্পদশালীকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে দিয়ে তাকে নিরাপদে অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তার অর্জনে শ্রম দিয়ে তাকে সহযোগীতাও করে চলেছে। অতএব সম্পদশালীর সম্পদে দরীদ্রের হক থাকা যথাযথ ও যুক্তিসম্মত। বলা হচ্ছে,

"... পার্থিব জীবনে তো আমিই তাদের জন্য তাদের জীবিকা বন্টন করি এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করি, যেন একে অপরের থেকে সেবা নিতে পারে। ...।" (আল-কোরআন ৪৩:৩২)

বিধাতা চাইলে দরীদ্রদেরকেও উজ্জীবিত করে দিতে পারেন। তারা তাদের হক ছিনিয়ে আনার চেষ্টায় রত হয়ে যাবে। অতএব যে বা যারা একজনকে নির্বিঘ্নে অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে তার সম্পদে তেমন একজনের হক থাকে। বিষয়গুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। কেননা কেবল এটুকু বিষয় নিয়েও শত পৃষ্ঠার বই লেখা সম্ভব।

আল্লাহর সকল নির্দেশনা সূত্র বা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু মানুষ সওয়াব বা পরকালীন প্রাপ্তির বাসনা থেকে আল্লাহর নির্দেশনা পালন করে। কেউ করে নরক যন্ত্রনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ভয়ে। তারা কোন ব্যাবস্থার নিহিত অর্থ অনুধাবন করে না বা করতে চায় না। আল্লাহ জানেন মানুষকে দিয়ে কিভাবে কাজ করাতে হবে। মানুষের মধ্যে লোভ ও ভয় দু'টোই বিদ্যমান আছে। ফলে মানুষকে দিয়ে এভাবেও যদি ভাল কাজ করান যায় তবে মন্দ কি? এটিও সূত্র মেনে চলে। যার জ্ঞান যেমন সে তেমন জ্ঞানেই চলবে এবং তাতেও লক্ষ্য অর্জন হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে ব্যায় করতে হবে মানবতা ও সৃষ্টির সার্বিক কল্যানের বিষয়কে বিবেচনায় রেখে। ভাল কাজের প্রতিদানে সৃষ্টির সূত্রে সওয়াব আপনা থেকেই অর্জিত হয়ে যাবে। সে সূত্র আল্লাহই প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা সূত্রটিই এমন যে, কেউ জীবন ও জগতের জন্য কল্যাণ সাধন করলে আপনা থেকেই সওয়াব অর্জিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্মের একটি ভাল ফল মূল্য আকারে সংযোজন হয়ে যায়। সূত্রটি এভাবে গাঁথা। সূত্রই সত্য। অতএব ব্যায় করতে হবে মানব কল্যানের কথা বিবেচনা করে। পুরস্কার নিয়ে নিজেকে ভাবতে হবে না। সেটি আল্লাহই ভেবে রেখেছেন। মানুষকে ভাবতে হবে কর্ম নিয়ে এবং সে কর্ম জগতের কোন উপকারে আসছে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে। যে কষ্টে আছে তার কষ্ট লাঘব হতে হবে। যারা কাজগুলি সে বিবেচনায় করবে তারাই সৎকর্মশীল। তাদের জন্যই পরবর্তীতে সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সে-ই সঠিক পথ অবলম্বনকারী যে ... আল্লাহকে ভালবেসে সম্পদ ব্যায় করে আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য এবং যারা যথাযথভাবে উপাসনা পালন করে এবং গরীবের প্রাপ্য অংশ যাকাত প্রদান করে ...।” (আল-কোরআন ২:১৭৭)

সত্য হচ্ছে, স্বর্গ প্রাপ্তি বা পুরস্কারের লোভে নয়, কিংবা নরকে পতিত হওয়া বা শাস্তির ভয়ে নয়, মানুষকে ভাল কাজ করতে হবে মানুষের নিজেদেরই ভাল থাকার স্বার্থে। তাহলে এখানেই স্বর্গ ধরা দেবে। সে রহস্য বুঝতে হলে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

জ্ঞানকে কাজে লাগাতে ব্যার্থ হলেও মানুষ পুরস্কৃত বা উপকৃত হয়ে যাবে যদি সে সহজ-সরল পথে চলে। কেবল লোভ কিংবা শাস্তির ভয়ে নয়, বরং সৎ ও সরল অন্তরে ভাল মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তাই আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সেটিই যথাযথ জ্ঞান। আল্লাহর নির্দেশনার অনুসরণ মানুষকে সহজ-সরল পথেই চালনা করে।

যথাযথ কাজ হচ্ছে সৃষ্টি তথা জীব ও জগতের কল্যাণ সাধনের ইচ্ছে নিয়ে কাজ করে যাওয়া। তবে কাজগুলি করতে হবে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও মানবতাকে বিবেচনায় রেখে। আল্লাহর সৃষ্টির সার্বিক মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে। নিজেকে প্রদর্শন করার জন্য নয়। সেটি তখনই করা সম্ভব হবে যখন তা আল্লাহর নামে করা হবে। অর্থাৎ সকল কাজের কৃতিত্ব সমর্পিত হতে হবে আল্লাহর কাছে [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। এতে কারও মনে অহংকার আবার কারও মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা দুরীভূত হবে। অতএব কোরআনের নির্দেশনা অনুসারে এ বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজ করতে হবে আল্লাহর কারণে। আল্লাহর প্রতি নিজের কৃতিত্বকে সমর্পন করে সৎ নিয়তে ব্যায় করতে হবে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“ভগবানের জন্যই কেবল কর্ম; তা ছাড়া কর্ম এ জগতে কেবল বন্ধনেরই কারণ। অতএব সে অর্থেই কর্ম কর, আসক্তিরহিত হয়ে।” (গীতা ৩:৯)

জীবন ও জগতের কল্যাণার্থে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে। বিনিময়ে যা দেবার বিধাতা নিজেই তা দেবেন এবং তাতেই

সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এমন উন্নত মানসিকতায় কাজ করতে হবে।

তবে বিশ্বাসী মাত্রই জানে যে আল্লাহ সব দেখেন ও শোনেন। কাউকেই তিনি তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেন না। বলা হচ্ছে,

“... নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভাল কর্ম সম্পন্নকারীদের কর্মের ফল নষ্ট হতে দেন না।” (আল-কোরআন ৯:১২০)

জীবন ও জগত আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সূত্র মেনে চলে। অতএব আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে কাজ করে যেতে হবে।

সে আলোকেই আল্লাহ যে জীবনোপকরণ প্রদান করেন সেখান থেকে ব্যায় করতে হবে। কোরআন তেমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদেরকেই পথ প্রদর্শন করে। তারাই সুপথ প্রাপ্ত। তারাই দিক-নির্দেশনার অনুসরণে সফলতার মুখ দেখে।

ওপরোক্ত আলোচনার পরে এ বিষয়ে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটেও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

▪ আল্লাহর পথে ব্যায় ও বর্তমান প্রেক্ষাপট : বাধ্যতামূলক যাকাতের নিয়ম যে সময়ে প্রবর্তিত হয়েছে, কিংবা দান করাকে যে সময়ে উৎসাহিত করা হয়েছে সমাজ তখন আজকের মতো ছিল না। সামগ্রীক মানবকল্যাণের ভাবনা তখনও জগতব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেনি। কাজসমূহও বিশ্বব্যাপি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়াতে পারেনি। মানবসমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন ও বৃহত্তর কল্যানের ভাবনা থেকে বহুদুরে। আধুনিক সময়ের আর্থিক ব্যাবস্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

মানুষ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের ভাবনাকে বিবেচনায় রেখে কোরআন যাকাতের নিয়ম প্রবর্তন করেছে। দানকে উৎসাহিত করেছে। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও দুরীকরণ এবং সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এগুলি উত্তম উপায়। এগুলিই মৌলিক দিক-নির্দেশনা। এ সকল বিধান দুঃস্থদের কল্যাণের দিকটিকে যেমন বিবেচনায় রাখে, তেমনি অবস্থাপন্নদের জন্য সহযোগীতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও বিধান করে। তবে কোরআনের দর্শনে অবস্থাপন্নদেরকে অবস্থাপন্ন হতে হবে ন্যায়সম্মত উপায়ে। কোনরূপ ছল-চাতুরতার আশ্রয় না নিয়ে। বর্তমানে যা হচ্ছে না।

গুরুত্ব বিবেচনায় যাকাতকে ধর্মীয় বিধানে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর বরখেলাফে শাস্তি এবং পরিপালনে আল্লাহর নামে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। শাস্তি ও পুরস্কার দুটোই এর পরিপালনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহতে বিশ্বাস ভিন্ন কেউ এটি পালন করবে না। তাই অদেখা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখা ইসলামের দর্শন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং একই সাথে আরও যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে সেগুলিও। কেননা সকল বিধি-বিধান একই লক্ষ্য অর্জনে কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা।

ওপরে আলোচিত কোরআনের দর্শনের শর্তসমুহ যে নিঃশর্তে বিশ্বাস করবে, তার অন্তর নির্দেশনা পালন করতে বাধ্য। শাস্তি ও পুরস্কার কিছুই প্রদান করা হচ্ছে না অথচ শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের প্রত্যাশা একটি নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখছে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীর প্রগাঢ় ভালবাসাই নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন তাই গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কোন দিক-নির্দেশনা বস্তুত কোন নিয়মের মূল বা মৌলিক দিকগুলিকে নির্দেশ করে। কিন্তু তার প্রয়োগ স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনা করে করতে হয় বা করা যেতে পারে। সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি পার্থিব নিয়মের অনেক বিষয়কে পরিবর্তন করে দেয়। তাই নিয়মে অনড় হয়ে পড়ে থাকা উদ্ভূত কোন নতুন সমস্যা সমাধানের পথ হতে পারে না।

নিয়মের মধ্যে আবার কোন বিষয়টিতে অনড় থাকতে হবে সেটিও বুঝতে হবে। এখানেই ব্যাক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের যথাযথ বিচার-বিবেচনা বা যোগ্যতার মাপকাঠির পরীক্ষা। ভূল কাজের মাসূল গুণতে হবে সমাজের মানুষকেই। ব্যায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনার মূল দিক-নির্দেশনাটি হচ্ছে দুঃস্থ-মানবতার সেবা করা, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য-সহায়তা করা। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখা। জীবন ও জগত তথা সৃষ্টিকে রক্ষা করা ও এর সার্বিক বিকাশে অবদান রাখা।

সময়ের সাথে জীবন-জগত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু পরিবর্তন হয় তা হয় আল্লাহর অনুমোদনের কারণে। বিষয়টিকে কেউ ভেবে নিতে পারে প্রকৃতির ইশারায় বা কারণে। আল্লাহ অনুমোদিত এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলাই

হচ্ছে মানুষের যথাযথ কাজ। বৃহৎ অর্থে সেটিই সমর্পন [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। সমর্পনই ইসলাম। সমর্পনই শান্তির পথ। ইসলাম তাই শান্তির ধর্ম।

যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে প্রচলিত নিয়ম, বিধি-বিধানসমূহকে তাই যুগোপযোগী করে নিতে হবে। সেটি করতে হবে স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনায় রেখে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মানুষ মূল দিক-নির্দেশনা থেকে বিচ্যুত হয়ে না যায়। অর্থাৎ গৃহিত পদক্ষেপ যেন দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তদের সাহায্য-সহায়তায় অবদান রাখে, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে, মানবতার কল্যাণ সাধন করে এবং সার্বিক অর্থে সকল ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা পায়। আর এ জায়গাগুলিতেই নিয়মের বিষয়ে অনড় থাকতে হবে।

পরিবর্তীত পরিস্থিতি মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনারও পরিবর্তন করে দেয়। ফলে নতুন নতুন সমস্যারও উদ্ভব ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে কোন ব্যাথিত হৃদয়ের সমস্যার সমাধান না করা বা করতে না পারা যথাযথ ধর্মের কাজ নয়। কোন নিয়মে অনড় হয়ে পড়ে থাকা ধর্মের দিক-নির্দেশনা নয়। সমস্যার সমাধানে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। কোরআনে এমন বহু ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক উদাহরণ আছে যার কিছু ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে এবং যথাস্থানে আরও এসে যাবে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কিছু বিষয়ে অনড় থাকারও প্রয়োজন আছে। যেমন, ধর্মের মৌলিক দিক-নির্দেশনাগুলির বিষয়ে। যেমন, ন্যায্যতার বিষয়টি। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে ধর্ম আপোষহীন। কিন্তু সে সত্য ও ন্যায়কে স্থান, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় বিবেচিত হতে হবে। অন্যথায় সেটি সংশ্লিষ্ট মানুষদের দ্বারা ন্যায় বিবেচিত হবে না। সমাজের মানুষই যদি কোন বিষয়কে ন্যায় বিবেচনা না করে তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে কিভাবে?

ধর্ম যদি মানবের কল্যাণ সাধন করতে না পারে তবে তা ধর্মই নয়। ধর্ম সকল ক্ষেত্রে একটি ন্যায়সম্মত সমাধান দেয় বা পথ নির্দেশ করে। যা মানব হৃদয়কে অবস্থানগত সমসাময়িক জ্ঞান ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে তুষ্ট করে। যেমন কোরআনেই বলা হয়েছে যে,

"তারা তোমার কাছে এমন কোন সমস্যা উত্থাপন করে না যার প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে সুন্দর ব্যাখ্যা বা যুক্তি ও সঠিক সমাধান কোরআনের মাধ্যমে না দিয়ে থাকি।" (আল-কোরআন ২৫:৩৩)

অতএব কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ভূলভাবে অনড়তা প্রদর্শন নয়। যুক্তির ভিত্তিতে যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সময়ের সাথে পরিস্থিতি বিবেচনায় সঠিক সমাধান দিতে হবে। ভূক্তভোগীর ব্যাথিত হৃদয়ের যন্ত্রনাকে লাঘব করতে হবে। অন্যথায় ধর্মের নামে কোন শাব্দিক অর্থে অনড় হয়ে পড়ে থাকলে সেটি কাউকে অনৈতিক সুবিধা দিতে পারে। আর এমন ভূল কার্যকলাপ ধর্মকে মানবসমাজে ছোট ও বিতর্কিত করে।

কথাগুলি বলা হল ধর্মের নিয়মের নামে অনড় থেকে অনেক বাস্তব সমস্যার সঠিক বা ন্যায়সম্মত সমাধান করা হয় না বা হচ্ছে না বিধায়। কথাটি প্রসংগক্রমে বলে রাখা হল, তবে এটি কেবল যাকাতের নিয়মকে বিবেচনা করেই বলা হয়নি। সকল ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটছে এবং অতীতে ঘটেছেও।

একটি বিষয় স্মরণে রাখা বাঞ্ছনীয় যে আল্লাহর বিশালত্ব ধারণাতীত। তাঁর বিবেচনায় মানবের ক্ষুদ্রত্ব আণুবীক্ষনিকও নয়। মানুষ আল্লাহর কোন উপকার করারই সাধ্য রাখে না এবং আল্লাহর সেটি প্রয়োজনও নেই। বলা হচ্ছে,

"তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশীল।" (আল-কোরআন ২২:৭৪)

"তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘূর্ণায়মান বা ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। তিনি মহিমান্বিত ..।" (আল-কোরআন ৩৯:৬৭)

"জেনে রাখ যে- আমার কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সহায়তা দিয়ে যাই।" (গীতা ১০:৪২)

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি কেন তুলে ধরা হয়েছে? আল্লাহ প্রদত্ত যে কোন দিক-নির্দেশনা বা নিয়মই মানবজাতির নিজেদের কল্যাণের জন্য। আল্লাহর ভাল-মন্দের জন্য নয়। সেটি তাঁর প্রয়োজনও নয়। বিষয়টিকে বোঝাবার সুবিধার্থে উদ্ধৃতিসমুহ তুলে ধরা হয়েছে। অতএব সে বিবেচনায় মানুষকে কাজ করতে

হবে। শাব্দিক অর্থে কোন কিছুতে অনড় হয়ে পড়ে থাকা চলবে না। সময়ের সাথে সব ঝালিয়ে নিতে হবে।

বস্তুত মানবকল্যাণে প্রয়োজন সাপেক্ষ্যে আপাতদৃষ্টে কোন নিয়মের পরিবর্তন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহতা'য়ালার কোন ক্ষতি সাধন করে না বা করতে পারে না। বরং মানুষই উপকৃত হয়। দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করে মহান আল্লাহ মানুষের নিজেদেরই উপকার লাভের শিক্ষা দান করেছেন। অতএব যুগের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধানসমূহকে নির্ধারণ করা হলে তাতে ধর্মের কোনরূপ ব্যাত্যয় ঘটবে না। আল্লাহরও কোন ক্ষতিসাধন হবে না। বরং মানবজাতি ও সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ সধিত হবে। আর এটিই কোরআনের মূল পথ-নির্দেশনা। কোরআন অধ্যায়ন করে বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে বুঝে নিতে হবে। বলা হচ্ছে,

"আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম?" (আল-কোরআন ২:১০৬)

স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় আল্লাহ নিজেও নিয়ম-বিধি-বিধানের পরিবর্তন করে থাকেন। বোঝার সুবিধার্থে ওপরের আয়াতটি তারই একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। নইলে আল্লাহর এত নবী-রাসূল ও অবতীর্ণ গ্রন্থ প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না। তিনি একবারেই সব নির্দেশনা শাশ্বত ও সার্বজনীনভাবে জারি করে দিতেন। কিন্তু এ জগত সংসারের সর্বত্র আছে পরিবর্তনশীলতা এবং সেভাবেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই বিধাতার মূল দিক-নির্দেশনা ঠিক রেখে সময় ও অবস্থানের সাথে সব উপযোগী করে নিতে হয়।

কিছু মানুষ আমাদের প্রিয় নবীকে তৎকালীন সময়েও এমনিভাবে প্রশ্ন করেছিল। অর্থাৎ একবারে সমগ্র কোরআন অবতীর্ণ হল না কেন? বলা হচ্ছে,

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'তার কাছে সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হল না কেন?' এটি এভাবে অবতীর্ণ করেছি, যেন এটি তোমার অন্তঃকরণকে দৃঢ় করে এবং আমি এটিকে ধারাবাহিকভাবে যথার্থতার সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি।" (আল-কোরআন ২৫:৩২)

সৃষ্টির অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়োপযোগী করে আল্লাহ তাঁর বিধান প্রেরণ করেন। অতএব সময়োপযোগী করে কোরআনের মূল দিক-নির্দেশনাসমুহ সঠিক রেখে বিবিধ বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়সমুহকে মানবসমাজে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। আমাদের প্রিয় নবী সর্বশেষ (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৩৩:৪০)। অতএব এ কাজ বর্তমানে জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষদের ওপর বর্তায়।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি মানবের ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁর দ্বারা কোন নিয়মের অনড়ত্ব আরোপ করা শোভনীয় নয়। বস্তুত এটি তাঁর ভাবনার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও নয়। তিনি মানুষকে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ কি উপায়ে মানুষ তার সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন বা বলা যায় সমস্যা সমাধানে কিছু দিক উন্মোচন করে দিয়েছেন। দিক-নির্দেশনায় তিনি যে নিয়ম বলে দিয়েছেন তা তৎকালীন স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনা করে দিয়েছেন। যুগের আলোকে। কালের প্রেক্ষিতে পাত্রের ধারণ ক্ষমতার অধিক কোন বোঝা তিনি কারও ওপরে চাপিয়ে দেননা। যেমন বলা হয়েছে,

“আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। তার জন্য ততটুকু যতটুকু সে নিজে অর্জন করেছে ...” (আল-কোরআন ২:২৮৬)

কোরআনে প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে সময়ের উপযোগী সবচেয়ে উত্তম পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের সাথে তার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধান করা বোধসম্পন্ন মানুষদের কাজ। তাতে কোন ত্রুটি তো নেই-ই উপরন্তু সেটি না করা অপরাধ বলে গন্য হতে পারে। কেননা তা না হলে মানবের কল্যাণ সাধন হবে না। ব্যথিত কোন ভূক্তভোগীর হৃদয়ের ব্যথা দুর করা সম্ভব হবে না। সমস্যার যথাযথ ও ন্যায়সম্মত সমাধান হবে না। সেটি না করা ধর্মের কাজ নয়। সেটি না করা আল্লাহর মহাত্বকে ছোট করে। আল্লাহ প্রদর্শিত পথকে বিতর্কিত করে এবং একই সাথে কোন স্বার্থান্বেষীকে নিয়মের নামে অনৈতিক সুবিধা দেয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনায় নিয়ে সে আলোকে উদ্ভূত সমস্যাসমুহের সমাধান করতে হবে।

আল্লাহ মানুষের জন্য মৌলিক নিয়ম বা দিকগুলি নির্দেশ করেছেন। কাজ করতে হবে জীবন ও জগতের কল্যাণে। জীবন ও জগতের কল্যাণ যুগের সাথে তাল রেখে চলে। এমনকি কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে, তখনও যুগের সাথে তাল রেখে অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যা পূর্বে বলবৎ ছিল না। সে সময়েও প্রচলিত নিয়মে অনেকেই অনড় ছিল। বিরোধীতা করেছিল। অতএব সকল মানবের কল্যাণের বিষয়কে বিবেচনায় রেখে, কোনরূপ ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে সময়ের চাহিদার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই আল্লাহ প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনা। এভাবে নিয়মের যুগোপযোগীকরণ বা আধুনিকায়ন কোন নিয়ম বা মূলনীতির বরখেলাফ নয়।

সকল যুগেই কিছু দুষ্ট, সুবিধাবাদী বা স্বার্থান্বেষী মানুষ থাকে। যারা ভাল উদ্দেশ্যে প্রণিত প্রচলিত একটি নিয়মকেও কাজে লাগিয়ে সুবিধা লুটে নিতে চায়। তারা নিজেদেরকে নিয়মের কঠোর অনুসারীরূপে পরিচয় দান করে এবং সে নিয়মকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সুবিধা আদায় করে, কিংবা অন্যকে বিপদে ফেলে। অথচ স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায় সে নিয়মটি হয়তবা ন্যায্যতা সৃষ্টি করতে পারছে না। ফলে দুষ্টের দমনে সেসব নিয়ম প্রয়োজনে পুনর্বিবেচনা করা অতীব জরুরী। বিষয়টি কেবল যাকাতের নিয়মকে বিবেচনায় নিয়েই বলা হচ্ছে না। ধর্মের সকল ক্ষেত্রকে বিবেচনায় নিয়ে বলা হয়েছে। এমনকি যে সময়ে বাইবেল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়েও এমন নিয়মের বেড়াজালকে ছিন্ন করার জন্যও এসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে বা বলা যায় মহামানবদের আগমন ঘটেছে। যেমন বলা হয়েছে,

“(জেসাস বলে- আমি এসেছি) ... যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।” (আল-কোরআন ৩:৫০)

সেকালেও সুবিধাবাদীরা অনেক ভাল কিছুকে অবৈধ এবং অনেক মন্দ বিষয়কে বৈধ করে নানান নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নিয়মের ওপর অনড় ছিল। নানান কুসংস্কার ও সামাজিক নিয়মের দ্বারা সাধারণ মানুষ যেভাবে নিষ্পেষিত ছিল নিয়মের এসব বোঝা থেকে তিনি তাদের মুক্তি দিতে এসেছেন সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে,

“.. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... সে তাদের নির্দেশ দেবে সঠিক কাজের এবং বারণ করবে যা মন্দ তা। সে তাদের জন্য যাবতীয় ভাল বস্তু বিধি-সম্মত ঘোষনা করবে এবং নিষিদ্ধ করবে শুধুমাত্র মন্দ বস্তুসমূহ এবং যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।” (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

নানান কুসংস্কার ও সামাজিক নিয়মের বেড়াজালে সাধারণ মানুষ যেভাবে শৃংখলে আবদ্ধ থাকে, মহামানবদের আগমন ঘটে সমাজ থেকে সেসব শৃংখলকে অপসারণ করার জন্য। সামাজিক এসব জঞ্জাল অপসারণ করা সহজ কাজ নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা এসব কাজ করে গেছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন! এবার মূল আলোচনায় আসি।

- বর্তমান সময়ে যাকাতের হারকে পরিবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এটিকে আরও একটু অধিক করা যেতে পারে। বর্তমান হারকে সর্বনিম্ন হার হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আবার এ হারকে আর্থিক সামর্থ সাপেক্ষে কম-বেশী করা যেতে পারে। একজন অতি ধনী এবং একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীর জন্য এ হার কম-বেশী হতে পারে। তবে অবশ্যই বিষয়গুলি হিসেব বিজ্ঞানীদের গবেষনা সাপেক্ষ বিষয়। এ বিষয়ে কাজ করার অবকাশ আছে।

মানুষের কাছে যখন অল্প টাকা থাকে তখন সে চিপে চিপে টাকা বের করে। ঘষে ঘষে বারবার নিশ্চিত হয় যে একটি টাকাও কি বেশী চলে গেল কিনা। একটি টাকারও তখন অনেক মূল্য।

আবার সেই একই মানুষের কাছে যখন অধিক টাকা থাকে তখন সে চোখ বন্ধ করেও টাকা দিয়ে দিতে পারে। কেউ যদি বলে কম হয়েছে তো যত কম হয়েছে তার চেয়ে অধিক দিয়ে দিতেও তার বাঁধে না। কেননা তার কাছে এত অর্থের যোগান আছে যে সে জানে এই লোকটি যত চাচ্ছে সেটিও কত কম! বেশী অর্থ সম্পর্কে দরীদ্র লোকটির বস্তুত কোন ধারণাই নেই।

যে সময়ে যাকাতের হারের নির্দেশনা এসেছে খুব বেশী মানুষ তখন আজকের প্রাচূর্য্য দেখে নাই। সে সময়ে যে হার নির্ধারণ করা হয়েছে আজকেও

সেটি প্রযোজ্য তবে সর্বনিম্ন বিবেচনায়। উচ্চহারে দেবার জন্য অর্থশালীদের উৎসাহ দিতে হবে। কেননা এখন আর আগের পরিস্থিতি নেই।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিয়মের পুনর্বিবেচনার সঙ্গে আল্লাহ-তা'য়ালার কোন প্রকার সুবিধা-অসুবিধা প্রাপ্তি বা লাভ-ক্ষতি নেই। এটি মানবজাতির কল্যাণার্থে তাঁর প্রদত্ত তৎকালীন সময়ের জন্য একটি যুগপোযোগী দিক-নির্দেশনা মাত্র। সে মৌলিক দিক-নির্দেশনার আলোকে পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে অধিকতর গবেষনা সাপেক্ষে এ হার পুনঃ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

যাকাতের নির্ধারিত হার পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে যারা অনড়তা প্রদর্শন করতে পারে, ব্যবসায়ে লাভ বা মুনাফার হার কমিয়ে আনার বিষয়ে তারা কিন্তু তেমন বেশী সোচ্চার নাও হতে পারে। বিষয়টি লক্ষ্ণীয়। যুগের সাথে মুনাফার হার বেড়েই চলেছে। অথচ অতি মুনাফা করাও নিয়মসিদ্ধ নয়।

- পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কোন বিচ্ছিন্ন একটি অংশে কোন নিয়মের পরিপালন সমগ্র মানবসমাজ ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য। অতএব সকলকে অন্তর্ভূক্ত করে কল্যাণের কাজ করা ভিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে এর থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে বিবেচনায় রেখে যাকাতের অর্থের ব্যাবহার করতে হবে। মানসিকতাকে সে পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। কেবল ক্ষুদ্র কোন গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ে ভাবলে হবে না। কোরআনের দিক-নির্দেশনা এসেছে জগতের সকল মানুষের জন্য। বিশ্ব ব্যাবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। এটি বলা হচ্ছে, বর্তমান পরিবর্তীত পরিস্থিতির কারণে। বিষয়গুলি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

- যাকাত সাধারণত মানুষ ব্যাক্তিক পর্যায়ে দিয়ে থাকে। কিন্তু সমন্ময়হীন এমন যাকাত প্রদান কোন বৃহৎ কল্যাণ এনে দিতে পারে না। অন্তত আজকের পৃথিবীতে। এত বড় অংকের খরচ সত্বেও বড় কোন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না এ অর্থ ব্যায় দ্বারা। অতএব ব্যাক্তিক পর্যায়ের যাকাতের অর্থ সামষ্ঠিক বা কেন্দ্রীয় যাকাত সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। যদিও আরও আগে থেকেই তেমন চিন্তা-ভাবনা বা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে তা এখনও তেমন শক্ত ভিত্তির ওপর দাড়াতে পারেনি।

- 'কর' আদায় করা হয় বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিমিত্তে। যাকাতও আদায় করা হয় ঐ একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সবই মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্তে করা হয়। যাকাতের অর্থ আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। কিন্তু যখন তা জীবন ও জগতের কল্যাণে ব্যায় করা হয় তখন সেটি আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। দু'টি ক্ষেত্রেই মানব কল্যাণই মূল উদ্দেশ্য। দু'টোই আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়।

এক অর্থে একই উদ্দেশ্যে দুইবার অর্থ আদায় হচ্ছে। 'কর'কে 'যাকাত' এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে যা বাধ্যতামূলক প্রদেয়। অথবা 'যাকাত'কে 'কর' হিসেবে দেখা যেতে পারে যা বাধ্যতামূলক প্রদেয়। দু'টোর উদ্দেশ্য এক। প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে আল্লাহর নির্দেশকে আধুনিক উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়েছে কর ব্যাবস্থার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে সেভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

যে সময়ে যাকাতের কথা বলা হয়েছে সে সময়ে আধুনিক কর ব্যাবস্থা ছিল না। তখন যা করা সম্ভব ছিল না এখন তা সম্ভব হয়েছে। সেসব বিবেচনায় বিষয়গুলিকে নিয়ে নতুন করে ভাবা যেতে পারে।

যাকাত ব্যাবস্থা মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। এটি আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। আধুনিক যুগে 'কর' প্রদান করা হয় মানব-সমাজ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য। রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রদেয়। একই ভাবনার ক্রমবিকাশের ফল এসব রূপান্তর বিষয়গুলিকে সেভাবে দেখা যেতে পারে।

যাকাত ও কর দু'টো অর্থকে এক জায়গায় এনে পৃথক হিসেবে রাখা যেতে পারে পৃথকভাবে ব্যাবহারের সুবিধার্থে; যতদিন না দু'টো ব্যাবস্থাকে একীভূত করা সম্ভব হয় বা হচ্ছে।

- এক সময়ে ব্যাক্তিক পর্যায়ের দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা দারীদ্র ছিল কিন্তু আধুনিক ব্যাবস্থাপনা ছিল না। বর্তমান সময়ে সরকারী-বেসরকারী অনেক প্রচেষ্টা আছে যেগুলিকে বেগবান করতে হবে দারীদ্র দুরীকরণে। তাই দানকেও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে মানব কল্যাণে দানের অর্থের ব্যাবহারে বৃহৎ আকারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং মানুষের

দানের সকল অর্থ কেন্দ্রীয় একটি হিসেব ব্যাবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে কর ও যাকাতের মতো। এসব অর্থ থেকে অন্তত সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করা যাবে না কোনভাবেই। দানের টাকা, যাকাতের টাকা, করের টাকার যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিত করতে হবে। বলা হচ্ছে,

"(জ্বিনেরা বলে) আমরা নিশ্চিত নই যে, পৃথিবীবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গল অপেক্ষা করছে, নাকি পালনকর্তা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছে রাখেন।" (আল-কোরআন ৭২:১০)

এইতো কিছুদিন পূর্বেও পৃথিবীকে আমরা কেমন দেখেছি, আর এখন কেমন দেখছি। কল্পনার মতো মনে হয়! কোনদিকে চলেছি আমরা মানবজাতি? কল্যাণের পথে নাকি অমঙ্গলের পথে? মানবজাতি আমরা কি সঠিক পথে চলেছি? আল্লাহ আমাদেরকে কোন পথে নিয়ে চলেছেন? বলা হচ্ছে,

"তিনি নভোমন্ডলীকে দুই দিনে সপ্ত আকাশে পরিণত হতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার নিজস্ব বিধান প্রদান করলেন।" (আল-কোরআন ৪১:১২)

এ আলোচনায় এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ দু'টি উদাহরণ কেন তুলে ধরা হল? বস্তুত আল্লাহর কাছে আছে অনেক অনেক বিধান! বিধান কেবল একটিই নয়। একই স্থানে বিধান বিভিন্নরকম হতে পারে কোন শর্তের পার্থক্যের কারণে। আবার স্থান-কাল-পাত্রভেদেও বিধান পার্থক্যপূর্ণ হতে পারে। আল্লাহ সব করতে পারেন।

তিনি একেক আকাশকে একেক বিধান প্রদান করেছেন। তীব্র গতিতে ছুটে চলা এ জগৎ এখন কোন আকাশে অবস্থান করছে বা কোন আকাশের পানে ছুটে চলেছে, যে কারণে নিয়মের এত এত পরিবর্তন হতে চলেছে? আমরা কোন বিধানের আওতাভূক্ত হতে চলেছি? কল্যাণের পথে চলেছি নাকি অমঙ্গলের পথে? যেমনটা জ্বিনেরা আশংকা করেছে? পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে আমাদেরকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। নয়ত বাঁচতে পরব না। কোন নিয়মে অনড় হয়ে পড়ে থাকা যাবে না। সকল বিধানই আল্লাহর বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে হবে।

- আধুনিক ব্যাবস্থাপনায় ঘরে বসে নিজ থেকে যাকাত আদায় বা প্রদান করা সম্ভব। যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা হিসেবে জমা হবে। ঠিক তেমনিভাবে এর ব্যায়ের হিসেবও মানুষের কাছে উন্মোচন করে দেয়া সম্ভব সুশাসনের স্বার্থে। আধুনিক যুগের 'কর' হবে যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। কিংবা আধুনিক যুগে 'যাকাত' এর সংগৃহীত অর্থের ব্যাবহার হবে 'কর' এর অনুরূপ।

- যাকাতের অর্থ আল্লাহর কাছে যায় না। কিন্তু মানব কল্যাণে যখন তা কাজে লাগে সেটিকেই আল্লাহর প্রাপ্তিরূপে দেখা হয়। এটি বলা হয় মানুষকে যাকাত প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য। কেননা মানুষ আল্লাহকে ভালবাসে। তাঁকে ভালবেসে নিজ থেকে সব পালন করে। কোন পুলিশ কিংবা কোন কর বা রাজস্ব কর্মকর্তার দরকার হয় না। যেমন পুলিশ কিংবা সরকারের ভয়ে মানুষ সালাত আদায় করে না। তাই যাকাতকে কররূপে না দেখে বরং করকে যাকাতরূপে দেখা উত্তম যা বাধ্যতামূলক প্রদেয়। যার হার করের মতো হতে পারে সামর্থ অনুযায়ী।

- এটিও বিবেচনাযোগ্য যে, ব্যাক্তিক পর্যায়ে মানুষ যাকাত দিয়ে তৃপ্ত। দান করে বা ভিক্ষা দিয়েও তৃপ্ত। কেননা সে নিজে জানছে যে সে দুঃস্থকে দান করছে। মানুষ বিষয়গুলি অর্থাৎ এর যথাযথ ব্যাবহারের বিষয়টি নিশ্চিত হতে চায়।

কোন তহবিলের যথাযথ ব্যাবহার, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এর হিসেবের উন্মোচন, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়। সামষ্ঠিক যাকাত সংগ্রহ ও তার ব্যাবহারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এসব তহবিলের রক্ষাকর্তাদের জীবন-যাপনের আতিশয্য ও দরীদ্রদের দীর্ঘকাল দরীদ্র হয়ে পড়ে থাকা তহবিলের সঠিক ব্যাবহারের বিশ্বাসযোগ্যতায় চির ধরায়। তাই এ ব্যাবস্থাগুলি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না। মানুষের ভেতর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যাকাত, দান কিংবা করের অর্থের যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে ব্যাক্তিক পর্যায়ে যেভাবে যাকাত দেয়া হয় এর অবশ্য একটি সুবিধা বা ভাল দিক আছে। জগতের আনাচে-কানাচে যেখানেই একজন মুসলিম আছে তেমন একজনের প্রদত্ত যাকাতের অর্থ তার পাশের দরীদ্র

লোকটি পাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে এর ব্যাবস্থাপনা করতে হলে দান বা যাকাতের অর্থ সকল দুঃস্থ মানুষের কাছে যেন পৌঁছায় সে লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। দুঃস্থদের তালিকা থাকতে হবে। সকল দুঃস্থদের হাতে সম্পদশালীদের প্রদত্ত যাকাতের অর্থ পৌঁছে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। তবেই যাকাত করের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

যাকাত প্রদানকারী কোন ব্যাক্তি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষে বা কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে তার প্রদত্ত যাকাতের একটি অংশ দিতে চাইলে সেটি দিতে পারার ব্যাবস্থা রাখা যেতে পারে।

- অনেকে প্রদর্শনের জন্যও ব্যাক্তিক পর্যায়ে ব্যায় করায় অর্থাৎ যাকাত বা দান করায় আগ্রহী। কিন্তু যাকাত বা দান করতে হবে আল্লাহর নির্দেশনাকে পরিপালনের জন্য। মানব কল্যাণের চিন্তা থেকে এবং এর মহাত্বকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন করতে হবে। নিজেকে বড় করে প্রকাশ করার জন্য নয়। তাহলে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এ ধারণার অধিকতর প্রচার-প্রসার প্রয়োজন। যেমন বলা হয়েছে,

"ভগবানের জন্যই কেবল কর্ম; তা ছাড়া কর্ম এ জগতে কেবল বন্ধনেরই কারণ। অতএব সে অর্থেই কর্ম কর, আসক্তিরহিত হয়ে।" (গীতা ৩:৯)

"ভাল কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যায় করা হয় না।" (আল-কোরআন ২:২৭২)

- অনেকে ধারণা করতে পারে বা মনে করে যে, যাকাত বা দানের অর্থ কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য ব্যাবহারযোগ্য। এটিও ঠিক যে, কোরআনে এর ব্যাবহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে। সে কারণেই এ আলোচনা। বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের দিক বিবেচনায় রেখে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে দিক-নির্দেশনার মূল বা মর্ম বাণীকে ঠিক রেখে নিয়মের পরিবর্তন করা যেতে পারে বা নিয়মকে যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। দর্শন হিসেবে কোরআন জগতের সকল মানুষকে মুসলিম পর্যায়ের ধরে নিয়েই তার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কেননা এটি এসেছে আল্লাহর দিক থেকে। মানুষ আল্লাহর প্রতিপক্ষ নয়। তিনি সকলের স্রষ্টা। সকল মানবের কল্যাণের নিমিত্তে তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বস্তুত সকল মানুষই আল্লাহকে স্বীকার করে, বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বা সমর্পিত- সকলেই মুসলিম। এমনকি যাদেরকে আমরা মুসলিমরূপে জানি তাদের নিজেদের মধ্যেও চিন্তা-ভাবনায় পার্থক্য আছে, ভূল-ভ্রান্তি আছে। কোরআনের দর্শন অনুযায়ী যাদেরকে আমরা অবিশ্বাসী বলি বস্তুত তারাও একজনেই বিশ্বাসী। যদিও সেই একজনকে বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকে। অগ্রসর জ্ঞান, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, আলোচনা ও ধারণার আদান-প্রদানে দিনে দিনে এসব ব্যাবধান কমে আসবে।

আজ যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী বলে পরিচিত তারাও এমনিভাবে জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমেই আজকের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছে। একসময় তাদের পূর্ব-পুরুষেরাও অবিশ্বাসী ছিল। মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভাবতে ও দেখতে হবে। বস্তুত মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকলে অন্য কোন কিছুতেই কোন সমস্যা নেই। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চালাবার জন্যই বস্তুত ইসলামের আগমন। যে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে এবং অপরের ক্ষতিসাধন করে না সে আল্লাহর পথেই থাকে বা আছে। অন্তরের গহীনে তেমন একজন সত্যিকার অর্থে আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষাকেই মেনে চলে। আল্লাহও তার সাথেই থাকেন। তিনি কোন লেবাসের সাথে থাকেন না। কর্মেই মানুষের সত্যিকার পরিচয়।

নামে মুসলিম হওয়া সত্বেও একজন দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হতে পারে। অপরদিকে ঈশ্বরকে ভয় করার কারণে একজন সে পথে পা নাও বাড়াতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ কোন দিকে থাকবেন? নিশ্চয়ই! যে সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকে, অপরের ক্ষতিসাধন করে না, ভাল পথে থাকে, মন্দ পথ পরিহার করে চলে সে আল্লাহর পথেই থাকে বা আছে। বিষয়গুলিকে এমনি সহজ-সরলভাবে বুঝতে হবে। মস্তিষ্কের অতি জটিলতা পরিহার করতে হবে। কোন একক ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বেঁধে দেয়া ব্যাকরণ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা পরিহার করতে হবে। ভালটি নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধিও প্রয়োগ করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত বিশ্বাসীর অর্থে অবিশ্বাসী এবং তথাকথিত অবিশ্বাসীর অর্থে বিশ্বাসীরাও উপকৃত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপি অর্থের প্রবাহ হিন্দু,

মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টনদের মধ্যে চালাচালি হচ্ছে। হিন্দুর টাকায় গড়া রাস্তায় মুসলিম হেঁটে চলেছে। অতএব নিয়ম পরিবর্তন হতে বাধ্য। বস্তুত অর্থ কখনও হিন্দু-মুসলিমের হয় না। সকল কিছুর উৎস বস্তুত 'একজন'! বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

এক সময়ের যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতিতে বিশ্বাসীদের অর্থে অবিশ্বাসীদের জন্য না করার কথা বলাটি যৌক্তিক ছিল। কেননা অবিশ্বাসী বলে পরিচিত জন সে সময়ে সরাসরি বিরোধী বা শত্রু পক্ষ ছিল। বিশ্বাসীদের প্রদেয় অর্থে তাদেরকে সহায়তা না করার কথা বলা সে সময়ে অযৌক্তিক কিছু ছিল না? এমনকি আজকের দিনেও যারা সত্য ও ন্যায়ের বিরোধীতা করবে তাদেরকে যাকাত, দান কিংবা করের অর্থে সহায়তা না করাও অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে না, কেবলমাত্র জীবন রক্ষার্থে সহায়তা ব্যাতিত। 'জীবন রক্ষার্থে সহায়তা'র বিষয়টিকে পৃথকভাবে ভাবতে হবে। এমন মহানুভবতা সে সময়েও যারা প্রদর্শন করেছে তাদের নিয়ে মানুষ আজও গর্ব করে। তারা মহামানবরূপেই পরিচিত! এমন জীবন দর্শন, আচার-ব্যাবহার সকলের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, জগতে সকল মানুষই কোন না কোনভাবে বিশ্বাসী। এক পিতা-মাতা থেকে আগত। আমরা নিজেরাই যেন কোন মানুষকে সংকীর্ণ সঙ্গার জালে ফেলে দিয়ে অবিশ্বাসী আখ্যায়িত করে অবিশ্বাসীতে পরিণত করে না দেই। তেমন হলে সে দায় তাদের ওপর বর্তাবে যারা এমন আচরণ করবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ... সতর্ক থেক বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে এবং ... বল না 'তুমি বিশ্বাসী নও' এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রাপ্তির কোন সুযোগ নিও না। ... আজ যার এ অবস্থা ইতিপূর্বে তোমরাও তো এমনি ছিলে, কিন্তু তখন থেকেই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্ক থেক। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সদা সর্বদা অবহিত।" (আল-কোরআন ৪:৯৪)

আল্লাহর অনুমোদন ব্যাতিত কিছুই ঘটে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটও আল্লাহই রচনা করেছেন। আলোচিত বিষয়গুলিকে তাই এ প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে।

এটিও সম্মিলিত মানব সমাজের জন্য এক পরীক্ষা যে, তারা আল্লাহ যে পথ প্রদর্শন করেছেন তাকে আধুনিকায়নে জ্ঞানসম্মত পথ বাছাই করে নেয়, নাকি মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে সৃষ্টি করা সত্বেও তারা তা প্রমাণ করতে ব্যার্থ হয়। অর্থাৎ অজ্ঞতার পথই বেছে নেয়। মানুষের কর্ম ও আচরণই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তাই আশংকা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে,

"(জ্বিনেরা বলে) আমরা নিশ্চিত নই যে, পৃথিবীবাসীদের জন্য কোন অমঙ্গল অপেক্ষা করছে, নাকি পালনকর্তা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করার ইচ্ছে রাখেন।" (আল-কোরআন ৭২:১০)

আল্লাহ পথ প্রদর্শন না করলে পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। মানুষকে তাই আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামত বা অনুগ্রহের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবেই সে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। নয়ত আল্লাহও তাকে তা দেবেন না যা পাওয়ার যোগ্য সে নয়। আল্লাহ মানুষকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন অর্থাৎ নিয়মের পুঃনর্বিবেচনার স্বাধীনতা দিয়েছেন সত্য ও ন্যায়ের পথে অবস্থান করা সাপেক্ষে। মানুষ যদি ভূল সিদ্ধান্ত নেয় তবে সে দায় তার এবং তদানুরূপ প্রাপ্তব্য ফলাফলও তার। সংকীর্ণ চিন্তা পরিহার করে জ্ঞানের পথকে বেছে নিতে হবে।

▪ **২.৪.১** এবং (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য) যারা বিশ্বাস করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীগনের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে : কোরআনের মাধ্যমে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাসী কোরআন তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। অতএব এ দিক-নির্দেশনা থেকে উপকার পেতে হলে এ বিশ্বাসেও বিশ্বাসী হতে হবে যে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর দিক থেকে এবং এটি মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা এটিও একটি শর্ত। যারা এ শর্তে বিশ্বাস করবে তারা এর নির্দেশনাও মেনে চলবে। নির্দেশনার মান্যতা ভিন্ন কিভাবে একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে?

কোরআন মানুষের সম্মুখে একটি দর্শনকে উপস্থাপন করেছে। কোরআনের নির্দেশনা কোন মানুষের উদ্ভাবন এমন ধারণা এর গ্রহণযোগ্যতাকে হ্রাস করে।

দর্শন বা প্রদত্ত পথ-নির্দেশনার সকল কৃতিত্ব এখানে তাই আল্লাহর প্রতি সমর্পন করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তা কোন মানুষের বক্তব্য নয়। এটি আল্লাহ প্রদত্ত। এমন ধারণা এর গ্রহণযোগ্যতাকে বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ নিজেও কোরআনের মাধ্যমে এটি ঘোষনা করেছেন যে, এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৩৯:১, ৪০:২, ৪১:২, ৪৫:২, ৪৬:২)। অর্থাৎ আল্লাহ এ বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। যদিও বিশ্বাসীর কাছে এ নিশ্চিতকরণের যথেষ্ট মূল্য আছে, কিন্তু সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসীদের কাছে এর তেমন কোন মূল্য নেই। যদিও এটাই সত্য যে এ জগতে কোন জ্ঞানই বস্তুত কোন মানুষের নিজস্ব নয়।

এমন ঘোষনার মাধ্যমে এখানে কারও অহমবোধ প্রদর্শন ও প্রকাশের কোনরূপ সুযোগ রাখা হয়নি। সেটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মানুষের জন্যও এখানে শিক্ষনীয় আছে। ভাল কাজ আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে করতে হয়। নয়ত সেটি মন্দ কাজে পরিণত হয়ে যেতে পারে। ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও অহমবোধের সৃষ্টি করতে পারে। কৃতিত্ব দাবীর মানবীয় প্রতিযোগীতায় পরিণত হতে পারে এবং বিতর্ক সৃষ্টির সুযোগ তৈরী করতে পারে।

কোন বার্তা আল্লাহ প্রদত্ত- এমন বার্তা বা ধারণা উক্ত বিষয়কে মানবসমাজে অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটিও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে যিনি বোঝেন তিনি জানেন যে সকল ভাল বা উপকারী সকল ধারণাই আল্লাহ প্রদত্ত। কেননা যে কোন প্রকারে তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস [দ্রষ্টব্য ১.ক]।

সন্দেহবাদীদের জন্য এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আল্লাহ কোন মন্দ কাজের আদেশ করেন না। আল্লাহ প্রদত্ত বার্তা অবশ্যই সত্য ও ন্যায়সম্মত হতে হবে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৬:১১৫)। অতএব যে কেউ যে কোন নির্দেশনা আল্লাহর নামে জারী করেও কোন সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ না হলে সেটি আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠা পাবে না বা তাকে আল্লাহর নামে প্রতিষ্ঠা করাও যাবে না। বিষয়টি এতটাই সহজ নয়। আর নির্দেশনা সত্য ও ন্যায় হলে কোন সুযোগ সন্ধানী সেটাকে কাজেও লাগাতে পারবে না।

কোন বার্তা আল্লাহ প্রদত্ত কিনা সেটি সত্য ও ন্যায়ের কষ্টি-পথর দিয়ে যাচাই করে নিতে হয়। আর সেভাবে যাচাই করলে এমনকি সন্দেহপ্রবণ মানুষও বুঝতে পারবে যে কোরআনের বার্তা সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। মানবীয় ত্রুটি ও বিচ্যুতিহীন। নিরপেক্ষভাবে এমন বার্তা আল্লাহ ভিন্ন কোন ব্যাক্তি বা মানুষের পক্ষে দেয়া সহজ বা সম্ভব না।

একজন অক্ষর-জ্ঞানবিহীন মানুষের মাধ্যমে কোরআন যে সময়কালে ইহলৌকিক-পারলৌকিক বিষয়, মানুষের ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক জীবন, আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, যুদ্ধ থেকে শুরু করে এমনকি সৃষ্টি সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয় ও দর্শন যেভাবে মানব সমাজে তুলে ধরেছে, সেটিও এর অবতীর্ণতার ক্ষেত্রে কোন অদৃশ্যের অনুগ্রহের উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিতে যথাযথভাবেই অনুপ্রাণীত করে।

অতএব এটি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় যে কোরআন আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি বাস্তবেও একটি যৌক্তিক ভাবনারও বিষয়। যাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে তাদেরকেও বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। কেননা কোন একক ব্যাক্তি বা মানুষের পক্ষ্যে এভাবে এমন কাজ করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের কথা ভিন্ন। তারা সকল প্রকার তর্কের উর্ধ্বে থেকে বিষয়গুলি বিশ্বাস করে।

কোরআনের পূর্বে যে সব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সে প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা আবশ্যক। যেমন- তাওরাত, ঈঞ্জিল বা বাইবেল সেগুলিতেও বিশ্বাস রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেসবের অবতীর্ণতার বিষয়েও মনে কোন সন্দেহ বা বিদ্বেষ রাখা যাবে না। অবতীর্ণ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহে যা বলা হয়েছে কোরআন একই বার্তা নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ এক আল্লাহর ধারণা। 'তাওহীদ' এর বাণী। বিষয়টি কেবল বিশ্বাস নয়, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহ অধ্যায়ন করার মাধ্যমেও বিষয়সমুহের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব।

তাওরাত বা তোরাহ বা বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং যবুর, ঈঞ্জিল সকল গ্রন্থই আল্লাহর দিক থেকে আগত এবং একই বাণী প্রচার করেছে। এমনকি গীতাও। এসবের মৌলিক নীতি বা বক্তব্য এক যা একই আল্লাহ প্রদত্ত। সর্বশেষ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর কোরআন অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে তাকে যুগোপযুগী করা হয়েছে। যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহে প্রবেশ

করেছিল এখানে তা সংস্কার করা হয়েছে। নয়ত নতুন দিক-নির্দেশনা আগমনের প্রয়োজন ছিল না।

এটিও কোরআনের একটি শিক্ষা যে, দিক-নির্দেশনাকে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় বিবেচিত হতে হবে। শেষ নবীর পরে আর কোন নবী আসবে না। অতএব নির্দেশনাকে যুগোপযোগী করে নেয়ার দায়িত্ব এখন মানুষের ওপর তথা জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষদের ওপরই বর্তায়।

কোরআন একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সময়ের সাথে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর দিক থেকে। মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

"তিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ) সত্যসহ, যা স্বীকৃতি দেয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের, যেমন তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ঈঞ্জিল।" (আল-কোরআন ৩:৩)

"... আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি একটি ধারাবাহিক অবতীর্ণ বাণীর অংশরূপে (ক্রমশ)।" (আল-কোরআন ১৭:১০৬)

কোরআন আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি সর্বশেষ, বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে হলেও পূর্ববর্তীগ্রন্থসমুহ আল্লাহর দিক থেকে আগমন করেছে সেটিও বিশ্বাস করতে হয়। কেননা পূর্ববর্তীরাও তেমনভাবে বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। নয়ত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপরে অবতীর্ণ কোরআন আল্লাহর দিক থেকে এসেছে সে বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। পূর্ববর্তী পথ-নির্দেশনাসমুহ আল্লাহর দিক থেকে এসেছে, এ বিশ্বাস কোরআনের অবতীর্ণতার সত্যতাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এমনকি পূর্বের গ্রন্থের অনুসারীদেরও সেটি অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

সত্য হচ্ছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের অধ্যায়ন থেকেও দেখা যায় যে, কোরআনের আলোচনায় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের দিক-নির্দেশনার ধারাবাহিকতা বজায় আছে। কোরআনে অনেক বক্তব্য আছে যা বাইবেল থেকে এসেছে। আল্লাহর দিক থেকে আগত সকল বাণীর মূল বক্তব্য একই। যেমন আদম-হাওয়ার সৃষ্টি ও তাদের

পৃথিবীতে আগমনের ঘটনা, জগত সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ ইত্যাদি অনেক আলোচনা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের ধারাবাহিকতায় কোরআনে এসেছে।

পূর্ববর্তী অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহ নানান কারণে বিকৃত হয়েছে। যা মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভাজনের কারণেও সৃষ্টি করেছে। ফলে সেগুলি সঠিক পথ প্রদর্শন করার উপযোগীতা হারিয়েছে। সেগুলির ওপর আস্থা রাখলে ভূল পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বা আছে। সেসব বার্তার মাঝে নানান কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল এবং স্বার্থান্বেষী মহল ও সুবিধাভোগীরা সেসবের সুবিধাও গ্রহণ করে চলছিল। রাজনৈতিক কারণও ছিল। কোরআনের সামগ্রীক আলোচনায় বিষয়গুলির বিস্তারিত জানা যাবে।

বাইবেলে এক আল্লাহর কথা বলা হয়েছে। মূর্তী পূঁজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ বাইবেলের অনুসারীরা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরোপ করেছে। তারা এক পর্যায়ে মূর্তী পূঁজায়েও নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। এ সব তারা করেছে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে। যার পেছনে কারণস্বরুপ ক্ষমতা বা রাজনীতি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কোরআনে তাই বলা হয়েছে,

“... পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও গ্রন্থপ্রাপ্তরা (ইহুদি-খ্রীষ্টানরা) পারস্পরিক বিদ্বেষ বা ঘৃণাবশত (ধর্মের মধ্যে) বিভক্তি সৃষ্টি করে। ...” (আল-কোরআন ২:২১৩)

“যারা কোরআনকে (বাইবেলকে) বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। তোমার পালনকর্তার শপথ, তারা যা করেছে সে বিষয়ে তাদের প্রত্যেককে আমি প্রশ্ন করব।” (আল-কোরআন ১৫:৯১-৯৩)

এখানে ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে, যারা তাওরাতকে বা কোরআনকে তথা আল্লাহর বাণীকে বিকৃত করেছে।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ কোরআন পূর্বতন গ্রন্থসমুহের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমুহকে দুর করেছে। আল্লাহর বাণীকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করেছে। পরিশেষে তাই এটিই অনুসরণীয়। এর পরে আর কোন নতুন ধর্ম আগমন করেনি। কেউ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলেও এখানে উপস্থাপিত দর্শনের আওতার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে মূল বক্তব্য সব বলে দেয়া

হয়েছে। এর পরে যা আগমন করেছে তা বিজ্ঞানীদের কাছে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরের বিস্তারিত জ্ঞান। তাদের অবদান পৃথিবীকে এতদুর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। যিনি বোঝেন তিনি জানেন যে, সকল ভাল বা উপকারী ধারণাই আল্লাহ প্রদত্ত। কেননা যে কোন প্রকারে তিনিই সকল জ্ঞানের উৎস (দ্রষ্টব্য ১.ক)।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনে, সত্য ও সঠিক বার্তার প্রচার ও প্রসারে এ বাণীর ধারক ও বাহকের জন্য মানুষের সহযোগীতা প্রাপ্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মদীনা ও তার আশেপাশে ইহুদিদের বসবাস ছিল যারা পূর্বেই আল্লাহর দিক থেকে গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছিল। সভ্যতা এবং জ্ঞানগর্ভে তারা অগ্রগন্য বলে পরিচিত ও বিবেচিত ছিল। চিন্তা-চেতনায় তৎকালীন সময়ে তারা তুলনামূলক অগ্রসর ছিল। এক সময় তারাও আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করেছে ও রেখেছে। যদিও তারা তাদের পূর্বতন শৌর্য্য-বীর্য্য ও চেতনা থেকে দুরে সরে গিয়েছিল। পথচ্যুত হয়েছিল। নানান কুসংস্কার ও সুবিধাভোগী আচরণ তাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। তবে তাদের সকলেই এক রকম নয় কোরআনে সে কথাও বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তাদের (ইসরাইলিদের) সবাই এক রকম নয়। গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা রাতের গভীরে অবিচলভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করে সেজদায় পতিত হয়ে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সঠিক আচরণের নির্দেশ দেয় এবং অশোভন কাজকে নিষেধ করে এবং ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে। এরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী।" (আল-কোরআন ৩:১১৩-১১৪)

"মূসার সম্প্রদায়ে (ইহুদিদের মধ্যে) এমনও মানুষ আছে যারা সত্য পথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।" (আল-কোরআন ৭:১৫৯)

মোহাম্মদ (সাঃ) একই আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন যা তাদের নবী-রাসূলগন প্রচার করে গেছেন। সত্যের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে আয়াতের এ অংশটি তাই বলা যায় যে পূর্ববর্তী অবতীর্ণ গ্রন্থে যারা বিশ্বাসী তাদের সমর্থন

লাভের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করার একটি উপায় হয়েও কাজ করেছিল। যদিও পরবর্তীতে তারা সহযোগী না হয়ে বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয়েছিল।

পূর্ববর্তীদের দেখান পথকে স্বীকৃতি না দিয়ে বা একেবারে উপেক্ষা বা পরিহার করে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা করা দুরুহ কাজ। কেননা সে ধারার অনেক ধারক, বাহক ও সুবিধাভোগী থাকে। তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করা যায় না। ফলে এ বাণী তাদের গ্রন্থের সত্যতাকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে বিরোধীতাপূর্ণ পরিস্থিতিকে সহনশীল রাখতেও ভূমিকা রেখেছে বলা যায়।

সকলের মাঝেই কিছু ভাল দিক থাকে। সেগুলিকে স্বীকৃতি দেয়া বা গ্রহণ করে নেয়া মন্দ কিছু নয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ভালর মধ্যে মন্দ যা কিছু প্রবেশ করেছে তার সংস্কার করা এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। ফলে পূর্ববর্তীগনের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখার এ বাণী নতুনের গ্রহণযোগ্যতাকে সকলের মাঝে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনারও সৃষ্টি করেছে।

কোরআনে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের আলোচনার রেশ আছে। এখানে অনেক বক্তব্য রয়েছে যার উৎস বাইবেল। পূর্ববর্তীগনের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখার বিষয়টি তাই অত্যান্ত গুরুত্ব বহন করে। যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হবে তাদেরকে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের বাণীতেও বিশ্বাস রাখতে হবে। এটিও একটি শর্ত। যে তাতে বিশ্বাস করবে না বা এসব শর্তে বিশ্বাস রাখবে না, বস্তুত সে পরিপূর্ণভাবে দর্শনে বিশ্বাসী নয়। বিষয়গুলি যৌক্তিকতার সাথে এভাবে ধরে নেয়া হয়েছে। সে হবে অবিশ্বাসী নয়ত সন্দেহপ্রবণ। অবিশ্বাসী নির্দেশনা মেনে চলবে না। সন্দেহপ্রবণ যা মেনে চলবে চিত্তের দৃঢ়তার অভাবে তা ফলদায়ক হবে না। ফলে কোরআন প্রদর্শিত পথ তাদেরকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে না।

▪ **২.৪.২** এবং (কোরআন পথ প্রদর্শনকারী তাদের জন্য) পরকালের বিষয়ে বিশ্বাস যাদের নিশ্চিত : কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা সূরা-ফাতেহায় মানুষকে একটি বিচার দিবস সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। যে দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। আয়াতটি মানুষের মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদ্রেক করে। যেমন কবে, কখন সে বিচারকার্য সম্পাদিত হবে ইত্যাদি।

মানুষকে পরকালে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। পরকালে মানুষের কর্মের বিচার হবে। সেদিন মানুষ তার পার্থিব কৃতকাজের জন্য পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তির মুখোমুখী হবে। এখানে পরকালের বিষয়ে মানুষকে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে। যারা পরকাল ও বিচার দিবসে বিশ্বাস করবে তাদেরকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন। কেননা এ বিশ্বাসের কারণে মানুষ ভূল বা অন্যায় কাজ করা থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে। আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে। ফলে অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই তারা প্রদর্শিত পথ থেকে সুফল পায়।

পরকালকে যে অস্বীকার করে সে মনে করে তার যথেচ্ছাচার আচরণের জন্য কখনই তাকে কোন ফলাফল ভোগ করতে হবে না। এ পার্থিব জীবনই শেষ কথা। ফলে যথেচ্ছাচার আচরণ করতে মনের মধ্যে সে কোনরূপ বাধা অনুভব করবে না। বিশেষত যদি তার শক্তি, ক্ষমতা ও টিকে থাকার বুদ্ধি থাকে। কেননা সে কোন বিষয়ে ভীত নয়। সে জাগতিক খেলার শেষটুকু খেলে হলেও সব অর্জন করতে চাইবে। নীতি-নৈতিকতার কোন ধার সে ধারবে না। সে জানে এ জীবনই তার শেষ। এরপর আর কোন হিসেব-নিকেশ নেই। এখানে কোন প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ছেড়ে দেয়া হল বোকামি বা মূর্খতা। এটিও একটি জীবন দর্শন। এ ধারণায় বিশ্বাসীদেরকেই কোরআনের ধারণা মতে অবিশ্বাসীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সে কারণেই ধরে নেয়া হয় যে অবিশ্বাসীদের পক্ষেই মন্দ কাজ করা সম্ভব।

পরকালের বিষয়ে যার বিশ্বাস নেই অর্থাৎ অবিশ্বাসী সে কোরআনের পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে না। অনুসরণ না করলে সুফলপ্রাপ্ত হবে না। কথাটি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ের জন্য সত্য তেমনি সামষ্ঠিক পর্যায়েও প্রযোজ্য। পরকালের বিষয়টিকে তথ্য, প্রমাণ বা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ফলে এ বিষয়টিতে কেবল বিশ্বাসই আনতে হবে এবং সে বিশ্বাস হতে হবে নিশ্চিত। কোন সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মনের মধ্যে রাখা যাবে না।

যদিও পরকালের বিষয়টি তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রমাণ করা যায় না তথাপি মানুষের সাধারণ জ্ঞান বলে যে, এত বড় সৃষ্টি কোন কারণ ভিন্ন সৃষ্টি হতে পারে না। আমরা নিজেরাও যা সৃষ্টি করি সেটিও কোন কারণে করি। জগতে যত কাজ সম্পন্ন হয় কোন কারণে হয়। অতএব বিধাতা বলি প্রকৃতি বলি,

যাই বলি না কেন এত বড় সৃষ্টি কারণবিহীন হতে পারে না। সেটি হওয়া সাধারণ জ্ঞান কিংবা যুক্তি ও বুদ্ধিসম্মতও নয়। ফলে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এখানে আনা যেতেই পারে। কেবল সুযোগ সন্ধানি এখানে এসে যুক্তি মানতে চাইবে না।

বাস্তব জীবনেও পরকালের কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে যারা মন্দ কাজ করার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু অর্জন করেছে বলে ভাবে, পরকালে অর্থাৎ জীবনের শেষ দিকে একসময় তাদেরকে তাদের মন্দ কাজের জন্য ইহকালেও বিচারের মুখেমুখী হতে হয়। এগুলি নিয়ম বা সূত্র। যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে আরোপ করে রেখেছেন। সকল বর্তমান কর্মের পরের একটি কাল আছে, যেখানে পূর্বে সম্পাদিত কর্মের ভাল বা মন্দ ফল পেতে হয়। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করেন যেন মানুষ বিষয়গুলি বুঝতে পারে।

এ জগতে আমরা যত কাজ করি তার ভালটির জন্য পুরস্কার এবং মন্দটির জন্য শাস্তির ব্যাবস্থা আছে। সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে সেটি থাকা বাঞ্ছনীয়। পরকালের ধারণাটিকে জাগতিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনেও অনুপ্রানীত করা দরকার। মানুষের জন্য মৃত্যু পরবর্তী একটি বিচার ব্যাবস্থা থাকা যৌক্তিক। কেউ যদি মনে করে যে তেমন কিছু নেই, তবে না থাকলেও এটি ভেবে নেয়াই উত্তম এবং সেটি সভ্য সমাজ গড়ে তোলার জন্যও প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য বলা যায়।

সর্বপরি যদি পরকাল বলে তেমন কিছু নাও থাকে তবে জগতের সুশৃংখল পরিচালনা এবং মানবের ভাল কাজের প্রেরণার জন্য হলেও ধারণায় তেমনটি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভাল মানুষের আশাকেও জাগ্রত করে। গতকালও যে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে দেখা হয়েছে আবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে! পৃথিবীতে তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে বাকী জীবন বেঁচে থাকার জন্য এর চেয়ে আশাপ্রদ ও সুখের বাণী আর কি হতে পারে! বলা হচ্ছে,

“যারা বিশ্বাসী এবং যাদের সন্তানেরা বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব এবং তাদের কাজের যথাযথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বিন্দু পরিমাণেও বঞ্চিত করা হবে

না। প্রত্যেক ব্যাক্তি সে যা অর্জন করেছে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে।" (আল-কোরআন ৫২:২১)

কেন একটি হতাশার বা নিরাশার ধারণাকে লালন করে একটি আশাপ্রদ ভাবনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখব? বস্তুত মানুষের সকল সুখ-দুঃখ কেবল ধারণারই খেলা। স্বপ্নের মতো। পার্থিব বাস্তবতাও এক স্বপ্ন। কিন্তু যারা এখানে নিজেদেরকে অধিক পরিমাণে জড়িয়ে ফেলেছে, যারা এখানে বহুকিছুর মালিকানার দাবীদার, নিজেদের অধিকার আদায়ে ব্যাস্ত- তাদের কাছে জগতের রূপ ভিন্ন একরকম লোভনীয়। অথচ তাদের নিশ্চিত জ্ঞানও জানে যে অতি স্বল্প সময়ের জন্য এ এক ভঙ্গুর জীবনব্যাবস্থা।

পরকালের কথা চিন্তা করে এমন লোভকে পরিত্যাগ বা সম্বরণ করতে বলা হয়েছে। কেননা পার্থিব জীবনের এ লোভ বা আকর্ষনই মানুষকে জাগতিক অতি বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে এবং বিপথে নিয়ে যায়। যার পরিণতি পরকালীন শাস্তি। সমগ্র গীতায়েও তাই জাগতিক এ লোভ বা কামনা-বাসনা থেকে সৃষ্ট বন্ধনকে পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"ভগবানের জন্যই কেবল কর্ম; তা ছাড়া কর্ম এ জগতে কেবল বন্ধনেরই কারণ। অতএব সে অর্থেই কর্ম কর, আসক্তিরহিত হয়ে।" (গীতা ৩:৯)

সকল ধর্মগ্রন্থসমুহ একই সুরে কথা বলেছে। ঘুরে ফিরে ধর্মগ্রন্থসমুহের মর্ম বাণী এক। বিধাতায় সমর্পন। কিন্তু যারা এক একটি ধর্মকে উপার্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে তারা মর্ম কথা প্রকাশ করে কম। তারা শব্দের কিংবা উচ্চারণের ওপর জোর দেয়। মানুষ তাতে বিভ্রান্ত হয়। যারা বিভ্রান্ত করে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তাদের নিজেদের যতটা না দায় বা দোষ, তার চেয়েও অধিক দায় বোধসম্পন্ন হওয়া সত্বেও যারা নিজ জ্ঞান প্রয়োগ করে বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করে না এবং বিভ্রান্তির পথে পা বাড়ায় তাদের নিজেদের।

যিনি শান্তিপূর্ণ জগত দেখতে চান, যিনি বিষয়সমুহ নিয়ে ভাবেন বা যিনি এই জগতের পরিচালনার সাথে যুক্ত- তিনি তার বাস্তব জ্ঞানে জানেন বা বোঝেন যে, বিচিত্র ভাবনার অগনিত মানুষের পরিচালনার জন্য এ কাজগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা উপায়। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে যে,

"প্রকৃতির গুণে বিমূঢ় চিত্ত ব্যাক্তিগণ গুণের প্রভাবে কৃত কর্মে আসক্ত হয়। স্বল্পজ্ঞানের এইসকল ব্যাক্তিগণের কর্ম নিম্ন পর্যায়ের হলেও জ্ঞান সম্পন্নদের উচিত নয় তাদেরকে বিচলিত করা।" (গীতা ৩:২৯)

তবে সত্যের সন্ধানি কিছু মানুষের জন্য এসব বিষয়ের অন্তর্নিহিত যুক্তি বা গুঢ় রহস্যও তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। যদিও জগতের অগনিত সাধারণ মানুষের জন্য কেবল বিশ্বাসকে উৎসাহিত করাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব। কিন্তু এ বিষয়ে তখনই সমস্যার আবির্ভাব ঘটে যখন কোন অবতীর্ণ বাণীকে কাজে লাগিয়ে কোন স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের সুবিধা লুটে নিতে চায় কিংবা চরম সত্যেরও বিরোধীতা করে। তখনই সত্য প্রকাশের তাড়না সৃষ্টি হয় বা প্রয়োজন বোধ হয়। আর এ সমস্যা কেবল আজকের দুনিয়ায় নয়, হাজার বছর পূর্বেও যারা এসব বার্তার প্রবর্তক ছিলেন তাদেরকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাই বলা হয়েছে,

"যারা অবতীর্ণ বাণীসমুহকে নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন বা বিকৃত করে, তারা আমার অগোচরে নয়। ... তোমরা যা ইচ্ছে কর; নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।" (আল-কোরআন ৪১:৪০)

'নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।' এর অর্থই হচ্ছে যদি তোমরা মন্দ কাজ কর তবে তার মন্দ ফলাফল প্রাপ্তির জন্যও নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখ। পরকালে সে প্রাপ্তিই ঘটবে। ভাল কাজের ভাল ফলাফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফলাফল।

পরকালের শর্ত একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটি বিশ্বাসের মধ্যে আনতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষন করা যাবে না। কোরআনের দর্শন থেকে ব্যাক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা সমগ্র বিশ্ব বা মহাবিশ্বকে উপকৃত হতে হলে পরকালের শর্তে সকলকে বিশ্বাস রাখতেই হবে।

সৃষ্টিকর্তা নেই এবং পরবর্তীতে কোন জবাবদিহিতা নেই, পৃথিবীতে যদি শুধুমাত্র এমন দর্শন বিস্তার লাভ করত তবে জগত অন্যরকম হতে পারত। আজও পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা বেশী। তারা নিজ থেকে ভাল পথে চলে। এর পেছনে সৃষ্টিকর্তার ধারণা এবং ধর্মীয় দর্শনের পরকাল সম্পর্কিত ধারণার একটি বড় প্রভাব রয়েছে।

জগতে বিপুলসংখ্যক মানুষ পরবর্তী জীবন বা পরকালে বিশ্বাস করে। কর্মের ফলাফলে বিশ্বাস করে। ফলে নিজ থেকে ভাল হয়ে চলে। তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াতে হয় না। এদের কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ ইহুদি, কেউ .. এভাবে আরও অনেক। বস্তুত জগতের সকল মানুষই কোন না কোন ফর্মে বিশ্বাসী।

একই অংক বিভিন্ন নিয়মে করা যায়। সবগুলি পদ্ধতিই সঠিক এবং সব পদ্ধতিতে একই উত্তর আসবে। কিন্তু কোন শিক্ষক কোন একটি পদ্ধতিকে গ্রহণ নাও করতে পারে। সেটি একান্তই একজন শিক্ষকের ব্যাক্তিগত বিবেচনা। তাতে কিন্তু কোন পদ্ধতির সঠিকতা নষ্ট হয়ে যায় না। তাই কোন বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী বলতে বা আখ্যায়িত করতে হয় না, যদি না সে স্পষ্টতই কোন অন্যায় কাজ করে থাকে। এটি চরম মূর্খতা এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন মনোভাব যা নিচু পর্যায়ের।

মানুষকে নানানভাবে সতর্কবার্তা প্রদান করার পরেও কিছু মানুষ চিরকালই অপকর্ম করে যাবে। তবে তাদের সে সংখ্যাটিও ধর্মীয় দর্শনের প্রভাবের কারণে অনেকটাই হ্রাসপ্রাপ্ত থাকে। তাদের মধ্যেও এমন মানসিকতার কিছু মানুষ আছে যারা অপকর্ম করার পরেও অনুশোচনায় ভোগে। সৃষ্টিকর্তার কাছে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুত একটা পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন যাবার আর কোন পথ থাকে না।

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ধারণা ব্যাতিত জীবনের অর্থ হতে পারত অন্যরকম। কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, কিভাবে এলাম জানিনা। জানতেও চাইনা। এলাম, দেখলাম, খেলাম, বর্জ ত্যাগ করলাম এতটুকুই জীবন। এমন দর্শনে যথেচ্ছাচার জীবন-যাপনে বাস্তবিক অর্থে কোন বাধা নেই। নগদ প্রাপ্তিই সব। কেউ যদি তেমনটি না করে তবে সেটি নিতান্তই তার নিজস্ব বদান্যতা। নগদ প্রাপ্তি ছেড়ে দেয়া ও যথেচ্ছাচার জীবন যাপন পরিত্যাগ করা তেমন দর্শনে চরম বোকামি বা নির্বুদ্ধিতা। কেননা এর জন্য কোন ফলাফল প্রাপ্তি বা জবাবদিহিতা নেই। নেই কোন শংকা। নেই কোন প্রত্যাশা। ছলে-বলে-কৌশলে অর্জনে তেমন ক্ষেত্রে ধারণাগতভাবে কোন ত্রুটি নেই, বরং নির্বুদ্ধিতা আছে। এমন দর্শনের অনুসারীরা যে কোন উপায়ে বাস্তব জীবনটাকে কেবল নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে। তারা জানে যে এরপরে আর কিছু নেই।

এমন দর্শনে জীবনের সফলতা বলে কোন কিছু কোন অর্থ বহন করে না। এক জীবনেই সব শেষ। পরবর্তী প্রত্যাশাবিহীন জীবন অর্থহীন, বর্ণহীন, অসাড়। পরবর্তী প্রত্যাশা ও আকর্ষনবিহীন ক্ষণকালের এ জীবন ধারণায়ও নিরান্দময়।

পরকালের ধারণা মানবের জীবন দর্শনে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টিকারী। এই একটি বিষয় নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে আনা সম্ভব হলে জগতে আরও বেশী অপকর্ম হ্রাস পাবে। তবে আল্লাহ ভিন্ন এটি প্রতিষ্ঠা পাবে না। তাই না দেখা সব শর্তে বিশ্বাস রাখতেই হবে। এগুলি একটির সাথে একটি সম্পর্কযুক্ত। সব মিলে একটি লক্ষ্য অভিমুখে কাজ করে।

মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পরকালের ধারণা মেনে নেয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এই একটি ধারণার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কজনিত আরও অনেকগুলি শর্ত ও তাতে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় জড়িত। পরকালের ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক আছে মানবের কর্মের হিসেব সংরক্ষন, বিচার দিবস, পুরস্কার লাভ, শাস্তি প্রাপ্তি, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি নানান ধারণার। সকল বিশ্লেষণ সমাপ্ত করেই তাই বলা হয়েছে,

"যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। যদিও তাদের প্রতি আমি দয়া প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করি, তথাপি তারা তাদের অবাধ্যতায় নিজেদের গন্ডির মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে।" (আল-কোরআন ২৩:৭৪-৭৫)

▪ **২.৫** এরাই তাদের পালনকর্তার পথ প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে; এরাই সফল : ওপরে যেসব শর্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যারা শর্তগুলি মন থেকে মেনে নেবে তারা বিশ্বাসী। বলা হচ্ছে, বিশ্বাসীরাই সফল। কারণ তারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। তাই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির জন্য যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা তারা অনুসরণ করে চলে। কোন পথের অনুসরণ ভিন্ন সাফল্য আসবে কিভাবে? পথের অনুসরণ করতে হবে। পথ যদি যথাযথ হয় তবে সাফল্য আসবেই।

মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, কোরআনের দেখান পথটি আসলে কি, যে পথের অনুসরণে মানবজীবন সফল হবে? সেটি এক কথায় বলে দেয়ার চেষ্টা

করা সঠিক হবে না। সমগ্র কোরআনের আলোচনায় বিষয়গুলি যথাস্থানে এক এক করে উঠে আসবে। তবে এ বক্তব্যকে সঠিক ধরে নিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি করতে হবে আলোচ্য বিষয়ের সত্যতাকে বোঝার সুবিধার্থে। সমগ্র কোরআনের বিশ্লেষনাত্মক আলোচনায় এ দাবীর সঙ্গে বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে। তাহলেই বোঝা যাবে কোরআন কোন পথ প্রদর্শন করেছে এবং কোন অর্থে এ পথের অনুসরণকারীদেরকে সফল বলা হয়েছে।

কোরআনে প্রদর্শিত পথ কিছু নির্দেশনা পালন করা ও না করার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বাসী না হলে মানুষের দ্বারা নির্দেশনা পালিত হবে না। যদি কোরআন সত্যিই সঠিক পথ প্রদর্শন করে তবে নির্দেশনা পালিত না হলে সফলতা আসবে না। এ বক্তব্যটিই সত্য বা যথাযথ।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন মানুষ নির্দেশনা পালন করবে? সে জন্যই না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে যিনি এ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। পরকালের বিচার দিবসকে বিশ্বাস করতে হবে যার সাথে পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় জড়িত আছে।

নির্দেশনা পালন করা বা না করার সঙ্গে পরবর্তীতে পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রাপ্তির সম্পর্ক আছে। পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং শাস্তির ভয় দুটোই মানুষকে প্রদর্শিত পথে চলতে অনুপ্রাণীত কিংবা মানসিকভাবে বাধ্য করে যা প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং ভয় থেকে সৃষ্ট। না দেখা শর্তগুলি এর ভিত্তি। যারা ওপরের শর্তগুলি বিশ্বাস করবে প্রদর্শিত পথে তাদের চলতেই হবে। প্রদর্শিত পথে চললে ফল লাভ হবে। এভাবেই কোরআনের বিষয়গুলি একটির সাথে অপরটি সম্পর্কিত।

যারা উল্লেখিত শর্তগুলি গ্রহণ করতে পারবে না কোরআন তাদের জন্য পথ-প্রদর্শক হয়ে কাজ করবে না; প্রকৃতপক্ষে করতে পারবে না। কেননা তারা নিজেরাই নির্দেশনা মেনে চলবে না। পথ-নির্দেশনা মেনে না চললে কিভাবে পথ পাবে?

কোরআনে যে পথ প্রদর্শিত হয়েছে তার প্রতিটি বিষয় একটির সাথে একটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে তা বিশ্বাসীদেরকে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ, পরকাল, বিচার দিবস, পুরস্কার-শাস্তি, উপাসনা, যাকাত

এসবের প্রতিটি বিষয় ধাপে ধাপে মানবজীবনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সফলভাবে পৌঁছে দেয়। কি সেই লক্ষ্য? কোন সে সফলতা?

কোরআনের দর্শন মতে মানব জীবনের সফলতার (Success) দুইটি দিক আছে। একটি তার ইহজাগতিক সফলতা এবং অপরটি পরকালীন সফলতা [সফলতা দ্রষ্টব্য ২.৩.১]। বলা হচ্ছে,

"সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে এটিকে (আত্মাকে) বিকশিত করে এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যর্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।" (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)

"আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের কানন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। তারা সেখানে বসবাস করবে। কানন-কুঞ্জে থাকবে উত্তম বসবাসের ব্যাবস্থা এবং ততধিক ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা। এটিই হল মহাসাফল্য।" (আল-কোরআন ৯:৭২)

আত্মার বিকাশের সাথে আচার-আচরণ বা চারিত্রিক বিকাশের সম্পর্ক আছে। যা ইহজগতে সফলতার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটিই আবার মানুষকে পারলৌকিক সফলতার দিকে ধাবিত করে। এগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়।

যারা পরকালে সফলতা অর্জন করবে সেটিকেই কোরআন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ খেলা বা পরীক্ষার শেষ ফলাফল প্রাপ্তি। সে অর্জনই মূলত মানবজীবনের প্রকৃত সফলতা। কেননা সেটির সাথে চিরস্থায়ী সুখ-প্রশান্তির জীবন প্রাপ্তির সম্পর্ক আছে। সে জীবনে মানুষের আর মৃত্যু হবে না। এর চেয়ে বড় সফলতা মানব জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে আর কি হতে পারে? কিন্তু তার জন্য প্রেরীত বার্তায় বিশ্বাস রেখে প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। এ চলাই জীবনকে সফলতার দুয়ারে পৌঁছে দেবে। এমনই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

কোন সে পথ যে পথ সফলতার দুয়ারে মানুষকে পৌঁছে দেবে? এক কথায় বলা যায় ভাল কাজ করতে হবে। কিন্তু সেটি করতে না পারলেও অন্তত মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে বা তা পরিহার করে চলতে হবে। সে কারণেই উপাসনা, যাকাত, দান নানাবিধ ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের অবতারণা ও দিক-নির্দেশনা। যা ভাল কাজে মানুষকে নিয়োজিত রাখে এবং মন্দ কাজ থেকে দুরে থাকতে উৎসাহিত ও সহায়তা করে।

শাস্তির ভয় ও পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশার সাথে মানুষের ভাল হয়ে চলা বা মন্দ কর্ম পরিত্যাগ করে চলার সাথে নিবিড় সম্পর্ক আছে। দু'টো কারণেই বিশ্বাসীকে সতর্ক বা সচেতন হয়ে চলতে হয়। মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে হয় এবং ভাল কাজ করতে হয়। আল্লাহর প্রদর্শিত পথ এভাবেই মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালনা করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে মানসিকভাবে এক প্রকার বাধ্য করে। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে); যারা আল্লাহকে ভয় করে এতে তাদের দেহ শিহরীত হয়, ফলস্বরূপ তাদের দেহ ও মন আল্লাহর সতর্ক বার্তায় ও স্মরণে বিনম্র হয়। এমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে আল্লাহ বিপথে চালিত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।" (আল-কোরআন ৩৯:২৩)

ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি খুব সহজও নয়। যুগে যুগে আল্লাহ মানুষের জন্য তাই ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপক দিক-নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। বলা হচ্ছে,

"যুগে যুগে মানুষের দিক-নির্দেশনারূপে তিনি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন সঠিক ও ভূলের নির্দেশক। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস করে তারা কঠিন বিপদের মুখোমুখী হবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, ভূল উৎপাটনে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩:৪)

এ জগতে মানুষের করা ভাল কাজ তাকে পারলৌকিক জীবনের পুরস্কার বা স্বর্গ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। মন্দ কাজ শাস্তি বা নরকের কথা বলে। রূপরেখার প্রতিটি বিষয় যৌক্তিকভাবে একটি অপরটির সাথে কার্যকারণের সম্পর্কে সম্পর্কিত। যা কিনা অনুসরণকারীকে একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। সেটি হচ্ছে আল্লাহকে পাওয়া! এটিই লক্ষ্য! যেমনটি গীতায় বলা হয়েছে,

"অনন্যচিত্তে যে চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে তার কাছে আমি সহজলভ্য।" (গীতা ৮:১৪)

আল্লাহ বলি ভগবান বলি পরিশেষে সকলে তাঁকেই পেতে চায়। এটিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাঁকে পাওয়া সম্ভব হলেই সব পাওয়া হয়। জীবন সফল হয়।

অপরদিকে ইহজগতেও মানবের সফলতার আবার দু'টি দিক আছে। একটি মানুষের ব্যাক্তিক পর্যায়ে। অপরটি সামষ্ঠিক বা বৃহত্তর পর্যায় বা আঙ্গিকে। ব্যাক্তিক পর্যায়ে বিষয়টি মানব মনের প্রশান্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র বলয়ের আঙ্গিকে শান্তি স্থাপন ও উন্নতি করতে পারার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে বৃহত্তর পর্যায়ে এটি রাষ্ট্রিয় থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পর্যায়ের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও কল্যাণ সাধন এবং সামগ্রীক অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত।

অন্তরের সুখ ও প্রশান্তি ভিন্ন গাড়ি-বাড়ি, জায়গা-জমি ইত্যাদি কিছুই মানুষকে সফলতা এনে দিতে পারে না। একসময়ে এসবের মোহ আরেক সময়ে যন্ত্রনার কারণ হয়ে দাড়ায়। কথাটি সকলের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে প্রদর্শিত রূপরেখায় উপাসনা থেকে শুরু করে দর্শনে আরও যেসব কর্মযজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে, তার সবই মানব মনে মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। এ বন্ধনই জীবন ও জগতকে সচল রাখে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তীতার জীবন চর্চার সাথে ব্যাক্তিক উন্নতিরও সম্পর্ক আছে। এসবের মনস্তাত্বিক গুরুত্বও আছে। যা প্রেরণা হয়ে কাজ করে।

ব্যাক্তিক প্রশান্তি বৈশ্বিক পরিসরে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে। হজ্ব, যাকাত বৃহত্তর পরিসরে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। বস্তুত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত এর প্রতিটিই ব্যাক্তিক থেকে বৈশ্বিক পরিসরে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। যথাস্থানে বা সামগ্রীক আলোচনায় বিষয়সমুহ বিস্তারিতভাবে উঠে আসবে।

কোরআনের উৎস নিশ্চিত জ্ঞানে জানেন যে, যে পথ কোরআনে প্রদর্শিত হয়েছে তা সত্য ও সঠিক। এ পথ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই মানুষকে সফলতা এনে দেবে। কিন্তু তার জন্য নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। কিন্তু কেউই নির্দেশনা মেনে চলতে চাইবে না। তাই শর্তসমুহের আরোপকরণ।

শর্তে বিশ্বাস রাখতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তথা আল্লাহ প্রদত্ত বার্তা বা পথ-নির্দেশনার ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে হবে। এ আস্থা ও ভরসা

রাখার ওপরই সমগ্র দর্শন, কর্মকান্ড ও রূপরেখার লক্ষ্য অর্জনের সফলতা নির্ভর করে। বিশ্বাসীরা সে ভরসা রাখে। তাই বলা হয়েছে যে, এরাই অর্থাৎ বিশ্বাসীরাই তাদের পালনকর্তার পথ প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে। তারাই প্রকৃত আস্থা ও ভরসা রাখে। ফলে তারাই সফল হয়। কেননা তারা সে পথ অনুসরণ করে। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"বিশ্বাসী ব্যাক্তি যে অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্ম জ্ঞানে বিলীন এবং যে তার ইন্দ্রিয়সমুহকে সহসাই নিয়ন্ত্রন করতে পারে, (সে) পরম আধ্যাত্ম প্রশান্তি লাভ করে।" (গীতা ৪:৩৯)

একটি দর্শনের যখন নতুনভাবে আবির্ভাব ঘটে এবং যিনি এর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বিষয়ে অবগত তিনি যৌক্তিকভাবেই এর ভেতরের বিষয়গুলি জানেন। তিনি এর অনুসরণের ফলাফল সম্পর্কেও নিশ্চিত। বিষয়গুলি তাঁর কাছে পরিস্কার। কিন্তু নতুন একজনের কাছে দর্শনের উপস্থাপিত বিষয়গুলি প্রাথমিক পর্যায়ে সুস্পষ্ট থাকে না। তাকে স্পষ্ট হতে হলে এর গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যেটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। সবার সে সময় ও ইচ্ছেও থাকে না বা হয় না। তাই ভেতরের বিষয়গুলির মর্মার্থ বুঝতে হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে একজনকে আল্লাহর বার্তায় বিশ্বাস নিয়েই এগুতে হয় [বিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.২৫, ২.২৮৪.৪]। শুরুতেই কেউ গভীরের জ্ঞানে যেতে পারে না বা চলে যায় না কিংবা সেটি সম্ভবও নয়।

কোরআনের দর্শনের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি আলোচনা ও বোঝার সুবিধার্থে একজন আগ্রহী পাঠককে তাই কিছু বিষয়কে সত্য ধরে নিয়ে এগুতে হবে। যেমন ধরে নিতে হবে যে, কোরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং এ পথের অনুসরণে সুফল পাওয়া যাবে। কেননা সঠিক পথই সুফল বয়ে নিয়ে আসে।

যদি প্রমাণ করা যায় যে, কোরআন প্রদর্শিত পথের অনুসরণ সুফল বয়ে নিয়ে আসবে তাহলে পথটি সঠিক। আবার এভাবেও বলা যায় যে, যদি প্রমাণ করা যায় যে এ পথটি সঠিক তবে তা সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। পরবর্তীতে সকল আলোচনা এর ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। যেন বুঝতে পারি যে কোরআন সঠিক পথই প্রদর্শন করে।

যারা বিশ্বাসী বা কোরআন প্রদর্শিত পথের অনুসারী তারা সন্দেহাতীতভাবে উপস্থাপিত বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। কিন্তু অন্তর যাদের সন্দেহপ্রবণ বা অবিশ্বাসী তারা বিষয়গুলি যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই ওপরের বক্তব্যটিকে শুধুমাত্র অতৃপ্ত অনুসন্ধানি অন্তরের জন্য ধরে নিতে হবে। তবে এটিও উল্লেখ্য যে তাদেরকেও অবহেলা কিংবা অবজ্ঞা করা যাবে না। কেননা কোরআন এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাদের মধ্যেও যারা কোরআনের দর্শন প্রদত্ত পথ-নির্দেশনার যৌক্তিকতার সাথে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে তারা সেটি গ্রহণ করবে। বিচার-বিশ্লেষণ পরবর্তী বিশ্বাস বরং সুদৃঢ় হয়। আজ যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী একসময় তারা কিংবা তাদের পূর্ব-পুরুষেরাও এর সাথে পরিচিত ছিল না।

কিছু মানুষকে বিশ্বাসের মধ্যেই থাকতে হবে বা তারা বিশ্বাসের মধ্যেই থাকবে। কেননা বিষয়গুলি মানুষের জ্ঞানের পর্যায় এবং জানার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ও আগ্রহ-অনাগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। আবার অপরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সাথেও সম্পর্কিত।

সন্দেহ বিশ্বাসে চির ধরায়। বিশ্বাসে ঘাটতি থাকলে সূত্র কাজ করে না। কোন কিছু থেকে উপকার পেতে হলে বিষয়টির প্রতি যথাযথ সন্মান বা ভক্তি থাকতে হয়। ভক্তি মানুষকে নির্দেশনা মান্য করার মতো মানসিকতায় নিয়ে আসে। বিশ্বাস মানুষকে দিয়ে কোন একটি বিষয়কে ভক্তি করায়। আবার ভক্তিও বিশ্বাসের জন্ম দেয়। ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“মহাত্মাগণ আমাকে সকল সৃষ্টির কারণ অব্যয়-অক্ষয় জেনে অনন্যমনা হয়ে আমার উপাসনা করে। এইসকল ভক্তরা দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে নিরন্তর আমার গুণ-কীর্তন করে এবং ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।” (গীতা ৯:১৩-১৪)

ভক্তি ও বিশ্বাসের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনের পথ প্রদর্শনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে তাই সুনির্দিষ্টভাবে শর্তগুলিকে গ্রহণ করে নেয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটি ভক্তি ও বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য। পূর্ববর্তী

গ্রন্থসমুহের ওপর বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে এবং এ গ্রন্থের ওপরও। পূর্বেরটাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে না জানলে বর্তমানকে কিভাবে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে?

পৃথিবীতে আগমনের পর জীবনের একটি পর্যায়ে এসে মানুষ অন্তরে অজানা বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে একটি সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য। আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে সরল পথ বুঝতে সহায়তা দানের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যথাযথভাবে বুঝে নেয়ার দায়িত্ব মানুষের নিজেরও আছে।

বার্তা প্রেরণকারী মানুষের ভেতরকে জানেন। তিনি জানেন তাকে একটা সীমানার মধ্যে রেখে চালনা করতে হবে। সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে সে যথেচ্ছাচার করবে, কিংবা অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলতে গিয়ে নিজেকে নিঃশ্বেষ করে দেবে। নয়ত কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকারে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে।

কোরআনে উল্লেখিত না দেখা শর্তগুলি মানুষকে প্রথমেই একটি সীমানার মধ্যে নিয়ে আসার পদক্ষেপস্বরুপ। যারা এ শর্তসমুহ বিশ্বাস করবে তারা স্বেচ্ছায় এ সীমানার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখবে। তারা সীমালংঘনকারী হবে না। তাতে অবশ্য মানুষের অবাধ চলার স্বাধীনতায় কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না। কেননা কোরআনের নির্ধারিত এ সীমা কেবলমাত্র মন্দ কাজগুলিকে পরিহারের কথা বলে। মানুষকে একটা সভ্য সীমানার মধ্যে ধরে রাখে। আল্লাহর নির্দেশনা কখনই মন্দ কাজ করার কথা বলে না। আল্লাহর নির্দেশনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

“যখন তারা (অজ্ঞ বা ভূল পথগামীরা) কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে, ‘আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এমনটি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের ওপর এ নির্দেশ দিয়েছেন।’ বল: আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বল যা তোমরা জান না।” (আল-কোরআন ৭:২৮)

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদয়তা এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্ট প্রকৃতির কাজ

নিষিদ্ধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা বিষয়সমূহে মনযোগ প্রদান কর।" (আল-কোরআন ১৬:৯০)

আল্লাহর নির্দেশনা মানুষের মুক্ত চিন্তা বা অবাধ চলাচলের স্বাধীনতায় কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। কেবলমাত্র মন্দ কাজ পরিহার করার কথা বলে।

মানুষকে কেন কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী হতে হবে? 'কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী' কথাটি এভাবে বলা হল এ কারণে যে কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। তারাও ঐ একই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। যদিও তারা আল্লাহকে ভিন্ন নামে ডাকে এবং এমন কিছু রীতি-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণ করে যা কোরআন সমর্থন করে না।

কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী হতে এ কারণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, এর ধারণাগুলি বা দিক-নির্দেশনা কোন মিথ্যে বা কোন অলীক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি বাস্তবসম্মত এবং সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এ পথ জীবন ও জগতকে সত্যের ওপর ভিত্তি করে ভাল পথে নিয়ে যায়। ন্যায্যতার মাধ্যমে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কথা বলে। মন্দ পথ পরিহার করতে বলে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে কোন ভূল পথ অবলম্বন করতে নিরুৎসাহিত করে।

উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে বিশেষভাবে নামাজ বা সালাতের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু এটিও বুঝতে হবে যে জীবন ও জগতের কল্যান সাধনে সকল কাজই আল্লাহর নির্দেশনা। এগুলিও উপাসনার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। সব কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে। সেটিই ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম বা স্বকর্ম অনুসরণ করে সকল মানুষ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। ... মানুষ তার নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৫-৪৬)

প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ আল্লাহর উপাসনা করে। উৎকর্ষতা সাধন করে। প্রতিটি কাজই আল্লাহর জন্য। আল্লাহ নির্দেশিত। সৃষ্টিকে সংরক্ষণের জন্য। কাজগুলির কিছু প্রত্যক্ষ এবং কিছু পরোক্ষ। মানব জ্ঞান আল্লাহরই দান। প্রতিনিয়ত উৎকর্ষিত সে জ্ঞানেই মানুষ কাজ করে। মানব জ্ঞানও আল্লাহ নির্দেশিত বিষয়।

বিজ্ঞানও কাজ করে চলেছে [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আসলে কি করি? বস্তুত আল্লাহ, ভগবান বা ঈশ্বরেরই সন্ধান করি। আমরা যা খুঁজে পাই সবই তাঁর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর অন্তরস্থ। এ জগত সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআনে সে কথা বার বার বলা হয়েছে। কোন কিছুর সত্যাসত্যের অনুসন্ধান বিজ্ঞানের কাজ। চরম সত্যের অনুসন্ধানে বিজ্ঞানের কাজ বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। আল্লাহর অনুমোদনসাপেক্ষে বিজ্ঞানই এখন মানুষের জন্য যথাযথ পথ-প্রদর্শক।

বিজ্ঞানে কল্প-কাহিনীমূলক গল্প নেই। অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের স্থান নেই। কোরআনও তেমন। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে পথ প্রদর্শন করে। বরং যেসব দর্শন কল্প-কাহিনীকে প্রশ্রয় দেয় কোরআনে তা দুর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমন উন্নত ও মানসম্মত দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বাসী শব্দটিকে এখানে সত্যিকার অর্থেই আদর্শিক বিশ্বাসী হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে [বিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.২৫, ২.২৭৩.১, ২.২৮১.২]। ধরে নেয়া হয়েছে যে, তাদের দ্বারা মন্দ কাজ সংঘটন করা সম্ভব নয়। তারা ভাল পথে চলবে, ভাল কাজ করবে এবং অপরকেও ভাল পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই আলোচনার সুবিধার্থে গ্রন্থে যখনই বিশ্বাসী কথাটি উচ্চারিত হবে, তাত্বিকভাবে বিষয়টিকে সেভাবেই ধরে নিতে হবে। যদিও বাস্তবে বিচ্যুতি থাকে। কিন্তু কোরআনের নির্দেশনা তাই। বিচ্যুতি নিজস্ব ত্রুটি। দর্শনের নয়। তাই গ্রন্থে বিশ্বাসী কথাটি উচ্চারিত হলে তার দ্বারা মন্দ কাজ করা সম্ভব নয় বিষয়টিকে আদর্শিকভাবে সেভাবে বুঝতে হবে। যদি কেউ মন্দ কাজ করে তবে সে সঠিক বিশ্বাসী নয় সেটিও বুঝে নিতে হবে। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত; মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনবে। ...।" (আল-কোরআন ৩:১১০)

অতএব বিশ্বাসী শব্দটিকে ভূলভাবে বোঝার বা ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই।

মানুষের অন্তর কথা বলে। অন্তরই মানুষকে চালনা করে। অন্তরের জ্বালা রাগ বা ক্রোধ উৎপন্ন করে। ক্রোধ হিতাহিত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষ ভূল আচরণ করে। ভূল আচরণ ধ্বংস ডেকে আনে। অন্তরে উৎপন্ন জ্বালার পেছনে কথা থাকে; থাকে কারণ বা ইতিহাস। অতএব অন্তর যখন কথা বলে জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"এটি হচ্ছে কাম ও ক্রোধ; রজোগুণ থেকে উৎপত্তি। এ জগতে এটিকে সর্বগ্রাসী মহাপাপ ও শত্রু বলে জানবে।" (গীতা ৩:৩৬-৩৭)

আবার এই অন্তরই যখন কথা বলে জীবন হয় প্রশান্তিময়। অন্তরে ইচ্ছে উৎপন্ন হয়। অদম্য প্রচণ্ড ইচ্ছেকে দমন করা যায় না। সে ইচ্ছে যদি ধ্বংসের পথকে বেছে নেয় তবে ধ্বংস অনিবার্য। অন্তরের ইচ্ছে যদি শান্তির পথ বেছে নেয় তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। অন্তর চালনা করে। অন্তরে তাঁর বাস। অতএব তিনিই চালনা করেন। বলা হচ্ছে,

"... জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ..." (আল-কোরআন ৮:২৪)

"... প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমেশ্বর উপস্থিত...।" (গীতা ১৮:৬১)

পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ চলতে সক্ষম হবে কি হবে না সেটি নির্ভর করে অন্তরের বার্তার ওপর। অন্তরে সৃষ্টি হওয়া প্রেরণার ওপর। অর্থাৎ মানুষের নিজের ওপর। বস্তুত আল্লাহর ওপর। তাঁর সৃষ্টি করে দেয়া তরঙ্গের ওপর। কথাগুলি একটু জটিল। কিন্তু এর অধিক বিশ্লেষণ সঠিক কাজ নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তরই যদি চালনা করে বা তিনিই যদি চালনা করেন তবে পথ-নির্দেশনা, অবতীর্ণ বাণী এসবের প্রয়োজন কি? অন্তরই যদি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় তবে মানুষের দোষ কোথায়?

অন্তরে গোপনে ভাল ও মন্দ দুটো পথই তিনি বলে দেন। ভাল পথটিকে চিহ্নিত করে দেন। কিন্তু মানুষ কখনও কখনও অন্তর প্রদর্শিত সে ভাল পথের নির্দেশনাটিকে উপেক্ষা করে। এর দ্বারা সে নিজের গোপন মন্দ ইচ্ছে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। অতঃপর ইচ্ছে চরিতার্থ করার পর নিজেকে আবার নির্দোষও প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এ তো গেল অন্তরের কথা।

অপরদিকে কোরআন মানুষের জন্য ভাল-মন্দ পথ প্রকাশ্যে বলে দিয়েছে। আল্লাহর নির্দেশনাকে জগতবাসীর সম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছে। কেউ যেন বলতে না পারে যে সে সঠিক পথে চলার বিষয়ে অবগত ছিল না। তাই বলা হয়েছে,

"বার্তাবাহকগণ সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। বার্তাবাহকগণকে এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাদের প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোন যুক্তি না থাকে।" (আল-কোরআন ৪:১৬৫)

কোরআন প্রকাশ্যে মন্দ কর্মে নিষিদ্ধতা আরোপ করার মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। মানুষ যদি কোরআনের নির্দেশনা মেনে চলে তবে মানবজীবন সফলতার মুখ দেখবেই।

অতঃপর এটি মানুষের নিজেরই সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছে যে সে ভাল পথে চলবে নাকি মন্দ পথে গমন করবে। সে যে পথ বেছে নেবে আল্লাহ তাকে সে পথেই নিয়ে যাবেন। চলার শক্তি আল্লাহ থেকে আসে। তাই বলা হয় আল্লাহই চালনা করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। এ স্বাধীনতাটুকু তাকে দেয়া হয়েছে। এখানেই মানুষের নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রনের পরীক্ষা। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

".. ইন্দ্রিয়সমুহকে নিয়ন্ত্রন করার মাধ্যমে পাপের মহা প্রতীকী রূপ কাম বা কামনা-বাসনা ও ক্রোধকে প্রথমেই দমন কর এবং জ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধির এই বিনাশকারীকে সংহার কর।" (গীতা ৩:৪১)

ইন্দ্রিয়সমুহকে নিয়ন্ত্রন করতে পারা বা না পারার ওপরেই মানুষের ভাল-মন্দ পার্থক্য নির্ধারিত হয়। সে কারণেই এত এত পথ-নির্দেশনা! এতসব ধর্ম ও দর্শন! এত এত বিধি-বিধান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি! এখানেই মানুষের

শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানের কার্যকারীতার সফলতা ও বিফলতার পরীক্ষা! বলা হচ্ছে,

"... আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার শত্রুও। যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে জয় করতে পেরেছে আত্মাই সে আত্মার বন্ধু। কিন্তু যে আত্মা আত্মাকে বশ করতে পারেনি আত্মা শত্রুবৎ তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়।" (গীতা ৬:৫-৬)

আত্মাই হচ্ছে নিজ। নিজেকে নিজের বিকশিত করতে হবে। কিন্তু যে তা করতে ব্যার্থ হবে সে অধঃপতিত হবে। তাই আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার শত্রুও। অর্থাৎ নিজেই নিজের বন্ধু আবার শত্রুও। অতএব নিজেই নিজের ধ্বংসের জন্য দায়ী। কোরআনে বলা হয়েছে,

"সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যর্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।" (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)

আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। কিভাবে, কোন পথে চললে নিজেকে বিকশিত করা সম্ভব সে পথ বলে দিয়েছেন। কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে মন্দ পথ থেকে রক্ষা করতে হবে তাও বলেছেন। তাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে,

"আমি কি মানুষকে দু'টি চক্ষু দেইনি এবং জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট? তাকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দুটি পথ প্রদর্শন করেছি; ভাল ও মন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নততর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের," (আল-কোরআন ৯০:৮-১১)

মানুষকে চক্ষু, কর্ণ নানাবিধ উপকরণ দেয়া হয়েছে জগতকে জানা ও বোঝার জন্য। ভাল-মন্দ চিনে নেয়ার জন্য। নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা নিজেকে নিজের বিকশিত করতে হবে। নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রন করতে জানতে হবে।

আল্লাহর চিহ্নিত করে দেয়া ভাল-মন্দ পথ সম্পর্কে বস্তুত মানুষ জানে। মানুষ তাঁর নির্দেশনা সম্পর্কেও অবগত। কিন্তু সে পথে চলা মানুষের নিজের দায়িত্ব। সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিজের। সে স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে। বিষয়গুলি মানুষ জানে, বোঝে এবং স্বীকারও করে।

কোন কিছু স্বীকার করে নেয়া এবং স্বীকার্য্য বিষয় অন্তরে গ্রোথিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য সবার পক্ষে অনুধাবন করা হয়ত সহজ নাও হতে পারে। একজন ব্যাক্তি জ্ঞানের কোন পর্যায়ে আছে তার ওপরে সূক্ষ্ণ পার্থক্যগুলি অনুধাবনের বিষয়টি নির্ভর করে। যারা সঠিক জ্ঞানে পথ-নির্দেশনার অন্তনিহিত অর্থ বুঝতে পারবে তারা অবশ্যই এ বার্তার যথার্থতায় বিশ্বাসী হবে। তারা সঠিক পথে চলার কারণে ইহকাল ও পরকালে সফল হবে। এমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা।

➢ (আয়াত ৬-৭) কোরআনের পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে সুফল পেতে হলে মানবজাতিকে যেসব শর্ত মেনে চলতে হবে আয়াত দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত সে বিষয়ে বলা হয়েছে। যারা এসব শর্ত মেনে চলবে তারাই এ দর্শন মতে বিশ্বাসী। বিশ্বাসীদেরকেই সফল বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর আয়াত ছয় ও সাত এ অবিশ্বাসীদের (Disbeliever) সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

➢

৬	অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই, তারা বিশ্বাস করবে না। (As for the Disbelievers, Whether thou warn them or thou warn them not it is all one for them; they believe not.)
৭	আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (Allah hath sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom.)

▪ **২.৬** অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই, তারা বিশ্বাস করবে না : আয়াতে যা বলা হয়েছে যদি তার শাব্দিক অর্থ হুবহু ধরে নেয়া হয়, তবে অবিশ্বাসীদেরকে ইসলামের পথে আহবান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কেননা এখানে বলা হয়েছে অবিশ্বাসীরা আহবান করা সত্বেও বিশ্বাস করবে না।

কোরআনে এমনিভাবে অনেক আয়াত আছে যা কেবল তার শাব্দিক অর্থই প্রকাশ করে না। অন্তর্নিহিতে আরও বক্তব্য থাকে। তাই কোরআনকে

যথাযথভাবে বুঝতে হলে এর প্রতিটি আয়াতের যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থটি খুঁজে বের করতে হবে। আর সে কারণেই এত লেখার প্রচেষ্টা। আয়াতটি অধিকতর বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

ইসলামের ইতিহাসে যারা বিশ্বাসী হয়েছে তারা অবিশ্বাসী থেকেই কোরআনের রূপরেখায় বিশ্বাসী হয়েছে। কোরআন প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা বিষয়ে পূর্বে তাদের জানা ছিল না। সমাজে বিদ্যমান অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচার তাদেরকে এ দলে অন্তর্ভূক্ত হতে অনুপ্রাণীত করেছে। অত্যাচারিত সমাজে যারা মুক্তির জন্য পথের সন্ধান করেছে, কোরআনের ন্যায় ও সাম্যের বার্তা পেয়ে তারা যেন একটি পথ খুঁজে পেয়েছে। তাদেরকে এ পথে আহবান করা হয়েছে এবং তারা এ ধারণায় সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজেদেরকে সমর্পন করেছে। অতএব অবিশ্বাসীদের সতর্ক বা আহবান না করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, এখানে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সঙ্গায়িত হয়েছে কোরআনের রূপরেখার ভিত্তিতে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, প্রতিটি হৃদয় একজনকেই খুঁজে ফিরে। যাকে কেউ দেখতে পায় না, জানতে পারে না এমনকি বুঝতেও পারে না [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৭.২, ২.২৪, ২.৮২, ২.১০৮.২, ২.১৬১, ২.১৯১.১, ২.১৯১.৪, ২.১৯৩.২, ২.২১২.১, ২.২৫৪.২, ২.২৬১.১, ২.২৮৬.৬]।

কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। আল্লাহকে তারা ভিন্ন নামে ডাকে। তবে কোরআন একটি যথাযথ রূপরেখা তুলে ধরেছে যা সত্যের ওপর প্রতির্ষ্ঠিত। এখানে কু-সংস্কারের কোন স্থান নেই। মানবজাতিকে যা উদ্ভ্রান্তের ন্যায় নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে চলার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

ওপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতাকে বুঝতে হলেও কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোরআনের দিক-নির্দেশনার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাসমুহকে বুঝতে হবে।

কিছু মানুষের স্বভাব হচ্ছে পুরোনোকে আকড়ে ধরে রাখা। তারা নতুন ধারণাকে গ্রহণ করতে চায় না। বিদ্যমান পূর্ব-পুরুষের ধারণায় অভ্যস্ত বিধায় তারা তাতেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। যদিও তাদের কেউ কেউ পুরোনো ধারণাকে অন্তর থেকেই বিশ্বাস ও ভক্তির করে।

এ ধরণের মানুষ যা করে তারা তার সত্যাসত্য, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, ভাল-মন্দ যাচাই করে না। তারা সেটি করার প্রয়োজনও বোধ করে না। তারা যে সকল নিয়ম-বিধি পালন করে তা কেন করে তাও জানে না। এসব বিষয়ে তারা উদাসীন। গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলে। সত্যের চেয়ে তারা সামাজিক রীতি-নীতি, মান-মর্যাদা এসব বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়। নিয়ম-বিধি পালন করে স্বর্গে যেতে চায়।

অনেকে আবার প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়মের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়েও আসতে পারে না। তাই তারা নতুন জ্ঞানের সংস্পর্শ পাওয়ার সৌভাগ্য সত্বেও সে ধারণায় অবিশ্বাসীই থেকে যায়। কোরআনে তাদের বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।" (আল-কোরআন ৪৩:২২)

"... তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট যাতে আমরা আমাদের পিতা-পিতামহদের পেয়েছি। যদিও তাদের পূর্ব-পুরুষেরা সঠিক জ্ঞান রাখত না এবং তাদের কোন দিক-নির্দেশনাও ছিল না ...।" (আল-কোরআন ৫:১০৪)

ইসলামের আবির্ভাবকালে মক্কার অবস্থাসম্পন্ন কুরাইশ বংশের লোকেরা নিজেদেরকে অভিজাত শ্রেণীর মনে করত। মদীনার ইহুদিরাও তাই মনে করত। তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত বাণীকে বা এ পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নেয়ার মতো ছিল না। সত্যি বলতে সেটি করারও কথা নয়। এমন আচরণ মানব চরিত্রেরই কিছু সহজাত বৈশিষ্ট। আজও অনেকে যে কোন কারও প্রচেষ্টা দ্বারা ভাল কিছু করাকে গ্রহণ করে নিতে চাইবে না। তাদের ভেতরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ কাজ করে।

একজনের করা নবুয়তের দাবীকে কিছু মানুষ বিশ্বাসই বা করবে কিভাবে? এ আচরণটিও তো অস্বাভাবিক কিছু নয়? উপরন্তু ইহুদিরা অইহুদিদের প্রাপ্ত নবুয়তকে গ্রহণ করার মতো ছিল না। তারা বহু পূর্বে মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা মনে করত নবুয়ত কেবল তাদের মধ্য থেকেই প্রাপ্ত হবে। এমন আভিজাত্যপ্রসূত ধারণা আজও সকল ধর্মের অনেক মানুষের

মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখানে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বজনিত কিছু বিষয়ও ছিল। ফলে তারা কোরআনের আহবান ও সতর্ক বার্তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না।

কোরআন অবতীর্ণকালের সমসাময়িক সময়ে কেবল অবিশ্বাসীরা এমন আচরণ করেছে তা নয়। যুগে যুগে যেখানেই নতুন কোন বার্তা বা ধারণা বা জ্ঞান সত্য নিয়ে আগমন করেছে সেখানেই কিছু মানুষ সত্যকে অস্বীকার করেছে। এগুলি মানব চরিত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট।

একটি নতুন ধারণা শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা না পাওয়া পর্যন্ত বিশেষত সমসাময়িক সময়ের প্রতিষ্ঠিতরা বাধা হয়ে দাড়ায়। তাদের কিছু অনুসারীও থাকে। এসবের সঙ্গে তাদের নানারূপ স্বর্থেরও সংশ্লিষ্টতা থাকে। ফলে তারা নতুন ধারণা গ্রহণ করে না। অবিশ্বাসী থেকে যায়। এগুলি সূত্র মেনেই চলে। এতে তাদের ত্রুটিই বা কোথায়?

এই যে এই গ্রন্থে এত স্পষ্ট সত্য কথা তুলে ধরা হয়েছে সেটিও কি সকল বিশ্বাসীরা মেনে নেবে বা নিতে পারবে? যিনি এসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাকেও কি তারা গ্রহণ করে নিতে পারবে? দেখা যাবে যে বিরোধীতাই করবে কিংবা সত্য গোপন করার চেষ্টা করবে।

সত্য হচ্ছে- যারা জেনে অথবা না জেনে, বিচার-বিশ্লেষণ না করে যৌক্তিক কারণ ব্যাতিত কেবল বিদ্বেষের কারণে ভাল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা সার্বিক কল্যাণ চিন্তা দ্বারা চালিত নয়। ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ দ্বারা চালিত। তাদের অন্তর ক্ষুব্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন। এগুলি স্বাভাবিক আচরণ নয়। এ আচরণটিই তাদের ত্রুটি।

এমন ত্রুটিযুক্ত মানুষদের অবিশ্বাসী হওয়া তাদের একটি ভিতরগত সিদ্ধান্ত বলা যায়। তারা পূর্বেই চিন্তা-ভাবনা করে বিশ্বাস না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। এমন অবিশ্বাসীদের সকলে অজ্ঞ কিংবা উদাসীনও নয়। এরা সংকল্পবদ্ধ। তাদেরকে কোরআনের বাণী দ্বারা সতর্ক করা বা না করা একই; তারা বিশ্বাস করবে না।

উদ্ধৃত বাণী এমন অবিশ্বাসীদের জন্যই প্রযোজ্য। সকলের জন্য নয়। সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন কিছু মানুষ সত্য ধারণা গ্রহণ করে নিতে অনড়ত্ব প্রদর্শন করে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই এ বাণী প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে এক প্রকার বুঝ বা জ্ঞান কাজ করে। যারা অবিশ্বাসী তাদের মধ্যেও একটি বুঝ বা জ্ঞান কাজ করে। কিন্তু একে অন্যের জ্ঞানকে অনুধাবন করার চেষ্টা না করলে বা জ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদান না হলে সত্যকে কি করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে?

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে বিশ্বাসগত পার্থক্য মূলত জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে। জ্ঞান যতক্ষন কোন বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করবে না ততক্ষন বিশ্বাস আনা সম্ভব নয়। আবার মানুষ নিজে থেকে কোন জ্ঞান আহরণে আন্তরীক না হলে সে জ্ঞান সে আহরণও করবে না। ফলে যে নিজেকে অবিশ্বাসী করে রাখার সিদ্ধান্তে অটল তাকে সতর্ক করা না করা এক। সে জ্ঞান দ্বারা বোঝার চেষ্টা করবে না; ফলে বিশ্বাস করতে পারবে না।

অবিশ্বাসীদের মধ্যে আবার এক প্রকার আছে যারা না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বাস্তবে যা দেখে তাই বিশ্বাস করে। তারা মনে করে বাস্তবে যা দেখি তাই সত্য। বিষয়টি সঠিক। তবে এটিও তো সত্য যে, বাস্তবে যা দেখা যায় না সেখানেও সত্য বিদ্যমান। যা মানুষ অনেক পরে বাস্তবে দেখতে পেয়ে সঠিক মনে করে।

কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষ পার্থিব জগতে যেসব কাজ করেছে একদিন সে তা দেখতে পাবে। বিষয়টি যখন বলা হয়েছে তখন সেটি মানুষের ধারণা বা কল্পনা করার ক্ষমতারও বাইরে ছিল। কিন্তু আজ এটি বাস্তবে সম্ভব মনে হচ্ছে। আবার বাস্তবে দেখছি পৃথিবী ছাড়া কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। অথচ সকলেই এমন বিশ্বাস রাখে যে অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

মানুষকে কিছু বিষয় যৌক্তিকতার জ্ঞান দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেও বিশ্বাস করতে হয়। আবার প্রয়োজন বিবেচনা করেও বিশ্বাস করতে হয়। যেমন জীবন ও জগতের মঙ্গলার্থেই পরকালে বিশ্বাস করার বিষয়টি সত্যাসত্যের উর্ধ্বে উঠে একটি প্রয়োজনীয়তাও।

'অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই, তারা বিশ্বাস করবে না'- এ বাণী সকল অবিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা সকলেই বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না। অনেকেই একটি সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান করে। ফলে সঠিক পথের আহবান সকল বিশ্ববাসীর দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কেবলমাত্র

শাব্দিক অর্থকে বিবেচনায় নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভূল ধারণা পোষন করা না হয়।

আজ যারা বিশ্বাসী দাবীদার তাদের পূর্ব পুরুষেরাও এক সময় কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী ছিল না। তাই বলে কি আহবান করা বন্ধ ছিল? কেবল শাব্দিক অর্থ নয়। বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে হবে।

▪ **২.৭.১** আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে আবরণ : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, ‘অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই, তারা বিশ্বাস করবে না।’ এরা কারা? এরা হচ্ছে সংকল্পবদ্ধ। তারা পূর্বেই বিশ্বাস না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। এরা হচ্ছে তেমন অবিশ্বাসীদের দল।

এর পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব কিংবা বিদ্বেষ-ভাবাপন্নতা নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। যাকে মানব চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্টরূপেও দেখা যেতে পারে। এতে ক্রুটির কিছু নেই। এমন ঘটনা সকল ক্ষেত্রেই ঘটে। তাহলে এখানে ক্রুটি কোথায় যে কারণে কোরআনে অবিশ্বাসীদের বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে?

যারা জেনে অথবা না জেনে, বিচার-বিশ্লেষণ না করে যৌক্তিক কারণ ব্যাতিতই কেবল বিদ্বেষের কারণে কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে তারা সমাজের বা সামগ্রীক মঙ্গলের চিন্তা দ্বারা চালিত নয়। তারা ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ, প্রজন্মের ভাল-মন্দ, নিয়মের ভাল-মন্দ এসব নিয়ে ভাবে না। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভাবে। এটিই হচ্ছে তাদের ক্রুটি।

কোন একটি বিষয়কে সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। সেজন্য চক্ষু, কর্ণ, অন্তরকে কাজে লাগাতে হয়। একই সাথে সত্যকে গ্রহণ করার মতো মানসিকতাকেও প্রস্তুত রাখতে হয়। কিন্তু অন্তর যাদের কোন বিষয়ে অনড় হয়ে গেছে তাদের ইন্দ্রিয়গুলি যথাযথভাবে কাজ করে না। এটি হচ্ছে কোন বিষয়ে মানুষের অনড় হয়ে পড়ে থাকার অবধারিত পরিণতি।

মনের সংকীর্ণতা ভেতরে এক ধরণের জড়তা বা অনড়ত্ব সৃষ্টি করে। অনমনীয় এ মনোভাবের কারণে তেমন একজন নতুনকে জানতে চেষ্টা করে

না। মনের জড়তা জ্ঞানের চর্চা থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখে। যে কারণে তেমন একজন সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপন করতে ব্যার্থ হয়। এ অবস্থাটিকেই তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ হওয়া এবং তাদের চোখের আবরণস্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ ও অন্তকরণ সব বিদ্যমান থাকা সত্বেও সে বুঝতে চায়না বিধায় বুঝতে পারে না। শুনতে চায়না বিধায় শুনতে পায় না। দেখতে চায় না বিধায় দেখতে পায় না।

অতএব নির্দিষ্ট করে কিছু লোককে অবিশ্বাসী করে রাখার মানসে আল্লাহ নিজেই তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন বিষয়টি তেমন নয়। কথাগুলি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর দ্বারা অবিশ্বাসীদের সকল ইন্দ্রিয় কার্যত সচল থাকা সত্বেও সেগুলিকে তারা যথাযথভাবে কাজে লাগায় না সেটি বোঝান হয়েছে। যার কারণে তারা বিচার-বিবেচনা করে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা জানার চেষ্টা করে না। চেষ্টা করে না বিধায় জানতে পারে না। জানতে পারে না বিধায় গ্রহণও করতে পারে না এবং অবিশ্বাসীই থেকে যায়। বস্তুত তাদের এমন স্বভাবের কারণেই আল্লাহ তাদের জন্য এমন পরিণতি নির্ধারণ করে দেন। তাই বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে আবরণ।'

মানুষ যখন নিজে থেকে কোন বিষয়ে উদাসীন থাকে, কিংবা বিদ্বেষের কারণে অনড় হয়ে পড়ে থাকে তখন তার ওপর ওপরোক্ত সূত্র কাজ করে এবং সে অধিকতর পথচ্যূত হয়।

▪ **২.৭.২** তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি : 'অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে, যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা সতর্ক নাও কর একই, তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং কর্ণসমূহ বদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে রয়েছে আবরণ। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' অতএব কঠোর শাস্তি রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য। অবিশ্বাসীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে কেন? তাদের অপরাধ কি? অবিশ্বাসী কারা?

মহান আল্লাহ মানবজাতির জন্য চলার পথের সঠিক রূপরেখা প্রেরণ করেছেন। রূপরেখা ধরে চললে মানবজাতি মন্দ পথ পরিহার করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। মানব জীবন হবে সফল। কোরআন হচ্ছে সে রূপরেখা

বা পথ-নির্দেশনা (Guidance)। যারা কোরআনের রূপরেখায় বিশ্বাস করবে না তারাই অবিশ্বাসী।

সমাজে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত যে ধারনা তা কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাস করা বা না করার ওপর নির্ধারিত হয়ে থাকে। কোরআনের রূপরেখায় বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে।

কোরআনের দর্শন আল্লাহ, পরকাল, বিচার দিবসে বিশ্বাস করার কথা বলে। বিচার দিবসে কর্মের জবাবদিহিতার কথা বলে। বিচার দিবসে কৃতকর্ম অনুযায়ী মানুষ শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। বিশ্বাসীরা কোরআন প্রদত্ত বার্তায় বিশ্বাস রাখে। পুরস্কারের আশায় কিংবা শাস্তির ভয়ে তারা মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। ভাল পথে চলে।

অবিশ্বাসীরা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস করে না। ফলে তাত্বিকভাবে ধরে নেয়া হয় যে তাদের দ্বারা সমাজে সহজেই অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করা সম্ভব। কেননা তারা পরবর্তীতে তাদের মন্দ কাজের জন্য কোনরূপ দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতার ধারণায় বিশ্বাস করে না। তারা পার্থিব জীবনকেই সব ও শেষ মনে করে। ইহজগতে সবকিছু অর্জনে হেন অপকর্ম নেই যা তারা করতে পারে না। দর্শনগত দিক থেকে এমনকি মানসিকভাবেও মন্দ কাজ করতে তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অবিশ্বাসী কেউ যদি তেমন মন্দ কাজ না করে তবে সেটি ব্যাক্তির একান্তই নিজস্ব বদান্যতা দর্শনের নয়। অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বিষয়গুলিকে এভাবে ধরে নেয়া হয়।

এভাবে ধরে নিয়েই কোরআনের দর্শন অনুযায়ী বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সম্পর্কিত ভাল-মন্দ ধারণার উৎপত্তি [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]। কিন্তু বস্তবে সকল অবিশ্বাসীই খারাপ কাজ করে না, কিংবা সকল বিশ্বাসীই ভাল কাজ করে তেমনও নয়। কিন্তু কোন তত্ব উপস্থাপনকালে কিছু প্রমিত সঙ্গা ও মান নির্ধারণ করে নিতে হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। জবাবদিহিতার অভাবের কারণে অবিশ্বাসীদেরকে মন্দরূপে দেখা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে বিপরীতভাবে।

এভাবে প্রতীকী নামের মাধ্যমে ভাল-মন্দের পার্থক্য অগনিত মানুষের মাঝে তুলে ধরা সহজ ও সম্ভব হয়। দু'টি নামের বা ধরনের পার্থক্যের মাধ্যমে ভাল-মন্দ প্রকাশিত হয়। মানুষ ভাল পথটিকে চিনতে পারে। মন্দ পথটিকেও

বুঝতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে তাত্বিকভাবে বিষয়গুলিকে এভাবে ধরে নেয়া হয়।

এভাবে ধরে নেয়া থেকেই সমাজে ব্যাপকভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সম্পর্কিত ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বাসীরা ভাল পথে চলে। তারাই পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা মন্দ পথে চলে। তাদের প্রাপ্য শাস্তি। তবে আলোচ্য আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির যে বার্তা দেয়া হয়েছে তার কিছু সুনির্দিষ্ট কারণও আছে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে অনেকেই এ দর্শনের বিরোধীতা করেছিল। একে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায়নি। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এমনকি মহানবীকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। এর মধ্যে মহানবীর নিজের কুরাইশ বংশের লোকেরা যেমন ছিল, তেমনি মদিনার ইহুদিরাও ছিল। এখানে বিশেষভাবে সে সকল অবিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করেই শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যারা ছিল অবিশ্বাসেই সংকল্পকদ্ধ। ইসলামের পথে আহবান করলেও তারা সুপথে আসত না। তারা ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে কোন কিছুকে গ্রহণ কিংবা বর্জন করে না। তারা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কাজ করে।

কোরআনের রুপরেখায় বিশ্বাস করতে হলে তাদেরকেও মন্দ কাজ পরিহার করতে হত। কিন্তু তারা সেটি করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাদের অবিশ্বাস ও মন্দ কাজেই স্থিরচিত্ত ছিল।

অবিশ্বাসী শব্দটি মানবতা বিরোধী, যে কোন কল্যাণকর কাজের বিরোধী, সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষশক্তি, সংস্কারের পরিপন্থী, কু-সংস্কার লালন-পালনকারী এভাবে ধরে নেয়া হয়। তাই ধারণাগতভাবেই ওপরোক্ত সতর্ক বাণী অবিশ্বাসীদের ওপর বর্তায়।

কোন একটি বিষয় জানার চেষ্টা করার পর গ্রহণ না করার বিষয়টির ধর্তব্যতা এক রকম। কিন্তু ভাল-মন্দ বিবেচনা না করে তাকে অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে অপরাধ। কেননা এর পেছনে যৌক্তিক কোন কারণ থাকে না। থাকে হিংসা, বিদ্বেষ, ঔদাসিন্য, অজ্ঞতা বা মূর্খতা। এগুলির প্রতিটিই অপরাধের দোষে দুষ্ট।

এগুলি অপরাধ এ কারণে যে, এসবের যে কোন একটি কারণও সমাজ সংস্কারে গৃহীত কোন ভাল উদ্যোগ বা চেষ্টাকে রুদ্ধ করে দেয়। তাদের কারণে

সমাজ সংস্কার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যার পরিণতি সমাজের সকলকে মন্দভাবে ভোগ করতে হয়। এমনকি গোটা জগত সংসারও এ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যুগের পর যুগ সে বন্দি অবস্থা থেকে আর উত্তরণ সম্ভব নাও হতে পারে। এটি কোন ছোটখাট অপরাধ নয়। যারা বড় অপরাধের কারণ তাদের শাস্তিও হবে কঠোর। তাই অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির বার্তা দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা সংযোজন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বাসী যদি অপরাধী হয় তবে কি সে শাস্তি পাবে না? অপরদিকে অবিশ্বাসী যদি অন্যায় বা অপরাধ না করে তবুও কি সে শাস্তিযোগ্য হবে?

কোরআনের রূপরেখায় মানুষকে বিশ্বাসী হতে বলার পেছনে কিছু কারণ আছে। আছে উদ্দেশ্য। সেটিকে বিবেচনায় নিতে হবে। সে লক্ষ্য অর্জিত হতে হবে। সে লক্ষ্য অর্জিত না হলে কেউই পুরস্কৃত হতে পারে না। বলা হচ্ছে,

"... সেদিন তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ..." (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

অতএব পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টি কেবল বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নাম কিংবা কোন লেবাস ধারণ করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। এটি নির্ধারণ হয় ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতে।

নিজ নিজ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে হলেও প্রতিটি মানুষকে ভাল কাজ করতে হবে। ভাল কাজ করা, ভাল পথে চলার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই মহান আল্লাহ কোরআনের রূপরেখা প্রেরণ করেছেন। কোরআনের রূপরেখা মানুষকে ভাল পথে চালনা করে। সেভাবেই এ রূপরেখা সাঁজান। অধিকাংশ মানুষকে বিশ্বাসই ভাল পথে ধরে রাখে। সে কারণেই রূপরেখায় বিশ্বাস করতে মানুষকে আহবান করা হয়। যারা এ রূপরেখায় বিশ্বাস করে না তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বিবেচনা করা হয়।

বিষয়গুলিকে এভাবে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা না হলে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। অন্যায় করেও মানুষ পাড় পেয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে শুধুমাত্র এ

কারণে যে সে মুখে বলে কোরআনের রূপরেখায় বিশ্বাস করে। অথচ সকল মন্দ কর্মই করে। বলা হচ্ছে,

"যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

অন্য কিছু নয়, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শব্দ দু'টি দাড়িয়ে আছে সত্য-মিথ্যের মানদন্ডের ওপর। যারা সত্য পথের অনুসারী তারাই বিশ্বাসী। মিথ্যের অনুসারীরা অবিশ্বাসী। সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ আলোকেই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কথাগুলিকে বুঝতে হবে। আল্লাহ বলেন,

"তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি এসে যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর? ..." (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

বস্তুত কাউকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মানুষের মঙ্গলের জন্যই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন; যেন মানুষ বিশ্বাসী হয়ে পরিণাম বিবেচনা করে কর্ম করে। বলা হচ্ছে,

"... তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২:২৮৪)

একজন মানুষ শুধুই মানুষ। সে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিছুই নয়। এসব নামে ধর্ম সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেও মানুষ ছিল। মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ ছিল। এগুলি এক একটি রূপরেখা মানুষকে ভাল পথে চালনা করার জন্য। মানুষ ভাল পথে চললে সব ধর্মের লক্ষ্যই অর্জিত হয়ে যায়।

আল্লাহ সুনির্দিষ্টভাবে কোন জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয়ে কাউকে পুরস্কৃত কিংবা শাস্তি দেবেন না। আল্লাহর বিচারে কে পুরস্কৃত হবে এবং কে শাস্তি প্রাপ্ত হবে এটি আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কাউকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ সব করতে পারেন। বিশ্বাস রাখতে হবে।

শাস্তি হচ্ছে মানবের কিছু সহজাত প্রবৃত্তির কারণে সৃষ্ট ভূল কর্ম ও আচরণের সূত্রজনিত প্রাপ্তব্য অবধারিত ফল। শাস্তির বিষয়টি প্রকৃতির সূত্র। যে

নিয়ম বা সূত্র প্রকৃতিতে আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি নিজ বিশ্বাসেও সঠিক পথে না চলে, উপরন্তু মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তবে তাদের কর্ম ও আচরণই তাদেরকে শাস্তি আস্বাদনের দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহকে কিছুই করতে হবে না। তিনি যা করার পূর্বেই করে রেখেছেন।

সত্য হচ্ছে, নিজ বিশ্বাসে থেকে হলেও যদি মানুষ সঠিক পথে চলে তবে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। শাস্তির বিষয়টি কেবলই বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা কোন লেবাস ধারণের ওপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে ভাল-মন্দ কর্মের ওপর। অতএব এ বিষয়ে ভূল বোঝার বা বোঝাবারও কোন অবকাশ নেই। ভাল-মন্দ কর্মই মুখ্য বিবেচ্য।

➢ (আয়াত ৮-২০) আয়াত দুই থেকে সাত পর্যন্ত বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে আরও এক প্রকার আছে যাদেরকে মোনাফেক (Hypocrites) বলা হয়। আয়াত আট থেকে বিশ পর্যন্ত মোনাফেক তথা হঠকারদের বিষয়ে বলা হয়েছে।

৮	মানুষের মধ্যে এক প্রকার আছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করি অথচ তারা বিশ্বাস করে না। (And of mankind are some who say: We believe in Allah and the Last Day, when they believe not.)
৯	তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। বস্তুত তারা নিজেদেরকে ব্যাতিত অন্য কাউকেই ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (They think to beguile Allah and those who believe, and they beguile none save themselves; but they perceive not.)
১০	তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত এবং আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যাচার করে। (In their hearts is a disease, and Allah increaseth their disease. A painful doom is theirs because they lie.)

১১	যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না, তারা বলে: আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী। (And when it is said unto them: Make not mischief in the earth, they say: We are peacemakers only.)
১২	সাবধান! এরাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (Beware! They indeed are the mischief-makers. But they perceive not.)
১৩	যখন তাদেরকে বলা হয় অন্যরা যেভাবে বিশ্বাস এনেছে তোমরাও সেভাবে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে আমরাও কি বিশ্বাস করব যেভাবে বোকারা বিশ্বাস করে? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা জানে না। (And when it is said unto them: believe as the people believe, they say: Shall we believe as the foolish believe? Beware! They indeed are the foolish? But they know not.)
১৪	তারা যখন বিশ্বাসীদের মুখোমুখী হয় তখন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আবার যখন তাদেরই দুষ্কর্মাদের কাছে ফিরে যায় তখন বলে নিশ্চয়ই! আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো কেবল উপহাস করেছি। (And when they fall in with those who believe, they say: We believe; but when they go apart to their devils they declare: Lo! we are with you; verily we did but mock.)
১৫	আল্লাহ নিজেই তাদের সঙ্গে উপহাস করেন তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অন্ধের মতো ঘুড়ে বেড়াতে দিয়ে। (Allah (Himself) doth mock them, leaving them to wander blindly on in their contumacy.)
১৬	এরাই তারা যারা প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে। ফলে তাদের বানিজ্যে উন্নতি হয়না এবং তারা কোন দিশাও লাভ করতে পারে না। (These are they who purchase error at the price of guidance, so their commerce doth not prosper, neither are

	they guided.)
১৭	তাদের উপমা সে ব্যাক্তির মতো যে অগ্নি প্রজ্জলিত করল এবং আলো যখন চারিদিক আলোকিত করে তুলল, ঠিক তখনই আল্লাহ তার জ্যোতি উঠিয়ে নিলেন এবং অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ফলে তারা দেখতে পায় না। (Their likeness is as the likeness of one who kindleth fire, and when it sheddeth its light around him Allah taketh away their light and leaveth them in darkness, where they cannot see,)
১৮	বধির, মূক ও অন্ধ এবং তারা (সুপথে) ফিরে আসবে না। (Deaf, dumb and blind; and they return not.)
১৯	কিংবা তাদের অবস্থা এমন যে ঝড় ও বর্ষণমুখর আসমান, যেখানে আছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে তারা রক্ষা পেতে চায়। (অথচ) অবিশ্বাসীদের আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (Or like a rainstorm from the sky, wherein is darkness, thunder and the flash of lightning. They thrust their fingers in their ears by reason of the thunder-claps, for fear of death, Allah encompasseth the disbelievers (in His guidence).)
২০	বিদ্যুতালোক তাদের থেকে তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিনিয়ে নিতে চায়। যখনই আলো উদ্ভাসিত হয় তারা চলতে শুরু করে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায় তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন তিনি তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (The lightning almost snatcheth away their sight from them. As often as it flasheth forth for them they walk therein, and when it darkeneth against them they stand still. If Allah willed, He could destroy their hearing and their sight. Lo! Allah is able to do all things.)

■ **২.৮** মানুষের মধ্যে এক প্রকার আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করি অথচ তারা বিশ্বাস করে না : ইতিপূর্বে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে আরও এক প্রকার আছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, তাদের অন্তর আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না। এরা সত্যিকার বিশ্বাসী নয়। এদেরকে 'মোনাফেক' বলা হয়েছে। মোনাফেকরা হঠকারী আচরণ করে।

এখানে বিশেষভাবে মদীনা ও তার আশেপাশের হঠকার তথা ইহুদিদের প্রতি ইংগিত করে কথাগুলি বলা হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারকালীন সময়ে মদীনার ইহুদিরা বিশ্বাসীদের সঙ্গে চরমভাবে হঠকারী আচরণ করেছিল। তারা বলত যে, তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে অথচ তারা বিশ্বাস করত না।

অইহুদিদের প্রাপ্ত নবুয়তকে ইহুদিরা কখনই মেনে নিতে পারেনি। তারা মনে করত নবুয়ত কেবল তাদের মধ্য থেকেই প্রাপ্ত হবে। অইহুদিদের তারা নিচু পর্যায়ের গণ্য করত। তাদের ভেতরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাব কাজ করত। তাই তারা বিশ্বাসীদের সাথে এমন আচরণ করত। তবে ইহুদিদের হঠকারী আচরণ করার পেছনে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের বিষয়টিরও ভূমিকা ছিল।

মদীনার হঠকারদের মধ্যে দোদুল্যমান একদল ছিল। তারা বিশ্বাসীদের সাথে সত্যের পথ অবলম্বন করতে চাইত। কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জীবন ও সম্পদ হারানর ভয় থাকে, তারা কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল না। তাদের অবস্থা ছিল 'না এদিক, না ওদিক' এমন পর্যায়ের।

হঠকারেরা অবিশ্বাসীদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। আবিশ্বাসীদেরকে সরাসরি চেনা যায, জানা যায়। তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হঠকারেরা দলের মধ্যে অবস্থান করলেও তাদেরকে চেনা যায় না। দলের ভেতরে অবস্থান করেই তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। বিপক্ষে কাজ করে। তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। হঠকারদের এমন হীন চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে তাদের সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে যে,

"নিশ্চয়ই! হঠকাররা নরকের অগ্নির সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি তাদের জন্য কোন সহায়তাকারী খুঁজে পাবে না।" (আল-কোরআন ৪:১৪৫)

■ **২.৯** তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। বস্তুত তারা নিজেদেরকে ব্যাতিত অন্য কাউকেই ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না : হঠকারেরা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করি অথচ তারা বিশ্বাস করে না। এগুলি বলে তারা বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়।

আল্লাহ সর্বদাই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষশক্তি। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থানের কারণে বিশ্বাসীরা সর্বদাই আল্লাহর পক্ষশক্তি। ফলে বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ প্রকারান্তরে আল্লাহকেও ধোঁকা দেয়া। তাই বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদেরকে ধোঁকা দিতে চায়।

আল্লাহই সত্য, আল্লাহই ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। বিশ্বাসীরা আল্লাহর পক্ষশক্তি। সত্য-মিথ্যের দ্বন্দ্বে সত্য চিরকালই জয়লাভ করে। মিথ্যে বা ভূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটি সত্য ও সৃষ্টির সূত্র। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করলেও এ সূত্রের সত্যতা পাওয়া যাবে। সাময়িক সময় ব্যাতিত এর কখনই ব্যাত্যয় হয় না। সত্যের জয় হবেই।

হঠকারেরা সুযোগ পাওয়া সত্বেও সত্যের পথ অবলম্বন করে না। তারা চালাকির আশ্রয় নিয়ে বিশ্বাসীদের সাথে ধোঁকাবাজির খেলা খেলে। যখন বিশ্বাসীরা তথা সত্য জয়লাভ করে তখন তারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ফলে নিজেরাই ধোঁকায় পড়ে যায়। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, হঠকাররা সে সত্যটিও উপলব্ধি করে না। বোকামি বা মুর্খতার এটি আরেক চরম পর্যায়।

■ **২.১০** তাদের অন্তঃকরণ ব্যাধিগ্রস্ত এবং আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, কেননা তারা মিথ্যাচার করে : হঠকারেরা মিথ্যে বলে। তাদের মুখে এক কথা কিন্তু অন্তরে আরেক কথা লুক্কায়িত থাকে। তারা নিজেদেরকে নিয়ে শঙ্কায় থাকে। তাই মিথ্যে বলার মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে।

মিথ্যে হচ্ছে ব্যাধিস্বরূপ। হঠকারদের আচরণের দ্বি-মুখীতার সাথেই মিথ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান। মিথ্যে অন্তরের সততাকে নষ্ট করে দেয়। সততা নষ্ট হলে অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের অন্তরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা হয়েছে।

একটি মিথ্যেকে ঢাকতে মানুষকে দশটি মিথ্যে বলতে হয়। এমনিভাবে হঠকারদেরকে কাঁধে মিথ্যের দায়ের পাহাড় জমা হতে থাকে। তাদের ব্যাধি এভাবে বৃদ্ধিই পেতে থাকে। ভয়, সন্দেহ কিংবা অনিশ্চয়তা থেকে তাদের ভেতরে এ ব্যাধি তীব্র আকারে বাসা বাধে। অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবনে শান্তি আসে না। তাই বলা হয়েছে আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয় যে আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আল্লাহ সরাসরি কারও ব্যাধি বৃদ্ধি করে দেন না। আল্লাহ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য সূত্র স্থাপন করে দিয়েছেন। মানুষের কর্ম ও আচরণই মানুষকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ভাল-মন্দ পরিণতির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।

মানুষের মিথ্যে বা হঠকারী আচরণ কোন একটি ভাল উদ্যোগ গ্রহণকে অসফল করে দিতে পারে। এর কুফল পরিশেষে সকলকে ভোগ করতে হয়। যাদের কারণে কোন কল্যাণ প্রচেষ্টা বিনষ্ট হয়, যারা নিজেদের ক্ষুদ্র হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এমনকি বৃহৎ জনগোষ্ঠী তথা গোটা মানবসমাজকে ক্ষতির মুখে ফেলে দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না তারা অপরাধী। মিথ্যাচার থেকে তাদের এ অপরাধের সৃষ্টি। তাই মিথ্যাচারের কারণে তাদেরকে শাস্তির বার্তা দেয়া হয়েছে। হঠকারদেরকে তাদের ভূল পথে চলা থেকে নিবৃত করার জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা।

যখন কারও ধ্বংস অনিবার্য বা নিকটবর্তী হয় তখন তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। কেননা ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের ভূল বা মন্দ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তারা ভূলের পর ভূল করতে থাকে। তখন তাদের ধ্বংসের যৌক্তিকতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সে সময় তাদের কোন রক্ষাকর্তা থাকে না। তারা অসহায় হয়ে যায়। তাদের কর্মের পরিণতি তাদেরকে গ্রাস করে।

■ **২.১১-২.১২** যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কর না, তারা বলে: আমরা তো কেবল শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না : সমাজ থেকে অশান্তি, অশিক্ষা, কু-শিক্ষা ও কুসংস্কার দুর করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে হঠকারদের হঠকারী আচরণ সংস্কারের কাজকে বিঘ্নিত করে। মহানবী (সাঃ) ইসলামের প্রচারকালে হঠকারদের দ্বারা তেমন অবস্থার মুখোমুখী হয়েছিলেন।

ইসলামের আবির্ভাবকালে মদীনার ইহুদিদের মধ্যে হঠকারীতার প্রবণতা প্রকটভাবে দেখা গিয়েছিল। তারা ভাল কাজে রাসূলের সহযোগী না হয়ে বিরোধীতে পরিণত হয়েছিল। হঠকারেরা যে সবক্ষেত্রে ভাল-মন্দ না বুঝে এমনটি করেছে তা নয়। তবে কোন ভাল বা নতুন উদ্যোগ গ্রহণকালে এমনটি সর্বত্রই ঘটে থাকে।

কিছু মানুষ কারও দ্বারা করা কোন ভাল কাজকে গ্রহণ করে নিতে পারে না। তাদের ভেতরে ঈর্ষা-বিদ্বেষ কাজ করে। আবার নিজেরাও সে কাজটি করতে পারে না। করবে কিভাবে? তাদের ভেতরে তো সংস্কারের সে চেতনা কাজ করে না। কিন্তু তাদের ভেতরে নেতৃত্ব দেয়ার বাসনা কাজ করে। অথচ নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাও তারা রাখে না।

তারা সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে না। সামাজিক পরিবর্তন বা সংস্কার কার্যক্রমকে ভয় পায়। তারা নিজেদের বিদ্যমান অবস্থা ও অবস্থানের ক্ষতির আশংকা করে। পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা অশান্তি সৃষ্টি করে সংস্কার কার্যক্রমকে বিনষ্ট করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তাদেরকে যখন এ ধরণের ক্ষতিকারক কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হয় তখন তারা নিজেদেরকে শান্তি স্থাপনকারীরূপে পরিচয় দেয়। এ আরেক হঠকারীতা!

বিশ্বাসীদেরকে এমন চরিত্রের মানুষদের চিনে নিয়ে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসীদের দলভূক্ত বলেই পরিচয় দেয়। ফলে সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থাও গ্রহণ করা যায় না। এদের বিষয়ে সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়; অন্যথায় এরা দলের ক্ষতি ব্যাতিত আর কিছুই করবে না।

▪ **২.১৩** যখন তাদেরকে বলা হয় অন্যরা যেভাবে বিশ্বাস এনেছে তোমরাও সেভাবে বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে আমরাও কি বিশ্বাস করব যেভাবে বোকারা বিশ্বাস করে? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা জানে না : বলা হচ্ছে, হঠকারদেরকে যখন বলা হয় যে হঠকারী ছেড়ে তোমরা বিশ্বাসীদের মতো হয়ে যাও, তখন তারা বলে আমরাও কি বোকাদের মতো বিশ্বাস করব? বিশ্বাসীদেরকে তারা বোকা ভাবে।

সৎ অন্তরে যারাই সহজ-সরল পথে চলে হঠকারেরা তাদেরকে বোকা ভাবে। বস্তুত ভাবে না, বিষয়গুলিকে এভাবে তারা প্রচার করার চেষ্টা করে। কেননা সত্যটা তারা ঠিকই জানে। এটাও আরেক হঠকারীতা।

বাস্তব জীবনে দুষ্টুমি খেলা খেলতে পারাকে তারা বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ ষড়যন্ত্রের খেলাই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। যার সুদুরের ফলাফল অত্যান্ত খারাপ। এগুলি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে মন্দভাবে প্রভাবিত করে। পৃথিবীকে অশান্ত করে।

অতি চালাকির আশ্রয় নিয়ে তারা সবকিছু নিজেদের করে নিতে চায়। কিন্তু তাতে লাভ কি? সেটিই তারা বোঝে না। জীবন কত ক্ষণস্থায়ী! এসব করে তারা নিজেরাই বোকার মতো কাজ করে। সহজ-সরল ও সঠিক পথ ধরে চললে জগতের সকল মানুষ এখানেই স্বর্গের মতো জীবনযাপন করতে পারে। তারা সেটি বোঝে না।

হঠকাররা যে ভাল-মন্দ বোঝে না তাও নয়। তারা তাদের অবস্থান হাতছাড়া হওয়ার আশংকা করে। তাই হঠকারী আচরণ করে। অথচ এগুলি করেও তারা চিরদিন বাঁচতে পারে না। কিন্তু দুষ্টুমির যে প্রক্রিয়া তারা প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যায় সেটি থেকে যায়।

তাদের সৃষ্টি করা দুষ্টুমি ইহজগতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। যুগ যুগ ধরে মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলে দেয়। তাদের কারণে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায় না। অধিকাংশ মানুষ ভাল থাকতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহত্তর কল্যাণের বিবেচনায় এগুলি চরম পর্যায়ের বোকামি।

আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর ভর করে সমাজ দাড়িয়ে থাকে। কিন্তু হঠকারী আচরণ সে আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে নষ্ট করে দেয়। চারিদিকে অবিশ্বাস ও

সন্দেহ বিস্তার লাভ করে। হঠকারদের অস্পষ্ট চরিত্র সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা দুরুহ হয়ে পড়ে। ইহজগত বিশৃংখল ও নরকে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই হচ্ছে বোকামি আচরণ যা কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

হঠকাররা কেবল নিজেদেরকে নিয়ে ভাবে। তারা ভেবে দেখে না যে, যে দুষ্ট খেলার পরিবেশ তারা সৃষ্টি করে দিয়ে যাচেছ, কিংবা যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত করছে সে পরিবেশে তাদের পরবর্তী প্রজন্মও বসবাস করবে! তারা তাদের প্রজন্মকে নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে দিয়ে যায়। নয়তো তাদের বিবেচনায় নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে নানান অপকর্মের সৃষ্টি করে। যার সবগুলিই বোকামি আচরণ। শান্তির আশায় তারা অশান্তি ও জটিলতার পাহাড় সৃষ্টি করে! দুষ্টুমিতে ধূর্ত হলেও শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা প্রকৃতই নির্বোধ। তাই বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা তা জানে না।

ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ে হঠকাররা মনে করত যে ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসীরা নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। নানামুখী কষ্ট ও সমস্যায় পতিত হয়েছে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে সকলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। নিছক বোকামি ছাড়া এগুলি আর কিছুই নয়। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'আমরাও কি বিশ্বাস করব যেভাবে বোকারা বিশ্বাস করে?'

হঠকাররা কোন বিষয়ের ভাল-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতা এসব নিয়ে ভাবে না। সবকিছুর উর্ধ্বে তারা নিজেদের তাৎক্ষণিক লাভ ও স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে পারাকেই সঠিক, জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত বলে মনে করে।

আজও কিছু মানুষ তেমনিভাবেই বিষয়গুলিকে বোঝে। তবে এটিও তো সত্য যে, কিছু মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন না করে গেলে পৃথিবী আজ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছাতে পারত না। সকলেরই উচিৎ সহজ-সরল পথ অবলম্বন করা। সহজ-সরল পথকে বোকামি না ভাবা।

■ **২.১৪-২.১৫** তারা যখন বিশ্বাসীদের মুখোমুখী হয় তখন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আবার যখন তাদেরই দুষ্কর্মাদের কাছে ফিরে যায় তখন বলে নিশ্চয়ই! আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো কেবল উপহাস করেছি।

আল্লাহ নিজেই তাদের সঙ্গে উপহাস করেন তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অন্ধের মতো ঘুড়ে বেড়াতে দিয়ে : হঠকারদের দ্বি-মুখী চারিত্রিক বৈশিষ্টের এটি একটি উদাহরণ। বিশ্বাসীদের কাছে এসে তারা বলে আমরা বিশ্বাস করি। আবার যখন তাদেরই মতো দুষ্কর্মা সঙ্গী-সাথীদের কাছে যায় তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো বিশ্বাসীদের সঙ্গে উপহাস করেছি মাত্র।

ভাল-মন্দ কোন কাজ কখনও অপ্রকাশিত থাকে না। হঠকারদের মিথ্যে আচরণ সকলের কাছে একদিন প্রকাশ পেয়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদে মানুষ তাদের চরিত্রকে স্মরণে রাখে। সকলের কাছে তারা নীতি-নৈতিকতাহীন বলে পরিচিতি পায়। কারও আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারে না। অতঃপর বিভ্রান্ত হয়ে অন্ধের মতো একবার এদের- আরেকবার ওদের দারস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অতএব তারা নয়, বরং আল্লাহ নিজেই তাদের সঙ্গে এভাবে উপহাস করেন। তারা সকল দিক থেকেই বঞ্চিত হয়। সমাজও তাদেরকে ভালভাবে গ্রহণ করে না।

আল্লাহ এভাবে জগতে তাঁর নিয়ম বা সূত্র প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টই তাদেরকে সূত্র নির্ধারিত পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহর দুনিয়ায় সব সূত্র মেনে চলে।

দ্বি-মুখী মিথ্যে আচরণের কারণে হঠকাররা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিন্তু তারা নিজেরা সেটি বোঝেও না।

▪ **২.১৬** এরাই তারা যারা প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে। ফলে তাদের বানিজ্যে উন্নতি হয়না এবং তারা কোন দিশাও লাভ করতে পারে না : জীবন ও জগতের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মানুষকে চলার কোন একটি পথ বেছে নিতে হয়। পথ অবলম্বনের পূর্বে তাই পথসমুহের ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে নিতে হয়। আল্লাহ মানবজাতির জন্য কোরআনের মাধ্যমে চলার সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু হঠকারেরা ভাল পথ প্রদর্শন করা সত্বেও ভূল পথ বেছে নেয়।

তারা একবার বিশ্বাসীদের পথে হাটে, আবার সেখান থেকে ফিরে গিয়ে দুষ্কর্মাদের পথে হাটে। নির্দিষ্ট পথে স্থীর থাকে না। ফলে প্রয়োজনের সময়ে তারা না বিশ্বাসীদের সহযোগীতা পাবে, না দুষ্কর্মাদের সহযোগীতা পাবে। তারা

কারও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। যদিও তারা নিজেদের ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যই দ্বি-মুখী হঠকারী আচরণ করে, কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্টের এমন স্বভাবের কারণে বিপদে কেউই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। জীবনে তারা কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হতে থাকবে। এমনকি তারা এভাবে তাদের নিজেদের প্রজন্মেরও ক্ষতি সাধন করে। কেননা মানুষ তাদের কীর্তিকলাপ পরবর্তীতেও স্মরণে রাখে। যার প্রভাব প্রজন্মের ওপর মন্দভাবে পড়ে।

সার্বিক বিবেচনায় হঠকারদের তাই উন্নতি হয় না। সেজন্যই রূপক অর্থে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'তাদের বানিজ্যে উন্নতি হয় না'। অর্থাৎ অধিক লাভ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা যে পথ অবলম্বন করে তা থেকে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। এখানে কোন একটি পথ অবলম্বনকে রূপক অর্থে একটি বাণিজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেখান থেকে ভাল বা মন্দ ফলাফল অর্জন হয়। সে অর্থে তারা ভূল পথ ক্রয় করে বলে বলা হয়েছে।

হঠকাররা বেশী ভাল থাকার আশায় দুই নৌকায় পা দেয়। অতঃপর নৌকা যত দুরে সরে যেতে থাকে তাদের অবস্থা ততই বিপন্ন হতে থাকে। কোন পথে যাবে কোন দিশা খুঁজে পায় না। অতঃপর গহ্বরে পতিত হয়। তাই বলা হয়েছে, 'তারা কোন দিশাও লাভ করতে পারে না'।

প্রকৃতপক্ষে হঠকাররা বিচার-বিবেচনা ছাড়া পথ বেছে নেয় না। আবার তারা নিজেদের জন্য ভূল পথও বেছে নেয় না। তারা সে পথই বেছে নেয় যে পথে শুধুমাত্র নিজেদের সুবিধা সংরক্ষিত হবে। সামগ্রীক বা বৃহত্তর কল্যাণের কথা তারা বিবেচনা করে না। অথচ এটিই তাদের সবচেয়ে ভূল বিবেচনা।

■ **২.১৭-২.১৮** তাদের উপমা সে ব্যাক্তির মতো যে অগ্নি প্রজ্বলিত করল এবং আলো যখন চারিদিক আলোকিত করে তুলল, ঠিক তখনই আল্লাহ তার জ্যোতি উঠিয়ে নিলেন এবং অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ফলে তারা দেখতে পায় না। বধির, মূক ও অন্ধ এবং তারা সুপথে ফিরে আসবে না : হঠকারদের বিষয়ে কিছু উপমা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, হঠকারদের অবস্থা হতভাগাদের মতো। আলো যখন চারিদিক আলোকিত করে ঠিক তখনই তাদের থেকে জ্যোতি উঠিয়ে নেয়া হয় এবং তারা অন্ধকারে পতিত হয়।

হঠকাররা যখন বিশ্বাসীদের কাছে আসে তখন তারা একটি পথ খুঁজে পায়। সে পথ আলোর পথ। সত্য ও সঠিক পথ। কিন্তু দ্বি-মুখী স্বভাবের কারণে আবার যখন দুষ্কর্মাদের সাথে অন্তরঙ্গ হয় তখন সে আশির্বাদ বা আলো তাদের থেকে উঠে যায়। তারা অন্ধকারে পতিত হয়।

হঠকারেরা নীতি নিয়ে চলে না। চলার সুনির্দিষ্ট পথ বেছে নেয় না। সত্য-সঠিক পথ চিনে নেয় না। আবার কখনও চেনা সত্বেও ঈর্ষা-বিদ্বেষের কারণে সে পথে সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসে না। কিংবা স্বার্থের কারণে এগিয়ে আসতে পারে না। তারা কোন ভাল কাজে সহযোগী হয় না। ভাল-মন্দ বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোন বোধ, বিচার-বিবেচনা কাজ করে না। কিংবা করলেও তারা সেটিকে কাজে লাগায় না। ফলে সে বুঝ বা জ্ঞান কোন মূল্য বহন করে না।

চোখ, কান, মুখ সকল ইন্দ্রিয় সচল থাকা সত্বেও তারা বধির, মূক ও অন্ধের মতো। মন্দ প্রবৃত্তি তাদের ইন্দ্রিয়সমুহকে অকেঁজো করে রাখে। তাই সত্যের বার্তা শোনার ক্ষেত্রে তারা বধির, সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে মূক এবং সত্যকে দর্শনের ক্ষেত্রে অন্ধ।

না জেনে-বুঝে যারা ভূল করে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। তাদের সুপথে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইচ্ছেকৃত বা পরিকল্পিতভাবে যারা হঠকারী আচরণ করে তাদের সুপথে ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

ইসলামের আবির্ভাবকালে যারা হঠকারী আচরণ করেছে এখানে তাদেরকে বিশেষত ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে। ইহুদিরা ইসলাম সম্পর্কে জেনে-বুঝে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়তের বিষয়টি জানা সত্বেও হঠকারী আচরণ করেছিল। অথচ তারা নিজেরাও এক সময় মুসা (আঃ) এর নেতৃত্বে তৌহিদের বাণী প্রতিষ্ঠায় কঠোর সংগ্রাম করেছে।

ইহুদিরা তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বার্থকে বড় করে দেখতে শিখেছে। তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে।

তারা যেহেতু জেনে-বুঝেই হঠকারী করেছে, ফলে তাদের সুপথে ফিরে আসার সম্ভানা ক্ষীণ। এখানে তাদের সে অবস্থার কথাই উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.১৯** কিংবা তাদের অবস্থা এমন যে ঝড় ও বর্ষণমুখর আসমান, যেখানে আছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎচমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে তারা রক্ষা পেতে চায়। অথচ অবিশ্বাসীদের আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন : হঠকারদের বিষয়ে আরও উপমা তুলে ধরা হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টিতে আসমান থেকে বজ্র-বিদ্যুৎ পতিত হলে কিছু মানুষ চোখ-কান বন্ধ করার চেষ্টা করে। এটি করে বজ্র-বিদ্যুতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

যাদের জ্ঞান আছে তারা জানে যে বজ্র-বিদ্যুতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। তবুও মানুষ এগুলি করে অভ্যাসবশত। কিংবা মনকে ক্ষণিক শান্তনা দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা ভূলে যায় যে এখান থেকে পরিত্রানের কোন উপায় নেই। কেননা পরিবেশ ও প্রকৃতির চৌহদ্দির মধ্যেই মানুষ আটকা পড়ে আছে।

হঠকারেরাও তেমনিভাবে হঠকারী আচরণ করে নিজেদেরকে সমুহ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। তারা দ্বি-মুখী আচরণ করে। সকলের কাছে ভাল থাকতে চায়। সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ভাব প্রদর্শন করে। এভাবে নিজেদেরকে ও নিজেদের সহায়-সম্পদকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ সব জানেন। আল্লাহর জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যেই তারা আটকা পড়ে আছে। কিন্তু তারা সে কথাটি ভূলে যায়। যখন সময় আসবে তখন কোনভাবেই মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণকারীরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এখানে সে সতর্কবাণীই উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকও পরিবেষ্টন করে আছেন।

▪ **২.২০.১** বিদ্যুতালোক তাদের থেকে তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছিনিয়ে নিতে চায়। যখনই আলো উদ্ভাসিত হয় তারা চলতে শুরু করে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায় তারা স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন তিনি তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন : ঝড়ের রাতে বিদ্যুতালোক ক্ষণিকের জন্য মানুষকে চলার পথ প্রদর্শন করে। পরক্ষণেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। মানুষ চলতে পারে না। থমকে দাড়ায়।

হঠকারদের অবস্থাও তেমন। কোন পক্ষের আশ্বাসে ক্ষণিকের জন্য তারা চলার পথ খুঁজে পায়। দেহ-মনে শক্তি ফিরে আসে। কিন্তু যখন তারা দিক

পরিবর্তন করে তখন তাদের ওপর থেকে সহায়তার হাত উঠে যায়। আর চলতে পারে না।

বস্তুত তাদের নিজস্বতা বা স্বকীয়তা নেই। তারা কারও আশ্বাস বা সহায়তায় চলে। ভাল-মন্দ বিচার করে সত্যের পথ গ্রহণ করে না, কিংবা সে পথে দৃঢ় থাকে না। সবদিকে চলতে গিয়ে কোনদিকেই পথ পায় না।

আল্লাহর অশেষ দয়া যে তিনি তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বুঝ-জ্ঞান দিয়েছেন। তাদের উচিত আল্লাহর দেয়া এ সকল অনুগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সত্যের পথ খুঁজে নেয়া। অন্যথায় তিনি যেমন আশীর্বাদস্বরূপ তাদেরক শ্রবন ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন যথাযথভাবে সেসবের ব্যাবহার না করার কারণে তিনি তা উঠিয়েও নিতে পারেন। তাদেরকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.২০.২** নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম (Lo! Allah is able to do all things) : এ বাণী এখানে উদ্ধৃত করার কিছু প্রাসঙ্গিকতা আছে। তথাপি বাণীটিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকেও একটু গভীরভাবে বোঝার আছে। ‘আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম’। প্রথমেই বোঝার চেষ্টা করব এখানে ‘সব’ বলতে মানুষ কি বুঝবে?

মানুষের জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে যা নেই, কিংবা মানুষের কল্পনায় যা আসে না- এই ‘সব’ কথাটির মধ্যে কি সেসবও অন্তর্ভূক্ত হবে? তাই জানতে চাওয়া হয়েছে যে এই ‘সব’ কথাটি দিয়ে মানুষ আসলে কি বুঝবে? কতটুকু বুঝবে? এই ‘সব’ এর মধ্যে কতটুকু অন্তর্ভূক্ত হবে?

মানুষ ‘সব’ বলতে ততটুকুই বুঝবে যতটুকু সে জানে। অর্থাৎ যতটুকু তার জ্ঞানের মধ্যে আছে ততটুকুই তার জন্য ‘সব’। তার জ্ঞানের মধ্যে যা নেই তা এই ‘সব’ এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

মানুষ জানে যে ‘সব’ আল্লাহ করেছেন। এমনকি মানুষ নিজে যা সৃষ্টি করেছে কোন না কোন ব্যাখ্যায় সেসবও আল্লাহই করেছেন। অতএব মানব জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে জগতের যা কিছু সৃষ্টি সবই আল্লাহ করেছেন। তিনি যা করতে চেয়েছেন তাই তিনি করেছেন। তাই বলা হয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২৯.১, ২.২৯.২, ২.২৯.৪, ২.১০৭, ২.১১০.৩, ২.১১৫.২, ২.১৩৭.২, ২.১৪৮.৩, ২.১৬৩.১, ২.১৬৫.৩, ২.১৮৬.১, ২.২০২,

২.২১৮.১, ২.২৩৪, ২.২৩৭, ২.২৪৪.২, ২.২৪৫.২, ২.২৪৭.৪, ২.২৪৯.৩, ২.২৫১.৩, ২.২৫৫.১. ২.২৫৬.৩, ২.২৫৭.১, ২.২৬৩.২, ২.২৬৭.২, ২.২৬৮.১, ২.২৬৮.২, ২.২৭০.১, ২.২৭১.৩, ২.২৭৩.২, ২.২৮৪.১, ২.২৮৪.৪]।

মানুষ আজ যা জানে তার কোন কিছুই একসময় জানত না। আল্লাহর সৃষ্টি দর্শন করেই মানুষ সবকিছু জেনেছে। মানুষের জ্ঞানের মধ্যে নেই, অথচ আল্লাহ যখন তা সৃষ্টি করেন তখন সেটি মানব জ্ঞানে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। মানুষ তখনই বুঝতে পারে যে তার জ্ঞানের মধ্যে যা নেই আল্লাহ তাও সৃষ্টি করতে পারেন।

অতএব মানুষের জ্ঞানের মধ্যে যা আছে এবং মানুষের কল্পনার মধ্যেও যা নেই আল্লাহ তার সবই করতে পারেন। অভিজ্ঞতা বলে যে আজও যা নেই ভবিষ্যতে আল্লাহ তাও করতে পারেন। অতএব আল্লাহ সব করতে পারেন।

আল্লাহ সব করতে পারেন। এটি বিশ্বাসের মধ্যে আনা উত্তম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এই বিশ্বাস রেখে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবনশক্তির যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিত করা উচিত। অন্যথায় তিনি তা উঠিয়েও নিতে পারেন। কেননা আল্লাহ সব করতে পারেন।

জীবন ও ধন-সম্পদ কোনকিছুই চিরদিন থাকবে না। অথচ এসবের সুরক্ষা দিতে গিয়েই হঠকাররা ভূল পথে চলে। দ্বি-মুখী আচরণ করে। ভাল-মন্দ সবদিকে ঘুরে বেড়ায়। অথচ হঠকারী আচরণ না করে তাদের উচিত দেখে, শুনে, বিচার-বিবেচনা করে সত্যের পথ খুঁজে নেয়া। সত্যের পথে থেকেই নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। কিংবা ঝুঁকি নিলেও সত্য ও ন্যায়ের পথে থেকে ঝুঁকি নেয়া। কেননা হঠকারী আচরণ করেও তারা ঝুঁকির মধ্যেই আছে। এটি তাদের প্রতি সতর্ক ও উপদেশ বার্তা। যেন তারা ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসে।

যদিও এখানে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে, তবে এ বক্তব্য সর্বকালে সকল হঠকারদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এগুলি শ্বাশত ও সার্বজনীন বাণী। হঠকারদের চরিত্র সর্বকালে একইরকম।

হঠকারেরা দ্বি-মুখী আচরণ করে। তারা বিশ্বাসীদের কাছে এসে এক কথা বলে, আবার অবিশ্বাসীদের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে তাদেরই দলভূক্ত বলে পরিচয় দেয়। তাদের সুনির্দিষ্ট কোন নীতি থাকে না। তাদের প্রকৃত রূপ সহজে

বোঝা যায় না। তারা ভয়-ভীতি ও বিপদ-আপদ থেকে নিজেদেরকে এভাবে সকল দিক থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। এখানে হঠকারদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সংস্কারের কাজকে হঠকার ইহুদিরা একটি আন্দোলন হিসেবে দেখেনি। তারা এটিকে খুব সাধারণ জাগতিক রেষারেষি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা দলাদলির একটি অংশরূপে বিবেচনা করেছে। এর পেছনে যে একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প আছে তাদের কাছে সে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। তাদের মধ্যে যারা এ সামাজিক বিপ্লবের সত্যতার বিষয়টি জানত বা বুঝত তারাও তাদের নেতৃত্বের কারণে দোদুল্যমানতায় ভূগেছে। তেমন বোধসম্মত মানুষেরাও হিম্মত নিয়ে সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতে পারেনি। ফলে বলা যায় যে তারা সকলে বিরোধীতাই করেছে। মুখে যাই বলুক না কেন তারা আসলে বিশ্বাসী নয়। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট তুলে ধরে বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

➢ (আয়াত ২১-২২) আয়াত দুই থেকে বিশ পর্যন্ত মানুষের তিনটি ধরণ- বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও হঠকারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে সমগ্র মানবজাতিকে (Mankind) এক আল্লাহর উপাসনা (Worship) করার জন্য আহবান করা হয়েছে এবং আল্লাহর সঙ্গে তাঁর শরীক (Partner) দাঁড় করাতে বারণ করা হয়েছে। ইসলামের দর্শন মতে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা তাঁর শরীক বিবেচনা করা অত্যান্ত গর্হিত কাজ! ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বা পাপ।

২১	হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা (মন্দ কর্ম ও পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার, (O mankind! worship your Lord, Who hath created you and those before you, so that ye may ward off (evil).)
২২	যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বিশ্রামাগার এবং আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যাবস্থা করেছেন তোমাদের খাদ্যস্বরূপ। তোমরা ভালভাবেই

	জান, অতএব আল্লাহর সঙ্গে কোন সমকক্ষ দাঁড় করিও না। (Who hath appointed the earth a resting-place for you, and the sky a canopy; and causeth water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. And do not set up rivals to Allah when ye know (better).)

▪ **২.২১.১** হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন : বিশ্বাসী হতে হলে মানুষকে যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে ইতিপূর্বে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বাসের শর্তসমুহ তুলে ধরার পর মানবসমাজকে তাদের পালনকর্তার উপাসনা [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২] করতে আহবান জানান হয়েছে। বলা হচ্ছে, পালনকর্তা তিনি যিনি পূর্বাপর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

যিনি জীবন দান করেছেন, লালন-পালন করে চলেছেন এবং মানুষের জন্য এত এত অনুগ্রহ দান করেছেন মানুষের কি উচিত নয় তাঁর উপাসনা করা? মানুষকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"মহাত্মাগণ আমাকে সকল সৃষ্টির কারণ অনন্ত ভগবান জেনে অনন্যমনা হয়ে আমার উপাসনা করে। এইসব ভক্তরা দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে সর্বদা আমার গুণ-কীর্তন করে এবং ভক্তি সহকারে আমাকে নমস্কার বা সেজদা করে। ... অতএব আমাতে মনোনিবেশ কর। আমাতে ভক্তিপ্রবন হও। আমার উপাসনা কর। আমার মাঝে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট হলে তুমি আমাকেই পাবে।" (গীতা ৯:১৩-১৪, ৩৪)

সৃষ্টির বিষয়ে মানব জ্ঞান আজও নিশ্চিতভাবে কিছু জানে না। বিষয়গুলি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। তবে প্রকৃতি, পরিবেশ সবকিছুর পর্যবেক্ষণজনিত জ্ঞান বলে যে একজন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ধরে নেয়া উত্তম ও যুক্তিসম্মত। কোরআন সে বিষয়টিকেই এখানে নিশ্চিত করেছে।

যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে আমরা 'আল্লাহ' নামে জানি। সকলেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। এটিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। উপাসনা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উত্তম উপায়। ওপরে গীতার উদ্ধৃতিতে সে কথাই উঠে এসেছে।

উপাসনা স্রষ্টার সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। মানব হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়। মানুষ উপাসনায় মগ্ন হয়ে জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। সৃষ্টিকর্তার স্মরণ ধারণায় বিপদে-আপদে, যন্ত্রনায় আশ্রয়ের স্থল হয়ে কাজ করে। বিশ্বাসীর অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়।

উপাসনা ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক মানুষের জীবনাচরণকে সুশৃংখল করে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়াও উপাসনার শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও বৈশ্বিক থেকে শুরু করে বহুবিধ প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা আছে। উপাসনার মনাস্তাত্বিক গুরুত্বও অপরিসীম। এমন কোন ধর্ম নেই যে ধর্মে উপাসনার বিদ্যমানতা নেই। উপাসনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম উপায়।

সত্যি বলতে, আল্লাহকে সর্বপ্রথমেই অস্বীকার করে ফেললে উপাসনার আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তেমন মানুষের বিচার্য্য বিষয় আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে। কিন্তু আল্লাহকে স্বীকার করে নিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আছে। যিনি জীবন দান করেছেন, লালন-পালন করে চলেছেন, এত এত অনুগ্রহ দান করেছেন মানুষের কি উচিত নয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা? মানুষকে তাই কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দানকারীকে তুষ্ট করে। তাঁর তুষ্টি পরবর্তী প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। গীতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি দর্শন নিম্নরূপে বিধৃত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদেরকে তুষ্ট কর। দেবতারাও তোমাদেরকে তুষ্ট করবে। পরস্পরের তুষ্টি বিধানের মধ্য দিয়ে পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদেরকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু দান করবে।" (গীতা ৩:১১-১২)

যজ্ঞ হচ্ছে ভগবানের কারণে কোন কিছু উৎসর্গ করা। ভগবানের কারণে যে সবকিছুকে উৎসর্গ করতে পারে সেটি সম্ভব হয় তার কৃতজ্ঞতাবোধের কারণে। এতে ভগবান তুষ্ট হন। ভগবান বা পালনকর্তার তুষ্টি জীবনোপকরণ প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। মানুষ যদি নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক আদান-

প্রদানের বিষয়গুলিকে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করে তবে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।

সৃষ্টিকর্তার বিষয়গুলি অনুধাবনের উত্তম উপায় হচ্ছে মানুষের নিজেকে বোঝা। সর্বত্রই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন। তাই নিজেদেরকে দিয়েও মানুষ বিষয়গুলি বুঝতে পারে। অকৃতজ্ঞকে মানুষ নিজেরাও ভয়ানক অপছন্দ করে। মানব অন্তর তেমন একজনকে কখনই গ্রহণ করে নিতে পারে না।

আল্লাহর গুণাবলীই মানুষের মাঝে কিঞ্চিৎ বিদ্যমান। তাই মানুষ আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে করতে পারে। মানুষ তার নিজেকে দিয়েও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা না করার ভাল-মন্দ দিকগুলিকে বুঝতে পারে। বস্তুত ভেতরে তিনিই বিরাজ করেন।

আল্লাহকে উপাসনা করার এ নির্দেশনা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুখকর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। এটি প্রত্যেক উপকার গ্রহণকারীর কর্তব্য যে সে দাতার প্রতি যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। বোধসম্পন্ন মানুষ এর মাধ্যমে নিজেরাও তৃপ্তি লাভ করে। এসব আচরণ দাতা ও গ্রহীতা প্রত্যেকের জন্য সুখকর হয়। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অকৃতজ্ঞ আচরণ জগতে অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। মানুষ নিজেদেরকে দিয়েও এসব কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। এ অশান্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমেও হতে পারে। বস্তুত সবই আল্লাহর দ্বারা সংঘটিত হয়।

আল্লাহর ভাল-মন্দ ইচ্ছের প্রভাব আমাদের ওপর পতিত হয়। দৃশ্যমান এ প্রকৃতি আল্লাহর চৌহদ্দির বাইরে কিছু নয়। প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। প্রকৃতিতে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে অগনিত সূক্ষ্ণ কারণ নিহিত থাকে। আমরা কেবল ওপর থেকে পরিবেশ ও প্রকৃতিকেই দেখি। কিন্তু মহাজাগতিক পরিমন্ডলে অতি ক্ষুদ্র মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়ার পেছনের সব কারণগুলি অনুধাবন করতে পারে না। মানুষের নিজেদের ভূল কর্মকান্ডও পরিবেশ উত্তপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। যার অন্যতম হচ্ছে অকৃতজ্ঞ আচরণ।

আল্লাহর রুদ্ররোষ ভয়ংকর। যা প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মাধ্যমে মানুষের ওপর পতিত হয়। এসব ঘটনা সংঘটনের মূল রহস্যের পরিপূর্ণ জ্ঞান আজও মানুষের করায়ত্ত নয় বিধায় মানুষ বুঝতে পারে না। তবে মানুষের ধ্বংস তার নিজের ভূল কর্ম ও আচরণের ওপর নির্ভর করে। এটি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে হয়ে থাকে তেমনি সামষ্ঠিক পর্যায়েও হয়।

আল্লাহর উপাসনা হচ্ছে তাঁর দেয়া সকল অনুগ্রহ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি মস্তক অবনত করা। তাঁর গুণ-কীর্তন করা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যা তাঁকে তুষ্ট রাখে। প্রকৃতি ও পরিবেশকে শান্ত রাখে। মানুষের উচিত নিয়মিত পালনকর্তার উপাসনা করা। তাঁকে সেজদা করে যথাযথ সন্মান প্রদর্শন করা।

▪ **২.২১.২** যেন তোমরা মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার (So that ye may ward off evil) : বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের মনেই নানান প্রশ্নের উদয় হতে পারে। আল্লাহ সেভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পেছনের কারণ জানতে চায়। তাতে আত্মা তৃপ্তি পায়। বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষকে কেন আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হচ্ছে? নিশ্চয়ই পেছনে কারণ আছে। আছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সবাইকে সেসব জানতে হবে না। কিন্তু কিছু অনুসন্ধানি মন জানতে চাইবেই। তাদের জন্যই এমন বিশ্লেষণ।

কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কোরআনের দর্শনের একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। দর্শনের পরিপূর্ণ অনুসরণ জীবনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

কি সেই লক্ষ্য? উত্তর হচ্ছে 'শান্তি'। অর্থাৎ শান্তি লাভ করা। শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। তাই কেউ বলে ইসলাম মানে 'শান্তি' বা শান্তির ধর্ম। কেউ আবার 'ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি' জঁপে শান্তির অন্বেষায়। শান্তি অর্জনই চূড়ান্ত লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনেই কোরআনের দর্শনে মানুষকে বিশ্বাস করতে আহবান করা হয়।

ছোট্ট একটি শব্দ 'শান্তি'। কিন্তু এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাড়ি দিতে হয় বহু সংগ্রামের পথ। শান্তি যেমন প্রয়োজন ব্যাক্তিক পর্যায়ে তেমনি প্রয়োজন সামষ্ঠিক পর্যায়ে। আবার এদের একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। ব্যাক্তিক শান্তি ব্যাতিত সামষ্ঠিক শান্তি আসা কঠিন। সামষ্ঠিক শান্তি ব্যাতিত ব্যাক্তিক প্রশান্তি অকল্পনীয়। আবার আছে পরবর্তী জীবনেও শান্তি প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

সমগ্র দর্শন একটি সামগ্রীক রূপরেখা দাঁড় করায়। সেখানে থাকে সামগ্রীক লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি কর্মযজ্ঞের আছে আবার আপাত লক্ষ্য। দর্শন প্রদত্ত সামগ্রীক লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রতিটি কর্মযজ্ঞের আপাত লক্ষ্যসমুহকেও অর্জন করতে হবে।

কোরআন প্রদর্শিত পথে চললে লক্ষ্য অর্জন হবে। ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক এমনকি পারলৌকিক শান্তির পথও উন্মোচিত হবে। সে কারণে দর্শনে প্রদত্ত শর্তসমুহে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়। কিন্তু সে বিশ্বাসকে ধরে রাখার জন্যও কিছু ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখার জন্য ধর্মীয় দর্শনসমুহে যে সকল কারুকাজের ব্যাবস্থা আছে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে 'উপাসনা'। সকল ধর্মেই পালনকর্তার উপাসনা করার নির্দেশনা আছে [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]।

বিশ্বাসকে গভীরে গ্রথিত করার জন্য উপাসনা একটি উপায় হয়ে কাজ করে। উপাসনা প্রত্যহ নিয়মিত পালন করতে হয়। এটি দর্শন প্রদত্ত বিষয়গুলির সঙ্গে বিশ্বাসীকে সার্বক্ষণিক জড়িয়ে রাখে। উপাসনা মুখ নিঃসৃত বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে অন্তরে গ্রথিতকরণে ভূমিকা রাখে। বিশ্বাসের দৃঢ়তাই মানুষকে দিয়ে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করিয়ে থাকে। দর্শনের লক্ষ্যকে অর্জন করে।

লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাক্তিক, সামাজিক, বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পারলৌকিক শান্তি অর্জন করা। ব্যাক্তিক কিংবা পারলৌকিক শন্তি অর্জনে আল্লাহর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে ভগবানকে লাভ করতে হবে। তার জন্য উপাসনা উত্তম উপায়।

আল্লাহকে পেতে হলে তাঁর রোষানল থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। তাঁর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সে কারণেও উপাসনা প্রয়োজন।

সামাজিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা, ব্যাক্তিক শান্তি লাভ, পালৌকিক শান্তি অর্জন, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ সবকিছুর জন্য মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলতে হবে।

মন্দ কর্ম করা, মন্দ পথে চলা ওপরের প্রত্যেকটি লক্ষ্য অর্জনকে ব্যার্থ করে দেয়। অতএব মানুষকে সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হয়েছে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলার জন্য। দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য। উপাসনা পালন করার মধ্য দিয়ে যদি উপাসনার মূল লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব না হয় তবে সে উপাসনা পালন অর্থহীন।

এতদ্বসত্বেও মানুষ মন্দ কাজ করছে। একই সাথে প্রচন্ড পরিমানে উপাসনায়েও অংশগ্রহণ করে চলেছে। পরবর্তীতে ভাল কিছু পাওয়ার অলীক স্বপ্ন দেখছে। কোরআনের বাণীর মর্মার্থ না বুঝে কিছু ভূল বিশ্লেষণ ও সেসবের প্রচার মানুষকে এমন আচরণে উৎসাহিত করছে।

নিয়মিত উপাসনা মানুষকে দর্শনের নির্দেশনা তথা করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে উপাসনা মন্দ পথ থেকে নিজেকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে কাজ করে। এতদ্বসত্বেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। কেননা এ একটি বিষয় দর্শন প্রদত্ত শিক্ষার সকল বিষয়াবলীকে স্মরণের মধ্যে এনে দেয়। ফলে উপাসনাকারীর দ্বারা মন্দ কাজ করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ এসে বাধ সাধে। তথাপি যদি কেউ মন্দ কাজ করে তবে ধরে নিতে হবে যে তার ভেতরে সঠিক জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। কিংবা এখনও সে যথাযথ চর্চ্চার মধ্যে আসেনি।

নিয়মিত উপাসনার চর্চ্চা দর্শন নির্দেশিত বিষয়াবলীকে মানুষের অভ্যাসের সঙ্গে একীভূত করে দেয়। এর থেকে সামান্যতম বিচ্যূতি তাকে দৈহিক পেরিয়ে মানসিকভাবেও যন্ত্রনা দেয়। ফলে বিশ্বাসীকে সম্ভাব্য বিচ্যূতি থেকে যথাসময়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে। এটি স্বয়ংক্রীয় যন্ত্রের মতো কাজ করে। যা প্রকৃতপক্ষে তাকে তার দর্শনের দেখান পথে মজবুত রাখে। দর্শনের পথে কঠিনভাবে মানুষকে জুড়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কোরআন প্রদর্শিত পথের বাস্তবায়নের সফলতা নিয়মিত উপাসনা পালনের ওপর ভীষনভাবে নির্ভর করে।

সমাজে সাম্য-সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত মানব শক্তির জাগরণ প্রয়োজন। বিশ্বময় সকল মানুষের আল্লাহকে সামনে রেখে একই রীতিতে উপাসনা পালন ভ্রাতৃত্ববোধ ও তাদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করে। মানব শক্তির জাগরণে উপাসনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপাসনা মানুষকে সত্যের পথে থাকতে সাহস ও প্রেরণা জোগায়। অন্যায় অত্যাচারের মন্দ ছোবল থেকে মানুষকে রক্ষা করে। সামাজিক ও জাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। মন্দ কর্ম ও পথ থেকে রক্ষা করে।

▪ **২.২২** যিনি পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বিশ্রামাগার এবং আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে ফল-ফসল উৎপাদনের ব্যাবস্থা করেছেন তোমাদের খাদ্যস্বরূপ। তোমরা ভালভাবেই জান, অতএব আল্লাহর সঙ্গে কোন সমকক্ষ দাঁড় করিও না : মানুষকে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীকে মানুষের আবাসস্থলরূপে বসবাসযোগ্য করে সৃষ্টি করেছেন। সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যাবস্থা করেছেন। আকাশকে করেছেন আবরণস্বরূপ যা পৃথিবীবাসীকে সুরক্ষা দেয়। আকাশ থেকে পানি বর্ষনের ব্যাবস্থা করেছেন। যার সাহয্যে মানুষের আহার্য্য ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। সবই তিনি করেছেন তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ।

মানুষ বিষয়গুলি জানেনা এমন নয়। মানুষ জানে; কেননা মানুষ নিজে এসবের কিছুই সৃষ্টি করেনি। মানুষ সকল ব্যাবস্থা পৃথিবীতে তার জন্য প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পেয়েছে। তাই বলা হয়েছে, ‘তোমরা ভালভাবেই জান।’

যিনি নিজ থেকে মানুষের জন্য এতসব করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা কর্তব্য। তাঁকে যথাযথ মর্যাদার আসনে আসীন করা কর্তব্য। তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা করা উচিত নয়। তাই বলা হয়েছে, ‘আল্লাহর সঙ্গে কোন সমকক্ষ দাঁড় করিও না।’ এটি হচ্ছে জেনে-বুঝে জ্ঞানত তাঁর একক মহাত্ব ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দান করা। এটিই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ও তাঁকে যথাযথ সন্মান প্রদর্শন করা।

একের থেকে গ্রহণ করে অন্যের গুণ-কীর্তন করা ভয়ংকর রকমের দোষী চরিত্রের প্রকাশ। অকৃতজ্ঞতার চরম। এমন কর্ম দাতাকে বিক্ষুব্ধ করে। তার

রোষানলে পতিত হতে হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে তো বটেই এমনকি বাস্তব জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন আচরণের কুফল পরিলক্ষিত হয়।

এ বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করেছেন। এটি প্রকাশ করেছেন মানবজাতির নিজেদের মঙ্গলের জন্য। কেননা এ ভয়ংকর আচরণ জাগতিক জীবনেও শান্তি ভঙ্গ ও অশান্তি সৃষ্টির কারণ। আল্লাহর রুদ্ররোষ তো আছেই।

মানুষ নিজেকে দিয়েও আল্লাহকে বুঝতে পারে। আল্লাহকে চিনতে হলে তাই নিজেকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে হয়। অন্য অনেক কিছুই মানুষ সহ্য করে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু এ একটি আচরণ মানুষ কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। আল্লাহর গুণেই মানুষ গুণান্বিত। প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ বিরাজ করেন।

যে মানুষটি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি পরিচিত ও অপরিচিতজনদের জন্যও অকাতরে সবকিছু করতে পারে, সে একই মানুষটি অকৃতজ্ঞের জন্য আর কখনই মন থেকে কিছু করতে পারে না। যদিও বা দায়িত্ববোধ থেকে কখনও কিছু করে তবুও পরিপূর্ণরূপে পূর্বের মানসিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে এমনকি ক্ষমা প্রার্থনাও অন্তরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে না। মানুষের এ আচরণটি অন্তরে অমোছনীয় দাগ বা ক্ষত সৃষ্টি করে। তেমন অকৃতজ্ঞের প্রতি সন্দেহ, ভীতি, অনীহা সর্বপরি ঘৃণা কাজ করে। মানুষ সতর্ক হয়ে যায়। এটি আল্লাহরই গুণ যা মানুষের ওপর কাজ করে। আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করতে তাই বারণ করা হয়েছে। এর পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ!! তেমন আচরণের কারণে জগতে অনেক অশান্তি ও অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

ইসলামের দর্শনে তাই 'শিরক' তথা আল্লাহর সাথে কোন অংশীদারী আরোপ করা বা তাঁর সমকক্ষ কোন কিছুকে বা কাউকে গণ্য করা একটি অত্যান্ত গর্হিত অপরাধমূলক কাজরূপে বিবেচিত [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২৪, ২.৫৪, ২.৬৭, ২.১০৭, ২.১৩৫.২, ২.২৫৭.১, ২.১৬৫.১, ২.১৬৬, ২.১৬৯, ২.১৭৩.১, ২.২১৩.১, ২.২২১, ২.২৫৬.৩]। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। এছাড়া তিনি সব ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছে তাকে।" (আল-কোরআন ৪:১১৬)

কোরআন যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে তার মধ্যে এটি অন্যতম একটি। তাওহীদের বাণী অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব প্রচার করা। আল্লাহর তূল্য কাউকে গণ্য না করা। তাঁর সমকক্ষ কোন কিছু প্রতিষ্ঠা না করা। হোক সেটি মূর্তী কিংবা মহান কোন ব্যাক্তিত্ব। এক আল্লাহ ভিন্ন আর কারও উপাসনা বা গুণ-কীর্তন করতে বারণ করা হয়েছে। বাইবেলেও তাই বলা হয়েছে। গীতায়েও তাই বলা হয়েছে।

উপাসনার যোগ্য হবেন কেবলমাত্র তিনি যিনি সৃষ্টি করেন, লালন-পালন করেন, ভাল বা মন্দ করার সামর্থ রাখেন। এসবের একটিও না কোন মূর্তী করতে সক্ষম, না কোন ব্যাক্তি বা দেবতা। তারা কিছুই সৃষ্টি করে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

যখন কোন ব্যাক্তিকে পূঁজনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটি করা হয় বস্তুত আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে। নিজের ওপর যার বিশ্বাস নেই সে অন্যের হাল ধরে। সে যার দ্বারস্ত হয়। যদিও তারও নিজের কিছু করণীয় নেই। সেও আল্লাহরই দ্বারস্ত হয়। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানের অভাবের কারণে (আত্ম) বিশ্বাসহীন মানুষ সেটি বুঝতে পারে না। জ্ঞান অর্জন করা তাই অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। অন্যথায় পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ সৃষ্টি হবে। যাদেরকে পৃথিবীর প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই। এদের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। এরা মন্দ ভাইরাসের মতো জগতকে ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়।

জ্ঞান অর্জন না করাও অপরাধ। নির্জ্ঞানতার কারণে সমাজে মিথ্যে, ভূল ও কু-সংস্কারের প্রবেশ ঘটে। মানুষ অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাগুদের নামে অপরাধ করে। সমাজ কলুষিত হয়। অপরাধকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার বা তাঁর সমকক্ষ কোন কিছু সৃষ্টি করে সে ধারণাকে অপরাধীরা কাজে লাগায়। যথাস্থানে সে আলোচনা বিস্তারীতভাবে তুলে ধরা হবে।

➢ (আয়াত ২৩-২৪) এ পর্যায়ে অবতীর্ণ বাণী (Revelation) বা কোরআনের বিষয়ে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন করতে বারণ করা হয়েছে। সন্দেহ বিশ্বাসে চির ধরায়। ফলে উপকার লাভ হয় না। অবিশ্বাসীদেরকে (Disbeliever) তাদের মন্দ কাজের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

২৩	এ বিষয়ে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার (মোহাম্মদের) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আন এবং এক আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের অপরাপর সকল সহযোগীদেরকেও সঙ্গে নাও যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহেই) সত্যবাদী হও। (And if ye are in doubt concerning that which We reveal unto Our slave (Muhammad), then produce a surah of the like thereof, and call your witness beside Allah if ye are truthful.)
২৪	আর যদি তা না পার এবং তোমরা কখনই তা পারবে না, তবে সে নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য। (And if ye do it not - and ye can never do it - then guard yourselves against the Fire prepared for disbelievers, whose fuel is of men and stones.)

■ **২.২৩-২৪** এ বিষয়ে যদি ... কোন সন্দেহ থাকে ... একটি সূরা রচনা করে আন ... সহযোগীদেরকেও সঙ্গে নাও ... তোমরা কখনই তা পারবে না : কোরআন আল্লাহ প্রেরীত ঐশী বাণী, যা মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে- এ আয়াতের মাধ্যমে সেটি নিশ্চিতভাবে জানান হয়েছে [অবতীর্ণ বাণী দ্রষ্টব্য ২.২৫২]। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী বা সন্দেহপ্রবণ তাদের কাছে এ নিশ্চিতের কোন মূল্য নেই। তারা এ বাণী বিশ্বাস করবে না। তাদের মনে সন্দেহ থেকে যাবে। তাই বলা হয়েছে, যদি অবিশ্বাসীদের মনে কোনরূপ সন্দেহ বা সংশয় থাকে, তবে কোরআনের মতো একটি সূরা রচনা করে

আনার জন্য। আবার এটিও নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে সেটি তাদের পক্ষে করা কখনই সম্ভব হবে না।

দৃঢ়তার সঙ্গে এর নিশ্চিতকরণ বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও তাদের আত্মবিশ্বাসকেও বৃদ্ধি করে এবং তাদেরকে মানসিকভাবে বলীয়ান করে। উপরন্ত সুদৃঢ় এ ঘোষনা অবিশ্বাসীদের মনেও একটি ভাবনার সৃষ্টি করে।

যারা সত্যের সন্ধানে অধিকতর আগ্রহী, বিচার-বিশ্লেষণ শেষে তারাও জানতে বা বুঝতে পারবে যে, কোরআনের দর্শনে যা উপস্থাপিত হয়েছে তা কোন গবেষনার ফল নয়। দলীয় কোন আলোচনার ভিত্তিতেও উদ্ভাবিত কোন দর্শনও নয় এটি। এটি যার ওপর আবতীর্ণ হয়েছে তার প্রকাশ যেমন অকস্মাৎ, তেমনি কোন অদৃশ্য প্রক্রিয়ার সহায়তা ভিন্ন মস্তিষ্কে এমন উন্নত ও এত বিস্তৃত চিন্তার উন্মেষ ঘটানো কোন একক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটি পরিপূর্ণ একটি জীবন দর্শন। এর প্রতিটি বিষয়-কার্যকলাপ একটি একটির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এর সবকিছুই একটি লক্ষ্যকে অর্জনের জন্য বিনির্মিত। সে লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা এখানে রয়েছে। কোন একক ব্যাক্তির একক প্রচেষ্টায় এত সুন্দর ও ধারাবাহিক কার্যপ্রণালী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, যদি না অদৃশ্যের সহায়তা থাকে। উপরন্তু যার ওপর এটি অবতীর্ণ হয়েছে তিনি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্নও ছিলেন না। ফলে এটিও বলা যাবে না যে, তিনি পূর্বেই এমন কোন বিষয় বা গ্রন্থ পাঠ করেছেন যা তাকে কোরআন রচনা করতে সহায়তা করেছে। তাই বলা হয়েছে,

“এমনিভাবে আমি আমার নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তারা (অবিশ্বাসীরা) না বলে যে তুমি তো পড়ে নিয়েছ (পূর্বের গ্রন্থসমুহ) ...।” (আল-কোরআন ৬:১০৫)

এর মাধ্যমে এ দর্শনের আবির্ভাবের কৃতিত্ব কোন একক ব্যাক্তির ওপর অর্পন করা হয়নি। ধারণার সকল কৃতিত্ব অর্পিত হয়েছে সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর ওপর। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সব সমর্পিত হয়েছে। এখানের শিক্ষাটিও এই যে, সকল কাজের কৃতিত্ব আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হতে হয়। অন্যথায় তেমন কাজ মানুষের মধ্যে হিংসা-ঈর্ষা-বিদ্বেষের বা ক্ষোভের জন্ম দেয়। সেক্ষেত্রে ভাল কোন চিন্তা বা কর্ম মানবীয় কৃতিত্ব দাবীর প্রক্রিয়ায় পরে যায়। আল্লাহর প্রতি

সমর্পন তেমন মন্দ ছোবল থেকে কাজ ও মানুষকে সুরক্ষা দেয়। কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতাকেও বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়।

কোরআনে এমন কি বলা হয়েছে যার জন্য মানুষকে এত অভিভূত হতে হবে এবং কারও পক্ষেই এর মতো কোন গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয় বলে বলা হচ্ছে? পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কোন দিক-নির্দেশনার অনুপস্থিতিই কেবল সে দিক-নির্দেশনার গুরুত্বকে মানুষের সামনে সফলভাবে তুলে ধরতে পারে। কিন্তু এখন সেটি সম্ভব নয়। বিষয়গুলি মানুষ এখন জানে। অন্যথায় আজও হয়ত মানুষ কোন দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশায় অধিকতর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত।

কোরআনের দিক-নির্দেশনার মহাত্বকে বুঝতে হলে কোরআনের কেবল পাঠ নয় এর ভেতর থেকে যথাযথ অর্থসমুহকে বের করে আনতে হবে। যদি কেউ এর সঠিক অর্থ অনুধাবনে ব্যার্থও হয় তবে সে এতটুকু জেনেও অভিভূত হবে যে, এটি এমন এক গ্রন্থ যা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠায় মানুষের মধ্যে এক প্রচন্ড শক্তি, সাহস, ইচ্ছে ও প্রাণশক্তিকে জগিয়ে তোলার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে এবং রাখে। সেটি অপ্রতিরোধ্য। এ এক প্রেরণা! যা বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছে। আবার এক পরিপূর্ণ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যাবস্থা!

এখানে যা বলা হয়েছে তা আধুনিককালের সঙ্গার অধীন কোন গবেষনার ফল নয়। আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ। একটি বিষয় বুঝের মধ্যে আনতে হবে যে, মানুষের পক্ষে ভাল যা কিছু করা সম্ভব বস্তুত সে সবই বিধাতা প্রদত্ত। আলোর একটি ঝলকের মতো মানুষের মাঝে একটি চিন্তার উন্মেষ ঘটে যায়। সে ঝলক মানবসৃষ্ট নয়। এখানে যেমন বাইরের প্রকৃতির খেলা আছে, আছে দেহের ভেতরের প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ। আর এর কিছুই মানুষের নিজ নিয়ন্ত্রনে নয়। নিউটনের সূত্রও তার নিজের নয়। চিন্তা বা ধারণা অকস্মাৎ আপতিত হয়। মানুষ তো কম্পিউটারের এক কেসিং এর মতো। যার ভেতরে প্রসেসর আছে। জিবরাইল কে বা কি কেউ জানে না। বিদ্যূতের মতো। ভেতরে গতির সঞ্চার করে। প্রাণবন্ত করে তোলে। বার্তা নিয়ে আসে। আল্লাহর সৃষ্টির সব কিছুই সত্য ও সূত্রের সাথে সম্পর্কিত। পার্থিব জগতে যে সব রহস্য উদঘাটনের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এখন বিজ্ঞানের। বলা হচ্ছে,

"... সবকিছুই আল্লাহ সত্য ভিন্ন সৃষ্টি করেননি। তিনি তার অবতীর্ণ বাণী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।" (আল-কোরআন ১০:৫)

কোরআনের মতো একটি সূরা রচনা করে আনার জন্য অবিশ্বাসীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে। পরের আয়াতে এটিও বলা হয়েছে যে, তোমরা কখনই তা করতে পারবে না। এ বিষয়ে কোরআন নিশ্চিত। আর এ নিশ্চিতের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এর দর্শনের দিকটি। কোন বিকল্প কবিতা কিংবা ছড়া রচনা করার মতো বিষয় নয় এটি।

আজও কোন দর্শন একে উত্তীর্ণ করে যেতে পারেনি। বিশেষত এর পরকাল ও জবাবদিহিতার ধারণা এবং এর সাথে কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি। যা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মতভাবে কোরআনে উপস্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের উপমহাদেশে প্রভাব বিস্তারকারী সনাতন ধর্মীয় দর্শনেও পরকাল ও কর্মফলের বিষয়ে বলা হয়েছে। যুগে যুগে আল্লাহ সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে মূলত একই বার্তা প্রেরণ করেছেন। সকল বার্তার মর্ম কথাগুলি এক। তবে উপস্থাপনা বিভিন্নরকম। বলা যেতে পারে যুগোপযোগী করে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে।

তবে অতি প্রাচীন সেসব দিক-নির্দেশনা কালের বিবর্তনে ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়েছে। কতগুলির উপস্থাপনা বর্তমান সময়ের জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয় না বা কারও কারও কাছে বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে হয়।

বৌদ্ধ ধর্মে কর্মফল সম্পর্কে বলা হলেও সেটি আবার অতি বাস্তব। পরিপূর্ণভাবে মানবের আত্মবিশ্বাসের ওপর রচিত। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার বিষয়টি এখানে উহ্য। বিষয়টি এক রকম ভাল বোধ হলেও বাস্তবে মানব মনে প্রশান্তি এনে দিতে পারেনি। যার কারণে তারা নিজেরাই বিভাজিত হয়েছে।

মানব মন মহাজগতের একজন স্রষ্টাকেও প্রত্যাশা করে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হচ্ছে, 'জীবহত্যা মহাপাপ'। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, প্রাণের বিনিময়বিহীনভাবে কোন প্রাণ ধরে রাখা আপাতত সম্ভব

নয়। অর্থাৎ বিধাতার অনুমোদন সাপেক্ষে কখনও যদি সেটি সম্ভব হয় তবেই সম্ভব, নয়ত নয়। আদর্শিকভাবে শুনতে ভাল বোধ হলেও যা বাস্তবসম্মত নয়।

কোরআন সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ। বিবিধ দর্শনের নানাবিধ ক্রটি-বিচ্যুতিসমুহকে দুর করে কোরআন একটি বাস্তবভিত্তিক দর্শন উপস্থাপন করেছে। বস্তুত এটি কোন দর্শনের ক্রটি-বিচ্যুতিকে ধরেনি আবার দুরও করেনি। কোরআন সত্যের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত হয়েছে। তাতেই অপরাপর দর্শনের বিচ্যুতিসমুহ দুরীভূত হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পরিপূর্ণ ক্রটিমুক্তভাবে অর্থাৎ সত্যের ওপর ভিত্তি করে তার দিক-নির্দেশনাকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছে এবং এর চেয়ে ভাল দর্শন উপস্থাপন করা আর কারও দ্বারাই সম্ভব হয়নি এবং হবেও না তাই নিশ্চিত হয়েই বলা হয়েছে যে, 'এর মতো একটি সূরা রচনা করে আন' এবং 'তোমরা কখনই তা পারবে না।'

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি জানেন এখানে কোন মূল বক্তব্যকেই বাদ রাখা হয়নি। অর্থাৎ বিশ্ব জগতের প্রয়োজনে ধারণা বা দর্শন যা উপস্থাপিত হওয়ার তা এখানে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়ে গেছে। এরপরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে আল্লাহর সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে ব্যাখ্য-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মৌলিক ধারণার বিষয়গুলি এখানে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে কুসংস্কারমুক্ত, বাস্তবসম্মত ও ক্রটিহীনভাবে। সে কারণেই কোরআনের মতো কোন সূরা নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

"... গ্রন্থ লিপিবদ্ধকরণে কোন বিষয়কেই আমি উপেক্ষা করিনি।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

কেউ হয়তবা কোরআনের মতো করে একটি কবিতা কিংবা ছড়া রচনা করে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সেটি মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। কেননা কোরআনের দর্শনে প্রতিটি বক্তব্য সত্য ও ন্যায়কে বিবেচনা করে করা হয়েছে। আবার এখানে বাস্তব অবস্থাকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এরপর এ বিষয়ে নতুন

কোন মৌলিক জ্ঞান আনার নেই। বরং এটিকেই বুঝে যথাযথভাবে পালন করার আছে।

এমন কোন গ্রন্থ নেই যা নিরপেক্ষভাবে সত্য ও ন্যায়কে কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উপস্থাপন করেছে। জাগতিক সকল রচনাই কোন না কোন পক্ষকে টেনেছে কিংবা কাউকে ঠেলেছে বা বিতাড়ন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সত্য ভাষণে পূর্ণ, এমনকি নিজের বিপক্ষে গেলেও কোনরূপ ছাড় প্রদান না করার সৎ সাহস কোরআনই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর পথে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদান কর, যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও যায়।” (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

সকল বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই তাই আয়াতে এভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

▪ **২.২৪** তবে সে নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর সঙ্গে কোন সমকক্ষ দাঁড় করাতে মানুষকে বারণ করা হয়েছে। এটি অত্যান্ত গর্হিত একটি কাজ। যা অন্যায়। অকৃতজ্ঞ আচরণ। যে আচরণ সহ্য সীমার বাইরে। আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছু দাঁড় করানর বাস্তবেও নানারূপ কুফল আছে। যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। তেমন ভুল ও অন্যায় কাজের পরিণাম বিষয়েও আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

কোরআনের বাণীসমুহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ নিজেই সেটি ঘোষনা করছেন। এ বিষয়ে মানব মনে সন্দেহ পোষন করতে বারণ করা হয়েছে। সন্দেহ পোষন না করতে বলার অর্থই হচ্ছে এটিকে বিশ্বাস করে নেয়া। অতএব যারা সে সত্য বিশ্বাস করবে না তেমন অবিশ্বাসীদের জন্য নরকের আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অবিশ্বাসীদের জন্য নরকের আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে? কেবল একটি দর্শনে বিশ্বাস না করার কারণেই কি অবিশ্বাসীদের জন্য নরকের আগুনের কথা বলা হয়েছে? এ পর্যায়ে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]।

কোরআনের দর্শন জীবন চলার এমন এক রূপরেখা মানবজাতির জন্য উপহার দিয়েছে যে পথে চললে মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হবে। মানুষ সঠিক পথে চললে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাবে। বার্তা প্রেরণকারী বিষয়সমুহ মানুষকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? এ দর্শনে এমন কি আছে যার জন্য সে পথ অনুসরণ করলে মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হবেই?

কোরআনের দর্শন মহাবিশ্বের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কথা বলে। একটি বিচার দিবসের কথা বলে। বিচার দিবসে মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা বলে। মন্দ কাজের পরিণামস্বরূপ শাস্তির কথা বলে। ভাল কর্মের জন্য পুরস্কারের বার্তা দেয়। পুরস্কারের আশায় কিংবা শাস্তির ভয়ে মানুষ ভাল কাজ করবে, ভাল পথে চলবে এবং মন্দ কাজ পরিহার করবে। বিষয়গুলিকে এভাবেই ধরে নেয়া হয়।

কিন্তু কেউ এ তত্ব মেনে চলতে বাধ্য নয়। ফলে দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা বা তত্বকে কার্যকর করা মোটেও সহজ কাজ নয়। কেবলমাত্র যে বা যারা এ দর্শনে সত্যিকারের বিশ্বাসী হবে তারাই পথ অনুসরণ করে চলবে। এখানেই তত্ব বা দর্শনে সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্বাসীকে তাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী বলে ধরে নেয়া হয়।

একই সাথে অবিশ্বাসীকে ভূল পথ অবলম্বনকারীরূপে বিবেচনা করা হয়। কেন? অবিশ্বাসী যেহেতু ওপরোক্ত দর্শনে বিশেষত বিচার দিবস বা কর্মফলে বিশ্বাসী নয় ফলে তাদের সম্মুখে এমনকি ধারণায়েও এমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই যা তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিবৃত করতে পারে। তাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা বেশী। তারা সহজেই বিশৃংখলাকারীতে পরিণত হতে পারে। কেননা এর জন্য তাদের মস্তিষ্কে কারও কাছে জবাবদিহিতার কোন ধারণা নেই। কোন পরিণাম বা পরিণতি নেই। এমনকি এ জীবন পরবর্তীতেও নেই। ফলে মন্দ কাজ না করার জন্য কারও ওপরে মানসিক যে নূন্যতম প্রতিবন্ধকতাটুকু থাকে সে ব্যাবস্থাটিও তাদের ক্ষেত্রে নেই! এ জগতে টিকে থাকার শক্তি থাকলে অন্যায়-অপরাধ করায় বাধা কোথায়? এ যৌক্তিকতাগুলি কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসীদের জন্য ধরে নেয়া হয়। এ ধরে নেয়া থেকে তাদেরকে মন্দরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আর মন্দের জন্য হচ্ছে ‘নরক’। এটিই সূত্র। বিষয়গুলি পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এ ধারণাগুলিকেও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে

এভাবে ধরে নেয়া হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সম্পর্কিত যে ধারণা আমরা লালন করি বস্তুত তা বিষয়গুলিকে এভাবে ধরে নেয়া থেকেই সৃষ্ট।

বাস্তবে দেখা যায় যে সকল অবিশ্বাসীই মন্দ কাজ করে না। আবার সকল বিশ্বাসী ভাল কাজ করে সেটিও বলা যাবে না। ভাল-মন্দ কর্মের বিবেচনায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সম্পর্কিত উক্ত ধারণা তাই কিছু মানুষকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। মানুষ দেখছে যে অবিশ্বাসীকে মন্দভাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে, অথচ বিশ্বাসীও মন্দ কাজ করছে, কিন্তু বলা হচ্ছে অবিশ্বাসী নরকে গমন করবে।

বাস্তবে তাহলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? শুধুমাত্র একটি দর্শন বা একটি রূপরেখায় বিশ্বাসী হলেই একজন পুরস্কার পেয়ে যাবে এবং একজন সে দর্শনে অবিশ্বাসী হলেই নরকের আগুনে পুড়বে? বিষয়গুলি কি এতই সহজ বা সস্তা? মানুষ এমন ভাবনাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। এসব বিষয়ের যথাযথ সমাধান তুলে ধরা না হলে মানুষ দর্শনকেই পরিত্যাগ করবে। এটিকে ভাল কোন দর্শন বলে বিবেচনা করবে না। তাই কেবল গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিবেচনায় নয়, সত্যের আলোকে বিষয়গুলির যথাযথ বিশ্লেষণাত্মক সমাধান তুলে ধরতে হবে।

আল্লাহর বাণী কোথাও কোন অন্যায়, ভূল, অবাস্তব বা অযৌক্তিক কোন বার্তা দেয়নি। কোরআনে সবরকম সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে গভীর মনোযোগের সাথে বিষয়সমূহ অধ্যায়ন করে বুঝে নিতে হবে। বলা হচ্ছে,

"... বিচার দিবসে তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ..." (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

অতএব কেবল দর্শনে অবিশ্বাসী হলেই কেউ শাস্তি পাবে এমন নয়। যদিও বিষয়গুলি একান্তই আল্লাহর বিবেচ্য বিষয়। তবে শেষের কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হচ্ছে, '.. কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি।' অর্থাৎ যে যেটাই বিশ্বাস করুক না কেন প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ বিশ্বাসে থেকে হলেও ভাল কাজ করতে হবে। যার অপর অর্থ হচ্ছে মন্দ কাজ

করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এগুলিই মূল বিষয়। অপরগুলি মূল বিষয়কে নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয়ে কাজ করে।

একটি দর্শনের প্রতিষ্ঠা, সংগ্রাম বা যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও স্বাভাবিক সময় এক নয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অনুসারীদের মধ্যে যে চেতনা কাজ করে, পরবর্তীতে বা স্বাভাবিক সময়ে সে চেতনা থাকে না। পরবর্তীতে অনেকেই কেবল ব্যাকরণ বা গ্রামার অনুসরণ করে দর্শনে বিশ্বাসী বা অনুসারী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে সত্যিকার চেতনা, জ্ঞান এমনকি যথাযথ আচার-আচরণও পরিলক্ষীত হয় না। অনেকে সত্য অন্তরে সেসবকে ধারণও করে না।

উপরন্তু আবির্ভাবকালে অনুসারীরা দর্শনের প্রবক্তার সরাসরি নেতৃত্বাধীন থাকে। যার ভেতরে দর্শনের চেতনা থাকে সর্বোচ্চ মাত্রায়। সেটিও একটি মূল্য বহন করে। যে মূল্য বহু পরের অনুসারীদের থাকে না।

'যা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।' যে সময়কালে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে কোরআনের অনুসারী বা নব্য বিশ্বাসীগণ ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করেছে। অবিশ্বাসীরা তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ ন্যায়ের বিপক্ষে। তাই সে সংগ্রামকালীন সময়ের বিবেচনায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শব্দ দু'টি ন্যায়-অন্যায়ের প্রেক্ষিতে যথাযথ ছিল।

বহু বছর পরে বর্তমান সময়ে কোরআনের বাণীর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র বিবেচনায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শব্দ দু'টিকে ভিন্নভাবে বুঝতে হবে। অন্যথায় গ্রামার অনুসরণ করে অনেকে বিশ্বাসী নাম ধারণ করে সুবিধা লুটে নেবে; কিন্তু সে চেতনা ধারণ করবে না যা কিনা ইহকালে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করবে এবং পরকালেও মুক্ত হতে সাহায্য পারবে। বলা হচ্ছে,

".. যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

অতএব কোরআনের বাণীর 'শাশ্বততা' ও 'সার্বজনীনতা'র বিবেচনায় বিষয় দু'টিকে সত্য-মিথ্যের আলোকে বুঝতে হবে। যারাই ভূল পথ, অলীক বা মিথ্যের পথ, কুসংস্কারের পথ, মন্দ পথ অবলম্বন করে এবং সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয় তারাই আল্লাহ তা'য়ালার দিক-নির্দেশনায় অবিশ্বাসী।

সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণকারী মিথ্যের অনুসরণকারীগণই হচ্ছে 'অবিশ্বাসী' এবং সত্য ও ন্যায় পথের অনুসারীগণ হচ্ছে 'বিশ্বাসী'।

আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন। সে পথ অনুসরণ করে চললে মন্দ পথে চলার কথা নয়। মন্দ পথ পরিত্যাগ করে ভাল পথে চলার কথা। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে সকলকে তাই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। কিন্তু ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে কেউ যদি মন্দ কাজেই রত থাকে, তবে পৃথিবীকে অশান্ত করার জন্য সে নিজেই দায়ী সাব্যস্ত হবে এবং অবিশ্বাসের কারণে শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

সত্য হচ্ছে, দর্শনের রূপরেখায় অবিশ্বাসের কারণে মানুষ যতটা না শাস্তিযোগ্য হয়, তার চেয়ে বেশী মন্দ কাজ করার কারণেই শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য হয়। মন্দ কাজের পরিণাম মন্দ এটি একটি অতি সাধারণ সূত্র।

কর্মই ভাল-মন্দ, পুরস্কার-শাস্তির নির্ধারক। বিশ্বাস নয়। তবে বিশ্বাস নির্ধারক এজন্য যে বিশ্বাসই অধিকাংশ মানুষকে ভাল পথে চালনা করে। অবিশ্বাস ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। গীতার দৈবাসুর সম্পদ বিভাগে সে কথাই গুরুত্ব পেয়েছে।

সন্দেহ পোষনকারী বা অবিশ্বাসী যদি অজ্ঞতা হেতু কোন মন্দ কাজ করে তবে সেটির বিবেচনা হয়তবা ভিন্নতরও হতে পারে। যদিও বিষয়গুলি আল্লাহর বিবেচনাধীন। যেমন বলা হয়েছে,

"…. তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ অযৌক্তিকভাবে ধ্বংস করেন না, যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞতা হেতু অন্যায় কাজ করে।" (আল-কোরআন ৬:১৩১)

তবে আলোচ্য আয়াতে অবিশ্বাসীদের যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেটির যৌক্তিকতা আছে। কেননা তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। বিশ্বাসের পথে আহবান করা হয়েছে। ভূল পথ বলে দেয়া হয়েছে। ভূলের পরিণতি বিষয়ে সতর্কও করা হয়েছে।

সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তারা মন্দ কাজ করতে পারত না। ফলস্বরূপ শাস্তিও পেত না। তাই একথা বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসের ফলস্বরূপ নরকের আগুন বা শাস্তি থেকে নিজ দায়িত্বে বেঁচে থাকার বা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা

কর। অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। কেননা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু প্রদর্শিত পথকে তারা উপেক্ষা করেছে।

আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে কেন শাস্তি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে ওপরে সে বিষয়টিই যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেটি হচ্ছে মন্দ কাজের সম্ভাবনার জন্য। কেননা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হলে মন্দ কাজ করা সম্ভব না। বিচার দিবসকে ভয় করার কথা।

অবিশ্বাসীদেরকে এখানে 'কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসী' এভাবে বলা হচ্ছে। কেননা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। তারাও এক আল্লাহকে মানে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদিওবা আল্লাহকে তারা ভিন্ন নামে ডাকে এবং ভিন্ন রীতি-নীতি বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। সত্য হচ্ছে, এসব রীতি-নীতি বা তার পরিপালনই প্রকৃত ধর্ম নয় [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]।

'নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।' রূপক অর্থে ব্যবহৃত কথাটির মর্মার্থ হল অবিশ্বাসীদের স্থান হবে নরক। তারা নরকের আগুনে পুড়বে। কেবল তারাই নয়, আল্লাহর সমকক্ষরূপে তারা প্রতীকী যে সকল পাথরের মূর্তী তৈরী করেছিল সেগুলিও তাদের সাথেই পুড়বে। সেসবের বাস্তবিক কোন মূল্য নেই। অবিশ্বাসীরা বস্তুত অলীক কল্পনায় মূল্যহীন বিষয়ের পেছনে ছুটে চলেছে।

পাথরের মূর্তী পুড়ে যেখানে অঙ্গার হয়ে যাবে সেখানে মোমের মতো সৃষ্টি মানুষের শাস্তিভোগ নরকে কেমন হতে পারে সেটি এ প্রকাশ ভঙ্গি থেকে সহজেই অনুমেয়। এ প্রকাশ ভঙ্গি দ্বারা আল্লাহর সমকক্ষ কোনকিছু দাঁড় করানর শাস্তি যে কত ভয়ানক হবে সেটি বোঝান হয়েছে। কেননা এ কাজটিও একটি ভয়ানক গর্হিত পাপ কাজ। বস্তুত এসব বার্তার মাধ্যমে মানুষকে ভুল, মিথ্যে বা অনুমানভিত্তিক ধারণা তথা আল্লাহর অপছন্দের কাজ করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়েছে।

যারা মনে করে যে কোরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করা খুবই সহজ কাজ এবং তারা তেমন কিছু রচনা করতে পারবে তাদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে। তারা সেটি কখনই করতে পারবে না। কিন্তু তারা বোঝে না। কেবল

ছন্দের মিল রেখে কবিতার মতো কিছু একটা নিয়ে এলেই সেটি কোরআনের মতো হয়ে যাবে না।

কোরআনের প্রকৃত মহাত্ব এর দর্শন ও প্রেরণার উৎস হিসেবে। যে অনুপ্রেরণা আর কারও দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এ বক্তব্য যে সময়ে উদ্ধৃত হয়েছে সে সময়ে এর যথার্থ অনুধাবনের বিষয়টি সহজ ছিল না। কিন্তু আজ সহজেই অনুমেয় যে এমন দর্শন ও প্রেরণা আজও পৃথিবীর কোথাও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

কোরআনের দর্শন আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ সমকক্ষ দাঁড় করানকে কোনভাবেই গ্রহণ করে না [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। এর বহুবিধ বাস্তব অপকারীতা আছে। তদুপরি এটি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গেও সম্পর্কিত। যা মানুষকে মিথ্যে ও ভূল বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। মানুষকে আত্মবিশ্বাসহীন করে। মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। এসবের মন্দ ফলাফল সমাজে পতিত হয়। এগুলি মানুষকে সত্য ও জ্ঞানের পথ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত করে দেয়। সত্যের পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার যেখানেই সম্ভাবনা আছে সেটিই গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এখানে উল্লেখ্য যে, নরকের জ্বালানী কি হবে সে বিষয়টি নিয়ে অতি গবেষনা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। সেটি আল্লাহই ভাল জানেন। আর নরকের জ্বালানী কেবল উল্লেখিত দু'টি বিষয়ই হবে তেমনটিও মনে করারও কোন কারণ নেই। এখানে একটি সাধারণ ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র। সেটিও করা হয়েছে মানুষকে সহজে বিষয়টি বোঝাবার জন্য। নরক ব্যাবস্থাপনায় নিশ্চয়ই আরও অনেক জটিল বিষয় আছে। যেমন জটিল এ ক্ষুদ্র পৃথিবী।

নরকের বিষয়ে অতি গবেষনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অন্তত এ ধরণের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হিসেবে। মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর বিদ্যমানতাকে বিশ্বাস করা। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা। মন্দ কাজের পরিণাম বিষয়ে অন্তরে একটি ভীতি থাকা। মন্দ কাজ পরিহার করে চলা। ভাল কাজ করা। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি এসে যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর? ..." (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

"... বিচার দিবসে তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ..." (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

আল্লাহ কাউকেই শাস্তি দিতে ইচ্ছুক নন যদি মানুষ যথাযথ অন্তরে যে কোন প্রকারেই সুপথ প্রাপ্ত হয়ে চলে চলে। এটিই সত্য। মানুষকে অলীক কল্পনা, কুসংস্কার, ভূল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনকে পরিত্যাগ করে সত্যের পথে চলতে হবে। অন্যথায় অবিশ্বাসীদেরকে অধঃপতিত হতে হবে। কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। সেটি হতে হবে তাদের দ্বারা সৃষ্ট মন্দ কার্যকলাপের জন্য। অন্য কোন কারণ নেই।

➢ (আয়াত ২৫) আয়াত তেইশ ও চব্বিস এ কোরআনের বার্তায় সন্দেহপ্রবণ এবং অবিশ্বাসীদের বিষয়ে বলা হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে বিশ্বাসী (Believer) এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ (Glad Tidings) দেয়া হয়েছে।

২৫	(হে মোহাম্মদ) যারা বিশ্বাসী এবং ভাল কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান যার পাদদেশে রয়েছে বহমান নদী। যখনই সেখানে তারা খাবাররূপে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, বলবে: এ তো সেই ফল যা আমরা পূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গি/সঙ্গিনী। আর সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (And give glad tidings (O Muhammad) unto those who believe and do good works ; that theirs are Gardens underneath which rivers flow; as often as they are regaled with food of the fruit thereof, they say: this is what was given us aforetime; and it is given to them in resemblance. There for them are pure

	companions; there for ever they abide.)

▪ **২.২৫** যারা বিশ্বাসী এবং ভাল কাজ করে ... বসবাস করবে চিরকাল : অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে অবহিতকরণের অব্যবহিত পরেই এ আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে পুরস্কার [বিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৫]। কেননা দর্শনে এটি ধরেই নেয়া হয়েছে যে বিশ্বাসীরা মন্দ কাজ করে না, করতে পারে না বা করবে না। দর্শন তাদেরকে তেমন শিক্ষায় গড়ে তোলে। যদি তাদের কেউ মন্দ কাজ করে তবে বুঝতে হবে যে সে যথাযথ বিশ্বাসী নয়, কিংবা বিশ্বাস তার অন্তরে যথাযথভাবে গ্রথিত হয়নি। তার মন্দ কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী হবে এবং তার কর্মের পরিণামের দিকেও সে যেতে থাকবে। বিশ্বাসী নাম ধারণ করলেই কেউ পুরস্কৃত হয়ে যাবে না। কেবল নামের বিশ্বাসীই বিশ্বাসী নয়। কর্মে তাকে সঠিক হতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআনের দর্শনে মানুষকে কেন 'বিশ্বাস' করতে বলা হয়েছে [বিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.৫]? এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। বিশ্বাসকরণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'মন্দ কাজ না করা' এবং 'ভাল কাজ করা'। বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে যেন মানুষ এ বিশ্বাসের কারণে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং ভাল কাজ করে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে ভাল কর্ম ও পথে চলার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে আবার শাস্তির ভয়ও দেখান হয়েছে। এ সবই বলা হয়েছে যেন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। পৃথিবী যেন রক্তপাত ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার স্থানে পরিণত না হয়। সৃষ্টিকালীন সময়ে মানুষকে নিয়ে ফেরেশতারা যে আশংকা প্রকাশ করেছিল তা যেন সত্য না হয়। যা বর্ণিত হয়েছে আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের কথোপকথনের মাঝে।

পূর্বের আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মন্দ কাজ করা থেকে নিবৃত রাখার একটি পন্থা উপস্থাপন করা হয়েছে, কিংবা বলা যেতে পারে যে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে ভাল কাজ করার দিকে ফিরিয়ে আনার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এ আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কারের কথা বলে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ

করা হয়েছে বা মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সবই করা হয়েছে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

যারা কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করবে, সহযোগীতা করবে তাদের ভাল কাজের পুরস্কারস্বরূপ পরকালীন জীবনে স্বর্গীয় উদ্যানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। জগতে শান্তি বজায় রাখাই উদ্দেশ্য। কল্যাণ ও মঙ্গলই এতকিছুর উদ্দেশ্য। জাগতিক কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম ব্যাতিত কেবল স্বর্গে যাবার বাসনা হবে কাল্পনিক ও নিরর্থক। তবে নিদেন পক্ষে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাও কল্যাণেরই অংশ। অন্যকেও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করতে হবে।

বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, কোরআনের যেখানেই বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে সেখানেই তার সাথে ভাল কাজ করার কথাটি জুড়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেবল বিশ্বাস করলেই হবে না। বিশ্বাসীর পরিচয় তার কর্মে। তাকে ভাল কাজ করতে হবে। কিংবা বলা যেতে পারে যে ন্যূনতম মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে চলাও ন্যূনতম ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। ভাল কাজ করা কিংবা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা দুটোই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। তবে এর মাঝেও কিছু তারতম্য আছে। এমনতর তারতম্যের কারণে পুরস্কারের ক্ষেত্রেও তারতম্যের ব্যাবস্থা আছে।

মানুষ যদি মুখে বলে যে সে বিশ্বাস করে এবং প্রচুর উপাসনা করে, অথচ সকল প্রকার মন্দ কাজেও লিপ্ত থাকে তবে কি সে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে? নিশ্চয়ই না। বিষয়গুলি ভাবতে হবে। অপরদিকে কেউ যদি ভাল কাজ নাও করে, কেবল মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তবে কি সে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না? বিষয়গুলি মানুষকে বিবেচনায় নিতে হবে এবং যথাযথ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে হবে।

কেউ একজন কোরআনের সকল বার্তায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোন মন্দ কাজ করছে না, উপরন্তু সমাজে ভাল কাজ করছে তবে কি তার শাস্তি প্রাপ্য? সে কি পুরস্কৃত হবে না? ভাববার আছে। প্রকৃতিকে দেখে আমরা একজন সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিকে যৌক্তিক বলে ভেবে নেই। তেমনি প্রকৃতির বিচার ব্যাবস্থা বলে যে ওপরে উল্লেখিত তেমন একজনও পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য। প্রকৃতি আল্লাহর ইশারা ভিন্ন চলে না। প্রকৃতিতেই রয়েছে তাঁর

ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সূক্ষ্ণ বিচারক। তিনিই ভাল জানেন। বলা হচ্ছে,

"... তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২:২৮৪)

যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রদানের ঘোষনা দেয়া হয়েছে। পুরস্কার কেমন হবে তার কিছু ধারণাও আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। পুরস্কার সম্পর্কিত ধারণা এত স্বচ্ছ যে, এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এসব বিষয়ে অতি গবেষনা করে মানুষের কি লাভ? স্বর্গীয় উদ্যানে পৃথিবীর চেয়ে সুখ-আনন্দটা বেশী হবে বর্ণনা থেকে সে ধারণা পাওয়া যায়। হাতের নাগালে সব পাওয়া যাবে। হবে অফুরন্তও। মন যা চায় তাই পাবে। থাকবে সঙ্গি-সঙ্গিনী। সেখানে পুরস্কার প্রাপ্তরা চিরকাল বসবাস করবে। এতটুকু ধারণাই কাজের মানুষের জন্য যথেষ্ট নয় কি? তবে কেউ যদি অতিরঞ্জিত কিছু ভাবতে চায় বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চায় করতে পারে; সে স্বাধীনতা আছে। যদিও বিষয়গুলি খুব জরুরী বা প্রয়োজনীয় নয়। নিচে কোরআন ও গীতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল। বলা হচ্ছে,

"আমার সেই পরম ধাম চন্দ্র-সূর্য্য কিংবা অগ্নি দ্বারা আলোকিত নয়। সেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করতে হয় না।" (গীতা ১৫:৬)

"সেখানে তাদের ঘাম বা অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না।" (আল-কোরআন ১৫:৪৮)

"সেখানে আছে নদী যার পানি দূষণমুক্ত, নির্মল দুধের স্রোতধারা যার গন্ধ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর স্রোতধারা।" (আল-কোরআন ৪৭:১৫)

➢ (আয়াত ২৬-২৭) কোরআনে মানুষের জন্য ইংগিতপূর্ণ নিদর্শনস্বরূপ অনেক উপমা (Similitude) তুলে ধরা হয়েছে। এসব উপমা সম্পর্কে সমালোচকেরা বিরূপ সমালোচনা করার চেষ্টা করত। সমালোচকদের সেসব সমালোচনার একটি জবাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহর সঙ্গে মানবজাতির কৃত অঙ্গীকারের (Covenant) প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে যারা তাদের আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার ভঙ্গের দোষে দুষ্ট হয় এবং জগতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় বস্তুত তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

২৬	আল্লাহ মশা কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তু দ্বারা উপমা দিতেও কুন্ঠাবোধ করেন না। যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমা সত্য। কিন্তু যারা বিশ্বাসী নয় তারা বলে: এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান? এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (Lo! Allah disdaineth not to coin the similitude even of a gnat or anything above that. Those who believe know that it is the truth from their Lord; but those who disbelieve say: What doth Allah wish (to teach) by such a similitude? He misleadeth many thereby, and He guideth many thereby; and He misleadeth thereby only miscreants;)
২৭	যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে এবং তিনি যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (Those who break the covenant of Allah after ratifying it, and sever that which Allah ordered to be joined, and (who) make mischief in the earth: Those are they who are the losers.)

▪ **২.২৬.১** আল্লাহ মশা কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তু দ্বারা উপমা দিতেও কুন্ঠাবোধ করেন না : কোরআনে ছোট ছোট বিষয়, বস্তু বা প্রাণীর দ্বারা অনেক উপমা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মশা, মাছি, মৌমাছি, গরু, মাকড়সা ইত্যাদি। সমালোচকেরা এসবের সমালোচনা করার চেষ্টা করত। তারা বলত

কোরআনের মতো এমন মহাগ্রন্থে বড় বড় বিষয় আলোচনা হবে। অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয় দ্বারা উপমা তুলে ধরা হয়েছে কেন?

বিশেষত ইহুদি ও অবিশ্বাসীরা এসব উপমা নিয়ে কটাক্ষ করার চেষ্টা করত। তাদের ভূল ধারণাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। উপরন্তু এর মধ্য দিয়ে এটিও বোঝানো হয়েছে যে ক্ষুদ্রের মাঝেও অনেক বড় শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

ক্ষুদ্র এ মানবদেহে এক বিশাল মহাবিশ্ব লুকিয়ে আছে। ক্ষুদ্র পরমাণুর শক্তি সম্পর্কে মানুষ আজ অবগত। বর্তমান সময়ে করোনা ভাইরাসের উদাহরণটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ভাইরাস কিভাবে জগতের অনেক নিয়ম-রীতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে! প্রকৃতিতে ছোট কিংবা বড় এমন কোন বিষয় বা বস্তু নেই যা থেকে মানুষ জ্ঞান আহরণ না করে থাকে।

অবিশ্বাসীদের অনেকে কোরআনের দর্শনের মহাত্বকে মানুষের মাঝে ছোট করে তুলে ধরার মানসেও বিদ্রুপাত্মকরূপে এভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে। কেউ আবার তীর্যকপূর্ণ কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা করেছে।

কোরআন মানুষকে এটি বুঝতে সহায়তা করেছে যে ছোট কিংবা বড় সেটি মুখ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, সত্য কি বা কোনটি এবং তার অবস্থান কোথায় সেটি। ক্ষুদ্রের মধ্যে অনেক বড় সত্য বা রহস্য লুকিয়ে আছে। প্রকৃতির মধ্য থেকে সত্যকে খুঁজে পেতে কোরআন মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে। দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। অন্যথায় তুচ্ছ জ্ঞান করে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় থেকে মানুষ নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রাখত।

▪ **২.২৬.২** যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত উপমা সত্য। কিন্তু যারা বিশ্বাসী নয় তারা বলে: এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান? এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন : কিছু মানুষ জ্ঞানত জানে যে কোরআনের বাণী সত্য। ক্ষুদ্রের মধ্যেও শিক্ষনীয় আছে। আবার যারা দিক-নির্দেশনাকে অনুসরণ করে বা বিশ্বাস করে, জ্ঞানত না জানলেও তারাও সন্দেহ ও বিতর্ক পরিহার করে আল্লাহর বাণীকে সত্য বলে জানে এবং মানে। ফলে দিক-

নির্দেশনা থেকে তারা উপকার লাভ করে। কেননা বিশ্বাস করার কারণে তারা এখান থেকে শিক্ষনীয় বিষয়টি বের করে আনার চেষ্টা করে। কখনও গবেষনায় অনুপ্রাণীত হয়। তারা প্রথমেই বিশ্বাস করে নিয়েছে যে কোরআনের বার্তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষনীয় আছে। এ মানসিকতাই তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত সত্যকে জানতে ও বুঝতে হলেও বিশ্বাস নিয়েই এগুতে হয়। অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে সামনে এগুনো যায় না। প্রেরণা থাকে না।

কিছু মানুষ সংশয় ও সন্দেহপ্রবণ। তারা বিদ্বেষভাবাপন্ন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চান? বস্তুত কোন বিষয়ে তাদের অবিশ্বাসী আচরণই তাদেরকে অধিক বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

তারা কোন বিষয়ে অজানা থাকা অবস্থায় ভাল থাকে। কিন্তু সত্যটি জানার পরে সেটিকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। অবিশ্বাস করে। আবার ফেলেও দিতে পারে না। কেননা তারা সত্যটিও জানে না। অর্থাৎ বার্তাটির মিথ্যে হওয়ার বিষয়টিও তারা নিশ্চিত জানে না। ফলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়।

আল্লাহর বাণী এভাবে কিছু মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। বিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু কিছু মানুষকে বিভ্রান্তিতেও ফেলে দেয়। যারা অবিশ্বাসী, সন্দেহপ্রবন ও বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। প্রথমেই সবকিছুকে অস্বীকার ও তুচ্ছ জ্ঞান করার তাদের এমন মানসিকতাই তাদের বিভ্রান্তির কারণ।

যারা শিক্ষা গ্রহণ করে না বা করতে চায় না বা বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করে না, কেবল বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় এবং অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষন করে- এর দ্বারা কেবল তারাই বিভ্রান্ত হয়। ফলে কখনই তারা জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আর এগুলি ঘটে তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস তাদেরকে অধিক বিভ্রান্ত করে। তারা নিজেদের ভেতরে লুক্কায়িত মন্দ প্রবৃত্তি ও বোকামীর কারণে প্রদর্শিত পথ থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না। তাদের আচরণ ও মানসিকতা তাদেরকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। তারা বিভ্রান্তই হতে থাকে।

বর্তমানে আমরা অনেক টিভি চ্যানেল দেখি যেগুলিতে প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে গবেষনা করতে দেখা যায়। সেখান থেকে শিক্ষনীয় বিষয়টি বেড় করে আনার চেষ্টা করা হয়। এগুলি একদিনে গড়ে ওঠেনি। আল্লাহ প্রদত্ত নানান ধারণা ও জ্ঞান যুগে যুগে মানুষকে একটু একটু করে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণীত করে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ সকল যুগেই যুগোপযোগী জ্ঞানদান করে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আদম-হাওয়ার যুগে কম্পিউটারের জ্ঞান দান করেননি। যখন যেখানে যেভাবে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় সেভাবেই সেটি অনুমোদন করেছেন। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে ও অগ্রসর হতে অনুপ্রাণীত করেন। বলা হচ্ছে,

"আমি শপথ করি অস্তরাগের এবং শপথ করি রাত্রির এবং যা কিছুর সে সমাবেশ ঘটায় তার, শপথ করি চন্দ্রের যখন সে পূর্ণরূপ লাভ করে- নিশ্চয়ই! তোমরা অগ্রসরমান হবে, পরিভ্রমণ বা আরোহন করবে ধাপে ধাপে।" (আল-কোরআন ৮৪:১৬-১৯)

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন ক্ষুদ্রের মধ্যে কি আছে, যাকে তুচ্ছ ভাবা হয় তার মধ্যে কি আছে। তিনি এসব উপমা দিতে কুন্ঠাবোধ করেন না। এমন উপমা দ্বারা তিনি মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন। তবে বিশ্বাসীরাই কেবল উপকৃত হয়। অবিশ্বাসী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা নিজেরাই নিজেদের আচরণের কারণে বিভ্রান্ত হয়। তাই বলা হয়েছে যে, 'এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন।' বস্তুত বিশৃংখলাকারীরা নিজেরাই নিজেদের মানসিকতা ও আচরণের কারণে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

▪ **২.২৭** যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে এবং তিনি যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন।' অর্থাৎ অনুরূপ উপমা দ্বারা সকলেই বিভ্রান্ত হয় না। কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরাই

বিভ্রান্ত হয়। এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী। কেননা সর্বকালে সকল অবিশ্বাসী বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরাই অনুরূপ উপমার কারণে বিভ্রান্ত হয়। সকলে হয় না। এই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা কারা? যদিও এ বাণী সকল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের জন্য প্রযোজ্য। তথাপি তৎকালীন সময়ের বিবেচনায় এ বাণী উদ্ধৃতকরণের কিছু সুনির্দিষ্টতাও আছে।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে অবিশ্বাসী ও হঠকারেরা বলার চেষ্টা করত যে, 'এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কি শিক্ষা দিতে চান?' অবিশ্বাসী ও হঠকারেরা আল্লাহর বাণীকে মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এভাবে বলার চেষ্টা করত। তারা মানুষের মাঝে মিথ্যে, ভূল ও বিভ্রান্তি ছড়ানর চেষ্টা করত। তবে এসব কর্মকান্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কোরআনের দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়া। ব্যার্থ করে দেয়া। যারা এ কাজগুলি করত তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ইহুদি সম্প্রদায়।

বলা হচ্ছে যে, 'তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা কেবল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে বিভ্রান্ত করেন'। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে ইহুদিদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কিভাবে সেটি নিশ্চিত হওয়া গেল?

আয়াতের আলোচ্য অংশে বলা হয়েছে যে, 'যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে ... তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' তারা কারা যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল? আল্লাহর সঙ্গে 'অঙ্গীকারাবদ্ধ' হওয়ার বিষয়টির সাথে একসময়ে মুসলিম তথা মানবজাতির প্রতিনিধিত্বকারী ইসরাইল জাতির সম্পর্ক আছে।

এছাড়াও ইতিপূর্বে সূরার ৮-২০ নং আয়াতে মোনাফেকদের বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সেখানেও মূলত ইহুদি জাতিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সূরা বাকারায় ইহুদি জাতিকে উদ্দেশ্য করে অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের প্রচার-প্রসারকালীন সময়ে তারা মুখ্য বিরোধীতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই তাদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

বাইবেলে ইসরাইল জাতির আলোচিত ঘটনাবলীর মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে তাদের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.৪০.২, ২.৪০.৩, ২.৬৩, ২.৮৩, ২.৯৯, ২.১৭৭]। ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ মানুষের জন্য এক উদাহরণস্বরূপ বেছে নিয়েছেন। তাদের ঘটনাবলী থেকে সমগ্র

মানবজাতির জন্য ভাল-মন্দ শিক্ষনীয় আছে। কেবল তাত্বিক নয় বাস্তবেও এটি অস্বীকার করা যাবে না।

সমগ্র পৃথিবীতে বাইবেলের রয়েছে এক বিশাল প্রভাব ও মহাত্ম। কথাটি কেবল তত্ব নয়, বাস্তব সত্য। আর বাইবেল ইসরাইল জাতিকে নিয়েই কথা বলেছে। তাদের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী, উত্থান-পতন, আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, আল্লাহর সঙ্গে তাদের করা অঙ্গীকার ইত্যাদি সবই সমগ্র জাহানের মানবের জন্য শিক্ষনীয়। ফলে আল্লাহর সঙ্গে করা মানুষের অঙ্গীকার বিষয়ে জানতে বা বুঝতে হলে তাদের ঘটনাবলী জানতে হবে। এক অর্থে অনেক বিষয়ে তারা মানবজাতির প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করেছে। মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ তাদেরকে বেছে নিয়েছেন।

এখানে যে অঙ্গীকারের বিষয়ে বলা হয়েছে তা সৃষ্টিকালীন সময়ে মানুষের করা অঙ্গীকার বলেও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ কি সৃষ্টিকালীন সময়ের বিষয়গুলি স্মরণ করতে পারে? আজকের মানুষ বিষয়গুলি জানবে কি করে যে সৃষ্টিকালে সে আল্লাহর সঙ্গে কি অঙ্গীকার করেছিল? বলা হচ্ছে,

"যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব (পুনরুত্থান দিবসে), ... সেখানে (পৃথিবীতে) তারা প্রত্যেকে ইতিপূর্বে বারংবার যা কিছু করেছে তা জানতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে ..." (আল-কোরআন ১০:২৮-৩০)

সত্য হচ্ছে, আল্লাহ না চাওয়া পর্যন্ত কিংবা পুনরুত্থান দিবস না আসা পর্যন্ত মানুষ বিষয়গুলি স্মরণ করতে পারবে না। এমনকি মানুষ যে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, সেটিও মানুষ জানতে পেরেছে বাইবেল-কোরআন পাঠ করে। নিজের স্মরণ থেকে নয়। বিশেষত কোরআন পাঠ করে। কেননা কোরআন অঙ্গীকারের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছে। অতএব কি বিষয়ে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, কিংবা আদৌ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল কিনা সেটি জানতে বা বুঝতে হলেও কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে।

কোন বিষয়গুলিতে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে কোরআনে সে বিষয়ে সরাসরি কিছু বলা নেই। তবে কোরআনে আল্লাহর কিছু বাণী, নির্দেশনা বা আয়াত আছে যেখানে অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি তা

মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে নিচে অঙ্গীকারের বিষয়ে কোরআন থেকে উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরা হল।

- প্রসঙ্গ : অঙ্গীকার ও ইসরাইল জাতি

“এবং (হে ইসরাইলের সন্তানেরা, স্মরন কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং সুউচ্চ পর্বতকে তোমাদের সামনে রেখে বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ, যেন তোমরা মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার।” (আল-কোরআন ২:৬৩)

“(স্মরণ কর) যখন আমি ইসরাইলের সন্তানদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা করবে না, পিতামাতা, আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলবে; উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দরীদ্রদের প্রাপ্য (যাকাত) প্রদান করবে। ...।” (আল-কোরআন ২:৮৩)

“(স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, শক্ত করে ধারণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং শোন (আমার বাণী)। ...।” (আল-কোরআন ২:৯৩)

“আল্লাহ বনী-ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারজন গোষ্ঠীগত নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, আমার বার্তাবাহকদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপসমূহ দুর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব যেগুলির তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত। এরপরেও যে অবিশ্বাসী হবে সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত। অতঃপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা নিজেদের সুবিধা মতো (অবতীর্ণ গ্রন্থের) শব্দসমুহের অর্থ পরিবর্তন করে নিত এবং তাদেরকে

যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার একটি অংশ বিস্মৃত হয়েছে। ...।” (আল-কোরআন ৫:১২-১৩)

■ প্রসঙ্গ : অঙ্গীকার ও নবীগণ

“আল্লাহ যখন নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এই বলে যে: আমি তোমাদেরকে যে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করেছি, অতঃপর তোমাদের নিকট বার্তাবাহক আসবে তোমরা যে গ্রন্থ ধারণ কর তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকে সহায়তা করবে। তিনি বললেন: তোমরা কি একমত এবং এ বিষয়ে আমি যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করছি তা গ্রহণ করেছ? তারা বলল: আমরা একমত। তিনি বললেন: তবে সাক্ষী থেক। আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।” (আল-কোরআন ৩:৮১)

আল্লাহ সকল নবীগণের নিকট থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে এমন অঙ্গীকার নিয়েছিলেন বলে বলা হয় সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।

“(স্মরণ কর) যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও (হে মোহাম্মদ) এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার নিকট থেকেও এবং তাদের নিকট থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার-” (আল-কোরআন ৩৩:৭)

কোরআনে বেশ কিছু জায়গায় অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বার্তাবাহকগন ও তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ প্রদর্শিত পথে চলার এবং নবীগণকে সহায়তা করার বিষয়ে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছে। ফলে তাদেরকে তাদের অঙ্গীকার রক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। যারা তা অবিশ্বাস করবে এবং কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এমনই বলা হয়েছে।

■ প্রসঙ্গ : অঙ্গীকার ও সম্পর্ক

“... তারাই বোঝে যারা বোধসম্পন্ন। এরা এমন যারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। যারা বজায় রাখে ঐ

সম্পর্ক যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসেবের আশঙ্কা রাখে। যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য্যধারণ করে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যায় করে এবং ভাল দ্বারা মন্দকে জয় করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম-” (আল-কোরআন ১৩:১৯-২২)

“যারা আল্লাহর সঙ্গে করা দৃঢ় অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।” (আল-কোরআন ১৩:২৫)

“তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন রক্তের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক। ...” (আল-কোরআন ২৫:৫৪)

সম্পর্ক বলতে এখানে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও সকল ধরণের সামাজিক সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে।

ওপরে সুনির্দিষ্টভাবে কোরআনে উদ্ধৃত অঙ্গীকারের বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এগুলি ছাড়াও আল্লাহর আরও কিছু নির্দেশনা আছে যা নিচে তুলে ধরা হচ্ছে। যা এ আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কেননা এগুলি আল্লাহর নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত বিষয় হলেও অন্তরের অঙ্গীকারের সঙ্গেও সম্পর্কিত বিষয়।

- প্রসঙ্গ : নির্দেশনা : উপাসনা ও সমর্পন

“নিশ্চয়ই! আমি, কেবল আমিই আল্লাহ, আমি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর ...” (আল-কোরআন ২০:১৪)

“...সূর্য্য কিংবা চন্দ্রকে সেজদা কর না। বরং আল্লাহকে সেজদা কর, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, ...” (আল-কোরআন ৪১:৩৭)

“উপাসনার স্থানসমুহ কেবলমাত্র আল্লাহর, অতএব তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকে ডেক না।” (আল-কোরআন ৭২:১৮)

“আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

- প্রসঙ্গ : নির্দেশনা : শয়তান বা বর্জনীয় বিষয়

“হে মানবজাতি! ... শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (আল-কোরআন ২:১৬৮)

- সামগ্রীক নির্দেশনা

“... আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।” (আল-কোরআন ২:৩৮)

“(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা আদমের সন্তানদের পৃষ্টদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করে আনেন এবং তাদের নিজেরদের ওপর প্রতিজ্ঞা করান (এই বলে): আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলে: অবশ্যই! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (এটি এজন্য যে) পুনরুত্থান দিবসে তোমরা যেন না বল যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। অথবা বল যে, অংশীদারীত্বের প্রথা তো আমাদের পূর্ব পুরুষেরা উদ্ভাবন করেছে। আর আমরা হলাম তাদের পশ্চাৎবর্তী সন্তান-সন্ততি। তবে কি তাদের কর্মের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে?” (আল-কোরআন ৭:১৭২-১৭৩)

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন, তার নির্দেশনার প্রতিপালন, কেবলমাত্র তাঁর উপাসনা করা, তার সমকক্ষ কোনকিছু দাঁড় না করান, সকল সম্পর্ক বজায় রাখা, মন্দ কাজ বর্জন করা ইত্যাদি করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের অঙ্গীকার রয়েছে বলে ধারণা পাওয়া যায়। সকল অঙ্গীকার রক্ষা করা এবং নির্দেশনার যথাযথ পরিপালনের সাথেই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ও আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সবকিছু

নির্ভর করে। আর এ সম্পর্কের ওপরেই টিকে আছে গোটা জগত সংসার ও এর সুষ্ঠ ব্যাবস্থাপনা।

সম্পর্ক অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি রক্ষা করার গুরুত্ব অত্যাধিক। এক অর্থে সম্পর্কই জগতকে চালনা করে। কেননা সকল নির্দেশনা পরিপালনের নিশ্চয়তা আসে এই সম্পর্ক থেকেই। নির্দেশনার যথাযথ পরিপালনই জগত সংসারকে চালনা করে ও সচল রাখে। সম্পর্কের কার্যকারীতার মাধ্যমে জগত সংসারের সচলতার ধারাবাহিক কর্ম প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ-

যেমন আল্লাহ মানুষকে করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিলেন এবং তা পালনে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে নির্দেশনা যথাযথভাবে পালিত হবে না। তাই তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রজন্মান্তরে বজায় রাখতে হবে। সেজন্য আরও কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। যেমন- যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে সেসবে বিশ্বাস রাখতে হবে, নিয়মিত আল্লাহর উপাসনা করতে হবে এবং অপরাপর আরও যে সকল বিষয়াদি পালন করতে বলা হয়েছে সেসবও পালন করতে হবে। এগুলির মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে ধীরে ধীরে দৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

একক কোন ব্যাক্তি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও তা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল কাজ করা সম্ভব হবে না। তাই সকলকে বিশ্বাসের মধ্যে আসতে হবে। আবার সকলে বিশ্বাসের আওতার মধ্যে এসেও প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেও কাজ হবে না। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক লাগবে। কেননা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় না থাকলে কোন নির্দেশনার বাস্তবায়ন হবে না। কাজ করতে হবে মানুষকে। অতএব সেটিও বজায় রাখতে হবে। কোরআনে সে নির্দেশনাও দেয়া আছে। সেক্ষেত্রে কি করণীয় কি বর্জনীয় সেসবও বলা আছে।

বস্তুত ওপর থেকে নিচে নির্দেশনার পরিপালনই জগত সংসারকে সচল রাখে। অন্যদিকে সকল নির্দেশনার পালন এই সম্পর্কের ওপরই নির্ভর করে। যারা সম্পর্ক নষ্ট করে তারা মূলত জাগতিক ব্যাবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর এ সম্পর্ক নষ্টের উৎপত্তি বা শুরু হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার

ভঙ্গ করা থেকে। অঙ্গীকার হচ্ছে আঠার মতো। যা দিয়ে আল্লাহ সকলকে আবদ্ধ রাখেন। সম্পর্ক সকলকে আল্লাহর সঙ্গে এবং নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। যেমন বলা হয়েছে,

"স্মরণ কর আল্লাহর প্রতি করা অঙ্গীকার বা করণীয়সমুহ, যা দ্বারা তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছেন যখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর।" (আল-কোরআন ৫:৭)

অঙ্গীকারের মাধ্যমেই আল্লাহ মানুষকে আবদ্ধ করেন এবং মানুষ নিজেরাও পরস্পরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ফলে নির্দেশনার পরিপালন সম্ভব হয়। সম্পর্কহীন কারও দ্বারা কারও নির্দেশনা পরিপালিত হয় না। অন্তরে গোপনে হলেও একটি অঙ্গীকার লাগবে। অঙ্গীকার হচ্ছে আঠার মতো। একের সঙ্গে অপরকে কঠিন বন্ধনে জড়িয়ে রাখে। তাই এ বন্ধনকে দৃঢ় রাখতে হয়। অঙ্গীকার রক্ষা করা তাই আল্লাহর প্রতি মানুষের ও মানুষের পরস্পরের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত হয়।

যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা যে কোন নির্দেশনাকে তথা এক অর্থে আল্লাহর নির্দেশনাকে অমান্য করে। নির্দেশনা অমান্য করলে মানুষ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমাই মানুষকে সুপথে চালনা করে। সীমালংঘন জগত সংসারকে অশান্ত করে। বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সীমালংঘনকারীরা মন্দ ভাইরাসের মতো। সকল অশান্তি সৃষ্টির কারণ।

জগতের সকল নির্দেশনা পরিপালিত হয় সম্পর্কের ওপরে নির্ভর করে। নির্দেশনার পরিপালন জগতকে চালনা করে। সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হলে জগত সঠিকভাবে চলে। তদ্রূপ বিশৃংখলার সৃষ্টিও হয় সম্পর্ক ভঙ্গের কারণে। কোন কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষ বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে দ্বিধাবোধ করে না। কেননা তখন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মায়া-মমতা ছুটে যায়। মানুষ হিংস্র ও প্রতিশোধপরায়ন হয়ে ওঠে।

সম্পর্ক ছিন্ন হয় সূক্ষ্মভাবে কোন বিশ্বাস ভঙ্গ থেকে। বিশ্বাস ভঙ্গ হচ্ছে পারস্পরিক অঙ্গীকারের বরখেলাফ। অর্থাৎ বিশ্বাস ভঙ্গের পূর্বে একটা অঙ্গীকার থাকে। অঙ্গীকার অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বাসের মতো কিংবা তারও ওপরে অঙ্গীকারের অবস্থান। যে বা যারা বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দায়ী তারা বস্তুত

ভূল-পথগামী। তারা নিজের বা নিজেদের ক্ষুদ্র বা হীন স্বার্থ বা খায়েস পরিপুরণার্থে আল্লাহ প্রদর্শিত সরল পথ থেকে বিচ্যুত। হঠকারী আচরণ, মানুষকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ চরিত্রের মানুষ মনে করে যে এর দ্বারা তারা লাভবান হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সকল দিক বিবেচনায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা নিজেদের প্রজন্মকেও এ জগতে ক্ষতিগ্রস্ত করে রেখে যায়। গোটা জগত সংসারকেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত করে। জগতে তারা মন্দ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে। জাগতিক সকল বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য প্রধানত এরাই দায়ী। এদের বিষয়ে বাইবেল, কোরআন, গীতা সর্বত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মানুষ তার নিজ জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতা থেকেও এসব বার্তার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে। সম্পর্ক বা অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে যেভাবে মানুষ তথা সম্পর্ক ভঙ্গকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিচে তা আলোচনা করা হল।

প্রথমত: অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার তথা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাদের বিশ্বাস আর কোনদিন ফিরে পায় না। হয়তবা তারা মনে করে হারানো লোকদেরকে তাদের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আল্লাহ বা ভবিষ্যতই সেটি বলতে পারে প্রয়োজন আছে কি নেই। তাদেরকে তারা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। অথচ তারা একে অপরের অতি ঘনিষ্ট বা কোন না কোনভাবে কখনও ঘনিষ্ট ছিল। তারা ঘনিষ্টদেরকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে নিজের কোন লোভ, লাভ ও অতি চালাকির কারণে। জীবন নামক জাগতিক খেলায় সামান্য ক'দিনের জন্য জেতার আশায়। বিপদে সাহায্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি তারা হারিয়ে ফেলে।

দ্বিতীয়ত: তাদের চরিত্র ও কর্মকান্ড এক সময় সকলের কাছে জানাজানি হয়ে যায়। তারা পরবর্তীতে অন্যান্যদের বিশ্বাসও আর অর্জন করতে পারে না।

তৃতীয়ত: তারা নিজেরা সাময়িক লাভবান হলেও প্রজন্মকে অনিরাপদ রেখে যায়। কেননা তাদের কৃতকর্ম মানুষ স্মরণ রাখে। যার ফলাফল প্রজন্মের ওপর এসে পড়তে পারে।

চতুর্থত: এরা শুধু নিজেদের নয় গোটা জগত সংসারকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। তারা সকলকে বোকা ভাবে। কিন্তু তাদের কর্ম ও আচরণই

বোকামির ফসল। তাদের কারণে জগত সংসারে অন্যায় আচরণের প্রবেশ ঘটে এবং তা প্রসার লাভ করে। এরা ধূর্ত। সূক্ষ্ম চালাকি করে বহু ওপরে ওঠে। ফলে অন্যরা তাদেরকে অনুসরণ করে। জগত অন্যায়ে ছেঁয়ে যায়। দুষ্টুমি খেলায় মেতে ওঠে জগত। এর সুদুর প্রসারী মন্দ পরিণাম ভয়াবহ!

পঞ্চমত: আল্লাহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব বিষয় জানেন ও হিসেব রাখেন। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সমাজে অভিনয়স্বরূপ প্রদর্শন করলেও অন্তরে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বলেই সরল পথ ছেড়ে সূক্ষ্ম দুষ্টুমিতে ভরা জটিল পথে অংক কষে। ভূল পথে হাটে। আল্লাহর সূক্ষ্ম বিচার ব্যাবস্থা থেকে তারা কোনভাবেই রেহাই পায় না বা পাবেও না। এগুলি বাস্তব সত্য কথা। এসবের প্রচুর প্রমাণ বা উদাহরণও আছে। কিন্তু মানুষ শিক্ষা নেয় না। কিছু আছে বোঝেও না।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষ আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকারসমুহকে স্মরণে আনতে পারে না। তবে একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ সহজ-সরলভাবে ভাল-মন্দ, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বুঝতে পারে যদি না তার অন্তরে কোন রোগ অর্থাৎ দুষ্ট চিন্তা, লোভ-লালসা বা কোন প্রকার ভাইরাস প্রবেশ করে। আল্লাহ মানুষকে সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যদি লিখিত কোরআনে ভাল-মন্দ, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে দেয়া না হত, তথাপি মানুষ জানে যে হত্যা করা অন্যায়, ব্যভিচার করা পাপ, মিথ্যে বলা নিষেধ। কারণ নির্দেশনা সৃষ্টিকালেই ভেতরে প্রবিষ্ট। যেমন রয়েছে লওহে-মাহফুজে (দ্রষ্টব্য ২.২৭২.১) অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রসূত গ্রন্থে। যেমন কম্পিউটারের ভেতরে লিখিত ভাষা বা নির্দেশনা আছে যা ব্যাবহারকারী দেখতে পায় না। ভাইরাস আক্রান্ত না হলে সে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক চলে। ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলিও ঠিক তেমনি। কোরআনের নির্দেশনা গ্রন্থ ব্যাতিত মানবের অন্তরেও নির্দেশনা আকারে গ্রথিত করে দেয়া আছে। বলা হচ্ছে,

“যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে এটি (কোরআন বা অবতীর্ণ বাণী) সুস্পষ্ট বাণী বা নিদর্শন। ...” (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

সাধারণ ভূল-শুদ্ধ মানুষ সহজাতভাবে বুঝতে পারে। মানুষের ভেতরে এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা কাজ করে। বস্তুত এ সবই মানুষের পক্ষ থেকে

আল্লাহর প্রতি করা অঙ্গীকার হয়ে কাজ করে যা দ্বারা আল্লাহ মানুষকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এটিই আল্লাহর নিয়ম। যেমন কোন নিয়মের কারণে কম্পিউটার তাকে প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলে। অর্থাৎ ভেতরে অদেখা অনেক বিষয় আছে। ক্রিয়া অছে। তাই বলা হয়েছে,

"স্মরণ কর তাঁর প্রতি করা অঙ্গীকার বা করণীয়সমুহ, যা দ্বারা তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছেন যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। ...।" (আল-কোরআন ৫:৭)

অঙ্গীকার, বিশ্বাস এ শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রদর্শিত পথে আবদ্ধ রাখেন। একটি সীমার মধ্যে ধরে রাখেন। যে সীমা মন্দ কর্ম ও প্রবৃত্তির ছোবল থেকে মানবজীবন ও জগতকে রক্ষা করে। যারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পরও তা ভঙ্গ করে, বস্তুত তারা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সিষ্টেম বা নিয়মকে ব্যাহত এমনকি ভঙ্গ করে।

অঙ্গীকারের মাধ্যমে কি করা হয়? অঙ্গীকার আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে কিছু করতে ও কিছু না করতে বলা হয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ করা না করার কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়। এভাবে একটি নিয়ম গড়ে ওঠে এবং সে নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়।

প্রতিটি অবস্থান ও ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু পরিচালনার নিয়মকে যারা ভঙ্গ করে, তারা নিয়মের ব্যাত্যয় বা বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য দায়ী। তারা সকলের এমনকি তাদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য সঠিক নিয়মেরও ভঙ্গকারী। বস্তুত এর মাধ্যমে তারা নিজেরা যেমন নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি গোটা সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। নিজেদেরই স্বার্থে তাই সমাজের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য ভূল পথগামীদের প্রতিহত করা।

আল্লাহ যখন মশা কিংবা তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তু দ্বারা উপমা দেন, তখন যারা সেসব নিয়ে উপহাস করে বিশেষত ইহুদিরা, তারা তাদের এমন আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়। কেননা তারা আল্লাহর বাণীকে নিয়ে উপহাস করে। বিষয়টি এটিই প্রকাশ করে যে আল্লাহর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা তিরোহিত হয়েছে। আল্লাহর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা ছাড়া বিশ্বাস আসবে কি করে? তাঁর নির্দেশনা

পরিপালন হবে কি করে? এরা এক অর্থে সকল অঙ্গীকার ভঙ্গকারী! সম্পর্ক ছিন্নকারী! সম্পর্ক ছিন্নকারীরা যেমন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি জগতসংসারকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে ওপরে সে বিষয়গুলিই তুলে ধরা হয়েছে। তারা অশান্তি সৃষ্টিকারী বা অশান্তি সৃষ্টির বীজ বপনকারী। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। ফলে তারা যেমন ইহকালে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তা না হলেও পরকালে তাদের নিস্তার নেই। তাদের কর্ম ও আচরণই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। উদ্ধৃত বাণীতে সে বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

➢ (আয়াত ২৮-২৯) মানুষ কি নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? নিশ্চয়ই না। বিষয়টি মানুষ জানে ও বোঝে। আল্লাহই সকলকে জীবন দান করেছেন, বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই আমরা আল্লাহ নামে অভিহিত করি। এতদ্বসত্বেও মানুষ কি করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতে অবিশ্বাসী (Disbeliever) হয়! বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে! আল্লাহ (Allah) এবং তাঁর সৃষ্টি (Creation) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

➢

২৮	কেমন করে তোমরা আল্লাহতে অবিশ্বাস কর, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন এবং তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন! অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবনদান করবেন এবং পরিশেষে তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (How disbelieve ye in Allah when ye were dead and He gave life to you! Then He will give you death, then life again, and then unto Him ye will return.)
২৯	তিনিই সে সত্বা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমন্ডলের প্রতি এবং এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। (He it is Who created for you all that is in the earth. Then turned He to the heaven, and fashioned it as seven heavens. And He is knower of all things.)

▪ **২.২৮.১** কেমন করে তোমরা আল্লাহতে অবিশ্বাস কর যখন তোমরা ছিলে প্রাণহীন এবং তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন : মানুষ কি ভাবে না যে এমন একটা সময় ছিল যখন তার কোন অস্তিত্বই বিদ্যমান ছিল না? কোথা থেকে সে এল; কিভাবে এল; কে তাকে সৃষ্টি করেছে? সঠিক উত্তর কারই জানা নেই।

যদি মানুষ ধরেও নেয় যে এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন জানা সম্ভব হবে না, তথাপি এটা ধরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে সৃষ্টি যখন আছে তবে তার স্রষ্টাও আছে। সে স্রষ্টাকেই আল্লাহ নামে ডাকা হয়েছে। বিভিন্নজন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে। যে যে নামেই ডাকুক না কেন তাঁর সকল নামই সুন্দর। যেমন তিনি দয়াময়, করুণাময়, ক্ষমাময়, জ্যোতির্ময়, অনুগ্রহ বর্ষনকারী ইত্যাদি। আবার যদি সেটি হয় কঠোর শাস্তিদাতা- তবে সেটিও দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য। অর্থাৎ তিনি সর্বদাই 'দয়াময়'; 'করুণাময়' ও 'কল্যাণময়'!

কিছু মানুষ যদি এমনটি ভেবেও নেয় যে সে একটা পরিবেশের মধ্যে আপনা-আপনি সৃজিত হয়েছে, তবে আপনা-আপনি সৃজনের সেই পরিবেশ ও প্রক্রিয়াটি যিনি তৈরী করে রেখেছেন তিনিই 'আল্লাহ'। তাঁকেই আল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়।

যদি মানুষ এমনটিও ভাবতে চায় যে, এ আপনা-আপনি সৃজনের প্রক্রিয়াটিও কেউ সৃজন করেনি এটিও 'আপনা-আপনি' ঘটছে, তাহলে এ 'আপনা-আপনি'টিই অর্থাৎ ভেতর ও বাহিরের সমগ্র পরিবেশ মিলিয়ে যাকে এ 'আপনা-আপনি' বলা হয় সেটিই 'তিনি'। তিনিই সবকিছুর ধারক। বলা হচ্ছে,

"তাঁর আসন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে ...।" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

"ভগবান! ... যদিও তিনি তার ধামে বর্তমান, তথাপি তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সবকিছু তার মধ্যেই স্থিত।" (গীতা ৮:২২)

মানুষ নিশ্চিত জ্ঞানে জানে যে একটি সময় ছিল যখন সে নিজেও ছিল না। সে ছিল প্রাণহীন। সে নিজেকে নিজে জীবন দান করেনি। কেউ তাকে জীবন দান করেছেন। এমন কি জীবন কি সেটিও সে জানে না। অতএব এটি বিস্ময় প্রকাশেরই বিষয় যে, কি করে মানুষ সৃষ্টিকর্তারূপে আল্লাহকে অবিশ্বাস করতে পারে? যদি কেউ অন্ধ বিশ্বাস নাও করতে চায়, তথাপি যৌক্তিক জ্ঞানও তো তেমনটি বলার কথা নয়। এখানে এসে অতি যুক্তিবাদীরাও চরম অযৌক্তিক আচরণ করে! তাই যথার্থই অবিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, কেমন করে তোমরা আল্লাহতে অবিশ্বাস কর যখন তোমরা ছিলে প্রাণহীন এবং তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন?

▪ **২.২৮.২** অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (Then He will give you death) : মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে যে সে একদিন থাকবে না। তার মৃত্যু হবে। এ বিষয়ে মানুষের মাঝে কোন বিতর্ক নেই। কেননা বিষয়টি সে তার অভিজ্ঞতা থেকেই জানে। মানুষ যেমন নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেনি, তেমনি তার মৃত্যুও সে নিজে ঘটাবে না। কেউ না কেউ ঘটাবে। তিনিই আল্লাহ। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে এটিই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বলা হচ্ছে,

“কারও মৃত্যু হয় না আল্লাহর হুকুম এবং একটি পূর্ব নির্ধারিত সময় ব্যাতিত। ...।” (আল-কোরআন ৩:১৪৫)

“প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমরা আমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে।” (আল-কোরআন ২৯:৫৭)

▪ **২.২৮.৩** পুনরায় জীবনদান করবেন (Then life again) : কোরআন নিশ্চিত করে বলছে যে, আল্লাহ মানুষকে পুনরায় জীবনদান করবেন। এটি কোরআন প্রদত্ত দর্শনের অন্তর্গত একটি বিষয়। যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস করবে তাদেরকে এটি বিশ্বাস করতে হবে। এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কেননা আজও এটি কোনভাবে প্রমাণিত নয়। এ ধারণায় যারা বিশ্বাস করবে না তারাই অবিশ্বাসী। এর সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান বিচার দিবসের। বস্তুত কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে এ ধারণার নিবিড় সম্পর্ক আছে [বিশ্বাস-অবিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.২৮.৪, ২.৩০]। কেবল এ একটি ধারণার

সাথে কার্যকারণ সম্পর্কের আরও বহুবিধ ধারণার যৌক্তিক সম্পর্ক আছে। বলা হচ্ছে,

"মানুষ বলে: যখন আমার মৃত্যু হবে তারপরও কি আমি জীবিত উত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বেও সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।" (আল-কোরআন ১৯:৬৬-৬৭)

উল্লেখ্য যে, সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও পুনর্জন্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারাও বিশ্বাসী।

▪ **২.২৮.৪** এবং পরিশেষে তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে (Then unto Him ye will return) : আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটাবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদান করবেন। এটি কোরআন প্রদত্ত দর্শনের অন্তর্গত বিষয়। যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস করবে তাদেরকে এটি বিশ্বাস করতে হবে। এ ধারণা যাদের পছন্দ হবে না, তারা নিজ দায়িত্বে সেটি বিশ্বাস না করতে চাইলে না করতে পারে। তাদের সে স্বাধীনতা আছে।

এত বড় মহাসৃষ্টি, অন্যকথায় মহান আল্লাহ-তায়ালার কোন সৃষ্টি বা কাজই অনর্থক কিংবা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন নয় বা হতে পারে না। এটি ভেবে নেয়া খুবই অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনকি মানুষ নিজেও যা সৃষ্টি করে তাও লক্ষ্যবিহীন নয়। খেলার ছলে মানুষ যদি কিছু সৃষ্টি করে তারও লক্ষ্য থাকে। অনর্থক সময় অতিবাহিত করার জন্য যদি মানুষ কিছু সৃষ্টি করে, তবে তারও লক্ষ্য আছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিহীন জগতে কিছু নেই। মানুষকে যিনি সৃজন করেছেন তিনি সে বৈশিষ্ট মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতিও সে রীতিতে চলে। তবে কি তিনি নিজে কোন উদ্দেশ্যবিহীন কাজ করবেন? বস্তুত এ প্রকৃতিও তাঁরই সৃষ্টি! প্রকৃতিও আমাদেরকে সে শিক্ষা দেয়। প্রকৃতির প্রতিটি কর্মকান্ড স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসরমান।

আল্লাহ মানুষকে পুনরায় জীবন দান করবেন দর্শনে সেটি বলা হয়েছে এবং এরও উদ্দেশ্য আছে। তিনি এটি করবেন মানুষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। কেন ফিরিয়ে নেবেন সেটিও কোরআনে বিধৃত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"হে মানুষ, নিশ্চয়ই! তুমি তোমার কর্মসহ তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে চলেছ। এ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে (কৃতকর্ম সহ)।" (আল-কোরআন ৮৪:৬)

পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা কৃত কর্মের তিনি হিসেব নেবেন। মানুষকে সে আলোকে বিচার-বিবেচনা করা হবে। তার ভিত্তিতে মানুষ পুরস্কৃত কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত হতে পারে। এটিকে একটি আপাত লক্ষ্য বলা যেতে পারে।

এ একটি আয়াতে কোরআনের দর্শনের মূল ভিত্তি বিবৃত হয়েছে। কার্যকারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অপরাপর ধারণাগুলির কারণ হয়ে দাড়িয়ে আছে। যার একটির কারণে অপরটির অপরিহার্যতার সৃষ্টি। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিচার দিবস, কর্মের হিসেব সংরক্ষণ, আল্লাহর ব্যাবস্থাপনার অন্তর্গত বিষয় তথা ফেরেশতাগণে বিশ্বাস, পুরস্কার ও শাস্তি, স্বর্গ ও নরক ইত্যাদি সকল ধারণা ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। বস্তুত কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে এ ধারণায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসেরই সম্পর্ক রয়েছে [বিশ্বাস-অবিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.২৮.৩]। কোরআন প্রদত্ত দর্শনের এই একটি বিষয়ে বিশ্বাস রাখা সম্ভব হলে অপরাপর সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে যৌক্তিক কারণেই মানুষ বাধ্য। কেননা এগুলি প্রয়োজনীয়তা বা অপরিহার্যতার ভিত্তিতে সুশৃংখল সম্পর্ক বজায় রেখে একটির কারণে অপরটি গড়ে উঠেছে।

কোরআনে অনেক বিষয় আছে যা মানব সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। যার সবকিছুর ব্যাখ্যা না করা শ্রেয়। সেসব বিষয় নিজে থেকে কেউ বুঝে নিতে সক্ষম না হলেও, এর থেকে সুফল পেতে হলে মানুষকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসই রাখতে হবে। এখানে আংশিক বিশ্বাস রাখার কোন অবকাশ নেই। সেক্ষেত্রে দর্শনের বিধি-বিধান অনুসরণ থেকে পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে না। বস্তুত তেমন ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ণ ফল লাভ করতে পারবে না। কেননা অবিশ্বাসের কারণে সে বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলবে না। দিক-নির্দেশনার অনুসরণ ব্যাতিত কিরূপে দিক-নির্দেশনা থেকে ফল পাওয়া যেতে পারে?

কোরআন সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। সকল মানুষের এ ধারণা বা দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন সমগ্র জগতের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতার জন্য তাই অপরিহার্য্য। বলা হচ্ছে,

"তুমি তো এর (অবতীর্ণ বাণীর) জন্য তাদের কাছে কোন বিনিময় মূল্য চাইছ না। এটি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এক উপদেশ বার্তা বৈ আর কিছু নয়।" (আল-কোরআন ১২:১০৪)

যদিও কোরআনের বার্তায় পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে, তবে অবশ্যই ভূল ধারণা বা ব্যাখ্যায় নয়। তবেই এটি বিশ্বাসীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে বাইবেলেও ইংগিত রয়েছে। বাইবেল অনুসারে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে আদম-হাওয়াকে বিতাড়নকালে গড বা আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে, যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে।'

আদম-হাওয়া সম্পর্কিত একই ঘটনা প্রসঙ্গে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ বললেন, তোমরা সেখানেই (পৃথিবীতেই) জীবন-যাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ৭:২৫)

গীতায় বলা হয়েছে, "মানুষকে সে স্থানের সন্ধান করতে হবে যেখানে গমন করলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। তাকে অবশ্যই সেই আদি সত্ত্বার স্মরণাপন্ন হতে হবে স্মরণাতীত কাল হতে যার থেকে সবকিছুর প্রবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে।" (গীতা ১৫:৩)

আরও বলা হয়েছে, "আমামুখী হয়ে যে নিজেকে আমাতে সমর্পন করে; একান্তই আমার ভক্ত ও আসক্তিবর্জিত এবং সর্বজীবে শত্রুভাব রহিত সে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে।" (গীতা ১১:৫৫)

■ **২.২৯.১** তিনিই সে সত্ত্বা (He it is) : কোথা থেকে এল বিশ্ব জগতের এত এত সৃষ্টি এবং এমনকি এ বিশ্বজগত? কে এসবের স্রষ্টা? সঠিক উত্তর কারই জানা নেই। যদি মানুষ ধরেও নেয় যে এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন জানা সম্ভব হবে না, তথাপি এটি ধরে নেয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে সৃষ্টি যখন আছে তখন তার স্রষ্টাও আছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রকৃতির ইশারা আমাদেরকে সে কথাই বলে।

একজন নিয়ন্ত্রক ভিন্ন এত এত সৃষ্টি এত সুশৃংখলভাবে চালানো সম্ভব না। তিনিই স্রষ্টা– যিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁকেই তাঁর যাবতীয় গুণের সাপেক্ষে কোরআনে 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"এ জগতে যা কিছু জড় ও চেতন বস্তু আছে ... নিশ্চিতভাবে জেন যে, আমিই এর উৎস এবং সংহারের মূল কারণ।" (গীতা ৭:৬)

যিনি সৃষ্টিজগতের পেছনে রয়েছেন। তিনি নিজেই তাঁর সবকিছু সরাসরি মানুষের সামনে উপস্থাপন করেননি। কিংবা হয়তবা তিনি উপস্থাপিত হয়েই আছেন, কিন্তু মানুষের সেই সক্ষমতা নেই বা তাকে সেই সক্ষমতা দেয়া হয়নি বিধাতাকে পরিপূর্ণরূপে দেখার, জানার ও বোঝার।

বিভিন্নজন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে। ভাষার পার্থক্যের কারণে একই পানিকেও মানুষ বিভিন্ন নামে ডাকে। তাতে সমস্যা কি, যদি উচ্চারিত একটি শব্দ থেকে মানুষ সঠিক অর্থে সে পানিকেই বুঝে থাকে?

বিবিধ নামের পার্থক্যের কারণে স্রষ্টার রূপ, রস, গন্ধ, গুণ ও বৈশিষ্টের সম্পর্কজনিত যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, সেটি হয় মূলত মানুষের নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে। কেননা মানুষ এসব বিষয়ে সঠিক কিছুই জানে না। সেটাই মানবের সীমাবদ্ধতা। আল্লাহ আল্লাহই আছেন এবং তিনি তাঁর সকল গুণ দ্বারা যথাযথভাবে চিরকালের জন্যই পরিপূর্ণ। মানুষের বুঝের পার্থক্যের কারণে তাঁর কোন পরিবর্তন নেই বা হতে পারে না। যে নামেই মানুষ তাঁকে ডাকুক না কেন, তাঁর বা তাঁকে প্রদত্ত সকল নামই সুন্দর। তিনি দয়াময়! ক্ষমাময়! জ্যোতির্ময়! প্রভৃতি।

কিছু মানুষ যদি এমনটি ভেবেও নেয় যে সে আপনা-আপনি সৃজিত হয়েছে, তবে সে আপনা-আপনি সৃজনের প্রক্রিয়াটি যিনি তৈরী করে রেখেছেন তিনিই আল্লাহ। তাঁকেই আল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোরআন মতে আল্লাহ-ই সে সত্ত্বা যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

▪ **২.২৯.২** যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন : বলা হচ্ছে, আল্লাহ-ই সে সত্ত্বা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে তিনি বলেন,

“কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা থাকবে।” (আল-কোরআন ২:৩৬)

যেহেতু তিনি মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন বা পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তাই তিনি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যাবস্থা তৈরী করে দিয়েছেন। তিনিই সকল কিছুর সরবরাহকারী। তিনিই লালন-পালনকর্তা।

বৃহৎ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পর্যন্ত, জীব ও জড় জগতের যা কিছু সৃষ্টি তা পরিপূর্ণ ব্যাবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সব রহস্য মানুষের জানা নেই। তবে মানুষকে জানতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষের পার্থিব জীবনের কাজের মাঝে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর মাধ্যমেই মানুষ নিজের অবস্থা, অবস্থানকে জানে। এভাবেই মানুষ নিজেকে চেনে, জানে ও বুঝতে শেখে [নিজেকে জানা দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]। এভাবেই মানুষ স্রষ্টাকে জানে। অজানাকে জানার মধ্য দিয়েই মানুষ একটু একটু করে স্রষ্টাকে বুঝতে শেখে। তাঁকে খুঁজে পাওয়া বা বুঝতে পাওয়ার আনন্দই প্রকৃত আনন্দ!

আল্লাহর সর্বাধিক মহাত্ম এখানেই যে কেউ তাঁকে জানতে বা বুঝতে না চাইলেও তিনি নানানভাবে আকৃষ্ট করার মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে সে পথেই অগ্রসর করে নিয়ে যান। তিনিই সহায়তা করেন তাঁকে জানতে। যেমন বলা হয়েছে,

“যারা নিয়ত ভক্ত এবং ভালবাসার সাথে আমার উপাসনা করে তাদেরকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করি, যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করে।” (গীতা ১০:১০)

আবার মানুষকে তিনি এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধও করেছেন। বলা হচ্ছে,

“নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে এবং বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল মহিমা তোমারই! ...।” (আল-কোরআন ৩:১৯০-১৯১)

"মানুষকে সে স্থানের সন্ধান করতে হবে যেখানে গমন করলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। তাকে অবশ্যই সেই আদি সত্বার স্মরণাপন্ন হতে হবে স্মরণাতীত কাল হতে যার থেকে সবকিছুর প্রবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে।" (গীতা ১৫:৩)

পৃথিবীতে যা আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিকে জানতে জানতেই ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে ও বুঝতে হবে। এভাবে নিজ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়িই মানুষকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এমনই তাঁর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া! বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! তোমরা পরিভ্রমণ করবে, আরোহন করবে বা অগ্রসরমান হবে ধাপে ধাপে।" (আল-কোরআন ৮৪:১৯)

▪ **২.২৯.৩** অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমন্ডলের প্রতি এবং এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে : উদ্ধৃত বিষয়টি সম্পর্কে সত্যি বলতে মানুষের নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে মানুষ কেবল অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য দিতে পারে। তাই বিষয়টি বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ওপর ছেড়ে দেয়া উত্তম [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। এ বিষয়ে আনুমান ভিত্তিক বক্তব্য না দেয়া শ্রেয় এবং সেটি এখানে দেয়া এক অর্থে অপ্রয়োজনীয়ও বটে। কল্পনাপ্রসূত বা অনুমানভিত্তিক এরূপ আলোচনায় বস্তুত কোন অর্জন নেই, যদি না সেটি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনার আওতার অন্তর্ভূক্ত হয়।

যেসব বিষয়ে মানুষের সঠিক জ্ঞান নেই, সেসব বিষয়ে কল্পনাপ্রসূত কিছু বলার বিষয়ে কোরআনে এভাবেই বলা হয়েছে যে,

"(বস্তুত) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে অনুমানের এবং অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।" (আল-কোরআন ৫৩:২৮)

তাবে যারা এ বিষয়ে সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনা করে তাদের জন্য এসব বার্তা দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। মানুষ আজ অন্য গ্রহে প্রাণের সন্ধান করছে! আরও অনেক অনেক কাজ করছে। এর পেছনে কি বিধাতা প্রদত্ত বার্তার ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা ছিল না? বর্তমানে যেসব গবেষনা হয় এসব গবেষনা শুরুর বহু পূর্বে যুগে যুগে ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া

হয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে? যা মানুষকে এ পথে গবেষনায় নামতে উদ্বুদ্ধ করেছে, পথ দেখিয়েছে এবং বলা যায় সূত্রও ধরিয়ে দিয়েছে! যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং যা সেখান থেকে নির্গত হয় এবং যা নভোমণ্ডল থেকে নেমে আসে এবং যা নভোমণ্ডলে উত্থিত হয়।" (আল-কোরআন ৩৪:২)

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে, নভোমণ্ডলে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু; নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালকের শপথ যে এটি সত্য, যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ।" (আল-কোরআন ৫১:২০-২৩)

"... সত্যের সন্ধান করতে হবে। .. মানুষকে সেই স্থানের খোঁজ করতে হবে যে সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় চলে যাওয়ার পর সে আর ফিরে আসে না।" (গীতা ১৫:৩)

আজও যারা গভীর মনযোগের সঙ্গে জিওগ্রাফি কিংবা ডিসকভারি চ্যানেলসমুহ দেখেন, কিংবা গবেষনা সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ করেন এবং তাদের যদি ধর্মীয় গ্রন্থসমুহ সম্পর্কিত জ্ঞানও থেকে থাকে, তবে তারা নিশ্চিতভাবেই দেখতে পাবে যে বহু পূর্বেই এসব বিষয়ে ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বস্তুত বিজ্ঞানী বা গবেষকরাই এসব বাণীর মর্মার্থ যথার্থভাবে অনুধাবন করে এবং বিচার-বিশ্লেষণ ও গাবেষনার মাধ্যমে জ্ঞানকে কাজে লাগায়। কোরআনে বোধসম্পন্ন মানুষদের কথা বারবার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য" (আল-কোরআন ৩:১৯০)

বস্তুত তারাই সত্যিকার অর্থে বোধসম্পন্ন মানুষ যারা সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষনা করে। অন্যরা অনর্থক অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়। তবে আল্লাহ প্রদত্ত বার্তার প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণ এবং তার গুরুত্ব বা মহাত্বকে মানবসমাজে তুলে ধরার জন্য অন্যান্যদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই বেদ, গীতা, কোরআন নিয়মিত আবৃতি করে চলেছে পূণ্য লাভের আশায়। তবে এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য। অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের জন্য। বস্তুত আল্লাহর নিদর্শন ও দিক-নির্দেশনা সকলের জন্য। কিন্তু জ্ঞানীরা এগিয়ে থাকে। তারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়। তাদেরকেই গীতায় যোগী বলা হয়েছে। বিধাতা প্রদত্ত নানাবিধ দিক-নির্দেশনা মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। বস্তুত জগতের সকল কাজই আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তীত। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম ও প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

"... জেনে রেখ যে, পরিশেষে সকল কর্মের পরিণামই আল্লাহ অভিমূখীন।" (আল-কোরআন ৪২:৫৩)

"... ভগবানই লক্ষ্য।" (গীতা ৯:১৮)

"... তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানের বিষয় এবং তিনিই জ্ঞানের লক্ষ্য।" (গীতা ১৩:১৮)

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোরআন কোন বিজ্ঞান বই নয় [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। এটি পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতি বা হিসাব বিজ্ঞানের ওপর লিখিত বিস্তারিত কোন গ্রন্থও নয়। এর বিষয়বস্তুসমুহকে সেভাবে প্রমাণ করতে চাওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কাজ নয়। তবে এটি এমন এক গ্রন্থ যা বিবিধ বিষয়ের মূল নীতিগুলির ওপর ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা তুলে ধরে। পথ প্রদর্শন করে। তাই সূরার শুরুতেই একে দিক-নির্দেশনা বা পথ-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ বলা হয়েছে। সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই যে বিষয়গুলিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে সেসব বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে এ গ্রন্থ। যা পালিত না হলে কোন কর্মই ফল দেবে না। পৃথিবী বর্তমানে যেখানে দাড়িয়ে আছে তার শুরু এসব দিক-নির্দেশনা থেকে। বলা হচ্ছে,

"গ্রন্থ লিপিবদ্ধকরণে কোন বিষয়কেই আমি উপেক্ষা করিনি।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

"কোরআন মানব সম্প্রদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত, দিক-নির্দেশনা ও অনুগ্রহ তাদের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী বা জ্ঞানসম্পন্ন।" (আল-কোরআন ৪৫:২০)

বস্তুত মানুষকে জ্ঞান-গবেষনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা তার কাজ করে নিতে হবে। সব আল্লাহ করে দিলে মানুষের কাজ করার প্রয়োজন ছিল না। আবার মানুষের অস্তিত্বেরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন তিনি এতসব আয়োজন করেছেন সেটি তিনিই ভাল জানেন। কেউ প্রয়োজন ছাড়া অতিরঞ্জিত কিছু ভাবতে চাইলে ভাববার স্বাধীনতা আছে। তবে তাতে কি আদৌ কোন ফল লাভ আছে? সেটিও ভাববার আছে।

মানুষের জ্ঞান-গবেষনা ও প্রচেষ্টা এগুলি সে প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়েও আল্লাহ জগত পরিচালনা করেন। তাই মানুষকে কিছু কাজ করতে হবে। বিশেষত যা যা করতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনার ফলস্বরূপ পাঠ্যপুস্তকে আজ যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে মানুষের জন্য সেসবই বর্তমানে অনুসরণীয় ও করণীয়। এটিই সত্য। কোরআন সেভাবে কাজ করতেই নির্দেশ করে। কোরআন যেসব বিষয়ে মানুষকে অনুসন্ধানে অনুপ্রাণীত করেছে, বৈজ্ঞানিক গবেষনা বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সে কাজসমুহ করে চলেছে।

একসময় উপাসনাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। তাই উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বারবার বলা হয়েছে। তেমনি কোরআনে আরও যেসব দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেসবেরও একসময় প্রাতিষ্ঠানিক কোন ভিত্তি ছিল না বা প্রতিষ্ঠা পায়নি। বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রকারের কাজসমুহ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেছে। বিবিধ দিক-নির্দেশনাকে অনুসরণ করে জগত এ পর্যায়ে এসেছে। সকল কাজ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত। বুঝতে হবে যে, সকল কাজই উপাসনার অন্তর্ভূক্ত যদি না সেটি মন্দ বা অশ্লিল হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়েছে,

"... মানুষ তার নিজ কর্তব্য পালন করার মধ্য দিয়েও ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৬)

আল্লাহর পরিচালন প্রক্রিয়া অত্যান্ত সূক্ষ, কারুকার্যময় ও নিখুঁত! কিছু কাজ মানুষকে করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যা মানুষকে করতে হবে।

মানুষ করে কি-না তিনি সেটি দেখেন। এটি একটি পরীক্ষা। কিছু কাজের নির্দেশনা অন্তর্গ্রথিত। মানুষ তা করতে বাধ্য। যেমন খাদ্য গ্রহণ করে, প্রজনন করে ইত্যাদি। সময়, পরিবেশ ও নানান শর্ত সাপেক্ষে নিজ প্রয়োজনে মানুষ তা করে। কিন্তু তাতেই মানুষের অলক্ষে-অজান্তে কোন বৃহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। যেমন, নিজ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একজন পরিবেশ নষ্ট করে, ক্ষুদ্র পোকা আবার সেটি নিজ প্রয়োজনে মহা আনন্দে গ্রহণ করে এবং উপভোগও করে তাতেই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর পরিচালন প্রক্রিয়া অত্যান্ত সূক্ষ, কারুকাজপূর্ণ ও নিখুঁত! মানুষকে গবেষনা করে বিষয়গুলি খুঁজে বেড় করে আনতে হবে, বুঝতে হবে এবং নিজেদেরকেও সেভাবে চলতে ও চালাতে জানতে হবে। এসবই যথাযথ দিক-নির্দেশনা। এভাবেই তিনি মানুষকে অনুপ্রানীত করেন ও নির্দেশনা দেন। বলা হচ্ছে,

"তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে কেন তোমরা তা উপলব্ধি কর না?" (আল-কোরআন ৫৬:৬২)

উল্লেখ্য যে, সৃষ্টির বিষয়ে বাইবেলের শুরুতে ধারাবাহিকভাবে একটি ছোট্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গড প্রথমে কি সৃষ্টি করেছেন তারপর কোনটি, তারপর কোনটি .. এভাবে। এগুলিও ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানুষকে বিষয়সমুহ নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। এসব বাণীসমুহকে বিশ্বাস করে নিতে হবে। সত্য হিসেবে ধরে নিতে হবে। একই সাথে মানুষকে এসবের সত্যাসত্য অনুসন্ধানও করে যেতে হবে। সত্য হিসেবে ধরে না নিলে বা বিশ্বাস না করলে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। মানুষকে সত্যের সন্ধান করতে হবে। বর্তমান সময়ে সেটি করতে হবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। সে জন্যই এত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষনা-আলোচনা ইত্যাদি। এ সবই মানুষের কাজ ও দায়িত্ব। কোরআন মানুষকে সে দিক-নির্দেশনাই প্রদান করে।

বাইবেলে উদ্ধৃত বিষয়গুলি সম্পর্কে সত্যি বলতে মানুষের নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে গড ছয় দিনে সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেন। কোরআনেও স্বীকৃতি দিয়ে সে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই। মানুষ কেবল অনুমানভিত্তিক বক্তব্য দিতে পারে। তাই বিষয়গুলি বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ওপর ছেড়ে দেয়া উত্তম। কিন্তু কিছু

মানুষ বাইবেল সঠিক নাকি কোরআন সঠিক সেটি নিয়ে বিতর্কে ব্যাস্ত। জ্ঞান-গবেষনার ভিত্তি ছাড়া এভাবে তর্কে জিতে কি অর্জন হবে?

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমন্ডলের প্রতি।' বিষয়গুলি বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ওপর ছেড়ে দেয়া উত্তম। অনুমানভিত্তিক কথা না বলা শ্রেয়।

'এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে।' যার শাব্দিক অর্থ সাতটি আকাশ বা আকাশমন্ডলি। এমনিভাবে কোরআনে সময়ের ব্যাপ্তি বা সংখ্যাবাচক আলোচনায় 'পঞ্চাশ হাজার বছর' কিংবা বলা হয়েছে 'সত্তুর বারও যদি ক্ষমা প্রার্থনা কর' ইত্যাদি। উদ্ধৃত এসব সংখ্যাকে হুবহু পরিমান বা পরিমাপ হিসেবে ধরে না নেয়া শ্রেয়। কোরআনে উল্লেখিত সাত, সত্তর, পঞ্চাশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলিকে বিশেষত যখন সেগুলি সৃষ্টি কিংবা মাহাসৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে হয়ে থাকে তখন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক হিসেব হিসেবে না ভেবে সংখ্যার প্রাচূর্যতা হিসেবে বুঝে নেয়া শ্রেয়।

বিষয়গুলি আবার আপেক্ষিকও। যেমন বাইবেল বা কোরআনে উদ্ধৃত এক একটি দিন কোন গ্রহের বা অবস্থানের ভিত্তিতে বলা হয়েছে মানুষ সেটিও নিশ্চিতভাবে জানে না। সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির বিষয়ে বাইবেল বা কোরআনে উল্লেখিত এক একটি দিন পার্থিব দিনের সমান নয়। গীতায় যেমন সংখ্যা উল্লেখ না করে 'সহস্র বছর' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলি সংখ্যার প্রচুর্যতা প্রকাশ করে। তবে বিষয়গুলির সন্ধান বা অনুসন্ধান বিজ্ঞানের ওপর ছেড়ে দেয়াই যথাযথ এবং এসব বিষয়ে অতি দৃঢ়তার সাথে কল্প বা অনুমানভিত্তিক কথা না বলা শ্রেয়।

▪ **২.২৯.৪** তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত (And He is knower of all things) : যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকে জানেন। সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে জানেন। এটিই স্বাভাবিক।

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তা জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৬৭:১৪)

যেহেতু আল্লাহই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা এবং বিশ্বাসীরা তাই বিশ্বাস করে, অতএব তারা বিশ্বাস করে যে তিনি সকল বিষয়ই জানেন। সকল বিষয়ের

ভেতরের গোপন রহস্য তাঁরই জানা। আবার তিনি তাঁর সৃষ্টির বর্তমান প্রতিটি মূহূর্তকেও জানেন। সেভাবেই তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম সাঁজিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে,

“ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।” (আল-কোরআন ৩:৫)

“... পালনকর্তা প্রত্যেকটি বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন।” (আল-কোরআন ৬:৮০)

“তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে প্রত্যেকের অগ্রে ও পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তার তত্ত্বাবধান, অনুসরণ বা প্রহরায় নিয়েজিত।” (আল-কোরআন ১৩:১১)

“নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রাখেন।” (আল-কোরআন ৪:১২৬)

“হে ভগবান! তুমিই আদি কারণ। তুমি সব জান এবং জানার সকল বিষয়ই তুমি। ... এই সমগ্র সৃষ্টি তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত।” (গীতা ১১:৩৮)

বর্তমানে মানুষও নিজেদের সৃষ্টির ভেতরের ও বর্তমান অবস্থাকে জানার সক্ষমতা অর্জন করতে শিখেছে। মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক অগ্রগতি যা আল্লাহরই অনুমোদন সাপেক্ষ বিষয় এবং সৃষ্টিজগত তথা আল্লাহর তাবৎ সৃষ্টিও তাঁকে বুঝতে সহায়তা করে। মানুষকে তিনিই সে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি অতুলনীয়। তথাপি বোঝার সুবিধার জন্য কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে হয়।

আল্লাহর কোন কিছুই সীমাবদ্ধ নয় বরং অসীম! জানার বহুবিধ প্রক্রিয়া আছে। অনেক বিষয় হয়তবা মানুষ আজও জানে না। তবে সকল বিষয়ে আরও গভীরের জ্ঞান অনুসন্ধানের কাজটি বিজ্ঞানের [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। এটি কোরআনের পথ-নির্দেশনার ব্যাতিক্রম নয়। এটি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকে জানার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষ আল্লাহকে একটু একটু করে চেনে, জানে [নিজেকে জানা দ্রষ্টব্য ২.২৯.২]। নিজেকে বুঝে। বিজ্ঞানের সকল শাখাসমুহ বস্তুত অল্লাহ-তায়ালারই কর্ম ও গুণাগুণের পরিচয় তুলে ধরে। এটি স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, কোরআন কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়;

না বিজ্ঞান কোন বিচ্ছিন্ন বিষয়। সবই মানুষ ও সৃষ্টিজগতের কর্মকান্ড তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ যা জানে আল্লাহ তা অবগত [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। কেননা তিনি তাদের সাথেই আছেন। তাদের মধ্য দিয়েও তিনি জানেন। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র যত প্রাণী আছে তারা প্রকৃতির যে রূপ-রস-গন্ধ দেখে-শুনে তাদের সবই তিনি অবগত। সবাই তাঁর বাহক। তাঁর কর্মে রত। তাঁর জানা ও জ্ঞানের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষ পুরোপুরি অবগত নয়। আজ যতটুকু অবগত এক সময় সেগুলিও মানুষের ধারণার অতীত ছিল। ফলে তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত- এটি ধরে নেয়ায় কোন অযৌক্তিকতা নেই। আজ যা জানা নেই একদিন সেসবও জানা সম্ভব হবে। যা যৌক্তিক তাতে বিশ্বাস রাখাও যৌক্তিক।

এক থেকে বিশ পর্যন্ত আয়াতে মানুষের তিনটি ধরণ যথা বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও হঠকারদের সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসী তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তায় আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। অবিশ্বাসী সে বার্তা বিশ্বাস করে না বা অস্বীকার করে। হঠকার বিশ্বাসের ভান করে কিন্তু অন্তরে সত্যিকার বিশ্বাস রাখে না। বিশ্বাসীদের জন্য এরা অবিশ্বাসীদের চেয়েও ক্ষতিকর।

আয়াত নং একুশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা সেই মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত বার্তা বা পথ-নির্দেশনায় সকল মানুষকে সত্যিকার অন্তর নিয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহবান করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। তাঁর সমকক্ষ কোন কিছু সাব্যস্ত করতে বারণ করা হয়েছে।

কোরআন প্রদর্শিত পথ-নির্দেশনার অনুসরণ ইহকাল ও পরকালে মানুষকে সুখ-শান্তি ও সাফল্য এনে দিতে পারে। কোরআন তেমন দর্শন বা পথ প্রদর্শন করেছে। অতঃপর এটি বোধসম্পন্ন মানুষদের নিজেদেরই বিচার্য্য বিষয় যে, তারা সেটি গ্রহণ করবে কি করবে না।

কোরআন মানবজাতিকে কোন পথ প্রদর্শন করেছে সেটি সমগ্র আলোচনা থেকে মানুষ বুঝতে পারবে। এখানে সে পথে চলার বিষয়ে সহায়ক কিছু ধারণা, শর্ত, যৌক্তিকতার বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৩০-৩৯) আদম ও তাঁর স্ত্রী (Adam and His Wife) তথা মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত ঘটনাটি এ পর্যায়ে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহতে তথা তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় সমর্পনের পথই হচ্ছে মানবজাতির জন্য চলার যথাযথ পথ। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে যেমন সেটি তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি তাঁর নির্দেশনার অমান্যতার পরিণামও উঠে এসেছে।

৩০	যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন: নিশ্চয়ই! আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি। তারা বলল: আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার মহিমা বর্ণনা করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করি। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই! আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (And when thy Lord said unto the angels: Lo! I am about to place a viceroy in the earth, they said: Wilt thou place therein one who will do harm therein and will shed blood, while we, we hymn Thy praise and sanctify Thee? He said: Surely I know that which ye know not.)
৩১	তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন এবং এই বলে ফেরেশতাদের সম্মুখে সেসব উপস্থাপন করলেন: যদি তোমরা সত্যবাদী হও (অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাতজনিত তোমাদের ওপরোক্ত ধারণা যদি সত্য হয়) তবে এসবের নাম বল। (And He taught Adam all the names, then showed them to the angels, saying: Inform Me of the names of these, if ye are truthful.)
৩২	তারা বলল: আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাতিত আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই! আপনি, কেবল

	আপনিই সবজান্তা, জ্ঞানসম্পন্ন। (They said: Be glorified! We have no knowledge saving that which Thou hast taught us. Lo! Thou, only Thou, art the Knower, the Wise.)
৩৩	তিনি বললেন: হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও। যখন সে তাদের এসবের নাম জানিয়ে দিল, তিনি বললেন: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত? এবং আমি সে সব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। (He said: O Adam! Inform them of their names, and when he had informed them of their names, He said: Did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth? And I know that which ye disclose and which ye hide. He said: O Adam! Inform them of their names, and when he had informed them of their names, He said: Did I not tell you that I know the secret of the heavens and the earth? And I know that which ye disclose and which ye hide.)
৩৪	যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম: আদমকে সেজদা কর, ইবলীস ব্যাতিত সকলেই সেজদা করল। সে অহংকার প্রদর্শন করে সেজদা করতে অস্বীকার করল এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (And when We said unto the angels: Prostrate yourselves before Adam, they fell prostrate, all save Iblis. He demurred through pride, and so became a disbeliever.)
৩৫	আমি বললাম: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উদ্যানে বসবাস কর এবং তোমরা যা খেতে ইচ্ছে করে তাই খাও, তবে এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, তাতে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (And We said: O Adam! Dwell thou and thy wife in the Garden, and eat ye freely (of the fruits) thereof where ye will; but come not nigh this tree lest ye become wrong-

	doers.)
৩৬	কিন্তু তারা যে (সুখী) অবস্থায় ছিল শয়তান ওখান থেকে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিল। আমি বললাম: নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু! কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা থাকবে। (But Satan caused them to deflect there from and expelled them from the (happy) state in which they were; and We said: Fall down, one of you a foe unto the other! There shall be for you on earth a habitation and provision for a time.)
৩৭	অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার নিকট থেকে কিছু প্রত্যাদেশ গ্রহণ করল এবং তিনি তার প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হলেন। নিশ্চয়ই! তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (Then Adam received from his Lord words (of revelation), and He relented toward him. Lo! He is the relenting, the Merciful.)
৩৮	আমি বললাম: এখান থেকে তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (We said: Go down, all of you, from hence; but verily there cometh unto you from Me a guidance; and whoso followeth My guidance, there shall no fear come upon them neither shall they grieve.)
৩৯	কিন্তু যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করবে তারাই হবে অগ্নির প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে। (But they who disbelieve, and deny Our revelations, such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.)

■ বিশ্লেষণ পূর্ব কিছু কথা : সত্য হচ্ছে, মানব থেকে শুরু করে সকল প্রাণী এবং এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্য আজও কেউ জানে না। সৃষ্টি সম্পর্কিত এটি একটি বহুল প্রচলিত ধারণা। মানব সৃষ্টি বা আদম–হাওয়া সম্পর্কিত এ ঘটনাটি বস্তুত বাইবেলে বিবৃত হয়েছে। কোরআনে সূরা বাকারার আয়াত নং ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ নং আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, যুগে যুগে আল্লাহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে একই বার্তা প্রেরণ করেছেন। কোরআন ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর প্রেরীত বার্তা। যা ক্রমশ অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে অনেক বার্তা আছে যা বাইবেল থেকে আগত বা বাইবেলে বর্ণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (হে মোহাম্মদ) সত্যসহ, যা স্বীকৃতি দেয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের, যেমন তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ঈঞ্জিল।" (আল–কোরআন ৩:৩)

উল্লেখ্য যে, তাওরাত (ওল্ড টেষ্টামেন্ট) ও ঈঞ্জিল (নিউ টেষ্টামেন্ট) দুটোই বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থ। বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৬৯টি। বলা হচ্ছে, কোরআন পূর্বের গ্রন্থসমুহকে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ এ গ্রন্থসমুহ আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন সেটিকে স্বীকার করে এবং সকলকে সেটি বিশ্বাস করতেও বলে। ঐ সকল গ্রন্থের বিবৃতিসমুহ তাই কোরআনে বিশ্বাসীদের জন্যও সত্যরূপে বিশ্বাসযোগ্য। তবে সেসব গ্রন্থে যা কিছু বিকৃত হয়েছে তা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান কোরআন পূর্বের গ্রন্থসমুহের ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই বাইবেলে সৃষ্টি সম্পর্কিত যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে কোরআনেও সেটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

"... আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি ধারাবাহিক (ক্রমশ) অবতীর্ণ বাণীর অংশরূপে।" (আল–কোরআন ১৭:১০৬)

মানুষ চাইলে সৃষ্টি বা আদম–হাওয়া সম্পর্কিত এ ঘটনাটিকে বিশ্বাস করতে পারে। আবার কেউ বিশ্বাস নাও করতে পারে। কেননা মানুষ সব কিছুর যৌক্তিকতা ও প্রমাণ খুঁজে পেতে চায়। মানুষ সম্পর্কে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আমি কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার উপমা উপস্থাপন করেছি। কিন্তু মানুষ সবকিছুর চেয়েই অধিক বিতর্কপ্রিয় বা যুক্তিবাদী।" (আল-কোরআন ১৮:৫৪)

মানুষ চাইলে বর্ণিত ঘটনাটি বিশ্বাস করতে পারে। আবার কেউ বিশ্বাস নাও করতে পারে কিংবা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে পারে [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। তবে বিজ্ঞানও এখন পর্যন্ত সৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত সত্য জানতে পারেনি। সেখানেও কিছু ধারণা প্রচলিত আছে মাত্র। সেসব ধারণাও আবার সৃষ্টির প্রক্রিয়াগত বিষয়ে; সৃষ্টির কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নয়।

যেমন বলা যায়, বিবর্তনবাদে সৃষ্টির রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়া বর্ণীত হয়েছে মাত্র। যেভাবে মানুষ আজকের পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি ও তার কারণ নেই। কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। কেউ নিশ্চিত কিছু জানে না। এমন কি বিজ্ঞানও নয়। সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের তুলে ধরা ধারণা অসম্পূর্ণ। তবে হ্যা, সৃষ্টির সামান্য একটু অংশের বা একটি অধ্যায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তুলে ধরে যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

বলা হচ্ছে, আল্লাহ আদমকে বললেন 'নেমে যাও' (২:৩৮)। তার নেমে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো মানুষ জানে না। প্রথম প্রশ্ন- এই নেমে যাওয়া কি পৃথিবীর কোন উচ্চ স্থান হতে নিম্ন স্থানে নেমে যাওয়া? কেননা বাইবেলে বলা হয়েছে, আদম হাওয়া যে উদ্যানে ছিল তার দু'পাশে প্রবাহিত হয়ে গেছে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী। যা ইরাক, তুরস্ক ও সিরিয়া দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ধরে নেয়া যায় যে তারা পৃথিবীতেই অবস্থান করছিল।

এমনও হতে পারে যে, তারা অন্য কোন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে। যদি অন্য গ্রহ থেকে নেমে আসে, তবে নেমে আসার প্রক্রিয়াটি কি ছিল? তারা কি নভোচারীদের মতো মহাকাশযানে নেমে এসেছে?

বাইবেলে আল্লাহ বা গড এর এমনিভাবে নেমে আসার একটি বর্ণনা আছে। "চারিদিক তখন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তুর পর্বত কাঁপতে থাকে। ইসরাইলের সন্তানেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারা দূর থেকে অবলোকন করে।" [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]।

এমনও হতে পারে যে, পৃথিবীর জলাধারে আদমের বীজ ফেলে দেয়া হয়। অতঃপর বিবর্তনবাদের সূত্র ধরে মানুষ আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তেমন হলে বিবর্তনবাদের সাথে কোরআনের বক্তব্যের কোন বিরোধ থাকার কথা নয়। বিবর্তনবাদ একটি প্রক্রিয়ার কিছু অংশ প্রকাশ করে মাত্র। সত্য হচ্ছে, মানুষ আজও সত্য জানে না।

কোরআনে আদম-হাওয়ার ঘটনাটি পাঠ করার সময় পাঠকের মনে হতে পারে যেন সমস্ত ঘটনাসমুহ মূহুর্তে ঘটে গেছে। বিষয়টি তেমন নাও হতে পারে। আবার হতেও পারে। যদি আল্লাহর দিক থেকে ভাবা হয় তবে মূহুর্তে হতে পারে। কিন্তু যদি মানবীয় হিসেবে বিষয়টিকে ধরা হয় তবে মিলিয়ন মিলিয়ন কিংবা বিলিয়ন বছরও পার হয়ে যেতে পারে। কেননা আল্লাহর হিসেবের একদিন মানবীয় হিসেবে হাজার হাজার বছরের সমান! যেমন বলা হয়েছে,

"... তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭)

"মানবীয় হিসেবে হাজার হাজার বছরে ব্রহ্মার একদিন এবং তাঁর রাতের সময়ের হিসেবও তেমনি।" (গীতা ৮:১৭)

বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন' (২:৩১)। মস্তিষ্কে একটি মেমোরী প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহতা'য়ালা মূহুর্তে কাজটি সম্পন্ন করে দিতে পারেন। যেমন কম্পিউটারে আমরা নানান প্রোগ্রাম ইনস্টল করি। আবার তিনি আদমকে সব শিখে আসার জন্য এ জগতে প্রেরণ করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে মানবীয় হিসেবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর শুধু এই একটি কাজ সম্পন্ন হতে অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। সত্য হচ্ছে মানুষ সত্যটি জানে না।

আল্লাহ নিজেই মানুষকে সৃষ্টির বিষয়সমুহ অবগত করেননি। ফলে মানুষ এসব বিষয়ে কিছুই জানে না। এমনকি দেবতা বা ফেরেশতারাও জানেনা। তাই ফেরেশতারা বলেছে,

"আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাতিত আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই! আপনি, কেবল আপনিই সবজান্তা, জ্ঞানসম্পন্ন।" (আল-কোরআন ২:৩২)

গীতায় বলা হয়েছে, “না দেবতারা আমার উৎস সম্পর্কে জানে, না মহর্ষিগণ। কেননা সর্বতোভাবেই আমি দেবতা ও মহর্ষিগণেরও আদি কারণ।” (গীতা ১০:২)

মানুষ না জেনেও অনেক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এসব বিষয়ে মানুষের ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-গবেষনা বা লেখালেখির যেন অন্ত নেই। বলা হচ্ছে,

“এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে অনুমানের এবং অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।” (আল-কোরআন ৫৩:২৮)

যেসব বিষয়ে মানুষের যথার্থ জ্ঞান নেই, তেমন সব বিষয় নিয়েও মানুষ অনুমানভিত্তিক অনেক কথা বলে বা কাজ করে। বস্তুত অনুমান আর সত্য এক নয়। অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।

সত্যের সন্ধানে এবং শৃংখলার প্রয়োজনে অজানা বিষয়ের ক্ষেত্রেও একটি নিয়ম বা পথ বেছে নিয়ে এগুতে হয়। ফলে কিছু মানুষ আদম-হাওয়া সম্পর্কিত উদ্ধৃত ঘটনাটির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে। এ বিশ্বাস মনের মধ্যে জন্ম নেয়া অনেক অজানা প্রশ্নের বিষয়ে প্রশান্তি এনে দিতে পারে। সমাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মানব মন নিশ্চিতভাবে সত্য জানার পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

কিছু অনুসন্ধিৎসু মানুষ বিজ্ঞানকে অনুসরণ করবে এটিও সত্য এবং তাতে দোষের কিছু নেই [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]। কোরআন মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে অনুপ্রানীত করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা আল্লাহকে নিয়ে ভাবনারই নামান্তর। এটি এবাদতেরই অংশ! মানুষ এত ক্ষুদ্র যে আল্লাহর জ্ঞান একবারে ধারণ করার বা বোঝার ক্ষমতা রাখে না। যেমন মানবদেহে বিরাজমান কোন জীবানু মানব সম্পর্কে হয়তবা পূর্ণাঙ্গ ধারণা রাখে না। সমগ্র সৃষ্টিকেই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জেনে-বুঝে তাঁকে জানার চেষ্টা করতে হয়। বলা হচ্ছে,

“নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে রাখেন।’ (আল-কোরআন ৪:১২৬)

“ভগবান! ... যদিও তিনি তাঁর ধামে বর্তমান, তথাপি তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সবকিছু তাঁর মধ্যেই স্থিত।’ (গীতা ৮:২২)

পরিবেষ্টনকারীর অভ্যন্তরে কোন কিছুর সন্ধান করা তাঁকে অনুসন্ধানেরই নামান্তর। তাঁকেই জানা ও বোঝার চেষ্টা করা। বিশ্বাসীরা যদি ওপরোক্ত ঘটনাটিকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে, তবে বিজ্ঞান একদিন সত্যকে সত্যরূপেই তুলে নিয়ে আসবে সে বিশ্বাসও রাখতে হবে। কেননা সত্যিকার অনুসন্ধানের কাজ বিজ্ঞানই করে। অন্য কেউ নয়। সবাই করে অনুমান। অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না। তবে আসমানী গ্রন্থসমুহ মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন পথে যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে, কি করতে হবে ইত্যাদি। তাই এগুলি দিক-নির্দেশনা (Guidance) বা পথ প্রদর্শকমূলক গ্রন্থ।

জগতের সকল কাজই আল্লাহর। বিজ্ঞান আল্লাহ বা সত্যের সন্ধান থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। সত্যকে জানার জন্য বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মাত্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা আল্লাহর এবাদতেরই অংশ [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। এ বিষয়ে ভূল বোঝার বা বোঝাবার কোন অবকাশ নেই। বলা হচ্ছে,

“নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের পার্থক্যে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা ও গবেষণা করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে এবং বলে: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল মহিমা তোমারই!” (আল-কোরআন ৩:১৯০-১৯১)

প্রসঙ্গক্রমে কিছু অতিরঞ্জিত আলোচনা করে রাখি যা উল্লেখিত বক্তব্য অনুধাবনে সহায়ক হতে পারে। উপাসনা বা এবাদতের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি করি [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]? আল্লাহর কাছে যাচ্ঞা করি। প্রার্থনা বা কোন কিছু কামনা করি। আবার তাঁর গুণগান করি বা তাঁর মহাত্ব তুলে ধরি।

মানুষ যেমন প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য কিছু চায়। তেমনি মানব অন্তরের এটিও একটি গভীর ও নিরব আকুতি যে সে আল্লাহকে

জানতে, দেখতে ও বুঝতে চায়। কিছু কামনা করা, প্রত্যাশা করা বা এই চাওয়াই প্রার্থনা। ইব্রাহীম (আঃ) প্রাণ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছেন, মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছেন, গীতায় অর্জুন ভগবানকে দেখতে চেয়েছেন। দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী গ্রন্থসমূহে এসব বিষয়ে ইংগিত রয়েছে।

মানুষ তার হাঁটা-চলার সময় মনে মনে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে পারে। ঘুমুতে যাওয়ার সময় চাইতে পারে। আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন সুনির্ধারিত সময় নেই। কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই। বান্দা যখন-তখন তাঁর কাছে চাইতে পারে। তিনি সর্বদা সজাগ! সচেতন!

তবে কি প্রার্থনা বা উপাসনার জন্য নির্ধারিত নিয়মের প্রয়োজন নেই? যা সকল ধর্মের মানুষই অনুসরণ করি?

আল্লাহ মানুষকে কোরআনের মাধ্যমে পথ প্রদর্শন করেছেন এক নিয়মমাফিক ও সুশৃংখল জীবনের প্রয়োজনে। মানুষ আল্লাহর কাছে যে কোন সময় চাইতে বা প্রার্থনা করতে পারে। আবার কেউ তো নাও চাইতে পারে। কেউ তো ভূলেও যেতে পারে। কেউ তো নির্দেশনা অমান্য করতে পারে। নিয়মমাফিক উপাসনা একটি নিয়মকে ধরে রাখার জন্য অপরিহার্য্য। তাই প্রাতিষ্ঠানিক বা নিয়মমাফিক উপাসনারও প্রয়োজন আছে। এটি আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে ছিন্ন হতে দেয় না বা সে সুযোগ সৃষ্টি হতে দেয় না। নিয়মিত তাঁকে স্মরণের মধ্যে রাখে। মানুষের মধ্যে একটি দল এ কাজে সব সময়ই নিষ্ঠাবান থাকে। যারা উদাসীন থাকে কখনও তারাও নিয়মানুবর্তীতায় ফিরে আসে।

ঐচ্ছিক প্রার্থনা ব্যাক্তির ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্ধারিত উপাসনা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যা জগতব্যাপি সকলের মাঝে নিয়মকে প্রতির্ষ্ঠিত রাখে। এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। তাই উপাসনাকে প্রাতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটিকে একটি প্রাতির্ষ্ঠানিক রূপ দিতে বলা হয়েছে। তা না হলে জাগতিক অনেক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বে। এক সময় মানুষ নিয়মও ভূলে যাবে। এক সময় মানুষ খাম-খেয়ালিপনার অনুসরণ করবে। সামাজিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। মানুষ আল্লাহকে ভূলে যাবে। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়বে যা কিনা সকল সম্পর্কের ভিত্তি [দ্রষ্টব্য ২.২৭]। এ সম্পর্কই জগতকে সচল রাখে যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর

শন্তি ও শৃংখলার প্রয়োজনে নিয়মমাফিক কিছু নিয়ম তাই অবশ্যই পালন করে যেতে হবে। আদর্শগতভাবে এক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই।

যারা জীবন ও জগত নিয়ে ভাবে- গবেষনা করে, অর্থাৎ গবেষক, বৈজ্ঞানিক বা আবিস্কারক তাদের অন্তরেও অনেক চাওয়া থাকে। যার সামাধানের পথ তারা সন্ধান করে। তারা সত্যের সন্ধান করে। আল্লাহই একমাত্র চরম সত্য। অতএব তারা যা করে তা বিধাতার সন্ধান ভিন্ন আর কিছু নয়। যদিও তাদের অনেকে বিষয়গুলিকে সেভাবে বোঝে না। তাদের এসকল কর্ম তাদের অন্তর্জনিত আঁকুতি বা প্রার্থনা থেকে উৎসারিত হয়। কাজগুলি এবাদতেরই অংশ [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]।

গবেষনার মাধ্যমে গবেষক যে সত্য বেড় করে নিয়ে আসে সেটিই আল্লাহর মহাত্বকে বুঝতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হয়ে কাজ করে। অপরাপররা সত্য বিষয়ে গবেষকদের আবিস্কৃত বিষয়ে মুগ্ধ হয়েই মহান আল্লাহর সৃষ্টি তথা স্বয়ং আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যায়। বিজ্ঞানী বা গবেষকদের কর্ম-প্রচেষ্টা ভিন্ন মানুষ আল্লাহর এত এত প্রশংসা করার নব নব পথও খুঁজে পেত না। সে পথ গবেষক বের করে আনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের কাজ এবাদতেরই অংশ। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত। তারাই মহান আল্লাহকে সাধারণের কাছে মহানে রূপান্তরীত করে দেয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে। তাই সাধারণেরা আল্লাহর প্রসংশায় এত পঞ্চমুখ হতে পারে!

গবেষনার কাজটি যেমন প্রার্থনার সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ এবাদতের অংশ, তেমনি এ থেকে প্রাপ্ত ফলও আল্লাহর মহাত্বেরই বর্ণনা! এটিও এবাদত। এবাদতের মধ্যে আমরা আল্লাহর মহাত্বই বর্ণনা করি। আল্লাহর প্রশংসা করি। এই হল ৩০ থেকে ৩৯ নং আয়াতের বিশ্লেষণ পূর্ব কিছু কথা।

▪ (আয়াত ২.৩০-২.৩৯) এটি একটি বহুল প্রচলিত ধারণা যে, আদম-হাওয়ার ঘটনাটির মধ্যে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে। বস্তুত আদম-হাওয়ার ঘটনাটির মধ্যে মানব সৃষ্টি কিংবা মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলা নেই। অর্থাৎ এর প্রক্রিয়াগত দিক নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। তবে মানব সৃষ্টির প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু বলা হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মানব সৃষ্টির বিষয়ে একটি ধারণার অবতারণা করে দেয়া হয়েছে মাত্র।

মনোনিবেশ সহকারে অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পরিচালনা বিষয়ে নিগুঢ় কিছু সূত্র বা তত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষকে পৃথিবীতে কিভাবে চলতে ও চালাতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান বা দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। আমাদের জগত পরিচালনাকারীরাও জগত পরিচালনায় এই একই সূত্রসমুহ ব্যাবহার করে থাকেন। বোধসম্পন্ন মানুষগণ নিশ্চয়ই বিষয়সমুহ লক্ষ্য করে থাকবেন!

মানব সৃষ্টি বা আদম-হাওয়া সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ঘটনাটির মধ্যে মানব সম্পদ ব্যাবস্থাপনা বা হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের নিগুঢ় তত্ব বিষয়ক মৌলিক জ্ঞানের কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যা আদি থেকে শিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে। এ বার্তা তাই মানবজাতির পরিচালনার জন্য পথ-প্রদর্শক হয়ে কাজ করে আসছে আদি থেকে।

বস্তুত মানব সম্পদের পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা কঠিন কাজ। আবার এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই জীবন ও জগতের জন্য। এ শ্রেষ্ঠ কাজটিরই দিক নির্দেশনা রয়েছে বর্ণিত এ ঘটনার মধ্যে।

কোন একটি পথ প্রদর্শিত না হলে মানুষ একটি কদমও চলতে পারে না। বিষয়টিকে সৃষ্টির অব্যাবহিত পরে প্রথম মানবের প্রথম পথ চলার সময়কে বিবেচনা করে ভাবতে হবে। অর্থাৎ প্রথম মানব সৃষ্টি হল। কিন্তু সে কি করবে? সে তো কিছুই জানে না। তার মস্তিষ্কে কিছুই নেই! অতঃপর তার ভেতরে ধীরে ধীরে সবকিছু ইনষ্টল করা হচ্ছে।

তাকে যা যা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ নির্দেশনা বা কমান্ড দেয়া হচ্ছে ঐটুকুই তার করণীয়। সেগুলিই তার পথ চলার প্রথম নির্দেশনা। তাকে উদ্যানে ঘুরে-ফিরে আহার করতে বলা হল (২:৩৫)। সে এতটুকু কাজ সম্পর্কে ধারণা পেল। চলতে শুরু করল। আদম প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে লাগল। আমাদের নিজেদের জীবনের শিশুকালকে অনুভবে এনে বিষয়গুলি অনুধাবন করা যেতে পারে।

বলা হচ্ছে, 'আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন' (২:৩১)। অর্থাৎ তাকে কিছু বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হল যা ফেরেশতাদেরকে শেখান হয়নি। এভাবে আদমের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেয়া হল। মানুষ ভুমিষ্ট হয়েও কিছুই জানে না। তাকে যা শেখানো হয় সে তাই শেখে। আদম অনেক কিছু শিখেছে যেরূপ

পরিস্থিতি সে মোকাবেলা করেছে সেখান থেকে। সব কিছুই কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি এমন নয় যে কোরআনে যেভাবে পাঠ করছি সব মূহূর্তেই ঘটে গেল। আবার হতেও পারে। মানুষ সৃষ্টির বিষয়ে কিছুই জানে না। কেননা তাকে জানান হয়নি। সব আল্লাহ জানেন।

ফেরেশতাদের বলা হল আদমকে সেজদা করতে (২:৩৪)। ইবলিস করল না। ঘটনাগুলি আদমের মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে গেল। এ ঘটনা নতুন অনুভূতি ও বোধের সৃষ্টি করল আদমের মধ্যে। নির্দেশনার অমান্যতা বিষয়ে জ্ঞান লাভ হল।

উদ্যানে আদমের একাকীত্ব আল্লাহর কাছে ভাল লাগছিল না (বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে)। তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন আদমের সঙ্গীরূপে। এটি আদমের চাওয়া ছিল না। সঙ্গিনী বিষয়ে আদমের কোন জ্ঞান থাকার কথা নয় এবং ছিলও না। কিন্তু লাভ করল। আরও একটি নতুন জ্ঞান লাভ করল আদম।

তারা উদ্যানে হেসে-খেলে বেড়ায়। আনন্দে দিন ও জীবন অতিবাহিত করে। বাড়তি আর কিছু করার নেই। কেননা জানা নেই। তাকে নিষেধ করা হল একটি গাছের ফল খেতে (২:৩৫)। সে শর্তের মুখোমুখী হল। তাকে সীমানা বেঁধে দেয়া হল। সে চলার পথের একটি সীমানা সম্পর্কে অবগত হল। করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে ধারণা লাভ হল।

ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি। আল্লাহর আদেশ সত্বেও সে আদমকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তৃতীয় শক্তি বা শত্রু বিষয়ে ধারণা লাভ হল। পক্ষ-বিপক্ষ বিষয়ে ধারণা প্রাপ্ত হল আদম। শত্রুর প্ররোচনাকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

"আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।" (আল-কোরআন ২০:১১৫)

আদম শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হল। ভূল কাজ করল। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল। তাকে জানান হল, 'তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু' (২:৩৬)। ভূল কাজের বা আল্লাহর আদেশ ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হতে থাকল। এ অবস্থায় কি করতে হবে? মুক্তির উপায় কি? জানা নেই।

আদম স্বীয় পালনকর্তার নিকট থেকে কিছু প্রত্যাদেশ গ্রহণ করল (২:৩৭)। ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ে অবগত হল। আদম ক্ষমা প্রার্থনা করল। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হলেন (২:৩৭)। মুক্তির উপায় বিষয়ে জ্ঞান লাভ হল!!

বলা হল, 'তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও।' আল্লাহর আদেশ অমান্যের পরিণতি জানা হল। বলা হল, '.. আমার পক্ষ থেকে .. পথ-নির্দেশনা আসবে' (২:৩৮)। যারা পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। 'অবিশ্বাসীরা .. সেখানেই বসবাস করবে' (২:৩৮)। একটি আপাত লক্ষ্য নির্ধারিত হল।

উল্লেখিত ঘটনাটি সম্পর্কে কম-বেশী সকলেই অবহিত। তাই একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি পরিহার করার জন্য বিষয়গুলিকে অতি বিশ্লেষন না করে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। এছাড়াও এর অধিক আলোচনা করা প্রয়োজনীয়ও বোধ হচ্ছে না। যা বলতে চাইছি বা যেভাবে বলতে চাইছি পাঠক যেন অন্তত ততটুকু বুঝে নিতে পারেন সেভাবে বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবের শুরু থেকে তার কর্মের পরিণতি ও পরবর্তী করণীয় সবকিছু এখানে বর্ণিত হয়েছে।

কোন দিক-নির্দেশনা যদি প্রথম মানবের মস্তিষ্কে প্রবেশ করান না হত, তবে মানুষ জগত কি তাই বুঝত না। একটি কদমও চলতে সক্ষম হত না। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বিষয়ে ধারণা লাভ করেছে। চলার একটি পথ, তার প্রতিবন্ধকতাসমুহ ও সেখান থেকে বের হয়ে আসার উপায় সম্পর্কে জেনেছে। আল্লাহর নির্দেশ, করণীয়-বর্জনীয়, আদেশ ভঙ্গের পরিণাম অতঃপর পরিত্রাণের উপায় জেনেছে। এটি কেবল একটি প্রেক্ষাপট কিংবা কেবল একটি গল্প বা ঘটনাই নয়, এটি একটি প্রোগ্রাম যা মানুষকে চালনা করে বা পথ চলতে দিক-নির্দেশনা দেয়। আল্লাহ চাইলে মস্তিষ্কে অন্যরকম প্রোগ্রামও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। যা মানুষের ধারণার বাইরে। তখন মানবজীবন হত অন্যরকম। যেমন বলা হয়েছে,

"যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।" (আল-কোরআন ১৪:১৯)

আধুনিক উন্নত মানুষের আজকের চলা প্রথম মানবের প্রথম পথ চলারই পরিবর্তীত রূপ মাত্র। আজও ঘুরে ফিরে সংক্ষেপে মানবজীবন এই একই ছকের বৃত্তে আবদ্ধ। তথাপি বৈচিত্র আছে। আছে নতুনত্ব! এমনই মহান আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টি! যেমন- সব নাটক-চলচ্চিত্রের মৌলিক ছকগুলি একইরকম; তবুও মানুষ নতুন সৃষ্টি উপভোগ করে। কখনই আবেদন ফুরিয়ে যায় না।

জটিল জাগতিক ব্যাবস্থাপনাকে কিভাবে চালনা করতে হবে সে বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ এ ঘটনায় তিনি সবকিছু কিভাবে পরিচালনা করেছেন সেটি লক্ষণীয়। আজও মানুষকে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ পথ বা সূত্রই অনুসরণ করে চলতে হয়। তাইতো বাইবেল-কোরআন বিবিধ অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহ মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশনা (Guidance)।

কোরআনের দর্শন বলছে, আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর কর্মী বাহিনী তথা ফেরেশতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। যদিও আল্লাহর জন্য আদৌ কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। তথাপি বিবৃতিটি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা, জ্ঞান ও দিক-নির্দেশনা দেয়।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ। প্রতিনিধির নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। তাকে যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয় সে গন্ডির মধ্যেই তাকে থাকতে হয়। এটিই নিয়ম। নইলে প্রতিনিধিত্ব থাকে না; কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। যা কিনা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনুমতি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সৃষ্টিকর্তার কর্তৃত্বকেই অস্বীকার করা হয়। এটিই সীমালংঘন, অবাধ্যতা। যা আল্লাহ সহ্য করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"সৃষ্টির পরিচালনায় বা কর্তৃত্বে অংশ নিতে তিনি তাঁর সঙ্গে কাউকেই অংশীদার করেন না।" (আল-কোরআন ১৮:২৬)

মানুষ নিজের পরিচালনার ক্ষেত্রেও কি তেমনটি মেনে নিতে পারে? আল্লাহর গুণই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জগৎ পরিচালনাকারী মানুষের ক্ষেত্রেও করণীয় কি? বিষয়গুলি গভীরভাবে ভাববার আছে।

আল্লাহ তাঁর বার্তা প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে পার্থিব জীবনে তার চলার পথের সীমানা, করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিয়েছেন। ইংগিত প্রদান করেছেন। বোধসম্পন্ন মানুষদেরকেই বিষয়গুলি বুঝে নিতে হবে। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে Guidance বা দিক-নির্দেশনা প্রদর্শিত পথ বুঝে চলা। সেটিই মঙ্গলজনক। সেটিই তার আপাত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

অতএব মানুষ তার নিজের ইচ্ছে মতো যা ইচ্ছে তা করতে পারে না। করতে পারে; সে স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। যা ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি। তবে তা অমঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। মানবজীবন তাই এক পরীক্ষা। যার ভাল-মন্দ পরিণতি আছে। যেটি এ ঘটনার মধ্য দিয়েও তুলে ধরা হয়েছে।

ওপরোক্ত কথার অর্থ এই নয় যে, সে কোন প্রকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক, কৃষ্টি-সভ্যতা বিষয়ক কোন কর্মকান্ড কিংবা নাচ-গান, নাটক-সিনেমা, ছবি আঁকা, যাত্রা, পালা গান, ভাস্কর্য তৈরী বা কোন প্রকার নান্দনিক বা সৌন্দর্যবোধ বা শিল্প রুচিসম্পন্ন কোন কাজ করতে পারবে না। বস্তুত এসবে কোন সমস্যা নেই। তাকে কেবল একটি সীমানার মধ্যে চলতে বলা হয়েছে। আর সে সীমানাও খুব জটিল কিছু নয়। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। মন্দ কর্ম ও পথ পরিহার করে চলা। যেমন বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদয়তার ... নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্ট প্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন।” (আল-কোরআন ১৬:৯০)

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও মন্দ কর্মের বিষয়টি যেহেতু এখানে উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে, তাই প্রসঙ্গক্রমে কিছু অপ্রাসঙ্গিক বা অতিরঞ্জিত কথা এ পর্যায়েই তুলে ধরতে চাই। কেননা কথাগুলি বলার আর সুযোগ নাও হতে পারে।

আল্লাহ বা কোরআনের নির্দেশনার ধারক-বাহকগণ সাংস্কৃতিক বা এ জাতীয় কর্মকান্ডের মধ্যে কেবল মন্দ কিছু দেখে বা খুঁজে পায় বা খুঁজে পেতে চায় সে কারণেই কথাগুলি বলে রাখা। কেননা বিষয়গুলি জগতকে বা মানবজাতিকে এক বিশাল জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তবে এ ফেলে দেয়ার পেছনে

মূলত মানুষ নিজেরাই দায়ী। ধর্ম বিষয়ে কিছু মানুষের উপলব্ধিবোধ ও পূর্বতনদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের প্রভাব এর পেছনে কাজ করে চলেছে। যদিও পূর্বতনেরা সময় ও পরিস্থিতি এবং তৎকালীন জ্ঞানের বিবেচনায় কাজ করেছেন।

বর্তমান সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তব ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উপনীত হওয়া এবং সে আলোকে বিষয়গুলিকে বোঝা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সত্য হচ্ছে, বাস্তব ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও সকল প্রকারের পবিত্রতা রক্ষা করে চলা সম্ভব। যে তা রক্ষা করে চলতে পারবে না সে কোন ক্ষেত্রেই পারবে না। সকল ক্ষেত্রেই সে নিয়ম ভঙ্গ করবে এবং বাস্তবে হচ্ছেও তাই।

সাংস্কৃতিক বা এ জাতীয় কর্মকান্ডের বিষয়টি এখানে কেবলি একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও এরকম আরও অনেক কর্মকান্ড আছে যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন বা ভূল ধারণা দুর করা প্রয়োজন। তবে সব তুলে ধরা এ পর্যায়ে অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

এটি সত্য যে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বলয়ের মধ্যে তথাকথিত মন্দকর্ম তুলনামূলকভাবে সহজে ঘটতে পারে। কেননা সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে। আবার এ অঙ্গনে ব্যাক্তিগত বা বলয়ের মধ্যে দলগতভাবেও নানা প্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থাকে। তাই সেখানে অনাকাংখিত কিছু ঘটার ঝুঁকি বা সুযোগ বেশী। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, সেখানেও যারা সচেতন ও দৃঢ়চিত্ত তারা ভালই থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোন বিষয়ে যথাযথভাবে জানা বা বোঝা যায় না। দুর থেকে কেবল অনুমান করা যায়, মুখরোচক আলোচনা করা যায় কিন্তু সত্যকে জানা যায় না। উপরন্তু যেখানে ঝুঁকি বেশী সেখানে ভাল থাকায় পুরস্কারও বেশী বিষয়টিকে সেভাবেও ভাবতে হবে।

ধর্মবোদ্ধাগণ সাধারণত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাটিকেই সবচেয়ে বেশী বড় বা কবীরা গুনাহ হিসেবে দেখে থাকেন ও সেভাবে বিষয়টিকে প্রচারও করেন এবং এ বিষয়ে তাদের কন্ঠ অধিকতর সোচ্চার। কেননা এ একটি বিষয়ে কথা বলা অধিক নিরাপদ ও জটিলতামুক্ত। সমাজের সহজ-সরল মানুষগুলো সহজেই বিষয়গুলিকে গ্রহণ বা স্বীকার করে নেয়। তাদের মন-

মানসিকতাকে সেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এসব বক্তব্যের বিপরীতে শক্ত কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। অথচ এর চেয়েও অধিক ও গুরুতর গুনাহর কাজ সমাজে চলছে যা কোরআনের দৃষ্টিতেও নিষিদ্ধ, সেসব নিয়ে কথা বললে বক্তাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখাও কঠিন হয়ে যাবে। সেখানে স্বার্থান্বেষী মহল আছে। যারা সকল পক্ষের পৃষ্ঠপোষক। সূদ খাচ্ছে, ঘুষ খাচ্ছে, দূর্নীতি করছে, খুন হচ্ছে, ধর্ষন হচ্ছে- কেউ কথা বলে না। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গন্ডির বাইরে কেউ কথা বলে না। অথচ ইসলাম তো তেমন দিক-নির্দেশনা দেয় না।

এবাদতে মশগুল থেকেও কি মানুষ মন্দ কর্ম করছে না? বা সেখানেও কি মন্দ কর্ম ঘটতে পারে না? হঠকারীতা হয় না? অনিয়মের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে বড় বড় গরু কোরবানী দেয়া হচ্ছে। এগুলি কি মন্দ কাজ নয়। তেমন কোরবানীর আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? মন্দ সবখানে হতে পারে। যে মন্দ কাজ করবে সে সর্বত্র করবে। মসজিদেও করবে। সেখানেও খুনের ঘটনা ঘটে। হিজাব পড়েও বেশ্যাবৃত্তি হয়। বেশ্যাবৃত্তি তত অপরাধ নয় যত অপরাধ সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে কিছু মানুষকে সে পথে ধাবিত করা। সেটিই বড় অপরাধ। কিন্তু সে বিষয়ে কেউ মুখ খুলে না। খুললেও খুলে লোক দেখানর জন্য দায় সাড়াভাবে।

যে ভাল থাকবে সে সর্বত্র সচেতন, দৃঢ়চিত্ত ও ভাল থাকবে। সর্বপ্রথম এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। অন্যথায় এক হিসেবে আমাদেরকে কেবল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বলয় নয় এ পৃথিবী ছেড়েই চলে যেতে হবে। কেননা পৃথিবীই মন্দ; এখানে মন্দ কাজ হয় বা করা সম্ভব। পবিত্রতা রক্ষার জন্য মহাশূন্যে পালিয়ে বেরাতে হবে।

পবিত্র ও দেহের ভেতরেও অপবিত্র বস্তু আছে। যেগুলিকে সাথে নিয়ে আমরা ঘুরে বেরাই। এবাদত করি। সেটিও বুঝতে হবে। তাকে দেহে রেখেই নিজেকে যথাসম্ভব ভালভাবে চলতে হবে। কোন অঙ্গকে কেটে ফেলে দেয়া যাবে না। যতক্ষণ মহান আল্লাহ সেটি অনুমোদন না করছেন।

ভাল পথে থাকার ভান করে মন্দ কাজ করা অধিক খারাপ। মিথ্যে বলা খারাপ, চুরি করা খারাপ, খুন করা খারাপ, ব্যাভিচার করা খারাপ, ধর্ষন করা খারাপ। প্রতিবেশী বা ভাল মানুষদের সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা খারাপ। অথচ মানুষ প্রতিনিয়ত এসব খারাপ কাজ করছে, নিজেকে সাচ্চা মুসলিম

হিসেবে সমাজে পরিচয় দিচ্ছে এবং নিয়মিত এবাদতও পালন করছে। এগুলি হঠকারীতার চরম পর্যায়!

সবচাইতে অধিক খারাপ অনেক মানুষের আমানতের অর্থ কেবলমাত্র গুটিকয়েক মানুষ ভোগ করা এবং অন্যদেরকে তার সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার থেকে কৌশলে বঞ্চিত করা। উপরের সকল মন্দ কাজের উৎস এটি।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, শেষের একটি কান্ডই অগনিত বা অধিক সংখ্যক মানুষকে একসাথে মন্দভাবে প্রভাবিত করে এবং শেষোক্ত মন্দ কাজটির প্রভাব ওপরোক্ত সকল মন্দ কাজগুলির গতিকে তরান্বিত করে।

প্রচলিত ধারণায় সমাজে নারীঘটিত বিষয়গুলিকে অধিক মন্দ হিসেবে প্রচার করা হয়। এটি তারাই করে যারা বহু মানুষের আমানতের অর্থের সবচেয়ে বেশী সুবিধাভোগী। তারা অনৈতিক উপায়ে উপার্জিত অর্থ-বিত্ত দিয়ে সকল প্রকারের সুবিধা ভোগ করে। নিজেরা অনৈতিক কাজও করে। আবার ক্ষুদ্র একটি নারীঘটিত বিষয় দ্বারা অন্যের চরিত্র হনন করে। বিশেষত প্রতিবাদী মানুষের মুখ বন্ধ করার সহজ উপায় হিসেবে এটিকে কাজে লাগায়। কেননা সাধারণ মানুষ এ বিষয়টিকেই অনেক বড় পাপ বা অন্যায়রূপে বিবেচনা করে। সামাজিক মানসিকতায় বিষয়টিকে সেভাবেই শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে বা সৃষ্টি করা হয়েছে। বস্তুত সাধারণ মানুষ এমনটি ভাবে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু। আর বড় ও বুদ্ধিমানেরা সাধারণ মানুষের এ আচরণ বা চরিত্রের সহজ সুযোগ নেয়।

মানুষকে এ ভূল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অধিক মন্দ কাজ হচ্ছে অনৈতিকভাবে সুকৌশলে অর্থ-বিত্ত অর্জন করা বা হাতিয়ে নেয়া এবং সমাজে পাহাড় পরিমাণ বৈষম্য সৃষ্টি করা। এরই ফলে অধিক সংখ্যক মানুষ বিশেষত অসহায় নারীরা অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য হয় এবং সেখানেও বর্তমানে এ ধরণের কাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাড়িয়ে আছে সমাজেরই চোখের সামনে; অথচ দায়িত্বশীল ব্যাক্তিরা এবাদতে মশগুল! যতদিন সাধারণ মানুষ নিজ জ্ঞানে এসব বুঝতে না পারবে ততদিন সমাজ থেকে এ সমস্যা দুর হওয়া কঠিন। সত্যিকার ও বোধসম্পন্ন মুসলমান বা বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আল্লাহর দিক-নির্দেশনার প্রতি নিজেদেরকে সমর্পন করতে হবে। এটিও আদম-হাওয়ার এ ঘটনার মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদত্ত একটি শিক্ষা। আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি সমর্পনই আল্লাহর প্রতি সমর্পন [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। আর এটিই ইসলাম যা কোরআন দর্শনরূপে মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরেছে। আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি সকলের সমর্পন জাগতিক রেষারেষি-হানাহানি থেকে মুক্তির উপায়। মানুষ যেন নিজেরা কৃত্রিম উপায়ে নিজের বা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে হীন বা জটিল কোন ছক না আঁকে সেটিই অধিক কাম্য। তাই এ ঘটনা বর্ণনার অব্যাবহিত পূর্বে ২৮-২৯ নং আয়াতে আল্লাহর মহাত্ম স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনিই সব ও সর্বেসর্বা। তাঁর কাছেই সমর্পিত হতে হবে সকলকে।

সহজ-সরলভাবে প্রদর্শিত ইসলামের পথ ও বক্তব্যকে আমরা যেন জটিল থেকে জটিলতর না করি। তাতে জীবন চালাতে বর্তমানে এ পথের ধারক-বাহকদের প্রতিষ্ঠিত নানাবিধ পেশায় উপার্জনের ক্ষতি হলে সবাই তাদের জন্য বিকল্প পথের ব্যাবস্থায় সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। নতুন উপায়ের সন্ধান করতে হবে। অর্থনৈতিক জীবন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে এসে সবাই সাহাবিদের যুগের মানুষের মতো ততটা কঠিন জীবন-যাপন করতেও পারবে না। এ যুগের মানুষ তথা মুসলমানও মরুভূমির তপ্ত বালুর ওপর শুয়ে হযরত বেলালের মতো আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবে না। তারা এসির ঠান্ডা হাওয়ায় বসে এবাদত করতে চাইবে। তাই এমন প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।"

এসব প্রার্থনা শাশ্বত ও সার্বজনীন। প্রয়োজনে ভূল ব্যাখ্যা দানকারীদের পেশা পরিবর্তনে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু তবুও কোরআনের বাণী ভূলভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে কোন প্রকার সুবিধা লূটে নেয়া যাবে না। সহজ-সরল পথকে জটিল থেকে জটিলতর নিয়মের মধ্যে ফেলে দেয়া যাবে না। বর্তমানে এমনটি ঘটছে। প্রসঙ্গক্রমে তাই কথাগুলি বলে রাখা হল। আল্লাহ বলেন,

"যারা অবতীর্ণ বাণীসমূহকে নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন/বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে ব্যাক্তি নরকে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম নাকি যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছে কর; নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।" (আল-কোরআন ৪১:৪০)

"নিশ্চয়ই! যারা প্রেরিত গ্রন্থের সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা অর্জন করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না।" (আল-কোরআন ২:১৭৪)

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ফেরেশতারা মানব সৃষ্টির কারণে পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত সৃষ্টির আশংকা প্রকাশ করে (২:৩০)। তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে মহাবিশ্বে এমন ঘটনা প্রথম নয়। পৃথিবীতে বা মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও পূর্বেও এমনটি ঘটেছে এবং তারা বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত। ঘটনাটি প্রথম হলে ফেরেশতাদের রক্তপাতের আশংকা করার কথা নয়।

পরামর্শ শ্রবণ করা সত্বেও আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। তিনি সকল কিছু জানেন। এখানেও মানবের জন্য শিক্ষনীয় আছে। ফেরেশতাদের পরামর্শ অনুযায়ী মানব সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তারাই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, মানব সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করা। এটি কেবল বসে বসে এবাদত করাই না; তাঁর পবিত্রতা কিংবা মহাত্ম প্রচার করাই না। সকল ধরণের কর্মের মধ্য দিয়েই সে মহাত্বকে প্রকাশ করা হয়। বৈজ্ঞানিক নতুন কোন আবিস্কারও আল্লাহর মহাত্বেরই প্রকাশ [বিজ্ঞান দ্রষ্টব্য ২.২.২]! প্রয়োজনীয় প্রতিটি কাজই এবাদত [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর মহাত্ব প্রকাশ পায় বা ঘোষিত হয়। কিছু হচ্ছে মূল কাজ এবং কিছু হচ্ছে মূল কাজের সহায়ক কাজ। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম বা স্বকর্ম অনুসরণ করে সকল মানুষ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। ... মানুষ তার নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৫-৪৬)

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করা কেবল মৌখিক প্রশংসা বা নিয়মিত আনুষ্ঠানিক উপাসনা পালন করাই নয়। এর দ্বারা জগতের সকল করণীয় কার্য যথাযথভাবে পালন করাকে বোঝায়। আল্লাহর নির্দেশিত সকল কাজই প্রশংসনীয়, প্রয়োজনীয় ও তাঁর পরিচয় বহন করে। তাঁকে চিনতে ও বুঝতে শেখায়। যথাযথভাবে সেসবের পরিপালনই তাঁকে মহিমান্বিত করে। করণীয় সকল শুভ কাজই এবাদত বা উপাসনার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আমরা যেন বিষয়গুলিকে জ্ঞানের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করি।

আল্লাহ বলেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'। এর অর্থ এই যে, নতুন সৃষ্টির দ্বারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা তথা নিয়মিত উপাসনা বা করণীয় কার্যসমুহ যথাযথ উৎকর্ষতার সাথে পালন করা ছাড়াও আরও কাজ আছে। কেননা ঐটুকু কাজের বিষয়ে ফেরেশতারাও অবগত। কিন্তু আরও কাজ কি সেটি আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি সেটি প্রকাশ করেননি। তবে নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবে যে, জটিল এ বিশ্বজগত পরিচালনায় 'শক্তি'র ভারসাম্য সৃষ্টিতে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে শক্তি শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ধরে নেয়া হয়েছে। এছাড়াও ফেরেশতারা মেশিন বা কম্পিউটারের মতো অনমনীয়। তাদেরকে যা করতে বলা হয় তারা হুবহু তাই করে। তারা সত্যের পথে চলে। ব্যাতিক্রম করে না। কেননা তারা পবিত্র! নির্দেশের বাইরে এক চুলও যায় না। যেতে পারে না। তাদেরকে তেমন শর্তেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কম্পিউটারের মতো।

এর যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। যে অসুবিধার চিত্র মহাভারতে তুলে ধরা হয়েছে। মায়ের মুখ নিঃসৃত বাণী সত্য। শিরোধার্য্য। কমান্ডস্বরূপ। যা ফিরিয়ে না নিলে পালন করতেই হবে। ফেরেশতার মতো মানুষেরাও কম্পিউটারের মতো কাজ করে। আদেশদাতার আদেশ শিরঃধার্য। তারা প্রচন্ড বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। মায়ের আদেশ রক্ষা করতে গিয়ে পঞ্চ পান্ডবের সকলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করে।

অপরদিকে নতুন সৃষ্টি মানবকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। নির্দেশনার পরিপালনে তারা ফেরেশতাদের মতো অনমনীয় নয়। তাদেরকে নমনীয়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে বিবেচনা শক্তি দেয়া হয়েছে। নিজ বিবেচনায় তারা ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে ভূল সিদ্ধান্ত বা কর্মের কারণে

তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী হতে হবে। অতএব যাচ্ছে-তাইও করা যাবে না।

এ জগতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যের লড়াই আছে। মানুষ এ লড়াইয়ের মাঝে আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত আছে। তাই সে এত মর্যাদাবান! তাকে ফেরেশতাদের ওপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে! কেননা কাজটি স্বয়ং আল্লাহর এবং আল্লাহ প্রদত্ত। বলা যায় মহাবিশ্ব পরিচালনায় মানব সন্তান আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকারীরূপে অংশগ্রহণকারী। আল্লাহর দিক বিবেচনায় সেটি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, মানবীয় দিক বিবেচনায় বিশাল দায়িত্বের- অথচ ঝুঁকিপূর্ণ। যে কাজে ঝুঁকি বেশী সে কাজে মর্যাদা ও মূল্যও বেশী। যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই তাকে মর্যাদাবান করেছেন; তিনি যেমন তাকে উচ্চে উন্নীত করেছেন, তেমনি আবার কিছু শর্তও দিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনিই শাস্তি দেবেন। তবে সঠিক পথ অবলম্বনকারী পুরস্কৃত হবে- এগুলি তাঁর প্রতিশ্রুতি। যেমন বলা হয়েছে,

“আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বিশ্বাসের বোঝা বহণ করার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহণ করা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিল ও বিশ্বাসের বিষয়ে ভীত হল এবং মানুষ তা বহণ করতে পারবে বলে অনুমান করল এবং সে নিজেকে নির্যাতনকারী ও বোকারূপে প্রমাণ করল।” (আল-কোরআন ৩৩:৭২)

বলা হচ্ছে ‘আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন’ (২:৩১) বা তার ভেতরে ‘প্রয়োজনীয়’ সকল জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যা ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়নি। এর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। সাধারণের জন্য তো মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ যা খুশি যেভাবে খুশি করতে পারেন। এতটুকু বুঝলে বা বিশ্বাস রাখলেই যথেষ্ট। বিশ্বাসীর জন্য অতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষনা হলে সেটি ভিন্ন কথা।

ফেরেশতাদের সম্মুখে আদমকে উপস্থাপন করা হল। ফেরেশতারা যেসব বিষয় বা বস্তুর নাম বলতে পারেনি আদম সেসব বলতে পেরেছে এবং আদম সেটি পারবেই; কেননা আল্লাহ সেটি চেয়েছেন। তাই তিনি তাকে পূর্বেই এ বিষয়ে জ্ঞানদান করে রেখেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে সে জ্ঞান দেননি।

আদমের মর্যাদাকে তিনি এভাবে উচ্চে উন্নীত করেছেন। এখানেও মানুষের শিক্ষনীয় আছে। জাগতিক পরিচালনায় কাউকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হলে মানুষেরও এসব জ্ঞান কাজে লাগে। তাই ওপরে উল্লেখ করেছি যে, ঘটনাটির মধ্যে মানব সম্পদ ব্যাবস্থাপনা বা হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের নিগুঢ় তত্ব বিষয়ক মৌলিক কিছু জ্ঞানের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ সবকিছুকে লক্ষ্যে উপনীত করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা যা চান কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই! তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (১২:১০০)

আদমের মর্যাদাকে উচ্চে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কেননা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের কথোপোকথন থেকে এটি স্পষ্ট যে, ফেরেশতারা কিছু বিষয় আল্লাহর নিকট গোপন করার চেষ্টা করত (২:৩৩)। কিন্তু আল্লাহ সব জানেন। এ কথার তাৎপর্য অনেক। এর সাথে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তারও একটি সম্পর্ক আছে।

উল্লেখ্য যে, এটি একটি বহুল প্রচলিত ধারণা যে আদম-হাওয়ার ঘটনাটির মধ্যে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে সৃষ্টি দ্বারা মানব কিংবা মহাবিশ্ব সৃষ্টির কোন বিষয় আলোচিত হয়নি। এখানে অন্যান্যদের তথা ফেরেশতাদের ওপর মানবের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ তিনি আদমকে সেভাবে সৃষ্টি তথা উন্নীত করেছেন।

ফেরেশতাদেরকে বলা হল, 'আদমকে সেজদা কর'। সকলেই সেজদা করল; ইবলিস ব্যাতিত। সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করল। সকলে সেজদা করা এবং ইবলিস সেজদা না করা এক বিষয় নয়। পার্থিব ব্যাবস্থাপনায়ও আমরা একই প্রকৃতির সমস্যার মুখোমুখী হই। যদিও বিষয়টি আল্লাহর সঙ্গে তুলনীয় নয়; তবে এভাবেই আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাই কোরআন বাস্তবিকই মানুষের জন্য এক যথাযথ দিক-নির্দেশনা। জীবন ও জগত পরিচালনা সংক্রান্ত এসব বিষয়গুলিকে সহজেই পরিহার করা যায় না। আবার পরিচালনা করা ছেড়েও দেয়া যায় না।

আল্লাহর কৃপা একজনকে অনেকের ওপরে ও অনেক উচ্চে উন্নীত করতে পারে। পরবর্তীতে সে-ই আবার আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট অপরকে তার নিজের

ওপরে মেনে নিতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়। যেটি আদম ও ইবলিসের ঘটনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থাটি জটিল। এ অবস্থাকে মেনে নেয়া উচিত কি উচিত নয় সেটি আল্লাহই ভাল জানেন। কেননা দ্বন্দ্বটিও প্রয়োজনীয়। দ্বন্দ্বটি প্রয়োজনীয় সত্যকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে। কেননা এক পক্ষ সত্যকে ধারণ করে কিংবা আল্লাহর সুপ্ত ইচ্ছের পক্ষে থাকে, যখন অপর পক্ষ ইচ্ছের বিপক্ষে থাকে বা মিথ্যেকে ধারণ করে বলে বলা হয়। বলা হচ্ছে,

"একদলকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করছেন যখন অপরদল ভ্রান্তপথ ধারণ করে আছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করছে যে তারা সঠিক পথেই পরিচালিত।" (আল-কোরআন ৭:৩০)

আল্লাহর পরবর্তী ও পরিপূর্ণ কার্যক্রম বিষয়ে কারই জ্ঞান নেই। তাই এ অবস্থায় করণীয় নির্ধারণ করা জটিল। কেননা যিনি সর্বোচ্চ আসন অলংকৃত করেন তথা আল্লাহর প্রকৃত ইচ্ছেকে সব সময় সকলে জানতে বা বুঝতে পারে না। সে কারণেও ভূল হয়। আর তাই ভূল করেও ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহর ইচ্ছে সাপেক্ষে ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখানে এটিও স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহর ইচ্ছে ও চাওয়া ভিন্ন কোন কিছুই সংঘটন সম্ভব নয়। ফলে আদম ও ইবলিসের ঘটনায় যা হয়েছে তা আল্লাহর ইচ্ছে ভিন্ন হয়নি। অর্থাৎ তিনি নিজেই তেমনটি করতে চেয়েছেন। কেননা তিনি জানেন এ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য কি কি ঘটতে পারে। ইবলিস আদমকে সেজদা করলে সার্বিক ব্যাবস্থাপনা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু তিনি জানেন কিভাবে বা কার দ্বারা বা কাকে ব্যাবহার করে সত্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। কেননা সত্যকে সমুন্নত রাখাই মূল লক্ষ্য। সৃষ্টির সংরক্ষণ এবং জীবন ও জগতের যথাযথ পরিচালনায় যা অপরিহার্য। সত্যকে সমুন্নত রাখাই ধর্মের কাজ। যারা সেটি করে তারাই আল্লাহর পক্ষ শক্তি। বলা হচ্ছে,

"... সত্য ব্যতিত কেবল ধর্মের (ধর্মের প্রচলিত ধারণা বা ব্যাকরণিক রিতি-নীতির) প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না ...।" (আল-কোরআন ৫:৭৭)

আরও বলা হয়েছে, “সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম .. রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি, .. গৃহের জন্য দরজা ও পালংক .. এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকারও। যদিও এ সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।” (আল-কোরআন ৪৩:৩৩-৩৫)

অর্থাৎ সত্যের পথে থাকলে এবং মন্দ কর্ম না করলে আল্লাহকে অস্বীকারকারীও পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য হতে পারে। কেননা নিজেদের অজান্তে হলেও তারা প্রকৃতই বিশ্বাসী এবং সৃষ্টি সুরক্ষার বিবেচনায় তারা উপকারী বা প্রয়োজনীয়। সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়াটিই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর! যা কিনা সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

যে প্রকৃতি বা বিধানে আল্লাহ এক-একটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ বিধি, প্রকৃতি বা ধর্ম অনুসারে চলবে এটিই স্বাভাবিক। এর ব্যাতিক্রম হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহই সে ধর্ম বা সূত্র তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করে দেন। অতএব নিয়ম, প্রকৃতি, সূত্র বা ধর্মের কারণে যথাযথ পরিস্থিতিতে দু'টি সৃষ্টি যে যে শর্তে প্রতিষ্ঠিত তা বিপরীতমুখী হলে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হবেই। বিকর্ষন করবেই। তাই তিনি এতদ্বসত্বেও বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে বলে দিয়েছেন। যেন ধর্ম বা নিয়ম বিচ্যুত কোন নির্দেশ ভঙ্গকারী নির্দেশ অমান্য করার পর নিজেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর সম্মুখে কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে না পারে। বলা হচ্ছে,

“বার্তাবাহকগণ সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। বার্তাবাহকগণকে এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে যেন তাদেরকে প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোন প্রকার যুক্তি উত্থাপনের উপায় না থাকে।” (আল-কোরআন ৪:১৬৫)

এর সাথে সমর্পনের জ্ঞানেরও সম্পর্ক আছে। বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে অহমবোধের কারণে ইবলিস বা শয়তান আদমকে মেনে নিতে পারেনি, সে অহমবোধ আল্লাহতায়ালাই সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। সেটি কাজ

করবেই। এ ঘটনায় বর্ণিত সকল জ্ঞানের মধ্য দিয়েই তিনি মানবজাতিকে জগত পরিচালনা করার শিক্ষাদান করেছেন।

অতঃপর প্রকাশ্যে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ফল ইবলিসকে কিছুদিন ভোগ করতে হবে। এটিও মানবের জন্য জগত পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা। তবে অবশ্যই যতদিন আল্লাহ সেটি চাইবেন। কেননা দ্বন্দ্বের একটি পক্ষ হয়ে ইবলিস আল্লাহকেই সহায়তা করেছে এবং আল্লাহর গুপ্ত ইচ্ছেকে পূর্ণ করেছে। যদিও তার নিজস্ব কিছু গুপ্ত ইচ্ছেও থাকতে পারে। যেটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ আদম ও তার স্ত্রীকে উদ্যানে অবাধ বিচরণের অনুমতি দিলেন। সব ফল খেতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু একটি বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ সে গাছের ফল খাওয়া বারণ। এটি একটি শর্ত। অর্থাৎ শয়তানকে মোকাবেলায় আদম কতটা দৃঢ়চিত্ত তার পরীক্ষা। যেমন বলা হয়েছে,

“.. আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।” (আল-কোরআন ২০:১১৫)

শয়তান তার প্ররোচনা দ্বারা তাদেরকে উদ্যানের সুখী অবস্থা ও অবস্থান থেকে পদস্খলিত করে দিল। অতঃপর তাদের সকলকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হল। এটি হচ্ছে আদেশ অমান্যের পরিণতি। এভাবেই আল্লাহ কৌশলে তাঁর কার্য সম্পন্ন করেন। মানুষকেও এভাবে শিক্ষাদান করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“... নিশ্চয়ই! আমার পালনকর্তা যা চান কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই! তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (আল-কোরআন ১২:১০০)

‘আপাত পদস্খলিত’দের কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে। নির্দিষ্টকাল পরে সকলকে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আরেকটি শর্ত ও পরীক্ষা। বিষয়টিকে ক্ষমা প্রদর্শনের কারণে লঘু দণ্ড হিসেবে ভাবা যেতে পারে। কিংবা ক্ষমা প্রদর্শনের কারণে গুরু দায়িত্ব অর্পনরূপেও দেখা যেতে পারে। যেহেতু জীবন ও জগত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কেউই কিছু জানে না, অতএব মানুষের ভাবনার স্বাধীনতা আছে সত্য সন্ধানের প্রয়োজনে।

ওপরে ‘আপাত পদস্খলিত’ কথাটি ব্যাবহার করা হয়েছে এ কারণে যে, এখানে কারই কোন ত্রুটি নেই। কেউই পরিপূর্ণ পদস্খলিত বা পথভ্রষ্ট নয়।

যেমন বিধান দ্বারা আল্লাহ প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ বিধান অনুসরণ করে কাজ করেছে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে,

"আপনি যেমন আমাকে উদভ্রান্ত করেছেন, তেমনি আমিও তাদের জন্য আপনার সরল পথে অপেক্ষারত থাকব। ... আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" (আল-কোরআন ৭:১৬)

সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন। অতএব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বস্তুত সকলেই আল্লাহকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু একে অপরকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।" (আল-কোরআন ৫৯:১৬)

'তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু।' এ ঘটনার মধ্য দিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ আবির্ভূত হল। একটি মূল শক্তির সহায়ক শক্তি, অপরটি বিতাড়িত বা বিরোধী শক্তি। বিতাড়িত শক্তি সহায়ক শক্তির চতুর্পাশে সদা ঘূর্ণায়মান। সে তাকে অপসারণ করতে চায়। তার জন্য সে সকল প্রকার কৌশল প্রয়োগ করার অনুমতি ও সক্ষমতা মূল শক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

একটি বিষয় এখানে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্যনীয় যে, বিরোধীতা করার অনুমতিও শয়তানকে আল্লাহর নিকট থেকেই নিতে হয়েছে! যেমন উদ্ধৃত হয়েছে,

"আল্লাহ বলেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালে?

সে বলল, আমি এমন নই যে একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিতাড়িত এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিবস পর্যন্ত অভিসম্পাত।

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

আল্লাহ বলেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত, সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব।” (আল-কোরআন ১৫:৩২-৩৯)

আল্লাহর সম্মুখে ইবলিসেরও বিরোধীতা করার কোন শক্তি, সক্ষমতা বা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের সাহস নেই। আল্লাহর ভয়ে সেও ভীত এবং সেও আল্লাহরই অনুগত! সে কেবল আদমকে মেনে নিতে পারেনি। যেমন উদ্ধৃত হয়েছে,

“শয়তান বলে, নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।” (আল-কোরআন ৫৯:১৬)

আল্লাহ শয়তানকে তার প্রার্থিত বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনি চাইলে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতেন। একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি তিনি সেটি চাননি।

অপরদিকে পুরুষ একটি শক্তি। নারী একটি শক্তি। আবার উভয়ে উভয়ের সহায়ক ও বিরোধী শক্তি। শয়তান মূল শক্তির সকল সহায়ক শক্তিসমুহের বিরোধী শক্তি। বিরোধী শক্তি অপরাপর শক্তিসমুহের চতুর্পাশে সদা ঘূর্ণায়মান। সে অপর দুই শক্তির কোন একটি সহায়ক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মূল শক্তির নিকটবর্তী হতে চায়।

মূল, সহায়ক ও বিরোধী শক্তিসমুহের বস্তুত কোন সুনির্দিষ্টতা এমনকি কোন স্থায়িত্বও নেই। প্রতিটি রূপেই শক্তিসমুহ এখানে একে অন্যের স্থান দখল করে নিতে পারে কর্ম, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই সকল শক্তিসমুহই পৃথকভাবে একে অন্যকে নিজ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে কৌশল অবলম্বন করে বা কোন পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং এক অর্থে সে প্রচেষ্টায় প্রতিটি শক্তিই এখানে টিকে থাকার লড়াইয়ে সদা রত! তাই জীবন এত প্রাণবন্ত ও সচল। তবে বিষয়গুলি অনুধাবন করা জটিল।

জটিলতার বড় কারণ হচ্ছে শয়তান তথা বিরোধী শক্তির উপস্থিতি। এ শক্তি অপর যে কোন শক্তির ভেতরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করার সক্ষমতা রাখে এবং পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। যা আসে যে কোন বিবেচনায়

'আপাত' মূল শক্তির অনুমোদনক্রমে। এখানে 'আপাত' শব্দটি এ কারণে ব্যাবহার করা হচ্ছে, কেননা যাকে এখানে মূল শক্তিরূপে বিবেচনা করা হচ্ছে অপর দুই শক্তির যে কেউ যে কোন সময়ে পরিস্থিতি সাপেক্ষে প্রবল হয়ে উঠতে পারে এবং মূল শক্তিতে রূপান্তরীত হতে পারে। অর্থাৎ শক্তিগুলি একে অপরকে প্রতিস্থাপন করার যোগ্যতাসম্পন্ন।

মূল চালকের আসনে সর্বদা একজন অধিষ্ঠিত থাকেন। যিনি 'নির্দেশদাতা' বা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী। যাকে 'সত্য' বলা হয় বা সত্য নামে অভিহিত করা হয়। যিনি সবদিক থেকে যথাযথ-পরিপূর্ণ (Perfect), সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। অপরজন সত্যের পক্ষ বা সহায়ক শক্তি এবং একজন আপাত বিরোধী শক্তি। মূল শক্তিকে যথাযথ রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক এমনকি কখনও কখনও বিরোধী শক্তিরও ভূমিকা থাকে। কিন্তু এই চক্রে কে কখন কোন আসন নেবে বা পাবে সেটি পরিস্থিতি বা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়। তাই আল্লাহকে প্রতিনিধিত্ব করে মূলত তাঁর 'আসন' বা 'কুরসি' [কুরসি দ্রষ্টব্য ২.২৫৩.৩, ২.২৫৫.৮]।

ওপরে বর্ণিত সূত্রটি সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণা বা এককে তথা অনু-পরমাণুতেও একইভাবে প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর লক্ষ্য-কোটি ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ে বৃহৎ সৃষ্টিজগত গড়ে ওঠে। কিন্তু মূল শক্তি ক্ষুদ্র এককগুলির মধ্যেই নিহিত থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি কণায় কণায়, অণুতে-পরমাণুতে যেখানে প্রতিনিয়ত বিপরীতমুখী শক্তিসমুহের সংঘর্ষ বা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানেই সকল শক্তির উৎস। যা সৃষ্টির কোন বৃহৎ রূপকেও চালনা করে।

সত্য হচ্ছে- আজও কেউ এসব সত্য পরিপূর্ণ ও নিশ্চিতভাবে জানে না। বিভিন্নজন সৃষ্টি সম্পর্কিত এ ঘটনার যেমন বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, এটিও তেমনি একটি ব্যাখ্যা। চিন্তা বা ধারণায় পরিবর্তনের সূচনা বা জ্ঞান ও যৌক্তিকতাকে প্রবেশ করাবার জন্য ব্যাখ্যাটি এভাবে উপস্থাপন করা হল। যদিও এভাবে উপস্থাপনের পেছনে গভীর ভাবনা আছে। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কোনদিন সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

নিষিদ্ধ গাছ বা ফল না খাওয়ার শর্তটি ছিল সহায়ক শক্তির অন্তর্জনিত দৃঢ়তা বা শক্তিমত্তার একটি পরীক্ষাস্বরূপ। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে সহায়ক শক্তির জন্য একটি শিক্ষা বা তার অর্জিত জ্ঞান বলা যেতে

পারে। উদ্যান থেকে অধঃপতিত হওয়ার বিষয়টি পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের সামর্থ অর্জন ও তার শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার অন্তর্গত বিষয়। যথাযথ যোগ্যতা অর্জনের ব্যার্থতা তার অপসারণের কারণ হতে পারে। আল্লাহ বলেন,

“.. আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।” (আল-কোরআন ২০:১১৫)

“আমি, আমিই তাদের (মানুষ) সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। যখন আমি ইচ্ছে করব তাদেরকে প্রতিস্থাপন করব। তাদের পরিবর্তে তাদের মতো অন্যদের নিয়ে আসব। নিশ্চয়ই! এটি একটি সতর্কবার্তা। অতঃপর যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।” (আল-কোরআন ৭৬:২৮-২৯)

‘তিনি তার (আদমের) প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হলেন।’ পৃথিবীতে আদমের আগমন আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গের কারণে ক্ষমার অন্তর্ভূক্ত বিষয়; কিংবা বলা যেতে পারে ক্ষমা প্রাপ্তির কারণে লঘু দন্ড বা গুরু দায়িত্ব প্রাপ্তির অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আল্লাহ আদমকে দিক-নির্দেশনা দিলেন যা সফলতার সাথে প্রত্যাবর্তনের জন্য পথ-প্রদর্শকস্বরূপ।

বলা হচ্ছে, ‘আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে ...’ (২:৩৮)। এটি ক্ষমা প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত বিষয়। কেননা ক্ষমা করার কারণে মানুষকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআন হচ্ছে সে পথ-নির্দেশনা (Guidance) এবং মোহাম্মদ (সাঃ) সে বার্তার বা পথ-নির্দেশনার বাহক (Messenger)। এভাবে যৌক্তিকভাবে বিষয়গুলি কোরআনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

■ উদ্ধৃত ঘটনা এবং বাইবেল ও কোরআন প্রসঙ্গ : অ্যাডাম বা ‘আদম’ এবং ইভ বা ‘হাওয়া’ সম্পর্কিত এ ঘটনাটি বাইবেল থেকে এসেছে। বাইবেলে ‘হাওয়া’র সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে অ্যাডামের পাঁজরের একটি হাড় থেকে ‘হাওয়া’কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কোরআনে এ বিষয়ে কিছু বলা নেই।

অ্যাডাম ও ইভ স্বর্গীয় বাগানে নগ্ন ছিল। তাদের মাঝে লজ্জার কোন বোধ ছিল না। কোরআনে এই ‘নগ্নতা’ বিষয়ে ইংগিত রয়েছে।

বাইবেলে বলা হয়েছে, বাগানের মাঝখানে বিশেষ দু'টি গাছ ছিল। গাছ দু'টির একটিতে ছিল 'প্রাণ' এবং অপরটিতে ছিল ভাল ও মন্দের 'জ্ঞান'। গড দ্বিতীয় গাছটির নিকট যেতে ও তার ফল খেতে অ্যাডাম ও ইভকে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, যেদিন তোমরা এ গাছের ফল খাবে সেদিন থেকে তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কোরআন বলছে,

"আমি বললাম: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উদ্যানে বসবাস কর এবং তোমরা যা খেতে ইচ্ছে করে খাও, তবে এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না, তাতে তোমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।" (আল-কোরআন ২:৩৫)

কোরআনে একটি নিষিদ্ধ গাছের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে গাছ দু'টির একটিতে 'প্রাণ' এবং অপরটিতে ভাল বা মন্দের 'জ্ঞান' রয়েছে এভাবে বলা হয়নি।

বাইবেলে বলা হয়েছে, বাগানে বিচরণরত প্রাণীকুলে ধূর্ত ছিল সরীসৃপ। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে সে ইভকে প্ররোচিত করতে লাগল। বলল, যদি তুমি এ গাছের ফল খাও তবে অবশ্যই তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না। গড জানেন যে, যদি তোমরা এ গাছের ফল খাও তবে তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং তোমরা গডের সমপর্যায়ে ভাল ও মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।

কোরআনে শয়তানের প্ররোচনার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও সরিসৃপের কথা বলা হয়নি। কোরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচিত করতে লাগল, যেন তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায় যা তাদের থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। সে বলল, 'তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষিদ্ধ রেখেছেন শুধুমাত্র এ জন্য যে, পাছে না তোমরা আবার ফেরেশতা হয়ে যাও, কিংবা হয়ে যাও চিরজীবি।'" (আল-কোরআন ৭:২০)

বাইবেলে ফল খাওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করতে হবে না বলা হয়েছে। একই প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে, 'পাছে না তোমরা আবার ফেরেশতা হয়ে যাও, কিংবা হয়ে যাও চিরজীবি।' দু'ভাবে উপস্থাপিত হলেও বক্তব্য এক। অর্থাৎ চিরজীবি হয়ে যাওয়া।

বাইবেলে বলা হয়েছে, সরিসৃপের প্ররোচনায় ইভ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল। অ্যাডামকে খেতে উৎসাহিত করল। ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উভয়ের ভিন্ন এক দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে গেল। তারা তাদের নগ্নতাকে উপলব্ধি করতে পারল। গাছের লতা-পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করার চেষ্টা করতে লাগল। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে,

"... যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল এবং তারা বাগানের কিছু পাতা জড়িয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল। ..." (আল-কোরআন ৭:২২)

ইভ বা হাওয়া প্রথম ফল খেয়েছে বাইবেলে এটি উল্লেখ করা হলেও কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে তেমনটি বলা হয়নি। কোরআনে উভয়ের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগে-পরের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে আসেনি।

অ্যাডাম ও ইভ স্বর্গীয় বাগানে নগ্ন ছিল। তাদের মাঝে লজ্জার কোন বোধ ছিল না। কোরআনের উদ্ধৃতি থেকে 'নগ্নতা' বিষয়ে ইংগিত পওয়া যায়। বাইবেলের সাথে বক্তব্যের সাযুজ্যতা আছে।

এ ঘটনার পর গড সরীসৃপকে অভিশাপ দিলেন। বললেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে আমি শত্রুতা স্থাপন করলাম। বংশ পরম্পরায় তোমরা একে অপরকে তাড়া করে ফিরবে। এ বিষয়ে কোরআনে এভাবে বলা হচ্ছে,

"তারা যে (সুখী) অবস্থায় ছিল শয়তান ওখান থেকে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিল। আমি বললাম: নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু! কিছুকালের জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য জীবনোপকরণের ব্যাবস্থা থাকবে।" (আল-কোরআন ৭:৩৬)

গড ইভকে বললেন, তোমার প্রসবকালীন সময়ের ব্যাথাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং পুরুষ তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে। প্রসবকালীন সময়ের ব্যাথাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে কোরআনে তেমনটি বলা হয়নি। নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকারের বিষয়ে কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে,

"... নারীদের সমান অধিকার আছে পুরুষদের ওপর সদয়তার সঙ্গে, যদিও পুরুষের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আছে।" (আল-কোরআন ২:২২৮)

"পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এজন্য যে, পুরুষেরা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে।" (আল-কোরআন ৪:৩৪)

গড অ্যাডামকে বললেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে আহার সংগ্রহ করতে হবে যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধুলো থেকে সৃষ্টি ধুলোয় মিশে যেতে হবে। অতঃপর গড অ্যাডাম ও ইভকে চামড়ার পরিচ্ছদ দ্বারা আবৃত করেন। কোরআনে বলা হয়েছে,

"তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা সেখানেই (পৃথিবীতেই) জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ৭:২৫)

অ্যাডাম ও ইভের স্বর্গীয় বাগানে অবস্থান এবং সেখান থেকে তাদের বিতারণ বিষয়ে বাইবেলে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

কোরআনে বলা হয়েছে এ ঘটনার পর আল্লাহ মানবজাতির জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা দেন। বাইবেলে তেমন কিছু বলা হয়নি। আল্লাহ বলেন,

"হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, যেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাকে স্বর্গীয় উদ্যান থেকে বের করে দিতে সফল হয়েছিল এবং তাদের থেকে তাদের সেই পরিচ্ছদ ছিন্ন করে দিয়েছিল, যেন সে তাদের লজ্জাকে তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিতে পারে। নিশ্চয়ই! সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।" (আল-কোরআন ৭:২৫)

কোরআনে আল্লাহ এবং ইবলিস বা শয়তানের কথোপকথনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যা বাইবেলে নেই। যেমন শয়তানকে আল্লাহ বলছেন,

"এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত সেই অবধারিত সময় অর্থাৎ শেষ বিচার দিবস উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে

(শয়তান) বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব, তাদের ব্যাতিত যারা সঠিকতার সঙ্গে একান্তই আপনার অনুরক্ত (ভক্ত)। আল্লাহ বললেন, আমার কাছে আসার এটি (ভক্তি) একটি সহজ পথ।" (আল-কোরআন ১৫:৩৫-৪১)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর একান্তই অনুরক্ত, ভক্ত এবং সঠিক পথে চলে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এটিও একটি দিক-নির্দেশনা। গীতায় বলা হয়েছে,

"অনন্যচিত্তে যে চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে তার কাছে আমি সহজলভ্য।" (গীতা ৮:১৪)

ঘটনার পর আল্লাহ বলেন, ".. এখান থেকে তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:৩৮)

বাইবেলে বলা হয়েছে গড অ্যাডামকে বললেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে আহার সংগ্রহ করতে হবে যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধুলো থেকে সৃষ্টি, ধুলোয় মিশে যেতে হবে।

কোরআনে বলা হয়েছে, তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। অর্থাৎ ফিরে যাবার বিষয়টি উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে।

গীতায় এভাবে বলা হয়েছে, ".. যে একাগ্রতার সাথে, নিষ্ঠাপরায়নতার সাথে, পরিপূর্ণভাবে আমার ভক্তি কর্মে নিবেদিত, অপবিত্রতা বা কোন মন্দকর্ম এবং মানসিক বিভ্রান্তি বা মিথ্যে জল্পনা-কল্পনা থেকে রহিত; যে সকল জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন- অবশ্যই সে আমার কাছে ফিরে আসবে।" (গীতা ১১:৫৫)

বাইবেলে ঘটনাটি কেবল উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু কোরআন ঘটনাটিকে কেবল উদ্ধৃতই করে নাই, এর মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার একটি সম্পর্কও তৈরী করেছে। সে কারণে মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে অবতীর্ণ গ্রন্থ কোরআন এবং নবুয়ত তথা মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের

যথার্থতাকে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত করে তুলে ধরেছে। যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং জীবন চলার পথের একটি পূর্ণাঙ্গ বা পরিপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরে।

মানুষকে আল্লাহর বার্তায় বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে। যার অনুসরণ মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা এনে দিতে পারে। কিন্তু যারা এ বার্তায় অবিশ্বাসী বা অস্বীকারকারী হবে তারা শাস্তিযোগ্য হবে। এভাবেই আল্লাহ নির্দিষ্টকাল পরে ভাল ও মন্দকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত স্থানে প্রত্যেককে ফিরিয়ে নেবেন। বলা হচ্ছে,

"যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদেরকে উদ্যানে সুখী করা হবে এবং যারা আমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে এবং পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই শাস্তির মধ্যে আনা হবে।" (আল-কোরআন ৩০:১৪-১৬)

সত্য হচ্ছে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোন মূল্যই বহন করে না যদি না এর সাথে কর্মের ভাল-মন্দের সম্পর্কটি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত থাকে [বিশ্বাস-অবিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.২৮.৩]। এ ধারণার ব্যাত্যয় বিশ্বাস স্থাপন করার মূল কারণকেই পেছনে ফেলে দেয়। মন্দ কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অথচ এই মন্দ কাজকে বন্ধ করার জন্যই এত আয়োজন- এত বিশ্বাস! এত পথ-নির্দেশনা! আল্লাহর বাণীর ভূল উপলব্ধি ও ভূল ব্যাখ্যা জীবন ও জগতকে ভূল পথে নিয়ে যেতে পারে। সুবিধাবাদী ও ভূল ব্যাখ্যাদানকারীরা এর সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পায়।

ভাল ও মন্দ পৃথকীকরণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত স্থানে প্রত্যেককে ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর কি হবে? তারপরের ঘটনা মানুষের জানা নেই। তবে পুনরাবর্তনের (Re-creation or New creation) বিষয়ে ইংগিত রয়েছে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি

আমার একটি অবধারিত প্রতিশ্রুতি আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।” (আল-কোরআন ২১:১০৪)

গীতায় বলা হয়েছে, “সহস্রাব্দে উদ্ভাসিত প্রতিটি বস্তু আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং সহস্রের শুরুতে আমি আমার শক্তিতে পুনরায় সৃষ্টি করি। ... প্রকৃতির নিয়মে এই জগত পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হয়।” (গীতা ৯:৭, ১০)

একটি ঘটনা, কাহিনী বা গল্প। যে গল্প একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। যে নিয়ম কোন কিছুকে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। বস্তুত এ বর্ণনাগুলি কোন গল্প, ঘটনা বা কেবল বর্ণনাই নয়। এগুলি মূলত উন্নত পর্যায়ের প্রোগ্রাম বা কমান্ড বা নির্দেশনা তথা দিক-নির্দেশনা যা যার বা যাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় সেটি তাকে বা তাদেরকে সে আলোকে চালিত করে। মানবজীবনই তার প্রমাণ।

এ নির্দেশনাগুলি মানবজীবনকে যুগ যুগ ধরে প্ররোচিতকরণের মাধ্যমে পরিচালনা করে আসছে। এ জীবন ও জগতই তার প্রমাণ। এসব ধারণার বাইরে মানুষ আজও যেতে পারেনি। মানুষ আজও এর আবর্তেই আবর্তিত; হোক সে বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী। একটি পক্ষ শক্তি, অপরটি বিরোধী শক্তি।

আল্লাহর নামে একটি লেবাস ধারণ করে কেউ নিজেকে পক্ষ শক্তি দাবী করে। নিজেকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ দাবী করে। বস্তুত আল্লাহই সত্য। ফলে যে পক্ষশক্তি সে যেমন একটি পক্ষ, যে বিপক্ষ শক্তি সেও একটি পক্ষ। অর্থাৎ প্রত্যেকেই সত্যের আসনে আসীন হতে পারে বা প্রত্যেকেরই আসীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা প্রত্যেকেই আসীন হওয়ার যোগ্য। ফলে সময়ে কর্মের ভূল-শুদ্ধতা সাপেক্ষে একে অন্যকে অপসারণ করতে পারে। যে যখন সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয় বা যথার্থ পথ অবলম্বন করে সেই আল্লাহর পক্ষ শক্তি হয়ে যায়। আর এ দ্বন্দ্বই সত্যকে সমুন্নত রাখে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখাই আল্লাহর মূখ্য উদ্দেশ্য। তাই বলা হয়েছে,

“সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি .. এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার। যদিও এ

সবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার মাত্র। পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ, তাদের জন্য যারা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৩, ৩৫)

মানুষ একটি সহায়ক শক্তি মাত্র। সে কারণেই তার সৃজন। যদি উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তবে আল্লাহর ইচ্ছে সাপেক্ষে তার অপসারণ অবধারিত। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদের অপসারণ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে অন্যদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন?" (আল-কোরআন ৪:১৩৩)

"যদি তিনি ইচ্ছে করেন তিনি তোমাদের অপসৃত করতে পারেন এবং কোন নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসতে পারেন।" (আল-কোরআন ৩৫:১৬)

আল্লাহ কে? আল্লাহ কি কোন ব্যাক্তি? আল্লাহ কি কোন মানব বা মহামানব? কেউ এ বিষয়ে জানে না। এটি একটি ধারণা। এটি একটি সিস্টেম। যে বা যারা যতক্ষণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকবে ততক্ষণ তারাই এ অবস্থান, আসন বা আরশ গ্রহণ করবে। 'সত্য' হচ্ছে সকলের উর্ধ্বে, সর্বোচ্চ। ধর্মেরও ওপরে। 'সত্য'কে উচ্চে ধরে রাখার জন্যই ধর্ম। ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সত্য'। তবে সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য বা উপায় হিসেবে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যদি ধর্মের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যই অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে তার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২] [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]।

উল্লেখ্য যে, কেবল কতগুলি নিয়মের হুবহু পরিপালনই ধর্ম নয়। সেগুলিকে ধর্মের গ্রামার বা ব্যাকরণ বলা যেতে পারে। ব্যাকরণ মেনে চলতে পারলে ভাল। তবে তেমন ক্ষেত্রে অনেক সময় ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে আন্তরীকতার ঘাটতি থাকে। শুদ্ধভাবে ব্যাকরণ পরিপালন করে পুরস্কার প্রাপ্তির দিকে মনযোগ বেশী থাকে। জাগতিক জীবনে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য অর্জন হল কিনা সে ভাবনা কম থাকে। অর্থাৎ পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় ব্যাকরণ মেনে দান করলাম, আল্লাহর উপাসনা করলাম কিন্তু সমাজ থেকে দারীদ্র দুর হল কি-না, সমাজে নির্যাতন বন্ধ হল কি-না, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পেল কিনা সেদিকে আদৌ মনযোগ নেই।

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিছু নিয়ম বা ব্যাকরণ থাকে। অথচ ব্যাকরণ না জেনেও কাজ করা সম্ভব। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে কাজই করুক না কেন সৃষ্টির সূত্র অনুযায়ী সে কাজের ব্যাকরণ আপনাতেই তার ভেতরে অন্তর্গ্রথিত থাকে। যেমন গ্রামার না জেনেও শিশু কথা বলতে পারে। ভাষার ব্যাবহার করতে পারে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান বা ব্যাকরণ আছে। সব মানুষ সব বিষয়ের ব্যাকরণ জানে না বা জানার প্রয়োজনও হয় না। তবুও মানুষ সব কাজ করতে পারে এবং আন্তরীকতার সাথেই করতে পারে। সে সূত্রেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

উচ্চতর ও বিশেষায়িত জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন আছে। আবার নবীশদের জন্যও প্রয়োজন আছে। ফলে এটিও থাকতে হবে। এর গুরুত্বকেও অবজ্ঞা করা যাবে না।

তবে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। যা মোটেও ধর্মের ব্যাত্যয় নয়। বিষয়গুলিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। বিজ্ঞানই সত্যকে যথার্থতার সাথে তুলে ধরে। যা আর কেউ সেভাবে করতে পারে না। তবে কিছু মানুষ বিষয়গুলি যথাযথভাবে বুঝতে ভূল করে। বলা হচ্ছে,

“.. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সত্যকে ভিত্তি করে (অর্থাৎ সবকিছু বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্রের বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত বা আবদ্ধ)?” (আল-কোরআন ১৪:১৯)

“... সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের (ধর্মের প্রচলিত ধারণা বা ব্যাকরণিক রিতি-নীতির) প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না ...।” (আল-কোরআন ৫:৭৭)

এটা কখনই হতে পারে না যে সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে অমান্য করবে বা করতে পারবে। তখনই অমান্য করা সম্ভব যখন স্রষ্টা নিজেই তার ভেতরে সে প্রোগ্রাম রচনা করে দেবেন। ফলে সম্পূর্ণ ঘটনাটি স্রষ্টারই পরিকল্পনা বলতে হবে। তবে এ পরিকল্পনায় ইবলিস কি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তার ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করে। বর্তমানে আমরা যেভাবে চলেছি তা ইবলিসের প্রতিক্রিয়ারই ফল।

উল্লেখ্য যে, এমন ঘটনা তখনই ঘটন সম্ভব হতে পারে যখন সমপর্যায়ের, সম-যোগ্যতার বা সম আসনের দাবীদার কেউ থাকে। তাই সিস্টেমের কথা

বলা হয়েছে। যেখানে একই প্রাণ বা সব পক্ষই সব আসনে অর্থাৎ পক্ষ-বিপক্ষ আসনে বসতে পারে এবং চরম উৎকর্ষতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতে পারে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"যারা আমার মাঝে আশ্রয় নেয়, যদি তারা নিম্ন জাতভূক্তও হয়- তথা স্ত্রীলোক তথা পতিতা, বৈশ্য বা শূদ্র তারাও পরম লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হতে পারে।" (গীতা ৯:৩২)

অতএব যে বিশ্বাসী, যে ভাল কাজ করে সে তার নিজ কর্মে উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতে পারে। এমনটিই বিধাতার বিধান বা সূত্র।

বস্তুত কোন কিছুই মানুষ সঠিকভাবে জানে না। মানুষ কিছু ধারণাকে কেবল বিশ্বাস ও লালন করে। এখানে যে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আদম বা মানব সৃষ্টি, সেটি নিজ হাতে কাউকে মর্যাদাসম্পন্ন ও যোগ্য করে গড়ে তোলাকেও বোঝাতে পারে। অর্থাৎ সিস্টেমে বর্তমানে যিনি সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত তিনি নিজ হাতে কাউকে যোগ্য করে তাঁর নিজের সহায়ক শক্তিরূপে গড়ে তুলেছেন বা সৃষ্টি করেছেন বিষয়টি এমনও বোঝাতে পারে। কেননা বিভিন্ন পক্ষের প্রেক্ষিতে সেটি হয়তবা প্রয়োজন ছিল।

সত্যি বলতে মানুষ ও জগত সৃষ্টি বিষয়ে বস্তুত মানুষের কোন জ্ঞানই নাই। এসব বিষয়ের যথার্থতা বা সত্যটি খুঁজে পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে বিজ্ঞানের পথ ধরেই মানুষকে হাঁটতে হবে। অন্য কিছু নয়। কিংবা অপেক্ষা করতে হবে পুনরুত্থানের জন্য এবং সেক্ষেত্রে পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে হবে।

বর্ণিত আদম-হাওয়া ও ইবলিসের এ ঘটনাটি কোন সাধারণ বর্ণনা নয়। কম্পিউটার যেমন তার প্রোগ্রামে লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক চলে বিষয়গুলি তেমন। ওখানেও কেউ তা পরিপালন করে। হোক সে জীব কিংবা আমাদের জ্ঞানে জড়। তাদের বৈশিষ্টই তাদেরকে তাদের মতো করে চালনা করে। যে বৈশিষ্ট সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। সেখানেও তাদের এক বিশাল জগত আছে। বিজ্ঞানীরা বিষয়গুলি জানতে ও জানাতে পারবে আজ অথবা ভবিষ্যতে।

উল্লেখিত ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ না চাইলে এমনটি হত না। আল্লাহ তার সকল কার্য কৌশলে সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে, বাইবেলের পূর্বে এ জ্ঞানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক দাবীদার নেই।

'আদমকে সেজদা কর' এটি একটি আদেশ। আবার 'এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না' এটিও একটি আদেশ। কোন আদেশের পরিপালন কোন কর্ম ও পথকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আদেশ পালিত না হলে কর্মটি থমকে দাড়ায়। সামনে অগ্রসর হতে পারে না। জানা পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন বিকল্প কি? করণীয় কি? অজানা পথটি কি? এ অবস্থা থেকে বেড় হয়ে আসার উপায় কি? পরিত্রানের উপায় কি?

প্রথম মানবের সে জ্ঞান থাকার কথা নয়। এমন রুদ্ধ হয়ে যাওয়া অবস্থা থেকে মুক্তির দু'টি পথ আছে। শাস্তি যা কঠোর বা লঘু হতে পারে, এটি একটি পথ। অপরটি ক্ষমা। এটিও মানুষের জন্য একটি শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা।

আল্লাহ পথ চলার প্রাথমিক পর্যায়ে মানবকে এসব জ্ঞান দান করেছেন। আজও মানুষ সে পথই অনুসরণ করে চলেছে। এসব মৌলিক দিক-নির্দেশনার কোন ব্যাত্যয় নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বার্তাবাহকগনের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করে মানুষকে এসব জ্ঞান ধরিয়ে দিয়েছেন বা বুঝতে সহায়তা করেছেন। এগুলি মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা।

মানুষ যদি এসবকে ছেড়ে আরও উন্নত কোন জ্ঞান আনতে পারে, তবুও এগুলিই মূল দিক-নির্দেশনা হয়ে থেকে যাবে। কেননা এ জ্ঞানের পথকে পাড়ি দিয়েই মানুষকে উন্নততর বা উচ্চতর জ্ঞানের পথে এগুতে হবে। এসব দিক-নির্দেশনা 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত'।

মানব মস্তিষ্কে আল্লাহ এসব জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে না দিলে মানুষের জন্য পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। যেমন কম্পিউটার কোন বিকল্প নির্দেশনা না পেলে কাজ করতে পারে না। বিবৃত এসব ঘটনা, গল্প বা জ্ঞানও আল্লাহর জ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

লঘু শাস্তি মানুষকে তার অপরাধবোধ থেকেও স্বস্তি দেয় [শাস্তি দ্রষ্টব্য ২.২১১, ২.২৬৪.৩]। আবার প্রদত্ত সে শাস্তির পূর্ণ পরিপালন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে

এক প্রকার তৃপ্তিও দেয় এবং মানসিক অবস্থাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

যদি মানবের পৃথিবীতে আগমনকে লঘু শাস্তিরূপে বিবেচনা করি, তবে প্রদত্ত এ শাস্তি মূলত কালিমাকে পরিচ্ছন্ন করার প্রত্যয়ে। কিন্তু অপরাধের আনুপাতিক হারে শাস্তি প্রাপ্তি তার প্রাকৃতিক কারণ, যে প্রকৃতিকে আল্লাহই এমন নিয়ম প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বলা হয়েছে,

“পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেন, অতঃপর সেটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।” (আল-কোরআন ২০:৫০)

অর্থাৎ শাস্তি তথা প্রতিটি বিষয়ই আল্লাহ সৃষ্ট নিয়মানুযায়ী অবধারিত। যদি সেটি না হয় তবে তা মানব সমাজের জন্য একটি মন্দ উদাহরণ হয়ে থাকবে এবং সেটি হবে ক্ষতিকারক। অতএব এর অন্যথা নেই। যদি কোন অন্য পথ থাকে তবে সেটি কেবল আল্লাহতা'য়ালার এখতিয়ারভূক্ত। আর তিনি যা করেন অবশ্যই সেটি খামখেয়ালিপনার অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় নয়। সূত্র বা সত্যের ভিত্তিতে করেন। যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে করেন। সৃষ্টি তথা সকলের মঙ্গলের জন্য করেন।

কেবল আল্লাহই কারও অপরাধ পরিপূর্ণভাবে রহিত করার একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য যদি তিনি সেটি কারও জন্য করার ইচ্ছে পোষন করেন। অবশ্যই সেক্ষেত্রেও তিনি সেটি কোন নিয়মকে তথা সত্যকে অনুসরণ করেই করেন। নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে অন্যায়কারীর অন্তরের ইচ্ছেকেও তিনি বিবেচনায় নেন যা মানুষ দেখতে ও জানতেও পারে না।

লঘু শাস্তি অন্যায়কারীর মধ্যে আশার সঞ্চার করতেও সক্ষম। অবশ্যই যদি সে তার অন্যায় বুঝতে পেরে তা স্বীকার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে ও পুনরাবৃত্তি না করার সংকল্প করে। আদমের ক্ষমা প্রার্থনাকে আল্লাহ সেজন্যই গ্রহণ করেছেন। তাই বলা হয়েছে, “আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।”

এটি একটি ঘটনা বা কাহিনী বা গল্পের মতো। যা কম্পিউটারে প্রবেশ করান কোন প্রোগ্রামের মতো কাজ করে। বস্তুত এটি মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে আছে পথ-নির্দেশনা (Guidance)। বাস্তব জীবনেও মানুষকে তার চলার পথে অবস্থার প্রেক্ষিতে এ পথগুলো অনুসরণ করেই চলতে হয়।

এ ঘটনার বিবরণ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহতা'য়ালা নিজ তত্বাবধানে মানবের পরীক্ষা নিয়েছেন, শিক্ষা ও জ্ঞানদান করেছেন এবং তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি মানুষের একা চলার উপযুক্ততা দেখেছেন। তবে তিনি সরাসরি তাদেরকে স্বর্গীয় সুখী অবস্থা থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ না করে একটি যৌক্তিকতা বা যৌক্তিক ভিত্তি দ্বার করিয়ে অতঃপর প্রেরণ করেছেন। যদিও আল্লাহ পূর্ব থেকেই এসব কর্মকাণ্ডের পরিণাম জানেন। কিন্তু মানুষ কিংবা ফেরেশতারা জানত না। কিন্তু এর প্রতিটি পদক্ষেপে বিবেচনা সাপেক্ষে মানবের জন্য শিক্ষনীয় আছে। বলা হচ্ছে,

"সত্যি বলতে আমি এ কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ (উপদেশ গ্রহণ) করার জন্য। অতএব কেউ আছে কি যে তা স্মরণ করে?" (আল-কোরআন ৫৪:১৭)

সত্যি বলতে মানুষ যে পৃথিবীতে আছে বা এসেছে তা কিভাবে এল? কে তাকে পাঠাল? কি উদ্দেশ্যে পাঠাল? এগুলির কি কোন সঠিক উত্তর আছে বা মানুষের জানা আছে? অথচ এসব প্রশ্ন তো একসময় ভাষাহীন মানুষের মস্তিষ্কেও খেলা করেছে!

এসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়া প্রকৃতপক্ষে মানব চিত্ত অস্থির। চিরদিন এ অস্থিরতা থাকবে এবং মানুষ উত্তর খুঁজে বেরাবে। বাইবেলে তো তবুও আদম-হাওয়া সম্পর্কিত এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। তৎপূর্বে কি মানব মনের এসব প্রশ্নের এত সুন্দর কোন সমাধান কেউ কখনও দিতে পেরেছে বা কোথাও খুঁজে পেয়েছে? উদ্ধৃত এ একটি ঘটনা যুগের পর যুগ মানুষকে কিছুটা হলেও প্রশান্তি দিয়ে এসেছে বা দিয়ে চলেছে। এমন কি সৃষ্টির বিষয়ে এটি একটি আলোচনার সূত্রপাত হলেও করেছে! এতে মানুষের জন্য অনেক শিক্ষণীয়ও আছে যা ওপরে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

ডারউইনের তত্ত্বের পূর্বে কেউ এ বিষয়ে ভিন্ন কোন মত তুলে ধরেনি। ডারউইন যা তুলে ধরেছে তাতে কি মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়েছে? কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কে সৃষ্টি করল, কেন করল ইত্যাদি?

সেখানে কোন একটি বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাঝখান থেকে কেবল একটি অধ্যায়ের কিছু অংশের প্রক্রিয়াগত দিক নিয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। যা আদম-হাওয়া সম্পর্কিত এ বিবৃতির সাথে সাংঘর্ষিকও নয় কিংবা কোন কন্ট্রাডিকশনও তৈরী করছে না। বরং পরিপূরক হয়ে কাজ করছে। 'ডারউইনের তত্ত্ব' সৃষ্টির বিশাল জগতের ক্ষুদ্র একটি অংশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা মাত্র। তবে অবশ্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ ও বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য বিবেচ্য।

পার্থিব জীবনে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। সে আবার কোন গ্রহে উত্থিত হবে কি-না জানা নেই। যদি উত্থিত হয় তবে অবশ্যই তার একটি প্রক্রিয়াও আছে। পার্থিব মৃত্যু; মাঝখানে অন্ধকার অস্তিত্ব বা জগত; অতঃপর পুনরায় উত্থান। একটি প্রক্রিয়া। সেখানে ডারউইনের তত্ত্ব কাজ করতেই পারে।

আদম হাওয়া পৃথিবীতে এসেছে। কিভাবে এসেছে আমরা জানি না। রকেটে আসতে পারে। কিংবা ডারউইনের তত্ত্বে বর্ণিত যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যুগের পর যুগ অতিবাহিত করে আদমের রূপ লাভ করতে পারে। কোন বিরোধীতা নেই। এ ব্যাখ্যাও সত্যকে খুঁজে পাওয়ার যথাযথ প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য একটি উত্তর বলা যেতে পারে।

কোরআনে ঘটনাগুলি সব এক পাতায় পাঠ করছি বিধায় বিষয়গুলি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পুরো ঘটনাটি ঘটতে যে মিলিয়ন-বিলিয়ন বছর লেগে যায়নি সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না। আবার বিষয়টি আপেক্ষিকও। কেননা মানুষের জন্য যা বিলিয়ন আল্লাহর দিক থেকে তা চোখের একটি পলক ফেলার সমান হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"... তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭) "... সেদিন (পুনরুত্থান দিবসে) মনে হবে যেন

তারা মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে।" (আল-কোরআন ৭৯:৪৬)

মূল ঘটনাটি বাইবেল থেকে নেয়া হলেও বাইবেল ও কোরআনের উপস্থাপনায় কিছু ভিন্নতা রয়েছে। কোরআনের উপস্থাপনা বিষয়টিকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, "তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে। ধূলো থেকে সৃষ্টি তোমাদেরকে ধূলোয় মিশে যেতে হবে।" কোরআনে বলা হয়েছে,

".. তোমরা সেখানেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ৭:২৫)

ফিরে যাবার বিষয়টি বাইবেল ও কোরআন দু'গ্রন্থেই উল্লেখ রয়েছে। তবে কোরআন ঘটনাটি কেবলমাত্র বিবৃত করেই শেষ করে দেয়নি, আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ কোরআন বা দিক-নির্দেশনা প্রেরণ ও নবুয়ত তথা মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের যথার্থতাকে সম্পর্কিত করে তুলে ধরেছে এবং এর মধ্য দিয়ে সফলতার সঙ্গে ফিরে যাবার একটি সম্পর্ক তৈরী করেছে। যা কিনা মানুষের সঠিক পথে চলার অপরিহার্যতাকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে এবং এর ব্যাত্যয় হচ্ছে বিফলতার কারণ। বলা হচ্ছে,

"... আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা আসবে; যারা আমার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার প্রত্যাদেশকে অস্বীকার করবে তারাই হবে অগ্নির প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।" (আল-কোরআন ২:৩৮-৩৯)

এটিই দর্শনপ্রসূত মানব জীবনের সফলতা ও বিফলতার দিক [সফলতা দ্রষ্টব্য ২.৩.১]। এ কারণেই মানুষকে সঠিক পথে চলতে হবে। কোরআন বিষয়গুলির সার্বিক জ্ঞান যৌক্তিকতার সাথে অত্যান্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে [দিক-নির্দেশনা দ্রষ্টব্য ২.২.২]।

কোরআনে ঘটনাটিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে মানুষের জন্য পৃথিবীতে সুশৃংখল ও সঠিক পথে চলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে।

বাস্তব জীবনকে যা একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে। আবার অনুপ্রাণিত করেছে। এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে মানব জীবনের সফলতার। সে কারণেই দিক-নির্দেশনার (Guidance) প্রেরণ বা অবতীর্ণতা এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন ও নবুয়ত লাভ।

দিক-নির্দেশনার অনুসরণ ও পার্থিব জীবনে মানবের ভাল কর্ম তথা সফলতার সাথে সম্পর্ক আছে পুনরায় আল্লাহর কাছে সফলভাবে ফিরে যাবার। এটিই চূড়ান্ত সফলতা। কোরআন বিষয়গুলির মধ্যে এভাবেই যথাযথ যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

➢ (আয়াত ৪০-৪৪) কোরআনে ইসরাইল বা ইহুদি (Children of Israel) জাতিকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে সূরা বাকারার ৪০ নং আয়াত থেকে সে আলোচনা শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমুহের আলোচনাতেও তাদের প্রসঙ্গে কিছু ইংগিতপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে।

৪০	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং তোমরা পূর্ণ কর আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার, তাহলে আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। আর আমাকেই ভয় কর। (O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you, and fulfil your (part of the) covenant, I shall fulfil My (part of the) covenant, and fear Me.)
৪১	যে গ্রন্থ তোমরা বর্তমানে ধারণ কর (বাইবেল বা তাওরাত ও ঈঞ্জিল), তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। এর প্রতি তোমরা প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না এবং ক্ষুদ্র মূল্যের বিনিময়ে আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অবজ্ঞা কর না এবং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। (And believe in that which I reveal, confirming that which ye possess already (of the Scripture), and be not first to disbelieve therein, and part not with My revelations for a trifling price, and keep your duty unto Me.)

৪২	মিথ্যে দিয়ে সত্যকে সংশয়াবৃত কর না কিংবা জানা সত্ত্বেও সত্য গোপন কর না। (Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth.)
৪৩	উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, দরীদ্রকে তার প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং মস্তক অবনত কর তাদের সঙ্গে যারা অবনত করে (উপাসনায়)। (Establish worship, pay the poor-due, and bow your heads with those who bow (in worship).)
৪৪	তোমরা কি মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দাও যখন তোমরা নিজেরাই তা (পালন করতে) ভূলে গিয়েছ? অথচ তোমরাও এক অবতীর্ণ গ্রন্থের পাঠক! তবে কি তোমরা বুঝবে না? (Enjoin ye righteousness upon mankind while ye yourselves forget (to practise it)? And ye are readers of the Scripture! Have ye then no sense?)

■ বিশ্লেষণ পূর্ব কিছু কথা : সূরা বাকারার ৪০ নং আয়াত থেকে ইসরাইল জাতিকে নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং ১২৩ নং আয়াত পর্যন্ত তাদের প্রসঙ্গে একটানা দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও অনেক সূরায় বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে তাদের প্রসংগ আলোচনায় এসেছে। তাদের প্রসঙ্গে সমগ্র আলোচনাকে সহজে বুঝতে হলে আয়াতভিত্তিক বিশ্লেষণের পূর্বে সামগ্রীকভাবে কিছু আলোচনা করে নেয়া প্রয়োজন।

ইসরাইল জাতির আবাসভূমি হচ্ছে কানান বা প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে। মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবে। তাহলে কোরআনে ইসরাইল জাতির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে কেন? পাঠকের মনে যৌক্তিভাবেই এমন প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাসমূহ বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে। যেমন ইসলামের আবির্ভাব ও প্রচার-প্রসারকালীন সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শুরু করে নানান সব ঘটনা ঘটেছে। সংঘটিত এসব ঘটনার

প্রেক্ষিতে কোরআনে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের জন্য নানান দিক-নির্দেশনা উঠে এসেছে।

আলোচিত এসব ঘটনার মধ্যে ইসরাইল জাতির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাই তাদের প্রসঙ্গ কোরআনে উঠে এসেছে। কোরআন ও ইসরাইলের সম্পর্ক বুঝতে হলে তাই তাদের বিষয়ে একটু বিস্তারীত আলোচনা করা প্রয়োজন।

সূরা বাকারা থেকে তাদের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, তাই এখানেই তাদের বিষয়ে কিছু প্রাসংগীক আলোচনা করে নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। যে আলোচনা সমগ্র কোরআন ব্যাপি তাদের নিয়ে আলোচিত বিষয়গুলিকে বুঝতে সহায়তা করবে।

ইসরাইল জাতির ঘটনা প্রবাহ বুঝতে হলে বাইবেল সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা আবশ্যক। কোরআনে তাদের নিয়ে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তার মূল উৎস 'বাইবেল' বিশেষত 'তাওরাত' বা 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট'। বাইবেল হচ্ছে ইসরাইল জাতিরই নানান ঘটনা প্রবাহের বিবরণ।

বাইবেল অনুসারে ইসরাইল জাতির প্রকৃত বাসস্থান হচ্ছে 'কানান' বা প্যালেষ্টাইন বা ফিলিস্তিন অঞ্চল। কিন্তু সেখানেও তারা আগন্তক। বাইবেলে সেটিও বলা হয়েছে।

ইব্রাহীম (আঃ) হচ্ছেন তাদের পূর্বপুরুষ। তিনি ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ফলে কানান তাদের নিজেদের বাসস্থান নয়। তারা সেখানে আগন্তুক। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে কানান বা ফিলিস্তিন ভূমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি (Promise) দেন। এটি বাইবেলে বলা হয়েছে। সে কারণে সেখানে তাদের বসবাসের একটি শক্ত যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে ইসরাইলিদের আবাসভূমি হচ্ছে কানান। প্রশ্ন হচ্ছে, মদীনার জীবনে ইসরাইল জাতিকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হল কিভাবে? কেন তাদের প্রসংগ কোরআনে উঠে এসেছে?

মদীনায় ইহুদিদের বসবাস না থাকলে বা আগমন না ঘটলে তাদের প্রসঙ্গ সম্ভবত কোরআনেই অন্তর্ভূক্ত হত না। ফলে কোরআনের আলোচনায় তাদের নিয়ে যত তত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে এসবের প্রয়োজন হত না। কথাটি বলার কারণ আছে।

আল্লাহ প্রথম মানব 'অ্যাডাম' বা 'আদম'-কে সৃষ্টি করেন। বাইবেল মতে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তাঁর সঙ্গীনি 'ইভ' বা 'হাওয়া'-কে সৃষ্টি করা হয়। তাদের দুই সন্তান 'এ্যাবেল' বা 'হাবিল' এবং 'কেইন' বা 'কাবিল'। কাবিল হাবিলকে হত্যা করে। পরে তাদের আরেক সন্তানের জন্ম হয়। নাম 'সেথ' বা 'শিষ'। এগুলি বাইবেলের কথা। সেখান থেকে কোরআনে এসেছে ইসরাইলিদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে।

নোয়াহ বা নূহ (আঃ) সেথ এর বংশধর। তার সময়ে পৃথিবী পাপপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে সময়ে এক মহাপ্লাবনের আবির্ভাব ঘটে। সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নোয়াহ ও তাঁর সহযাত্রীরা যে নৌকায় ছিল আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন। নোয়াহ'র তিন সন্তান হেম, সেম ও জাফেথ। মহাপ্লাবনের পরে তাদের মাধ্যমে পৃথিবীময় মানুষের বিস্তৃতি ঘটে।

ইব্রাহীম (আঃ) সেম এর বংশধর। তার জন্ম ইরাকের 'উর' নামক স্থানে। সেখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক ছিল। নোয়াহ'র পরে ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম ব্যাক্তি যিনি আল্লাহ কর্তৃক ইসলাম প্রচারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি 'আল্লাহর একত্বের' বাণী প্রচার করেন। তিনি তাঁর নিজ দেশ ইরাক থেকে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন। কিন্তু ইরাকের তখনকার শাসক 'নমরূদ' তাঁকে তথাকথিত এ অপরাধের কারণে অগ্নিতে জীবন্ত নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন।

এ ঘটনার পর তিনি তাঁর স্ত্রী 'সারাহ' ও ভাইয়ের ছেলে 'লূত' সহ মিশরে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে কানানে বসবাস করতে থাকেন। ফলে কানানে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আগন্তুক। যে কথা বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটিও তাঁর নিজ ভূমি নয়। বাইবেল মতে, এই ভূমিতে এলে আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরকে এ ভূমি প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন (লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য)।

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই পুত্র 'ইসমাইল' ও 'ইসহাক' বা বাইবেল অনুসারে 'আইজ্যাক'। আল্লাহর বাণী প্রচারে লূতকে তিনি জর্ডান অঞ্চলে, ইসহাক নবীকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এবং তার বড় ছেলে ইসমাঈলকে আরবে নিয়োজিত রাখেন। অতঃপর মক্কায় তিনি কা'বা ঘর স্থাপন করেন এবং এটিকে তার কার্যক্রমের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুই সন্তান থেকে 'ইসমাঈলি' ও 'ইসরাইলি' এ দুই জাতির সৃষ্টি হয়। হযরত ইসমাঈলের সরাসরি উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছে আরবের কুরাইশ বংশ ও আরও কিছু গোত্র। মোহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর।

'ইসরাইল' হচ্ছে 'ইসহাক' নবীর সন্তান। যিনি 'ইয়াকুব' বা বাইবেল অনুসারে 'জ্যাকব' নামে পরিচিত। অর্থাৎ ইসরাইল হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ) এর দৌহিত্র। ইসরাইল নামের অর্থ হচ্ছে– 'আল্লাহর দাস' বা 'গোলাম'। যে নাম আল্লাহ নিজেই তাকে দিয়েছেন বলে বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে।

'চিলড্রেন অব ইসরাইল' বা ইসরাইলের সন্তান বলতে ইয়াকুব নবীর বংশধরদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। ইসরাইলের উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছেন– হযরত 'ইউসুফ' বা 'জোসেফ', 'মূসা' (আঃ) বা 'মোসেস', 'দাউদ' (আঃ) বা 'ডেভিড', হযরত 'সোলায়মান' বা 'সলোমন', নবী 'ইয়াহহিয়া' বা 'জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট' এবং 'ঈসা' (আঃ) বা 'জেসাস'। তাদের সকলেই 'ইসলাম' প্রচার করে গেছেন। অর্থাৎ আর কোথাও নয়, এক আল্লাহর প্রতি মানবজাতিকে 'সমর্পন' (Surrender) করতে বলা হয়েছে।

ইসরাইলের ১২ (বার) সন্তান। সেখান থেকে তাদের বারটি বংশের উৎপত্তি হয় (লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য)। সমগ্র কোরআনের আলোচনাকে সহজভাবে বোঝার সুবিধার্থে আলোচনাটিকে আরও একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আর এটি এজন্যই করতে হচ্ছে যে, কোরআনে ইসরাইল জাতিকে নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এ আলোচনা পূর্ণাঙ্গভাবে বিষয়গুলিকে বুঝতে সহায়তা করবে।

কোরআনের সূরা নাম্বার বার। সূরা 'ইউসূফ'। সূরাটি মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং মর্ম কথাটি পাঠককে বুঝে নিতে হবে। ইসরাইল নিয়ে কোরআনে যত আলোচনা রয়েছে তার শুরু এখান থেকে। 'ইউসূফ' ইসরাইলের বার সন্তানের এক সন্তান। বাইবেলে যাকে 'জোসেফ' বলা হয়েছে।

ইউসুফ ছিলেন পিতার অত্যান্ত প্রিয় পুত্র। অপর ভাইয়েরা ঈর্ষাপরায়ন হয়ে তাঁকে হত্যা করতে চায়। তারা তাকে একটি কূঁপে ফেলে দেয়। বাইবেল অনুসারে ইসমাঈলীয়দের একটি কাফেলা তাকে কূঁপ থেকে তুলে নিয়ে মিশরে

বিক্রয় করে দেয়। সেখানে সে তৎকালীন ফেরাউনের ঘনিষ্ট হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইউসূফ মিশরে প্রতিষ্ঠা পেলে তার পিতামাতা ও ভাইদেরকে কানান থেকে মিশরে নিয়ে আসে। এটি তার হারিয়ে যাওয়ার আরও বিশ বছর পরের ঘটনা। এভাবে ইসরাইল জাতির মিশরে প্রবেশ ঘটে। যেদিন ইসরাইল ও তার সন্তানেরা মিশরে গমন করে সেদিন তারা সংখ্যায় ছিল সর্বমোট সত্তুর জন।

ইউসূফের মৃত্যুর অনেক বছর পর মিশরে ইসরাইলিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে মিশরের তৎকালীন শাসকেরা আতঙ্কিত হয়। ফলে 'ফেরাউন' তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার ফরমান/আদেশ জারী করে। সে সময় মূসা (আঃ) এর জন্ম হয়। যিনি ছিলেন ইসরাইলের বংশধর। তাকে প্রাণে রক্ষা করার জন্য একটি পাত্রে রেখে পাত্রটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

মিশরের অধিপতি ফেরাউনের স্ত্রী গোসলের সময় শিশুটিকে নদীতে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে আনে। শিশুটিকে লালন-পালনের জন্য যে পরিচারিকার কাছে দেয়া হয় সে শিশুটির প্রকৃত মাতা। শিশু মূসা শত্রুর ঘরে নিজ মায়ের কোলে লালিত-পালিত হয়। এ এক অলৌকিক ঘটনা (সিনেমার গল্পের মতো কিংবা সিনেমার গল্পগুলো এসব ঘটনা থেকে নেয়া)!

মূসা (আঃ) বয়ঃপ্রাপ্ত হন। সে সময় মিশরে ইসরাইলিরা ভীষনভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। আল্লাহ তাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি মূসা (আঃ)-কে দায়িত্ব দেন ইসরাইলিদেরকে মিশর থেকে পৈত্রিক ভূমি কানানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে পরিকল্পিতভাবে সেভাবেই গড়ে তুলেছেন সেটি কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২০:৪০-৪১)।

ফেরাউন ইসরাইলিদেরকে শ্রমিকরূপে কাজে লাগিয়ে মিশরে পিথম ও রামসেসের মতো নগর গড়ে তোলে। সে ইসরাইল জাতিকে তার শ্রমিক বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তাদেরকে তাদের নিজভূমে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মূসা (আঃ) রাতের আঁধারে ইসরাইলিদের নিয়ে কানানের পথে যাত্রা শুরু করেন। লোহিত সাগর পাড়ি দেন। ফেরাউন পিছু তাড়া করে এবং সাগরে দলবলসহ নিমজ্জিত হয়। ইসরাইল জাতি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিনাই এর মরুতে

এসে অবস্থান নেয়। এখানে এলে করণীয় বিষয়ে তারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় বলে বলা হয়েছে।

নিশ্চিত হওয়া না গেলেও একটি তত্ত্ব মতে ধারণা করা হয় যে, মিশর থেকে কানানে ফিরে যাওয়ার পথে কোন এক যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের একটি দল হেজাজ বা আরবের ভূমিতে প্রবেশ করে। এভাবে মদীনায়েও তাদের প্রবেশ ঘটে এবং তারা মদীনায় বসবাস করতে শুরু করে। এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। তবে সে প্রসঙ্গে যাব না।

মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় ইসলামের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর নিজের কুরাইশ বংশের লোকেরাই শত্রু হয়ে ওঠে। তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে বা দেশান্তরীত হতে বাধ্য হন। মদীনা ও তার আশেপাশের এলাকায় ইহুদিদের বসবাস ছিল। সেখানে তাদের শক্ত ঘাঁটি ছিল।

ইব্রাহীম (আঃ) 'আল্লাহর একত্ব ও তাঁর প্রতি সমর্পনের বাণী' নিয়ে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। ইহুদিদের নবী মুসা (আঃ)-ও 'আল্লাহর একত্ব ও তাঁর প্রতি সমর্পনের বাণী'র প্রচারক ছিলেন। তিনি ইসরাইলের সন্তানদেরকে সে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের ওপর এ আদর্শ তথা ধর্মের প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে দায়িত্ব বা নেতৃত্ব অর্পন করে গেছেন যেন তারা মানবজাতির মাঝে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেয়। কিন্তু কালের বিবর্তনে তারা তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন বা পথের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, যেমনটি সাধারণত সকল ক্ষেত্রেই হতে দেখা যায়।

মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সেই একই বাণীর প্রচারক যা ইহুদিদের নবীগণও প্রচার করে গেছেন। সকলের পথই এক। 'ইসলাম' তথা 'আল্লাহর প্রতি সমর্পন'। তারাও 'মুসলিম' বা 'এক আল্লাহর প্রতি সমর্পিত' জাতি। সত্যের এ বাণী মানবসমাজে প্রচার করা আল্লাহ নির্ধারিত এক ধারাবাহিক কার্যক্রম। জগতের সর্বত্র আল্লাহ একই বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাই বলা হয়েছে,

"এমন কোন সম্প্রদায় বা জাতি (Nation) নেই যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি।" (আল-কোরআন ৩৫:২৪)

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বা এক্ষেত্রে জটিল বিষয়টি হচ্ছে কিরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হতে হবে সেটি বোঝা। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে যে,

“যে জানে যে, কিরূপে পরমার্থের কাছে সমর্পন করতে হয়- সে স্বর্গ রাজ্য লাভ করে।” (গীতা ১৫:৫)

কোরআনে বলা হয়েছে, “আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

মহানবী (সাঃ) যা প্রচার করে গেছেন মূসা নবীর অনুসারী হিসেবে ইসরাইলের সন্তানেরা সেসব বিষয় সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর ‘একত্ব’ বা ‘তাওহীদ’ এর বাণী। মুসা (আঃ) এর অনুসারীরূপে তারাও একসময় আল্লাহর বাণী ও নির্দেশনা নিয়ে এ পথে কঠোর সংগ্রাম করেছে। আল্লাহর একত্বের ধারণা ও এর পরিপালন ও প্রতিষ্ঠায় ইসরাইল জাতি ছিল সর্বপ্রথম কঠোর ও কঠিন সংগ্রামী জাতি। তারা মানবজাতির মাঝে এ ধারণার প্রচার ও প্রসারে মুসা নবীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধও ছিল।

মহানবী (সাঃ) এর ইসলাম প্রচারকালে তাদেরকে সহযোগী হিসেবে পাওয়াটি ছিল তাই প্রত্যাশিত এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারা যেমন ছিল একটি শক্তি, তেমনি তারা ছিল সুশিক্ষিত। এছাড়াও নবুয়ত, তৌহীদের বাণী ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল এবং তারাও ছিল এক আল্লাহতে বিশ্বাসী।

সময়ের ব্যবধানে ইসরাইল জাতি তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহর দিক-নির্দেশনা থেকে সরে গিয়েছিল। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারও রক্ষা করেনি। অবতীর্ণ বাণীর মূল চেতনা থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছিল। তাদের মধ্যে নানান কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল। এমনকি তাদের মধ্যে একটি অংশ মূর্তী পূঁজারও প্রচলন করেছিল। অথচ তাদের পূর্ব-পুরুষ ইব্রাহীম (আঃ), তাদের নবী বা নেতা মুসা (আঃ) সকলেই ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। মহানবী (সাঃ) এর ইসলাম প্রচারকালে তারা মানসিকভাবে সংস্কার কার্যক্রমকে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। অথচ এমন একটা সম্ভাবনাময় শক্তি বা গোষ্ঠীকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহযোগীরূপে পাওয়াটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবী (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার আহবান জানান। কিন্তু অ-ইহুদিদেরকে তারা সম্মানের চোখে দেখত না। তারা তাদের ব্যাতিত অন্য কারও নবুয়তের প্রাপ্তিকে স্বীকারও করত না। মহানবী (সাঃ) দেশান্তর (হিজরত) হয়ে মদীনায় এলে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাই ইসলামের প্রতি আহবান তাদের মনঃপুত হয়নি। তারা আল্লাহর পথে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহযোগী না হয়ে ঘোর বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয়। বিশ্বাসীদের সঙ্গে তারা হঠকারী আচরণ করতে শুরু করে।

তাদেরকে বিরোধীতা বা ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য বারংবার আহবান করা হয়। এ আহবান করতে গিয়েই কোরআনে তাদেরকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত।

মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ ইসরাইল জাতিকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে তিনি ফেরাউনের মতো জালিম শাসকের হাত থেকে রক্ষা করেন। মিশর থেকে কানান ফেরার পথে মরুর বুকে খাদ্য ও পানিয় সরবরাহ করেন। মেঘের ছাঁয়া দান করেন। তাদেরকে মানবজাতির ওপর নেতৃত্ব প্রদান করেন। সঠিক পথে নেতৃত্ব প্রদানে সহায়তার জন্য গ্রন্থ বা দিক-নির্দেশনা (Guidance) প্রদান করেন। তাদের প্রতি তিনি অফুরন্ত অনুগ্রহ বর্ষন করেন।

যে আল্লাহ তাদের প্রতি এত অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন তারা সে আল্লাহর প্রতি করা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। তারা ভূল পথে চলেছে। তাদের পথচ্যুতির কারণে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি অর্পিত সে দায়িত্ব কোরআনের বক্তব্য বা যৌক্তিকতা অনুসারে মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর অর্পণ করেন। তাদেরকে বিরোধীতা পরিত্যাগ করে মহানবীর পথ অনুসরণ ও তাঁর সহযোগী হতে আহবান করা হয়। কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে,

"আমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে অবতীর্ণ গ্রন্থ (বিধি-বিধান), নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) ও নবুওয়ত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম; আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে পথ চলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু জ্ঞান লাভের পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে

তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন। এখন আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) আমার নির্দেশনার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না।” (আল-কোরআন ৪৫:১৬-১৮)

যে আল্লাহ ইসরাইল জাতিকে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেছেন সে আল্লাহই বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। কোরআন বলছে সর্বশেষ নবী এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। বর্তমানে আল্লাহ মহানবী (সাঃ)-কে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতিও তাদের সহমর্মী হওয়া ও সহায়তার হাত প্রসারিত করে দেয়া কর্তব্য।

কিন্তু তারা যেমন তাদের ধর্ম বা দর্শনের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভূলে গিয়েছিল তেমনি তারা অ-ইহুদিদের প্রাপ্ত নবুয়তকেও মেনে নেয়ার মতো ছিল না। তাদের ধারণা নবুয়ত প্রাপ্তির অধিকার ও যোগ্যতা কেবল তাদের।

মদীনায় বসবাসরত ইহুদিরা মোহাম্মদ (সাঃ) তথা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক ও ঘোর বিরোধীতাকারীতে পরিণত হয়। তারা মোনাফেকি বা হঠকারী আচরণ করতে শুরু করে। সূরা বাকারার প্রথমদিকেই তাই মোনাফেকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে মূলত তাদেরকেই ইংগিত করা হয়েছে। আবার বিশ্বাসীদেরকেও এমন চরিত্রের লোকদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

সমগ্র কোরআনে তাদের নিয়ে আলোচনায় তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমুহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন তারা কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। অর্থাৎ একই আল্লাহ বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তারা যেন সে পথ অনুসরণ করে এবং তাঁকে সহযোগীতা করে। সে কারণে আল্লাহর সঙ্গে করা তাদের অঙ্গীকারের বিষয়সমুহ কোরআনের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একই সাথে বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) ও বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের করা বিরূপ আচরণের কারণে বিশ্বাসীদেরকেও হতাশ না হতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। কেননা তারা তাদের নিজেদের নবী মুসা (আঃ) এর সঙ্গেও এক সময় এমন আচরণ করেছিল

বর্তমানে যা মোহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি করে চলেছে। তারা মুসা নবীকেও অনেক যন্ত্রনা ও কষ্ট দিয়েছে। নানান কারণে উদাহরণ হিসেবে তাদের প্রসংগ কোরআনের বিভিন্ন সূরায় বারবার উঠে এসেছে। তাদের ভূল বা বিচ্যুতির পরিণতি বিষয়ে তাদের প্রতি কোরআনে বিভিন্নভাবে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। তাদের অতীত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসরাইলিদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত একই ধর্ম/দর্শন প্রতিষ্ঠায় মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহযোগী হতে বা অন্য কথায় বিরোধীতা পরিহার করে সঠিক পথে ফিরে আসতে আহবান করা হয়েছে। আর এতসব কারণে কোরআনে বারবার তাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে কোরআনে একথাও বলা হয়েছে যে তাদের সকলেই এক রকম নয়। বলা হচ্ছে,

“তাদের সবাই এক রকম নয়। গ্রন্থপ্রাপ্তগণের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা রাতের গভীরে অবিচলভাবে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করে সেজদায় পতিত হয়ে। তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সঠিক আচরণের নির্দেশ দেয় এবং অশোভন কাজকে নিষেধ করে এবং ভাল কাজে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে। এরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী। তারা যে ভাল কাজই করুক না কেন তাদের সে ভাল কাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে দূরে থাকে আল্লাহ তাদের বিষয়ে অবগত।” (আল-কোরআন ৩:১১৩-১১৫)

আরও বলা হয়েছে, “মূসার সম্প্রদায়ে অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে এমনও মানুষ আছে যারা সত্যপথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।” (আল-কোরআন ৭:১৫৯)

সংক্ষিপ্ত এ বর্ণনাটি কোরআনে ইসরাইল জাতি বা ইহুদিদের নিয়ে আলোচিত বিষয়সমুহের মর্মার্থ অনুধাবনে একজন সাধারণ পাঠকের জন্য সহায়ক হবে। ৪০ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরায় তাদের বিষয়ে যা আলোচিত হয়েছে, নিচে সেসব বিষয়ে আয়াতভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল।

▪ **২.৪০.১** হে ইসরাইলের সন্তানেরা! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ, যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি : কোরআনে ইসরাইল জাতি প্রসঙ্গে

বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে তারা যাদেরকে আল্লাহ মহাপ্লাবনকালে নোয়াহর সঙ্গে নৌকায় রক্ষা করেছিলেন (১৭:৩)। তাদেরই বংশের ধারা ইসরাইল।

নোয়াহর পুত্র সাম। সামের উত্তরসূরী ইব্রাহীম (আঃ)। ইব্রাহীম (আঃ) এর দৌহিত্র ইয়াকুব নবী। ইয়াকুব নবীই ইসরাইল নামে পরিচিত। ইয়াকুব নবীর বংশধরেরারই ইসরাইল জাতি নামে পরিচিত।

ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ অনেক অনুগ্রহ করেছেন। এখানে সে কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানবজাতির মধ্যে এ জাতিকে তিনি উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাদেরকে ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। নেতৃত্ব তথা নবুয়ত দান করেছেন। পথের দিশা বা দিক-নির্দেশনা বা গ্রন্থ অর্থাৎ তাওরাত-ঈঞ্জিল প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করে ও তাদের মাঝে নবী প্রেরণ করে মানবসমাজে তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

মূসা (আঃ) এর নেতৃত্বে ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়ে কানান যাওয়ার পথেও নানান অনুগ্রহ লাভ করেছে। অন্যথায় তাদের পক্ষে মরুর বুকে বছরের পর বছর টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। চলতে পথে আল্লাহ তাদেরকে মেঘের ছাঁয়া দান করেছেন, আসমান থেকে খাদ্য সরবরাহের ব্যাবস্থা করেছেন, মরুর বুকে পানি সরবরাহের ব্যাবস্থা করেছেন।

এ আয়াতে আল্লাহ সর্বপ্রথমেই তাদের প্রতি বর্ষিত তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে; তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে নমনীয় ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়।

▪ **২.৪০.২** তোমরা পূর্ণ কর আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার (Covenant) তাহলে আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব : বাইবেল তথা ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা তোরাহ বা তাওরাতে এভাবে বলা হয়েছে যে,

"মিশর ছেড়ে আসার তৃতীয় মাসে ইসরাইলের সন্তানদের কাফেলা সিনাই এ এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। সিনাইয়ের মরুতে তারা পর্বতের দিকে অবস্থান গ্রহণ করে। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসবেন বলে জানান হয়। সকলকে পূত পবিত্র হওয়ার জন্য বলা হয়। সেদিন ছিল তাদের সিনাইয়ে উপস্থিতির

তৃতীয় দিবসের প্রভাত। বজ্র বিদ্যুৎসহ ঘন মেঘে পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়। বিকট শব্দে চতুর্দিক প্রকম্পিত হয়। সমগ্র পাহাড় কাঁপতে থাকে। সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসছেন। গড মোসেসের সঙ্গে কথা বলেন। সবাই তা প্রত্যক্ষ করে।" [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]

ঘন মেঘে আচ্ছন্নতার মাঝে সেদিন কেবল মোসেস গডের সন্নিকটে গিয়েছিল। গডের আহবানে মোসেস পর্বত চূড়ায় আরোহণ করে। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত সেখানে অতিবাহিত করে। গড স্বহস্তে লিখিত বিবিধ নির্দেশনা সম্বলিত খোদাই করা পাথরের দু'টি ফলক মোসেসকে হস্তান্তর করেন। এটিই বাইবেল উদ্ধৃত বিখ্যাত 'দশ নির্দেশনা' বা 'Ten Commandments' নামে পরিচিত। ইসরাইল জাতি এ নির্দেশনা মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। দশটি নির্দেশনা হচ্ছে নিম্নরূপ,

১. আমিই গড (আল্লাহ)। আমি ব্যাতিত আর কোন গড নেই।
২. আমি ব্যাতিত আসমান, জমিন কিংবা পানিতে কোন ছবি, মূর্তি বা কোন কিছুকেই উপাসনা করবে না।
৩. গডের (আল্লাহর) নাম নিয়ে কোনরূপ উপহাস করবে না।
৪. সপ্তাহের একটি দিন (শনিবার) সাব্বাথ দিবস। পবিত্র দিন। এ দিন সকল প্রকার কর্ম থেকে বিরত থাকবে।
৫. পিতা-মাতাকে সম্মান করবে।
৬. হত্যা করবে না।
৭. ব্যভিচার করবে না।
৮. চুরি করবে না।
৯. মিথ্যে সাক্ষী দেবে না।
১০. প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা পোষন করবে না।

ইসরাইল জাতি গডের সঙ্গে করা তাদের এসব অঙ্গীকারের কথা ভূলে গিয়ে পথচ্যূত হতে বসেছিল। বস্তুত সুষ্ঠু-সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ গঠন এবং তা ধরে রাখতে এগুলি ছিল অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক দিক-নির্দেশনা। যা কিনা সার্বজনীন এবং এগুলি সরল পথকেই নির্দেশ করে। এ

নির্দেশনাসমুহ সমাজের জন্য হিতকর ও সমাজকে শান্তিপূর্ণ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যকারণ সম্পর্কের বহুবিধ বিষয়ের সাথে এসব বিধি-বিধানের গভীর সম্পর্ক আছে। এসব বিধানের কোন একটির বিচ্যুতি মানব সমাজকে অশান্ত করে তুলতে পারে। তাই সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল মন্ত্র বা মূল সূত্র হচ্ছে এ বিধানসমুহ। এসবের কোন একটির ব্যাত্যয় সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। সময়ের সাথে যা প্রকান্ড আকার ধারণ করতে পারে। সে অর্থেই ধর্মের বিচ্যুতি অশান্তির কারণ। কেননা এ বিধানসমুহ মানব ধর্মের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। মানবসমাজ আজ যে অশান্তির মুখোমুখী তার কারণ হচ্ছে এই ধর্ম বিচ্যুতি।

ইসরাইলের সন্তানদেরকে আল্লাহর সঙ্গে করা তাদের অঙ্গীকার পালন করার কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যদি অঙ্গীকার রক্ষা করে চলে তবে আল্লাহও তাদেরকে যে ভাল জীবনের বা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা সেটি লাভ করবে। সেটিও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"(হে ইসরাইলের সন্তানেরা, স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং সুউচ্চ পর্বতকে তোমাদের সামনে রেখে বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ যেন তোমরা মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার।" (আল-কোরআন ২:৬৩)

আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ বনী-ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন ... আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, আমার বার্তাবাহকদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দাও তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ দুর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব যেগুলির তলদেশে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত। এরপরেও যে অবিশ্বাসী হবে সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত।" (আল-কোরআন ৫:১২)

বলা হয়েছে, "আল্লাহ যখন নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এই বলে যে: আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করেছি; অতঃপর

তোমাদের নিকট বার্তাবাহক আসবে তোমরা যে গ্রন্থ ধারণ কর তাকে স্বীকৃতি দিয়ে; তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকে সহায়তা করবে। তিনি বললেন: তোমরা কি একমত এ বিষয়ে এবং আমি যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করছি তা গ্রহণ করেছ? তারা বলল: আমরা একমত। তিনি বললেন: তবে সাক্ষী থেক। আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।” (আল-কোরআন ৩:৮১)

আল্লাহ সকল নবীগণের নিকট থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে এমন অঙ্গীকার নিয়েছিলেন বলে বলা হয় সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।

ইসরাইলের সন্তানেরা সিনাই এর মরুতে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের নেতা বা নবী মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণীসমূহ গ্রহণ করে। আল্লাহর বাণী মানবসমাজে তুলে ধরার জন্য তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। যেমন বলা হয়েছে, ‘আমার বার্তাবাহকদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর’। আবার বলা হয়েছে, ‘তোমাদের নিকট বার্তাবাহক আসবে তোমরা যে গ্রন্থ ধারণ কর তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাকে সহায়তা করবে।’ তাদেরকে তাদের করণীয় বিষয়সমুহ এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা বর্তমানে যে একই দায়িত্ব আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অর্পণ করেছেন তারা তাঁর সহায়ক হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও একটি সরল ও সঠিক পথ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহযোগী হয়।

আল্লাহ মানবজাতির মধ্যে তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছেন। তাদেরকে তাদের উত্তম কর্মের কারণে একসময় অফুরন্ত অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। কিন্তু তারা অঙ্গীকারসমুহ বিস্মৃত হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর বর্তমানে সে দায়িত্ব অর্পন করেছেন। দায়িত্ব অর্পন করে মানবজাতির জন্য পথ-নির্দেশনাস্বরূপ আল-কোরআন প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে ভূল পথ পরিত্যাগ করে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকারসমূহ পালন করার কথা তাই এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা আল্লাহর নির্দেশে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহযোগী হয়। তাহলে আল্লাহও তাদেরকে দেয়া উত্তম জীবনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন বলে বলা হয়েছে।

▪ **২.৪০.৩** আর আমাকেই ভয় কর (And fear Me) : মহান আল্লাহ মানুষকে জীবন চলার সঠিক পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। কোরআন সে পথ-নির্দেশনা। যে নির্দেশনা মেনে চললে সমাজ হবে শান্তিপূর্ণ। কিছু মানুষ জ্ঞানতই এসব নির্দেশনার যথার্থতা উপলব্ধি করে সে পথে চলবে। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বা প্রতিশ্রুত শাস্তির ভয়ে সে পথে চলে। তাই সরল পথের বিচ্যুতি ও কোন প্রকার মন্দ কাজের পরবর্তী পরিণাম বিষয়ে অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি এ ভয়, প্রদর্শিত সঠিক পথে অধিকাংশ মানুষকে ধরে রাখে। আর তার জন্য আল্লাহতে বিশ্বাস থাকতে বা রাখতে হবে।

আয়াতে ইসরাইলের সন্তানদেরকে আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার রক্ষা করতে বলা হয়েছে। অঙ্গীকার রক্ষা না করা বা প্রদর্শিত পথে না চলার অপর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ভয় তিরোহিত হয়ে যাওয়া। যার অপর অর্থ হচ্ছে, যে কোন প্রকারেই হোক না কেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ক্ষুন্ন বা দুর্বল হয়ে যাওয়া। যদি আল্লাহর প্রতি বা কর্মের পরবর্তী পরিণাম বিষয়ে বিশ্বাস থাকে তবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সম্ভব না।

অঙ্গীকার পালন না করা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির মূল কারণ [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। বিশেষত আল্লাহর সঙ্গে যেসব বিষয়ে অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলি পালন করলে সমাজে শান্তি বিনষ্ট হতে পারে না। তাই কারও ভয়ে ভীত হয়ে বা কোন কিছুতে প্ররোচিত হয়ে প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হতে বারণ করা হয়েছে। অন্য কেউ বা কোন বিষয়ে ভীত বা কোন প্রকার পার্থিব মোহ বা লোভে পতিত না হয়ে কেবল আল্লাহকেই ভয় করার কথা বলা হয়েছে। এ ভয়ই অঙ্গীকার পালনকে পরিপালিত করাতে পারে। ভয় ছুটে গেলে মানুষ সহজেই বিচ্যুত হয়ে যায়।

মূল বিষয়টি হচ্ছে, যে পথ প্রদর্শিত হয়েছে বা যে অঙ্গীকারে ইসরাইলের সন্তানদেরকে তথা মানুষকে আবদ্ধ করা হয়েছে, তা করা হয়েছে মানবসমাজ ও জীবনেরই মঙ্গলের জন্য। এর থেকে বিচ্যুতি সমাজ, সংসার ও জগতকে অশান্ত করে তুলবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই।

কিছু লোকের অঙ্গীকার ভঙ্গও সমগ্র সমাজকে নষ্ট করে দিতে পারে। একজনের মন্দ পথে চলা একটি ভাল নিয়মকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও মন্দ কর্মের পরিণাম বিষয়ে আল্লাহর প্রতি অন্তরে ভয় থাকতে হবে। যেন মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে। কেবল আল্লাহকেই ভয় করতে বলা হয়েছে। অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে নয়। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় সেটি কখনও বিচ্যুতির একটি উপায় সৃষ্টি করে দিতে পারে।

কোন মানুষ কিংবা কৃত্রিমভাবে প্রতির্ষ্ঠিত কোন নিয়মের ভয়েও যেন মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বস্তুত কোন মানুষ কোন মানুষের স্রষ্টা নয়। ফলে যিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে উত্তম ও যুক্তিসম্মত।

আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। অতএব তাঁকে কিভাবে ভয় করতে হবে? আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা ও তাঁর দেয়া বিধি-বিধান বা পথ-নির্দেশনা মেনে চলাই হচ্ছে তাঁকে ভয় করার নির্ধারক।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটি আল্লাহর নির্দেশনা? আল্লাহর বিধি-বিধান কি বা কোনটি? কিভাবে সেটি নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে যে এটিই আল্লাহর বিধান? সন্দেহ প্রবণ বা অবিশ্বাসীদের মনের কোনে প্রাথমিকভাবে এমন প্রশ্নের অবতারণা হতেই পারে! এতে কোন অন্যায় নেই। এগুলি মানুষের স্বভাবজাত ভাবনা যা আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ১৮:৫৪)।

কোনটি আল্লাহর নির্দেশনা এবং কোনটি আল্লাহর নির্দেশনা নয় সেটি সহজভাবে বুঝতে হলে সকল নির্দেশনাসমুহকে পরিপালনের পূর্বে ন্যায়-অন্যায়ের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হবে। কেননা আল্লাহ কোন অশ্লিল, অন্যায় ও মন্দ কাজের আদেশ দেন না (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৭:২৮-২৯, ১৬:৯০)। সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে হবে। কোরআনের সঠিক পথের নির্দেশনা সকল মানুষের অন্তরেও গেঁথে দেয়া আছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৭:২০৩)। যথাযথ মানুষের অন্তর সঠিক পথ দেখায়। কিন্তু নানান কারণে মানুষ সে নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে ও পরিণাম ভোগ করে।

এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত দিক-নির্দেশনা। তবে তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে এটি ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। যেন তারা আল্লাহ ভীতি থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারণে যেসব ভূল

কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে তা থেকে সরে আসে; অঙ্গীকার পালন করে এবং আল্লাহর বার্তাবাহক তথা মোহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর কাজে সহযোগীতা করে।

■ **২.৪১.১** যে গ্রন্থ তোমরা বর্তমানে ধারণ কর, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর : মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে মহান আল্লাহ দিক-নির্দেশনারূপে ইসরাইল জাতির প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। যেমন, তাওরাত ও ঈঞ্জিল অবতীর্ণ করেন। কালের পরিক্রমায় ঐ সকল গ্রন্থে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজেরাও নির্দেশনার যথাযথ পালন থেকে বিচ্যুত হয়।

মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর সর্বশেষ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এটি পূর্বের গ্রন্থসমুহেরই ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে পূর্বের গ্রন্থসমুহে যেসব ভূল-ভ্রান্তি প্রবেশ করেছিল কোরআন সেসবকে সংশোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহকে স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ সেগুলিকেও আল্লাহ প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা ও সত্য বার্তা বলে গ্রহণ করে। তবে ঐ সকল গ্রন্থে যেসব ভূল-ভ্রান্তি প্রবেশ করেছে কোরআন সেসব থেকে মুক্ত। তাই বর্তমানে কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে তাদেরকে আহবান জানান হয়েছে।

■ **২.৪১.২** এর প্রতি তোমরা প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না : কোরআনের বার্তার প্রতি ইসরাইলিদেরকে অবিশ্বাসী না হতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোরআনের পূর্বে ইসরাইল জাতি আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ তাওরাত ও ঈঞ্জিল প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে আসমানি গ্রন্থপ্রাপ্তির সত্যতা বিষয়ে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল। কিন্তু অবতীর্ণ বাণী বা আসমানি গ্রন্থ বা কিতাব বিষয়ে আরবের অধিবাসীগণ তেমন অবগত ছিল না।

গ্রন্থের জ্ঞানের কারণে ইসরাইলিরা সমাজে গণ্যমান্য হিসেবে পরিচিত ছিল। আরবের অধিবাসীরা কোরআন, অবতীর্ণ বাণী এসব বিষয়ে তাদের কাছে জানতে চাইত। কোরআনের বাণীর প্রতি সাধারণ আরবদের বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে স্বাভাবতই তাদের ভূমিকাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। ইসরাইলিদের সহযোগীতা শান্তি স্থাপনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আবার তাদের অসহযোগীতা লক্ষ্য অর্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাজ হবে বিপদাপন্ন। যে বিপদ থেকে তারা নিজেরাও রক্ষা পাবে না। তাদের পরিণতিও খারাপের দিকেই যাবে। তাদেরকে তাই সহযোগী হয়ে কাজ করার আহবান জানান হয়েছে।

'এর প্রতি তোমরা প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না' এ বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে একটি সুযোগ দিয়েছেন। যেন তারা যথাযথ ভূমিকা পালন করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। আবার সতর্ক করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর এবং বিষয়টি তারাও জানে।

ধন-সম্পদ, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তারা ছিল উন্নত এবং সে কারণে তারা ছিল সন্মানিত। অপর কাউকে তারা তাদের ওপরে মেনে নেয়ার মতো ছিল না। এটি কোন অস্বাভাবিক আচরণ নয়। মানব আচরণেরই এটি একটি বিশেষ দিক যা আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। কখনও কখনও মানুষ একে অন্যকে মেনে নিতে পারে না। ইসরাইলিদেরও এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তারা মনে করত নবুয়ত বা নেতৃত্ব কেবল ইসরাইলিদের মধ্য থেকেই আসবে। অইহুদিদেরকে তারা মেনে নেয়ার মতো ছিল না। অথচ গ্রন্থ সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে ইসরাইলিরা একজন নবীর আবির্ভাবের বিষয়েও অবগত ছিল। আরবদের মধ্য থেকে মহানবী (সাঃ) এর আগমন ঘটলে তারা তাঁকে মেনে নিতে পারেনি।

এতদ্বসত্বেও অর্থাৎ মানুষের একে অন্যকে মেনে না নিতে পারার এমন স্বভাব সত্বেও আল্লাহ বলছেন 'এর প্রতি' আর্থৎ মহানবী (সাঃ) আনিত কোরআনের বাণীর প্রতি তোমরা প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এভাবে বলার পেছনে কিছু যৌক্তিক ভিত্তি আছে।

ইহুদি জাতিকে যারা সন্মানের আসনে আসীন করে দিয়ে গেছেন তারা তাদেরই পূর্বসূরী যারা নিজেদের জীবনে কঠোর সংগ্রাম করেছেন। তারা নিজেদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করেন নাই। কিন্তু পূর্বতনদের কীর্তি ও পরিশ্রমের ফল বর্তমানে এ জাতির উত্তরসূরীরা ভোগ করে চলেছে। অথচ বর্তমানে তাদের জীবনে উল্লেখ করার মতো কোন কীর্তি নেই। এমনকি

আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তাদের যেসব বিষয় পরিপালন করার কথা ছিল তারা সে দায়িত্বটুকুও যথাযথভাবে পালন করে নাই। তাতেও কোন সমস্যা ছিল না। এভাবেও মানবজীবন একটা সময় পর্যন্ত পেরিয়ে যায় যতক্ষন না আল্লাহ কোনরূপ ব্যাবস্থা নেন।

এখন আল্লাহ যখন মোহাম্মদ (সাঃ) কে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তখন তাদের কর্তব্য ছিল তাঁকে সহযোগীতা করা। কিন্তু তারা সেটি করে নাই। তবে এটিও একটি প্রশ্ন যে, তারা বুঝবে কি করে যে মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহযোগী হওয়ার বিষয়টি তাদের কর্তব্যের মধ্যে পরে? তিনি একজন নবী!

এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতি কেবল ইসরাইলিদের ওপরই পতিত হয়নি। এমন জটিল পরিস্থিতিতে জগতের সকলকেই কখনও না কখনও পতিত হতে হয়। এমন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। এসব ক্ষেত্রে সঠিক ও ভূল পথকে চিনে নিতে হবে সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে। সঠিক পথ চিনে নেয়ার বিষয়টি মানুষের নিজেদেরই দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে।

সেটি ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলিয়াতের যুগ। সে যুগে আরবের অধিবাসীরা এমনকি কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবরস্থ করত। তেমন সামাজিক পরিস্থিতিতে নিঃস্বার্থ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শৃংখল মুক্তির বাণী নিয়ে যারা এগিয়ে আসে তারা আসে আল্লাহর ইচ্ছে ও ইশারায়। এটি সকল বোধসম্পন্ন মানুষেরই দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে যে, যে বার্তা আগমন করেছে সেটি কি বলে তা যাচাই করে দেখা? সেটি ভাল না মন্দ ইত্যাদি? নিঃস্বার্থভাবে ভাল হলে অবশ্যই সহযোগী হয়ে সে পথে এগিয়ে আসা উচিত। যারা সেটি করবে না তাদের প্রতি যুগে যুগে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হবেই এবং তাদের কর্ম ও আচরণ তাদেরকে ধীরে ধীরে তাদের পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। কিছু মানুষের ভূল সিদ্ধান্ত ও মন্দ আচরণের কারণে মানবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে!

নবুয়ত, আসমানী কিতাব, অবতীর্ণ বাণী ইত্যাদি বিষয়গুলি ইহুদিদের কাছে আরবদের মতো নতুন কোন বিষয় নয়। তারা পূর্ব থেকেই এসব বিষয়গুলি সম্পর্কে জানে বা অবহিত। তাই ইসরাইলিদেরকে কোরআনের বাণীর প্রতি প্রথম অস্বীকারকারী হতে বারণ করা হয়েছে। কেননা আসমানি গ্রন্থ কোরআনের প্রতি ইসরাইলিদের বিশ্বাস স্থাপন অপরাপর আরববাসীকেও বিশ্বাসী

হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এর প্রতি প্রথমেই তাদেরকে অবিশ্বাসী হতে বারণ করা হয়েছে।

▪ **২.৪১.৩** এবং ক্ষুদ্র মূল্যের বিনিময়ে আমার অবতীর্ণ বার্তাকে অবজ্ঞা কর না : আল্লাহ যে বার্তা অবতীর্ণ করেছেন সেটি সমগ্র মানব জাহানের কল্যাণের জন্য। সাময়িক বা তাৎক্ষণিক কোন লাভের জন্য এর প্রতি মিথ্যে আরোপ করে কোনরূপ সুবিধা নিতে বারণ করা হয়েছে। তাহলে সেটি সমগ্র মানব জাহানের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এটিও একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বক্তব্য বা বাণী।

তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হলেও, কখনই মানব কল্যাণহেতু গৃহীত কোন পদক্ষেপকে নিজের বা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করা উচিত নয়। তাতে হয়তবা একজন বা একটি গোষ্ঠী বা কিছু লোক কিছুদিনের জন্য লাভবান হতে পারে বা সাময়িকভাবে ভাল থাকতে পারে, কিন্তু তেমন কাজের পরবর্তী মন্দ পরিণাম তাদের প্রজন্মকেও বহন করতে হতে পারে সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। বোধসম্পন্ন মানুষ তাই তেমন কাজ করতে পারে না। তেমন মন্দ বা ভূল কাজ করা থেকে বিরত রাখায় মানবসমাজ ভূমিকা পালন করবে সেটি প্রত্যাশিত। মানুষকে তাই বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এখানে।

ইসরাইল জাতি কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে নিজেদের কল্যাণের জন্য ভাল কাজ করতে বলা হয়েছে। মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশও যদি ভূল কাজ করে তবে তার ফল অন্যদের ওপরও এসে পরতে বাধ্য। তাই সকলের মঙ্গলের জন্যই এমন মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকার পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি সকল মানুষের জন্য শিক্ষনীয় ও করণীয়। এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকা ও অন্যদেরকেও না করতে বলা কর্তব্যের মধ্যে পরে।

▪ **২.৪১.৪** এবং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর : আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা বলতে কি বুঝব? আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশনা পালন করা; তাঁর

প্রদত্ত বিধি-বিধান মেনে চলা, তাঁর সাথে করা অঙ্গীকার রক্ষা করা এ সবই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

সকল প্রকার মন্দ কাজ পরিহার করে চলা এবং ভাল পথে চলাই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত হয়। মানবজাতি বা সুনির্দিষ্টভাবে ইসরাইলিরা আল্লাহর সঙ্গে বিভিন্ন ভাল কাজ করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। বিষয়গুলি ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নবীদেরকে তাদের কাজে সহযোগীতা করা। সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে ভূল কাজ না করে তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন কর। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে করা অঙ্গীকার রক্ষা কর তথা মহানবীর কাজে সহযোগী হও এবং তাৎক্ষণিক বা ক্ষুদ্র স্বার্থে অবতীর্ণ বাণীকে অবজ্ঞা কর না।

প্রসঙ্গক্রমে ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হলেও এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। সর্বকালে জগতের সকল মানুষের জন্যই বাণীটি প্রযোজ্য। বস্তুত সকল ভাল কাজই সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করা কোন না কোনভাবে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনেরই নামান্তর যা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

▪ **২.৪২** মিথ্যে দিয়ে সত্যকে সংশয়াবৃত কর না কিংবা জানা সত্বেও সত্য গোপন কর না : এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী। যা সর্বকালে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তথাপি তৎকালীন সময় বিবেচনায় এটি সুনির্দিষ্ট কারণে ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

আসমানি গ্রন্থ বা অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে আরবদের কোনরূপ পূর্ব ধারণা ছিল না। তাদের মাঝে শিক্ষিত লোক ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ইসরাইলিদের মধ্যে সুশিক্ষিত মানুষ ছিল। তারা জানত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর যে একত্বের বাণী প্রচার করছেন তা তাদের নবী মূসা (আঃ) এর প্রচারকৃত একই আল্লাহর বাণী। কোরআনের অবতীর্ণ বাণী আল্লাহর দিক থেকে আগত।

আরবের অধিবাসীরা জ্ঞানী-গুণী হিসেবে পরিচিত ইসরাইলিদের কাছে আগমন করত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারকৃত বাণীর গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা বিষয়ে জানতে। তারা মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির সত্যতার বিষয়টিও জানতে

চাইত। ইসরাইলিরা তাদের গ্রন্থগত জ্ঞান ও বিভিন্ন নিদর্শন থেকে বিষয়ের সত্যতা জানা বা বুঝতে পারা সত্বেও অনেক সত্য গোপন করত। তারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলত না। তারা সত্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করত যে মানুষ সংশয়ে পতিত হত। প্রকৃত সত্য বুঝতে পারত না। যা মহানবীর প্রচারকৃত বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে মানুষকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করত বা সংশয়ে ফেলে দিত।

আল্লাহ এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন যে, মিথ্যে দিয়ে সত্যকে সংশয়াবৃত কর না, কিংবা জানা সত্বেও সত্য গোপন কর না। এমন আচরণ বস্তুত জীবন ও জগতের বৃহত্তর কল্যাণের পথে বাধাস্বরূপ। ভাল যে কোন উদ্যোগকেও এমন আচরণ ও কর্মকান্ড নষ্ট করে দেয়। সমাজ ও জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজ-সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হয়। যার মন্দ প্রভাব সমগ্র মানবজাতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এমন কার্যকলাপের মন্দ ফলাফল সুদুর প্রসারি হয়। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।

শিক্ষনীয় বিষয়টি হল এই যে, যদিও এটি তৎকালীন সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহুদিদের নেতিবাচক কার্যকলাপকে বিবেচনা করে বলা হয়েছে, কিন্তু কখনই সত্য বিষয়ে কারই এমন আচরণ করা উচিত নয়। তা মানবসমাজকে বিপদাপন্ন করে। এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত দিক-নির্দেশনা।

▪ **২.৪৩** উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, দরীদ্রকে তার প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং মস্তক অবনত কর তাদের সঙ্গে যারা অবনত করে (উপাসনায়) : পৃথিবীতে মানুষের কাজের মধ্যে আছে খাওয়া-দাওয়া, ঘুরা-ফিরা, আনন্দ-ফুর্তি করা ইত্যাদি। আর এসবের জন্য মানুষ নানান পথ অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে। যে ব্যাক্তিটি দু'দিন পূর্বে এ জগতে ছিল না এবং নিশ্চিতভাবে জানে যে দু'দিন পরে আবার থাকবে না সে মাঝের এ ক'দিনে কিনা করতে চায়। নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করতে চায়। অত্যান্ত মর্যাদাবান হতে চায়। অথচ অত্যাধিক মর্যাদাশীল যিনি; যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই বিস্মৃত হয়ে যায়।

মানুষ যদি যথাযথভাবে বুঝতে পারে যে এ জগতে তার মহত্বের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং যিনি তাকে মহৎ করে গড়ে তুলেছেন তাঁর

মহত্ব প্রকাশই তার একমাত্র আরাধ্য তবে সে আরও মর্যাদাবান হত। কিন্তু নানাবিধ রিপুর তাড়নায় বাস্তবে মানুষ সে প্রকৃত জ্ঞানকে ভূলে থাকে। ফলে বিধাতার একান্ত স্মরণ ও আরাধনায় যথাযথভাবে মশগুল হতে পারে না।

অহমবোধ, মর্যাদাবোধ নানা প্রকারের বোধজাতীয় রোগ মানুষকে ঘিরে ধরে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না মানুষ। মানুষ জড় জগতের মিছে মায়ায় বাধা পরে যায়। অথচ এ সবই সাময়িক। মানুষ সেটিও জানে ও বোঝে।

মানুষকে প্রকৃত বা সঠিক কাজে মনোনিবেশ করতে হলে মিছে মায়া বা বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তার জন্য নিয়ম মেনে কিছু বিধি-বিধান পালন করতে হবে। যা তাকে ভূল পথের আকর্ষন থেকে সত্যের পথে চলতে সহায়তা করবে। জগতের এত মানুষের ভীড়ে একজন মানুষের এককভাবে খুব ভাল হওয়া খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। তাই সকলের জন্য এমন ব্যাবস্থা গড়ে তোলা দরকার যা গোটা মানবজাতিকেই পার্থিব জীবনের মোহের উর্ধ্বে তুলে নিয়ে প্রকৃত সত্যের পথে নিয়ে যাবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই একই বিষয়টি সমগ্র গীতারও মর্মকথা বা মূল বক্তব্য।

সে জন্য প্রয়োজন উপাসনা [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। উপাসনা মানুষকে আল্লাহর স্মরণের পথে নিয়ে আসে। তাই একে বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। একে এমন নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা দরকার যা সর্বস্থানে সকলে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নিয়মিতভাবে পালন করবে। এর পরিপালন মানসিক থেকে শুরু করে জাগতিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে। মানসিকতাকে উচ্চে উন্নীত করে। সত্য ও ন্যায় বা আল্লাহর পথে প্রয়োজনে সংগ্রামী হতে মানুষকে সর্বদা প্রস্তুত রাখে। যা সমাজে অন্যায় ও অসত্যের প্রবেশকে প্রতিহতকরণের সহায়ক হয়ে কাজ করে। মনবলকে উচ্চে নিয়ে আসে। ভয়কে জয় করতে ভূমিকা রাখে। নিয়মিত উপাসনা পালন বা এর সঠিক চর্চা মানুষকে জাগতিক মিছে মরীচিকার ছোবল থেকে রক্ষা করে। মন্দ কর্ম থেকে দুরে থাকার সহায়ক হয়। উপাসনা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেলে তার যথাযথ পরিপালনই তাকে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

এটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী। জগতের সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য উপাসনার যথাযথ পরিপালন কাম্য ও প্রযোজ্য। তবে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে

ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে। কেননা তারা তাদেরকে প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছে। ফলে এখন মহানবী (সাঃ) যখন আল্লাহর বাণী নিয়ে আগমন করেছেন তখন তাদেরকে আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অনুসরণের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে যথাযথভাবে উপাসনা পালন করতে বলা হয়েছে। যা মন্দ পথ পরিহার করে ভাল পথে ফিরে আসতে তাদের জন্য সহায়ক হবে। তাদের সঠিক পথে ফিরে আসা অন্যান্যদেরকেও সে পথে আসতে উৎসাহিত করবে। ফলে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠাকরণে তাদের যথার্থ ভূমিকা এ পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আল্লাহ নির্দেশিত সকল ধর্মই ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সমর্পন [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। তাঁর অবতীর্ণ সকল ধর্মেই উপাসনা ও যাকাত প্রদান একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। বলা হচ্ছে,

"তারা (গ্রন্থপ্রাপ্তরা তথা মানবজাতি) বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর উপাসনা করা ও অভাবগ্রস্থদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করা ছাড়া আর কোন কিছুর জন্যই আদিষ্ট হয় নাই। এটিই প্রকৃত ধর্ম।" (আল-কোরআন ৯৮:৫)

উপাসনা যেমন আত্মিক-মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখে, তেমনি আল্লাহ নির্দেশিত যাকাত প্রদান বাস্তবে সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। মানবজাতির মধ্যে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ বেছে নিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যম দিয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তিনি নানান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অথচ এমন এক জাতি কালের পরিক্রমায় জাগতিক লোভ ও আকর্ষনে প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যে মূর্তী পূঁজারও প্রচলন শুরু হয়েছে। অথচ তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছিল।

অপরদিকে যাকাত প্রদানের পরিবর্তে তারা সূদের কারবারকে বেছে নিয়েছে বা প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। সামাজিক জীবনে যার বহুবিধ কুফল রয়েছে। যা যথাস্থানে আলোচনায় আসবে। আয়াতে উপাসনার পাশাপাশি তাদেরকে যাকাত প্রদান করার বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশনার পথে তথা সুপথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

'মস্তক অবনত কর' বলতে এক আল্লাহকে সেজদা করাকে বুঝিয়েছে। আল্লাহই প্রতিটি মানুষকে পৃথক সত্ত্বারূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেককে নিজের মতো করে তাঁর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। সকল মানুষই সমমর্যাদার অধিকারী। অতএব প্রত্যেকেই সমুন্নত থেকে কেবল আল্লাহকেই সেজদা করবে। এটিই নিয়ম। কিন্তু যার মধ্যে সে জ্ঞান বা বোধ নেই, বোধের সে অভাবের কারণে সে তারই মতো অপর একজন মানুষের ভয়ে ভীত হয়ে যায়। এমনকি তখন আল্লাহর নির্দেশও অমান্য করে। ফলে নিজ জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ থেকে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে।

একজন সমুন্নত মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহকে ভালবাসবে, তাঁর ভয়ে ভীত থাকবে এবং এর ফলশ্রুতিতে কেবল তাঁকেই সেজদা করবে। অন্য কিছুকে বা কাউকে নয়। যারা কেবলমাত্র আল্লাহকে সেজদা করে তারা জাগতিক কাউকে বা কোন কিছুর ভয়ে ভীত হয় না। লোভেও লোভী হয় না। ফলে তারা ভাল কাজ করতে পারে। মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে চাপের মুখেও বিরত রাখতে পারে। কেবলমাত্র আল্লাহকে সেজদা করার বহুবিধ উপকারীতা আছে। এখানে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপরেও যারা ভূল করবে তাদেরকে ভূল কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে।

হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে ইসরাইলিদের একটি অংশ মূর্তী পূঁজার প্রচলন শুরু করে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]। তারা পথচ্যূত হয়। তাদের মনোবল নীচু পর্যায়ে নেমে আসে। তাদের পথচ্যূতি ও মানসিক বিপর্যয় তাদেরকে ভাল কাজে বা সংস্কারমূলক কোন কাজে সাহসী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। এমন মানসিক বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে এক আল্লাহর প্রতি মস্তক অবনত করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেন কোন কু-জন কিংবা কোন কু-প্রথার কাছেও তারা মাথানত না করে। সমুন্নত হয়ে আল্লাহর নির্দেশনায় সমর্পন করে।

মহানবী (সাঃ) এর অনুসারী বিশ্বাসীরা যখন নিয়মিত উপাসনা পালন করছে, নিপীড়ন-নির্যাতন ও কুসংস্কারের বিপক্ষে সংগ্রাম বা জেহাদ করছে, তখন তাদেরকেও বিশ্বাসীদের সাথে একইভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি মস্তক অবনত করে সমুন্নত থেকে ভাল কাজে অংশীদার হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

▪ **২.৪৪** তোমরা কি মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দাও যখন তোমরা নিজেরাই তা (পালন করতে) ভুলে গিয়েছ? অথচ তোমরাও এক অবতীর্ণ গ্রন্থের পাঠক! তবে কি তোমরা বুঝবে না : এটিও একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী। নিজে যা পালন করে না, অন্যকে তা পালন করতে বলা বেমানান। এ বিষয়টি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি সঠিক কাজ ও আচরণ নয়।

গ্রন্থে যেসব জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে ইহুদিরা অপরাপরদের সঙ্গে আলোচনাকালে সেসব উদাহরণ তুলে ধরত। তাদেরকে পরামর্শ দিত। কিন্তু তারা নিজেরা সেসব পালন করত না। তাই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে। কোন মানুষেরই এমনটি করা যথাযথ কাজ ও আচরণ নয়।

➢ (আয়াত ৪৫-৪৬) আল্লাহর সহায়তা কামনা করতে হলে কি কি গুণাবলী (Patience, Prayer, Believe) থাকা প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৪৫	সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার সঙ্গে; বাস্তবিকই এটি একটি কঠিন কাজ বিনয়ী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত, (Seek help in patience and prayer; and truly it is hard save for the humble-minded,)
৪৬	যারা জানে যে তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (Who know that they will have to meet their Lord, and that unto Him they are returning.)

▪ **২.৪৫-২.৪৬** সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার সঙ্গে ... এবং তাঁরই দিকে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে : এটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। সকল মানুষের জন্য শিক্ষনীয়। কোন সমস্যা বা বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এটি দৃঢ়তার প্রতীক। এটি বিপদকে জয় করতে শেখায়। আর প্রার্থনা বা উপাসনা এ গুণ অর্জনে সহায়তা করে। এ গুণ অর্জন করা কঠিন কাজ। তবে যারা বিনয়ী তাদের জন্য সহজ।

বলা হচ্ছে, তারাই বিনয়ী যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় আছে। কেননা তারা জানে যে তাদেরকে পরিশেষে একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তাদের প্রতিটি কর্মের জন্য তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে। হিসেব দিতে হবে। তারা ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল প্রাপ্ত হবে। এ ভয়ের কারণে মানুষ মন্দ কাজ এড়িয়ে চলে বা চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ ভয় মানুষকে বিনয়ী হতে সহায়তা করে। আল্লাহর ভয় ভিন্ন যে কোন প্রকার মন্দ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করায় বস্তুত মানুষের প্রকৃতিগতভাবে কোন বাধা থাকে না। মানুষকে বিনয়ী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যা অর্জনে কোরআনের দেখান পথ সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ কোরআনের দর্শন অনুযায়ী যারা বিশ্বাসী, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে তারা বিনয়ী হতে বাধ্য। ধৈর্য্য ও অন্তরে কৃত ভয় মিশ্রিত প্রার্থনা মানুষকে সে পথে সফল হতে সহায়তা করে। বিনয়ী মানুষকে মানুষও পছন্দ করে। তারা নিজ গুণে সকলের সহযোগীতাও অর্জন করে নিতে পারে। আল্লাহ নিজেও তেমন মানুষকে পছন্দ করেন। গীতায়েও বলা হয়েছে,

“নির্ভয়তা, সত্তার পবিত্রতা, .. আত্মসংযম, .. সত্যবাদীতা, .. বিনয়-নম্রতা .. ধৈর্য্য, .. এমন সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী স্বর্গীয় বা দৈব প্রকৃতিসম্পন্ন ভাল মানুষদের মধ্যে দেখা যায়।” (গীতা ১৬:১)

ইসলামের প্রচার-প্রসারকালে ইহুদিদের সহযোগীতা প্রাপ্তির বিষয়টি মুসলিমদের দিক থেকে কাম্য ও প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের সহযোগীতা লাভ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে হঠকারী আচরণ করেছে। এ বাণী বিশ্বাসীদের প্রতি শান্তনা ও উপদেশ বার্তাস্বরূপ। ভাল কাজে কেউ সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিক কিংবা না দিক হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ধৈর্য্যের সাথে এগিয়ে চলাই যথাযথ ও উত্তম পন্থা।

সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে, সকল বাধা অতিক্রমে ধৈর্য্য ও উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা মনের শক্তিকে জাগরিত ও বৃদ্ধি করে দেয়। যা মানুষকে পথ চলতে সহায়তা করে। কারও ভরসায় না থেকে আত্মবিশ্বাসী হতে শিক্ষা দেয়। বিনয়ীরাই এ গুণে গুণান্বিত। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার

ধারণায় যে বিশ্বাসী নয় তার পক্ষে সে পর্যায়ে পৌঁছান কঠিন। সে অর্থে যথার্থই বলা হয়েছে যে, বাস্তবিকই এটি একটি কঠিন কাজ বিনয়ী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত, যারা জানে যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে।

এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। সকলের জন্য প্রযোজ্য। তথাপি এখানে বিশেষভাবে ইসরাইলের সন্তানদেরকেও ভূল পথ পরিত্যাগ করে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে যথাযথ পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকেও তাদের বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে বলা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৪৭-৪৮) ইসরাইলের সন্তান (Children of Israel) বিশেষত ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

৪৭	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি! (O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I preferred you to (all) creatures.)
৪৮	নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন (বিচার দিবস) থেকে, যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না। (And guard yourselves against a day when no soul will in aught avail another, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be received from it, nor will they be helped.)

▪ **২.৪৭** হে ইসরাইলের সন্তানেরা! ... কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি : ইসরাইল জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ বর্ষনের কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ এ জাতিকে পছন্দ বা বাছাই করে নিয়েছেন উদাহরণ হিসেবে। তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ নবুয়ত তথা নেতৃত্ব দান করেছেন। যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসা নবীর মাধ্যমে। তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন বা চলার পথ প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ তাওরাত বা তোরাহ্ তথা বাইবেল বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট প্রদান করেছেন। যা এসেছে মুসা নবীর হাত ধরে।

মিশরে অবস্থানকালীন সময়ে এ জাতি ফেরাউনের নির্মম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল। অত্যাচারের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ফেরাউন তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারী করেছিল। আল্লাহ মুসা নবীর নেতৃত্বে তাদেরকে ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজ ভূমি কানান বা প্যালেষ্টাইন বা ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে আনেন।

কানান ফিরে আসার পথে মরুর বুকে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছেন, পানির ব্যাবস্থা করেছেন। মেঘের ছাঁয়া দান করে মহান আল্লাহ তাদেরকে এমনিভাবে সহায়তা করেছেন যে, অন্যথায় মরুর বুকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য যে, আজকের মতো সে কালে আধুনিক প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধাও ছিল না! অথচ তারা সকল প্রকার সহায়তা পেয়েছে [লেখকের ‘বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল’ বইতে বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]।

এ জাতির প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের বিষয়গুলি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা সেসব স্মরণ করে নমনীয় হয় এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়। ফলশ্রুতিতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে একই আল্লাহ মানবজাতির জন্য বর্তমানে যে পথ প্রদর্শন করেছেন তাঁর প্রতি তারা বিশ্বাসী হয় এবং সহযোগীতার হাত প্রসারিত করে।

উল্লেখ্য যে, ইসরাইল জাতির বহু পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মানবজাতির সম্যক ধারণা আছে। যা আর কোন জাতির ক্ষেত্রে তেমনটি পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবী আদম-হাওয়া থেকে শুরু করে তাদের ঘটনাবলী একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাইবেলে আলোচিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের উদাহরণ মানবজাতির ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এ জাতিকে মানবজাতির জন্য এক উদাহরণস্বরূপ বেছে নিয়েছেন। তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাসে সকলের জন্য আছে শিক্ষনীয়।

ইহুদি জাতির প্রতি আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। অতএব তাদের উচিত আল্লাহ প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করা। যে পথ মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে প্রদর্শন করেছেন। যে পথ থেকে কালের বিবর্তনে তারা বিচ্যুত হয়েছে।

যখন কোন মানুষ বা কোন মানবগোষ্ঠী পথ হারিয়ে ফেলে তখন সে বা তারা ভূল পথে চলতে থাকে। পথ খুঁজে পায় না। অতঃপর একসময় ভূলই তাদের অভ্যস্থতায় পরিণত হয়ে যায়। ভূলের পাশাপাশি এটি তাদের এক প্রকার অসহায়ত্বও বটে। কেননা তখন তারা সঠিক পথে ফিরে আসার কোন উপায় খুঁজে পায় না। এমনকি ভেতর থেকেও সে শক্তিটি পায় না।

আল্লাহর ইশারায় যখন কেউ পথ প্রদর্শনে এগিয়ে আসে তখন উচিত তাকে অনুসরণ করা। তেমন যথাযথ আচরণ তাদের পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ও আন্তরীকতাকেও প্রকাশ করে। কিন্তু পথ প্রদর্শিত হওয়ার পরেও কেউ যদি ভূলেই মশগুল হয়ে থাকে তখন সেটি তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতাকে নির্দেশ করে। বস্তুত বলা যায় যে, তখন তারা একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলে। এটি একটি অপরাধপ্রবন মানসিকতা। কেননা এতে বোঝা যায় যে এমন মানুষ বা গোষ্ঠী মন থেকে সুপথে ফিরে আসতে চায় না। তাদের অন্তর মন্দ কাজগুলিকেই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে নিয়েছে। পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকা কেবল খাদ্য গ্রহণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“কেবল ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ জীবন বৃথাই জীবনধারণ।” (গীতা ৩:১৬)

মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের ফলে নব উদ্যমে ইসরাইলের সন্তান তথা ইহুদিদের সুপথে ফিরে আসার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ) একই আল্লাহর বাণী তথা তাওহীদের বাণী প্রচারণা করছেন যা তাদের নবী মুসা (আঃ) করে গিয়েছেন। তাদের উচিত এ সুযোগকে কাজে লাগান এবং সুপথে বা সঠিক পথে ফিরে আসা।

এ বার্তার মাধ্যমে প্রচ্ছন্নে মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাজে সহায়তার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসার জন্য তাদেরকে আহবান করা হয়েছে। কেননা

এমন সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর সহযোগীতা প্রাপ্তি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য তৎকালীন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় ও অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ইহুদি জাতির উত্থান-পতনের মধ্যে মানবজাতির জন্য অনেক শিক্ষনীয় আছে। এখানে সে কথাটিও মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন কেবল বিদ্বেষ পোষন নয়, বরং তাদের কর্ম ও পরিণতি থেকে/দেখে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেরাও সুপথে চলে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ একটি জাতিকে তাই উদাহরণস্বরূপ বেছে নিয়েছেন বলা যায়।

▪ **২.৪৮** নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন (বিচার দিবস) থেকে, যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না : মহান আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণকরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা প্রদর্শন করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে সে বার্তা মানব সমাজে প্রচারিত হয়েছে। ওপরের আলোচনার ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, এ কাজে সহায়তার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ইসরাইলি বা ইহুদি সম্প্রদায়কে আহবান করা হয়েছে।

ওপরে উদ্ধৃত বাণীটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। যা সকল সময়ে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানুষকে ভাল কাজ করতে ও ভাল কাজে সহায়ক হয়ে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ভাল কাজ বিপদের দিনে নিজেদেরকেই রক্ষা করে বা করবে।

এখানে বিপদের দিন বলতে সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহর বিচারের দিন বা শেষ বিচার দিবসকে বোঝান হয়েছে। যেদিন সকল মানুষের ভাল-মন্দ কর্মের হিসেব গ্রহণ করা হবে। বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে ভাল কাজ শেষ বিচার দিবসে মানুষকে সমুহ বিপদ তথা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

আল্লাহ ইসরাইল জাতির মাঝে নবী প্রেরণ, গ্রন্থ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু তারা তাদের নানাবিধ মন্দ কর্মের কারণে নিজেদেরকে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

কোরআন মানবজাতির জন্য মুক্তির পথস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। এ পথের অনুসরণ মানুষকে ভূল পথ থেকে সঠিক পথে চালিত করে বা ফিরে আসার ক্ষেত্রেও সহায়ক। বোধসম্পন্ন মানুষদেরকে তাই এ পথের অনুসরণে আহবান করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্টভাবে এখানে ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে ওপরের কথাগুলি বলা হয়েছে। কেননা ইসলামের প্রচার ও প্রসারকালীন সময়ে তারা ছিল এমন এক গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা শক্তি যাদের সহযোগীতা এ কাজের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। আবার তাদের বিরোধীতা একে কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

এখানে বলা হয়েছে যে, যে যেমন কর্ম করবে 'সেই দিন' অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসে সে কর্মের তেমন ফল পাবে। এটি একটি সতর্কবার্তা যা বিশেষভাবে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

এ বার্তার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত এ বার্তার অন্তর্নিহিতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রচারিত বার্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার প্রদর্শিত পথে আগমনের আহবান জানান হয়েছে; যা তাদের নবী মূসা (আঃ) যে পথ প্রদর্শন করেছেন সে একই পথ প্রদর্শন করে এবং যাকে যুগোপযোগী করে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

যদিও ওপরোক্ত বাণী ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে একই আচরণের কারণে মানবজাতির সকলকেই এমন এক ভয়াবহ দিবসের মুখোমুখী হতে হবে এ বার্তা সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষ যখন ভূল পথে পা বাড়ায় এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তখন অল্লাহর আশীর্বাদ বঞ্চিত হয়। এ কথাটি কেবল ইসরাইল জাতির জন্যই প্রযোজ্য নয়। ইসরাইল জাতি হচ্ছে কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস ও পরিণতি সকলের জন্যই শিক্ষনীয়। এভাবেই আল্লাহ একের ঘটনা দিয়ে অপরকে শিক্ষা দেন বা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

ভষ্যিতেও যারা এমনটি করবে অর্থাৎ কোন ভাল কাজ বা উদ্যেগে সহযোগীতা করতে দ্বিধা করবে কিংবা বাধা হয়ে দাড়াবে তাদেরও এমন

পরিণতির মুখোমুখী হতে হবে। এমনটিই হচ্ছে আল্লাহর দিক-নির্দেশনা (Guidance)।

মন্দ কর্মের পরিণতি কত ভয়াবহ(!) হবে এখানে সে বিষয়েও ইংগিত দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ সেই ভয়ে ভীত হয়ে সঠিক পথে চলে।

এ বার্তায় বিচার দিবসের ভয়াবহতা বা মানুষের অসহায়ত্বের বিষয়েও ধারণা দেয়া হয়েছে। সেদিন কেউ কারও সামান্য উপকার করতে পারবে না, কারও কোন সুপারিশ সেদিন গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে বা বিপদগ্রস্তদেরকে কোন প্রকার সাহায্যও প্রদান করা হবে না। বস্তুত মানুষের নিকট থেকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ লাভের বিষয়টি আল্লাহর কোন প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই পরে না।

এ কঠোর দিবসের বার্তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে মন্দপথ পরিহার করে বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে ভাল পথে চলতে নির্দেশ করা হয়েছে। বস্তুত পথ-নির্দেশনায় যা কিছুই বলা হোক না কেন তা সবই এক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে করা হয়েছে। আর সেটি হল- মন্দ পথ পরিহার করা এবং ভাল পথে চলা।

নিয়ম রীতি-নীতি পথ-নির্দেশনায় যাই প্রদর্শিত হয়েছে তা হয়েছে ভাল পথে মানুষকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। উদ্দেশ্যই যদি অর্জিত না হয়, তবে কোন নিয়ম-কানুনের পরিপালনই মানুষকে সেই দিবসের সূক্ষ্ম বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহর বিচার অতি সূক্ষ্ম। এমনকি তিনি মানব অন্তরের অতি গোপন বিষয় সম্পর্কেও জানেন। এ থেকে কেউই রেহাই পাবে না। তাই মানুষকে সঠিক পথে চলতে হবে পরিপূর্ণভাবে সৎ নিয়তে। যারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসতে সতর্ক করা হয়েছে।

এ বার্তা সার্বজনীন ও শাশ্বত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে এ আয়াত তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ইসরাইলিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। এটি তাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত এক সতর্কবার্তা। যেন তারা আল্লাহর সাথে করা তাদের অঙ্গীকারসমূহ পালন করে। ভূল না করে। নবীকে সহায়তা করে। অন্যথায় বিচার দিবসে তাদের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না।

এটি এজন্য যে, তাদের ভূল সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্ত করবে এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা না পেলে প্রকারান্তরে একদিন তা গোটা মানবসমাজকেই ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহপ্রাপ্ত অগ্রগামী জাতি হিসেবে সেক্ষেত্রে এর দায় তাদের ওপরও বর্তাবে।

➢ (আয়াত ৪৯-৬১) এ পর্যায়ে ইসরাইলিদের জাতীয় জীবনে সংঘটিত পূর্বতন কিছু ঘটনার (Children of Israel and Pharaoh) বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। যেন বহু পূর্বে সংঘটিত সেসব বিষয় তারা স্মরণ করতে পারে এবং কোরআনে উদ্ধৃত বিষয়সমুহের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে। ফলশ্রুতিতে কোরআনের সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এর আহবানে সাড়া দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। ভূল পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রচার ও প্রসার তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) এর সহযোগী হতে নিজ জ্ঞান ও বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

৪৯	এবং (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছিলাম ফেরাউনের কবল থেকে, যারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত রেখে কঠিন যন্ত্রনা দিত। বস্তুতঃ তা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহা-পরীক্ষা। (And (remember) when We did deliver you from Pharaoh's folk, who were afflicting you with dreadful torment, slaying your sons and sparing your women: that was a tremendous trial from your Lord.)
৫০	এবং যখন আমি তোমাদেরকে সাগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউন ও তার দলবলকে নিমজ্জিত করেছি। (And when We brought you through the sea and rescued you, and drowned the folk of Pharaoh in your sight.)
৫১	এবং যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রির নির্জনাবাস নির্ধারণ করেছিলাম, তখন তোমরা মূসার অনুপস্থিতিতে গো-বৎস বানিয়েছিলে

	(পূঁজা করার জন্য) এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (And when We did appoint for Moses forty nights (of solitude), and then ye chose the calf, when he had gone from you, and were wrong-doers.)
৫২	এতদ্বসত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (Then, even after that, We pardoned you in order that ye might give thanks.)
৫৩	এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে প্রদান করেছিলাম গ্রন্থ (তাওরাত/তোরাহ) ও নির্ণায়ক/নির্ধারক (সত্য-মিথ্যের পার্থক্য নিরূপনের জন্য) যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও। (And when We gave unto Moses the Scripture and the criterion (of right and wrong), that ye might be led aright.)
৫৪	এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! (উপাসনার জন্য) তোমরা এই গো-বৎস নির্মাণ করে তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ। এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (অপরাধীরা) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু।' (And when Moses said unto his people: O my people! Ye have wronged yourselves by your choosing of the calf (for worship) so turn in penitence to your Creator, and kill (the guilty) yourselves. That will be best for you with your Creator and He will relent toward you. Lo! He is the Relenting, the Merciful.)
৫৫	এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা! কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব।' এমনকি বজ্র-বিদ্যুৎ তোমাদেরকে ছিনিয়ে নেয়া সত্বেও, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে। (And when ye said: O

	Moses! We will not believe in thee till we see Allah plainly; and even while ye gazed the lightning seized you.)
৫৬	অতঃপর, তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (Then We revived you after your extinction, that ye might give thanks.)
৫৭	এবং আমি তোমাদের ওপর ছাঁয়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া' (এই বলে যে) সেসব ভাল বস্তু আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত: আমি তাদের প্রতি কোন ভূল করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল। (And We caused the white cloud to overshadow you and sent down on you the manna and the quails, (saying): Eat of the good things wherewith We have provided you - We wronged them not, but they did wrong themselves.)
৫৮	যখন আমি বললাম, 'এ নগরে প্রবেশ কর এবং সেখানে যা আছে তা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর বিনয়ের সাথে এবং বল, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও' তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করব। (And when We said: Go into this township and eat freely of that which is therein, and enter the gate prostrate, and say: "Repentance." We will forgive you your sins and will increase (reward) for the right-doers.)
৫৯	কিন্তু যারা ভূল করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তারা সে কথা পরিবর্তন করে দিল। অতঃপর আমি ভূল পথগামীদের প্রতি তাদের ভূল কর্মের কারণে আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করি। (But those who did wrong changed the word which had been told them for another saying, and We sent down upon the evil-doers wrath from heaven for their evil-doing.)

৬০	মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল আমি বললাম, 'স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবন। ফলে প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নিল। (বলা হল) 'আল্লাহ যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে পান কর এবং আহার কর, কিন্তু পৃথিবীর বুকে অন্যায় আচরণের দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টি কর না।' (And when Moses asked for water for his people, We said: Smite with thy staff the rock. And there gushed out therefrom twelve springs (so that) each tribe knew their drinking-place. Eat and drink of that which Allah hath provided, and do not act corruptly, making mischief in the earth.)
৬১	(স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছি (মান্না ও সালওয়া)। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদেরকে ভূমিজাত দ্রব্য (যেমন)- শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি দান করেন।' মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্য চাও? তবে তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও। তাহলেই তোমরা যা কামনা করছ তা পাবে।' তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারীদ্রতা পতিত হল। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হল। এটি এ জন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল। (And when ye said: O Moses! We are weary of one kind of food; so call upon thy Lord for us that He bring forth for us of that which the earth groweth - of its herbs and its cucumbers and its corn and its lentils and its onions. He said: Would ye exchange that which is higher for that which is lower? Go down to settled country, thus ye shall get that which ye demand. And humiliation and

	wretchedness were stamped upon them and they were visited with wrath from Allah. That was because they disbelieved in Allah's revelations and slew the prophets wrongfully. That was for their disobedience and transgression.)

▪ **২.৪৯** এবং (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্তিদান করেছিলাম ফেরাউনের কবল থেকে, যারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং স্ত্রীলোকদেরকে জীবিত রেখে কঠিন যন্ত্রনা দিত। বস্তুতঃ তা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহা-পরীক্ষা : আয়াত নং ৪৯ থেকে ৬১ পর্যন্ত ইসরাইল জাতির ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যা তাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা বর্তমান প্রজন্ম বহু বছর পূর্বের তাদের সেসব কথা বিস্মৃত হয়েছে প্রায়।

ইউসুফ নবীর ঘটনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঘটনা কোরআনের সূরা ইউসুফে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি বাইবেলেও গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হয়েছে; যেভাবে ইসরাইলের সন্তান ইউসুফ নবীর মিশরে আগমন ঘটেছিল। তৎকালীন ফেরাউনের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মিশরে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিজ দেশ কানান বা ফিলিস্তিন থেকে তিনি পিতা-মাতা ও ভাইদেরকে মিশরে নিয়ে এসে বসবাস করার সুযোগ করে দেন। এভাবেই ইসরাইলিদের মিশরে আগমন ঘটে।

ইউসুফ নবীর মৃত্যুর বহু বছর পর মিশরে ইসরাইলিদের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মিশরের তৎকালীন শাসকেরা বিষয়টিকে তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করে। তারা ইসরাইলিদের দমন-পীড়ন করতে শুরু করে। তাদেরকে শ্রমিক বানিয়ে রাখতে চায়। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে পিথম ও রামসেসের মতো নগর গড়ে তোলা হয়। কর্মক্ষেত্রেও তাদের ওপর ভীষন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তাদের জীবনকে তিক্ততায় ভরে দেয়া হয়।

এদিকে যতই তাদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি করা হয় ততই তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি সময় আসে যখন মিশরের অধিপতি ফেরাউন তাদের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ জারী করে। এখানে সে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া

হয়েছে। কিভাবে(!) আল্লাহ তাদেরকে মুসা নবীর মাধ্যমে এহেন বিপদ থেকে উদ্ধার করে আনেন! এ সবই ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ!

বলা হচ্ছে, মানব জীবনের এসব দুর্যোগ আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা। দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ কেমন আচরণ করে এবং বিপদ কেটে গেলে তার আচরণে কেমন পরিবর্তন হয় আল্লাহ তা দেখেন। এভাবেই আল্লাহ ভাল-মন্দ, কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞকে চিনে নেন।

দুর্যোগকালীন সময়ে মানবের যে নমনীয় আচরণ বিদ্যমান থাকে সেটি পরবর্তীতে অনেকে ধরে রাখতে পারে না। যারা পারে না তারা ভূল করে। যারা বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ চিত্ত হয় তারাই সফল হয়। আল্লাহ তেমন মানুষদের পছন্দ করেন। বাস্তবে মানুষও নিজেকে দিয়ে ভাবলে বুঝতে পারে যে সে নিজেও অপরের দিক থেকে তেমন আচরণই প্রত্যাশা করে। ফলে আল্লাহও তেমন মানুষদেরই উন্নতির দিকে নিয়ে যান। তারাই সফল হয়। তবে এর ব্যাতিক্রমও হয় এবং তার পেছনেও কারণ থাকে। কারণ না জেনে-বুঝে যেন মানুষ ভূলভাবে বিষয়গুলিকে না বোঝে সে বিষয়েও সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়।

মানুষ যেন তার প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহকে বিবেচনা করে হলেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় বা থাকে এবং সে কারণে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে সেটিই প্রত্যাশিত। ফলে আল্লাহ বর্তমানে যে পথ-নির্দেশনাকে মেনে চলার কথা বলছেন সে নির্দেশনাও যেন ইসরাইলের সন্তানেরা তথা মানুষ মেনে চলে এখানে এ বাণীর মাধ্যমে সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পূর্বেও বলেছি যে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন মানবজাতির জন্য। তাদের ঘটনাবলীতে আছে শিক্ষনীয়। এসব বাণীর মাধ্যমে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যেমন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে, তেমনি পরবর্তীতে অপরাপর জাতিসমুহেরও এ থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। কোরআনের বাণী তাই সার্বজনীন ও শাশ্বত।

▪ **২.৫০** এবং যখন আমি তোমাদেরকে সাগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের চোখের সামনে ফেরাউন ও তার দলবলকে নিমজ্জিত করেছি : মিশর ছেড়ে ইসরাইল জাতির কানান বা ফিলিস্তিন অভিমুখে মহা-প্রস্থানকালীন কঠিন সময় ও তাদের ওপর আল্লাহর

অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইতে বিষয়সমুহ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]।

আল্লাহ একের পর এক সতর্কতামূলক নিদর্শন প্রদর্শনের পরেও ফেরাউন ইসরাইল জাতিকে মিশর থেকে নিজভূমে ফিরে যেতে দিতে চায়নি। সে তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে রেখে দিতে চেয়েছিল। ইসরাইলিরা মিশরীয়দের সেবা করবে এটাকেই একটি নিয়মে পরিণত করা হয়েছিল।

মূসা (আঃ) রাতের আঁধারে ইসরাইলিদেরকে নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিতে মিশর ছাড়েন। এটিই 'মহাপ্রস্থান' নামে তাদের ইতিহাসে বা তাওরাতে/বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়ে লোহিত সাগর পাড়ি দেয়ার সময় ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সাগরে নিমজ্জিত হয়। আয়াতে সে বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে প্রতিটি দুর্যোগেই আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে রক্ষা করেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে! যেন তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয় ও থাকে। ফলে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে।

যে আল্লাহ তাদেরকে এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তাদের উচিত তাই আল্লাহর নির্দেশনার অনুসরণ করা। অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) এর সহযোগী হয়ে কাজ করা। কোরআনের বাণীর মাধ্যমে এসব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

▪ **২.৫১-২.৫২** এবং যখন আমি মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রির নির্জনাবাস নির্ধারণ করেছিলাম, তখন তোমরা মূসার অনুপস্থিতিতে গো-বৎস বানিয়েছিলে (পূঁজা করার জন্য) এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। এতদ্বসত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর : ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়েছে তিন মাস। সিনাই এর মরুতে অবস্থান করছে। এখানে এলে আল্লাহ মূসা (আঃ) বা বাইবেল অনুসারে মোসেসকে তুর পর্বতে আহবান করেন। মোসেস ফিরে না আসা পর্যন্ত মোসেসের বড় ভাই হারুন বা অ্যারন ও হুর তাদের দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করে।

চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ মোসেস ফিরে আসছে না। কেউ বুঝতে পারছে না মোসেসের কি হয়েছে। পথহারা ইসরাইল জাতি এ

সময় অ্যারনকে তাদের জন্য গড বানিয়ে দিতে বলে যে তাদেরকে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাবে। সকলের দাবীর মুখে অ্যারন সোনা দিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তী বানিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর সকলে আনন্দিত হয় এবং তারা এর পূঁজা বা উপাসনা করতে শুরু করে।

মোসেসের অনুপস্থিতিতে এক আল্লাহকে ভূলে গিয়ে সামান্য ক'দিনেই তারা পথচ্যুত হয়। কি প্রকারে এ জাতি পদে পদে ভূল(!) করেছে, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত(!) হয়েছে এখানে সে ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত মিশর, ফিলিস্তিন ও আশেপাশের দেশগুলিতে গরুর উপাসনা করার প্রচলন ছিল এবং ইসরাইলিরা এর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের অন্তর থেকে সে ভালবাসা তখনও সম্পূর্ণরূপে দুর হয়ে যায়নি। অর্থাৎ মুসা নবীর সময়েও এ জাতি এমনই ভূল আচরণ করেছিল। এক আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়েও পথচ্যুত হতে বসেছিল। তাদেরকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সেসব ভূল আচরণের পরিণতি হয়েছিল মন্দ। তাদেরকে বারবার একই ভূল না করতে বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে, তাদের সকল প্রকারের অপরাধ সত্বেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যেন তারা কৃতজ্ঞচিত্ত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাদের প্রতি এমনিভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। সে একই আল্লাহ বর্তমানে যে পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে তাদের উচিত তা অনুসরণ করা এবং ভূলের পুনরাবৃত্তি না করা।

▪ **২.৫৩** এবং (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে প্রদান করেছিলাম গ্রন্থ (তাওরাত/তোরাহ) ও নির্ণায়ক/নির্ধারক (সত্য-মিথ্যের পার্থক্য নিরূপনের জন্য) যেন তোমরা সরল পথ প্রাপ্ত হও : মূসা (আঃ) তুর পর্বতে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত গডের সাথে অবস্থান করেন। এ সময়ে গড মানবজাতির চলার পথের দিক-নির্দেশনাসহ খোঁদাই করা দু'টি পাথরের ফলক মোসেসকে প্রদান করেন। বাইবেলে যা 'Ten Commandments' বা 'দশ নির্দেশনা' (দ্রষ্টব্য ২.৪০.২) নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে গড সত্য-মিথ্যে, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বুঝতে মানবজাতিকে সাহায্য করেছেন এবং সহজ-সরল পথ প্রদর্শন

করেছেন। তৎপূর্বে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল না। ছিল বিভ্রান্ত। এখানে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

দিক-নির্দেশনাবিহীন দিশেহারা ইসরাইল জাতিকে মহান আল্লাহ চলার সঠিক পথের দিক প্রদর্শন করেছেন। যে পথে চললে সমাজ ও জীবন হবে শান্তিময়। এ সবই ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহস্বরূপ। তিনি তাদেরকে দিশেহারা অবস্থায় দিশা দেখিয়েছেন। তাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের বিষয়গুলি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা তারা ভূলে গিয়েছিল। তাদের উচিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হওয়া এবং বর্তমানেও আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা এবং অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে অনুসরণ করা।

▪ **২.৫৪** এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! (উপাসনার জন্য) তোমরা এই গো-বৎস নির্মাণ করে তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ। এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (অপরাধীরা) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের স্রষ্টার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য এটিই কল্যাণকর। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু : মোসেস যখন আল্লাহর আদেশে চল্লিশ দিন নির্জনাবাসে ছিলেন, ইসরাইল জাতি তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে সামান্য ক'দিনেই এক আল্লাহকে ভূলে গিয়ে পথচ্যূত হয়েছিল। তারা গো-বৎস তৈরী করে তার উপাসনায় রত হয়। মুসা (আঃ) পর্বত থেকে ফিরে এসে তাদেরকে মূর্তীর আরাধনা করতে দেখে অত্যান্ত রাগান্বিত হন। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি হাতের পাথরের ফলক দু'টি মাটিতে ছুড়ে ভেঙ্গে ফেলেন। তাদেরকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। এসব ঘটনা বাইবেলে বিবৃত হয়েছে। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

এ ঘটনার জন্য তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাইবেল অনুসারে, সে রাতে প্রায় তিন হাজার জনকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, 'এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর স্বীয় স্রষ্টার কাছে এবং (অপরাধীরা) নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও।'

ইসরাইল জাতি কি প্রকারে বারবার ভূল করেছে ও পরিণতি ভোগ করেছে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা ভূলের পুনরাবৃত্তি না করে

এবং তাদেরকে বারবার শাস্তির মুখোমুখী হতে না হয়। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বস্তুত শাস্তিভোগ হচ্ছে ভূল কর্মের পরিণতিস্বরূপ। আবার ভূলের পুনরাবৃত্তি রোধ করার নিমিত্তে গৃহিত কঠোর পদক্ষেপ। তবে পদক্ষেপ কতটা কঠোর হবে তা সম-সাময়িক সময় ও পরিবেশ-পরিস্থিতিই বলে দেয়। আগেকার সময়ে শাস্তিগুলি অনেক নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল।

এক আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অন্য কারও বা কিছুর আরাধনা করা এ দর্শনে গর্হিত পাপরূপে বিবেচনা করা হয়। তবে এরূপ বিবেচনার বিষয়টি বা দর্শনের দিকটি একেবারেই মনগড়া নয়। এর বাস্তবভিত্তিক বহুবিধ কারণ আছে। বাস্তবে 'শিরক' এর বহুবিধ কুফল আছে। আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছু সৃষ্টি করা বা তাঁর সাথে কারও অংশীদারী আরোপকরণ তথা শিরক এর পাপ এমন একটিমাত্র পাপ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। অন্য যে কোন পাপ তিনি নিজ বিবেচনায় ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ একটি পাপ সকল বড় বড় পাপের উৎস। একই সাথে এটি আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য। বিষয়গুলি যথাস্থানে আলোচনা করা হবে/হয়েছে [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে এ দর্শনের অনুসারীদের সকলেই এ একটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যুগের পর যুগ সংগ্রাম করে গেছেন। অর্থাৎ 'তাওহীদের বাণী' বা আল্লাহর একত্বের ধারণার প্রচার। অন্যকথায় শিরক না করা বা আল্লাহর সাথে আর কোন কিছুকে বা কাউকে অংশীদার গণ্য না করা।

শিরক এর পাপ ক্ষমা হয়ে গেলে মানুষ আর এ দর্শনের ওপর দাড়িয়ে থাকতে পারত না। তৎকালীন সময়টা বর্তমানের মতো ছিল না। সে সময়কালে অনেক বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে মানুষকে যেমন কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে, তেমনি শাস্তির ক্ষেত্রেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। পূর্বে অনেক নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটেছে বিধায় মানুষ যেমন নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, আবার একই সাথে মানুষের বিবেককে নাড়া দেয়ার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে নমনীয় হয়েছে। সূরা বাকারার শেষ আয়াতে তাই এমন প্রার্থনা করা হয়েছে,

"... হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ওপর

এমন বোঝা অর্পণ কর না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা কর, পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। ...।” (আল-কোরআন ২:২৮৬)

ইসরাইলের সন্তানদেরকে তাদের কৃত পূর্বতন কর্মকান্ড স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা আবার তেমন বা একই ভূলের পূনরাবৃত্তি না করে। তাহলে তাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত কোন শাস্তি নেমে আসতে পারে।

উল্লেখ্য যে, শাস্তির বিষয়টি মন্দ কর্মের পরিণতিস্বরূপ প্রকৃতির নিয়মানুসারেই নেমে আসে। প্রকৃতির নিয়ম আল্লাহর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত জাগতিক নিয়মানুসারেই নেমে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির অন্যথা হলে সেটিও অন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে।

■ **২.৫৫–২.৫৬** এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বললে, ‘হে মূসা! কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাব।’ এমনকি বজ্র-বিদ্যুৎ তোমাদেরকে ছিনিয়ে নেয়া সত্ত্বেও(!) যা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছিলে। অতঃপর, তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর : বাইবেলে বলা হয়েছে মুসা (আঃ) চল্লিশ দিন গডের সান্নিধ্যে থেকে কাফেলায় ফিরে এসে এক বিশৃংখল অবস্থা দেখতে পেলেন। দেখেন সকলে গো-বৎসের আরাধনা করছে। গো-মূর্তীর চারপাশে নৃত্য করছে। এ অবস্থা দেখে রাগান্বিত হয়ে তিনি গডের নিকট থেকে পাথরের ফলকে যে লিখিত নির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন তা মাটিতে ছুড়ে ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদান করা হয় যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনার পর তিনি ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় সত্তুরজন প্রতিনিধি নিয়ে পুনরায় গডের কাছে ফিরে যান ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে দুষ্ট প্রকৃতির কয়েকজন দাবী করে তারা সরাসরি আল্লাহকে দেখতে চায়। অন্যথায় তারা তার ওপর বিশ্বাস আনবে না।

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন তখন সকলে অজ্ঞান হয়ে যায়। এতদ্বসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে দেন। এখানে আল্লাহর প্রতি তাদের অবিশ্বাস করার প্রবনতা ও তাদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ

বর্ষনের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। যেন তারা এসব স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

এ জাতি কিভাবে তাদের নিজেদের নবী বা নেতা মুসা (আঃ)-কেও অবিশ্বাস করেছে, জ্বালাতন করেছে ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতিও যেন তারা একইরকম আচরণ না করে পূর্বের উদাহরণ তুলে ধরে তাদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বাসীদেরকেও তাদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে যেন তারা তাদের বিষয়ে ধৈর্যশীল থাকে।

■ **২.৫৭** এবং আমি তোমাদের ওপর ছাঁয়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও 'সালওয়া' (এই বলে যে) সেসব ভাল বস্তু আহার কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুত: আমি তাদের প্রতি কোন ভূল করিনি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল : ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইসরাইল জাতি মিশর ছেড়ে কানানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু কানান পৌঁছাবার পথে 'চল্লিশ বছর' তারা মরুর বুকে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এটি ছিল আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি তাদের অবাধ্য আচরণের ফল। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ চল্লিশ বছর তাদের জন্য মরুর বুকে পানি, ছাঁয়া ও খাদ্যের অফুরন্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখেন। এখানে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হযেছে।

এটি সত্যিই বিস্ময়কর বিষয় যে, লক্ষ লক্ষ কারও মতে বিশ লক্ষ বা ততোধিক পুরুষ-নারী-শিশু-বৃদ্ধ, পশু-পাখি যারা সিনাই এর মরুতে অবস্থান করছিল, তাদেরকে সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার ব্যাবস্থা ভিন্ন বছরের পর বছর মরুর বুকে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তাদের ওপর মেঘের ছাঁয়া দান করেছেন।

সিনাই এর মরুতে তারা যখন খাবার প্রার্থনা করেছিল আল্লাহ আসমান থেকে তাদের জন্য খাবার প্রেরণের ব্যাবস্থা করেন। সকালের শিশির শুকিয়ে গেলে ছোট ছোট দানার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। 'মান্না' যা রুটি জাতীয় খাবার। দেখতে অনেকটা ধনিয়ার মতো। স্বাদ মধু মিশ্রিত বিস্কুটের মতো।

এছাড়াও সালওয়া/কুইলস যা কিনা মাংশ জাতীয় খাবার। কানান আসার পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইল জাতি চল্লিশ বছর খাবার হিসেবে মান্না ও সালওয়া খেয়েছে। এত পরিমান খাদ্যের সরবরাহ ছিল যে পুরো জাতি খেয়েছে কখনও অভাব অনুভব করেনি। এ সবই তাদের প্রতি আল্লাহর বর্ষিত অনুগ্রহের নিদর্শন।

মরুর বুকে দীর্ঘ সময় অবস্থান তাদের নিজেদের আচরণের পরিণাম। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ফল এটি। আল্লাহ যখন তাদেরকে কানান প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন কিছু সংখ্যক ব্যাতিত তারা তা পালন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যার পরিণতি তাদেরকে দীর্ঘ সময় ভোগ করতে হয়েছে। এটি তাদের নিজেদের কর্ম ও আচরণের ফল। তাই বলা হয়েছে আল্লাহ তাদের প্রতি কোন ভূল করেননি।

আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। কি করতে হবে বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি ভূল করেছিল। তারা যথা সময়ে যথাযথ কাজ করেনি। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। যার পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইতে বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত আকারে অথচ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন পরবর্তীতেও আল্লাহ তাদেরকে যা নির্দেশ করছেন তা পালন করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এরও পরিণতি তাদেরকে ভোগ করতে হতে পারে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.৫৮-২.৫৯** যখন আমি বললাম, 'এ নগরে প্রবেশ কর এবং সেখানে যা আছে তা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর বিনয়ের সাথে এবং বল, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও' তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করব। কিন্তু যারা ভূল করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তারা সে কথা পরিবর্তন করে দিল। অতঃপর আমি ভূল পথগামীদের প্রতি তাদের ভূল কর্মের কারণে আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করি : এ নগর কোনটি তা নিশ্চিত নয়। তবে বাইবেল অনুসারে, ইসরাইল জাতি জেরিকোর গিলগালে এসে পৌঁছালে সর্বপ্রথম মান্না খাওয়া বন্ধ করে এবং কানান ভূমির শস্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাদেরকে

নিষ্ঠুর, নির্দয় ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের ন্যায় নগরে প্রবেশ করতে বারণ করা হয়। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও বিনয়ের সাথে নগরে প্রবেশ করার শিক্ষা বা নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী বা ভূল পথগামী ছিল তারা এ বাণী নিয়ে উপহাস করে ও নির্দেশনা অমান্য করে এবং ভিন্নভাবে কথাটিকে উপস্থাপন করে। তাদের ভূল কার্যকলাপগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যা তাদের মন্দ পরিণতির জন্য দায়ী।

ইসরাইল জাতির অন্যদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিষিদ্ধ ছিল। কেননা এতে তাদের নিজেদের গডকে ভূলে গিয়ে অন্যদের গডের ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু তারা যখন জেরিকোর বিপরীতে জর্ডান নদীর পূর্ব প্রান্তে সিট্টিমে অবস্থান করছিল তখন মোয়াব নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। বলা হয়, এ কারণে তাদের ওপর মহামারি আকারে দূর্যোগ নেমে আসে। মহামারিতে প্রায় চব্বিশ হাজার ইসরাইলির মৃত্যু হয়। তাদের ওপর আপতিত এসব দুর্যোগ তাদের নিজেদের ভূল কর্মের ফল বলে মনে করা হয়।

এখানে বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হযেছে। অর্থাৎ তারা সবসময়ই এমন ভূল কাজ করে এসেছে। নির্দেশনা অমান্য করেছে ও শাস্তি ভোগ করেছে। বর্তমানেও তাই করছে। বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা পথচ্যূত হয়েছে এমনই তাদের চরিত্র। এটি যেমন তাদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য আহবানস্বরূপ বলা হয়েছে, আবার একই সাথে তাদের আচরণ দেখে বিশ্বাসীরা যেন হতাশ বা দুঃখ না পায় সেজন্যও বলা হয়েছে।

▪ **২.৬০.১** মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল আমি বললাম, 'স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবন। ফলে প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নিল : ইসরাইলের বার সন্তান থেকে তাদের বারটি গোত্রের সৃষ্টি। মরুর বুকে অবস্থান করাকালীন সময়ে তাদের বারটি গোত্রের জন্য বারটি পানির উৎসের ব্যাবস্থা করে দেয়া হয়েছিল।

কাফেলার সদস্যরা মরুর বুকে যখন পানির জন্য হাহাকার করছিল, মুসা (আঃ) তখন গডের কাছে পানির জন্য প্রার্থনা করেন। গড তার হাতের লাঠি

দিয়ে ভূমিতে আঘাত করতে নির্দেশনা দেন। সেখান থেকে বারটি প্রস্রবন প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানি সংগ্রহের স্থান চিনে নেয়। উল্লেখ্য যে, পানির কারণে মরুর দেশে বিবাদের ঘটনা একটি নিয়মিত বিষয় ছিল।

এটি একটি আশ্চর্য্যজনক বিষয় যে সিনাই এর মরুতে ছিল তাদের জন্য পানি সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা, খাদ্যের সরবরাহ ও সূর্য্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাবস্থা। এগুলি ছাড়া বছরের পর বছর সেখানে টিকে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এ সবই ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যা বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয় ও তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে।

▪ **২.৬০.২** (বলা হল) 'আল্লাহ যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে পান কর এবং আহার কর, কিন্তু পৃথিবীর বুকে অন্যায় আচরণের দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টি কর না।' : পান কর, আহার কর কিন্তু নৈরাজ্য সৃষ্টি কর না। ভোগ-উপভোগ কিংবা আনন্দকরণে কোন অপরাধ নেই। আল্লাহ এসবে বারণ করেন নাই। কিন্তু তিনি বারণ করেছেন অন্যায়কে, অশ্লীলতাকে এবং অন্যায় কার্যকলাপের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টি তথা পার্থিব শান্তি বিনষ্ট করাকে।

ইসরাইলের সন্তানদের নানাবিধ আচরণ প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশনা বা উপদেশ দান। তিনি তাদেরকে যে খাদ্য পানিয় সরবরাহ করেছেন বলা হচ্ছে তা থেকে পান কর, আহার কর কিন্তু নৈরাজ্য সৃষ্টি কর না।

এটি এমন এক বাণী যা সার্বজনীন ও শাশ্বত। এ বাণী কেবল তৎকালীন সময়ে ইহুদি জাতির জন্যই প্রযোজ্য ছিল না। এ বাণী সকল যুগে সকল জাতি, গোত্র বা মানুষের জন্য এক উপদেশ বার্তা। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহে তুষ্ট থাকতে সকলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এটি শান্তির পথ। সরল পথে চলার এটি একটি প্রক্রিয়াও। সরল পথই শান্তির পথ।

সমগ্র বিশ্ব ব্যাবস্থা আল্লাহ পরিচালনা করেন। তিনি সব বিষয়ের ভাল-মন্দ জানেন। যেভাবে মঙ্গল হয় তিনি সেভাবে বিবেচনাপ্রসূত হয়ে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন। যারা তাতে তুষ্ট হতে পারে না তারা তাঁর যথাযথ বিবেচনাকে উপদ্রুত করে। ফলে তিনি অধিক বরাদ্দ দিলেও সাথে এমন কিছু

দিয়ে দিতে পারেন যে সেই 'আধিক্য' মানবের জন্য বিষে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তবে সকল ক্ষেত্রেই তেমন পদক্ষেপ শাস্তিস্বরূপ না। মানুষকে বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করার জন্যও কখনও কখনও এমন করা হয়ে থাকে। বলা হচ্ছে,

"... তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করে জীবনোপকরণ প্রেরণ করেন। ...।" (আল-কোরআন ৪২:২৭)

সকলকেই আল্লাহর বিবেচনায় তুষ্ট থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় ক্ষণস্থায়ী জীবন পার হয়ে যাবে কেবল প্রাপ্তির আকাংখায়, অথচ কোনদিনও প্রাপ্তি নাও ঘটতে পারে। পূর্ণাঙ্গ জীবনটাই তখন ব্যার্থ হয়ে যাবে। জীবনোপকরণ নিয়ে অতৃপ্ত হতে বারণ করা হয়েছে। আবার এ নিয়ে জগত সংসারে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতেও বারণ করা হয়েছে। দুটোই মানব জীবনের শান্তি নষ্ট করার অন্যতম উপাদান। তবে নিজ গুণ ও যোগ্যতায় যথাযথ পথে অর্জনের চেষ্টা করা যেতে পারে এবং সেটি করতেই হবে। সেক্ষেত্রে অনৈতিক পথ পরিহার করে চলতে হবে। এগুলিই কোরআনের শিক্ষা বা পথ-নির্দেশনা। তাই তো কোরআন মানব জীবনের জন্য কেবল পথ-নির্দেশনাই নয়, ন্যায্যতার বার্তার কারণে এক তুলনাহীন প্রেরণা!

ইসরাইল জাতির জন্য আল্লাহ অফুরন্ত অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। কিন্তু একই সাথে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে তাদেরকে বারণ করে দিয়েছেন। এটি কেবল ইসরাইল জাতির জন্যই প্রযোজ্য বার্তা নয়। এটি মানব সমাজের সকলের জন্য প্রযোজ্য শাশ্বত সতর্কবার্তা।

■ **২.৬১.১** (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্যে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছি (মান্না ও সালওয়া)। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদেরকে ভূমিজাত দ্রব্য (যেমন)- শাক-সব্জি, কাঁকড়, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি দান করেন।' মূসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্ট দ্রব্যের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দ্রব্য চাও? তবে তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও। তাহলেই তোমরা যা কামনা করছ তা পাবে।' : ইসরাইল জাতি মরুর বুকে চল্লিশ বছর অবস্থান করাকালীন সময়ে একই খাদ্য খাবার হিসেবে গ্রহণ করেছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন

২:৫৭)। মান্না ও সালওয়া। তারা একই প্রকারের খাবারে অতিষ্ট ও অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিল।

তাদের এ দুর্গতি হওয়ার কথা ছিল না। তারা বহু পূর্বেই কানান নগরীতে প্রবেশ করতে পারত এবং নানারূপ ভূমিজ খাদ্য গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তাদেরকে যখন সে নগরীতে প্রবেশ করতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন তখন তারা তা অমান্য করেছিল। সে কারণে মরুর বুকেই তাদেরকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর থাকতে হয়েছে এবং একই খাবার খেতে হয়েছে। মরুর বুকে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

যখন তারা খাদ্যের বিষয়ে মূসাকে তাদের অধৈর্য্যের বিষয়টি জানাল, তখন তিনি তাদেরকে তাদের ভূল কাজের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন এবং এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে তাদেরকে কোন নগরীতে উপনীত হতে হবে বলে জানান। কোন নগরীতে প্রবেশের অর্থই হল যুদ্ধ মোকাবেলা করা। যা তারা একসময় ভীত হয়ে করতে অস্বীকার করার কারণেই তাদের আজকের এ পরিণতি। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার পরিণতি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এখনও যেন তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য না করে এর মাধ্যমে সে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

তাদের জাতীয় জীবনের নানাবিধ ঘটনা, আচার-আচরণ, ভূল-ভ্রান্তি তুলে ধরে তাদেরকে বর্তমানে একই ভূলের পুনরাবৃত্তি না করতে বলা হয়েছে। এসব ঘটনার স্মরণ মূলত তাদের প্রতি সতর্কবার্তা। ভূল পথ পরিহার করে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর একই আল্লাহ যে নির্দেশনা অবতীর্ণ করেছেন তা অস্বীকার করতে বারণ করা হয়েছে এবং একই সাথে তা গ্রহণ করে নিয়ে তাঁকে সহযোগীতা করতেও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

▪ **২.৬১.২** তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও দারীদ্রতা পতিত হল। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হল। এটি এ জন্য যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীসমূহ অবিশ্বাস করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল : হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল জাতি বিভক্ত হয়ে যায়। এক ইসরাইল জাতি ‘ইসরাইল’ ও ‘জুডাহ’ এ দুভাগে বিভক্ত হয়। তারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও

খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়। নবীদের পরামর্শ ও উপদেশ অগ্রাহ্য করে। আল্লাহকে পরিত্যাগ করে একদল মূর্তী পূঁজার প্রচলন করে। এলিজা, হানানি, মিকাইয়াহ, জাকারিয়া, জেরেমিয়াহ প্রমুখ নবীদের ওপর অত্যাচার করে।

নবী ইয়াহহিয়া বা জন দা ব্যাপ্টিষ্টকে সামান্য এক নর্তকীর অনুরোধে অকারণে হত্যা করে। যিশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে। তাদের ইতিহাসের কলংকজনক অধ্যায়গুলি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন তারা অতীতে যেসব মন্দ কাজ করেছে তার পুনরাবৃত্তি না করে।

অন্যায় কার্যকলাপের কারণে তাদের ওপর শাস্তি পতিত হয়েছে। তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। আল্লাহর বার্তায় তাদের ক্রমাগত অবিশ্বাস ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা এবং তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছিল বলে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এখনও যেন তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী বিশ্বাসী ভাইদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র না করে এবং ভূল পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসে আল্লাহর বার্তার মাধ্যমে তাদেরকে সে আহবান করা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৬২) মানুষের ভাল কর্মই (Right Deeds) মানুষকে উন্নীত করে। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

৬২	(হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাসী এবং যারা ইহুদি, খ্রীষ্টান ও সাবেয়ী (সাবেয়ী হচ্ছে নবী ইয়াহহিয়া বা জন দ্যা ব্যপ্টিষ্ট এর অনুসারীগণ; এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে) তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে– অবশ্যই তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে এবং তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (Lo! Those who believe (in that which is revealed unto thee, Muhammad), and those who are Jews, and Christians, and Sabians – whoever believeth in Allah and the

	Last Day and doeth right – surely their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them neither shall they grieve.)

▪ **২.৬২** (হে মোহাম্মদ) তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাসী ... না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে : ইতিপূর্বে ইসরাইল জাতির জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া নানাবিধ ঘটনার কিছু কিছু উদ্ধৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে ভূল কাজ করা ও তার পরিণতি ভোগের বিষয় তাদেরকে ও তাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ভূল পথে চলার কারণে তাদের সমগ্র জাতিকে চল্লিশ বছর মরুর বুকে নিদারুণ কষ্ট করতে হয়েছে। বলা হচ্ছে, এ সবই আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ফল।

বর্তমানে আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যে নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, তাতে যারা অবিশ্বাসী হবে বা আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে তারাও ভবিষ্যতে তাদের ভূল কর্মের পরিণতি দেখতে পাবে। আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। আল্লাহর আদেশ মান্য করার অপর অর্থই হচ্ছে ভাল বা সঠিক কাজ করা এবং অমান্য করার মানে হচ্ছে ভূল বা মন্দ কাজ করা। আর ফলাফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মটিই হচ্ছে মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ পালন করা বা না করার বিষয়টি ভাল বা মন্দ কাজে নিজেদের জড়িত থাকা বা না থাকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

উদ্ধৃত আয়াত থেকে এটিই স্পষ্ট যে, যে যে বিশ্বাসই অনুসরণ করুক না কেন কিংবা যে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন কর্ম যদি ‘ভাল’ হয় তবে তার ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। ভাল কাজটিই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। সে তার কর্মের পুরস্কারস্বরূপ উত্তম ফলাফল লাভ করবে। অতএব ভাল কাজ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে সে মূল বক্তব্যটি উঠে এসেছে। আল্লাহ ও শেষ দিবসে বা পরকালে বিশ্বাস সেক্ষেত্রে মানুষকে ভাল পথে ধরে রাখতে সহায়তা করে। তাই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস এমন দু’টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে বা মেনে নিলে কেউই কখনও মন্দ কাজ করতে পারে না। তাই

এ সূত্র মেনে চললে একজনকে ভাল বলে ধরে নিতে হয়। জগতের বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতগুলি লক্ষণ থেকেই মানুষের রকমভেদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে হয়। বিষয়টি অনেকটা তেমন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে এখানে ভাল-মন্দ চিহ্নিতকরণের নির্ণায়করূপে ধরে নেয়া হয়েছে। তাই বিষয়টিকে একটি সূত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা দ্বারা ভাল ও মন্দ চিনে নেয়া সহজ হয়। সূত্র অনুসারে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শব্দগুলি দ্বারা বস্তুত ভাল ও মন্দকে বোঝান হয়ে থাকে অন্য কিছু নয়।

আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসের মূল লক্ষ্যই হল মানুষকে সুপথে চালনা করা ও ধরে রাখা। মানুষের দ্বারা ভাল কাজ সম্পাদন হওয়াকে নিশ্চিত করা। কেননা এর সাথে পূর্ণাঙ্গ দর্শনের কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত আরও অনেক বিষয় আছে যার প্রতিটির পরিপালন মানুষকে ভাল পথে নিয়ে যেতে বাধ্য। তবে বিষয়গুলিতে অবশ্যই সত্যিকারভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং দর্শনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও যথাযথ হতে হবে। বিচার দিবসে শাস্তির ভয় এবং ভাল কাজের পুরস্কার প্রাপ্তির আশা দুটোই মানুষকে ভাল পথে চালিত করে। সে কথা কোরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে); যারা আল্লাহকে ভয় করে এতে তাদের দেহ শিহরীত হয়। ফলস্বরূপ তাদের দেহ ও মন আল্লাহর সতর্কবার্তায়/স্মরণে বিনম্র হয়। এমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা ...।” (আল-কোরআন ৩৯:২৩)

উল্লেখ্য যে, কোরআনে যতবার আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, ততবারই ‘ভাল কাজ’ করার কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত ভাল কাজটি মূল। তাই বলা হয়েছে যে, নিজ নিজ বিশ্বাসে থেকে হলেও মানুষকে ভাল পথে চলতে হবে- ভাল কাজ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“... সেদিন তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা ‘স্বীয় বিশ্বাস’ অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ...” (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

মন্দ কাজ করে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখাও অর্থহীন। অথচ যে ভাল কাজ করে তাকে কোন কারণেই কোনরূপ দোষে দোষারোপ করা যায় না বা করা সম্ভব না। বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ব্যাতিক্রম মানুষকে ভাল কাজ ব্যাতিতই পুরস্কার পাওয়ার মিথ্যে আশায় আশান্বিত করবে এবং মানুষকে ভূল ব্যাখ্যায় ভূল পথে চলতে উৎসাহিত করবে। অতএব এটিই হচ্ছে জ্ঞানের সহজ-সরল বুঝ ও পথ।

যে যে ধর্মই পালন করুক না কেন ভাল পথেই মানুষকে চলতে হবে যদি সত্যিই কেউ ভাল কিছু প্রাপ্তির আশা রাখে। ভাল কাজ সম্পন্নকারীদের জন্য আল্লাহর কাছে যথাযথ মর্যাদা ও পুরস্কার আছে। এটি কোরআনের একটি সুস্পষ্ট বার্তা।

যারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস রাখে এবং ইহুদি, খ্রীষ্টান ও সাবেয়ী- যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করবে, তারা তাদের ভাল কাজের কারণেই ভীতিগ্রস্ত হবে না। তেমন মানুষদের দ্বারা মন্দ কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব না।

পৃথিবীতে নানান ধরণের মানুষ আছে। কিছু মানুষ জ্ঞানের কারণেই ভাল কাজ করে। ভাল পথে চলে। তারা ভাল-মন্দের পরিণাম জানে ও বোঝে। আবার বিশাল জনসংখ্যার ব্যাবস্থাপনায় জ্ঞানই সবকিছুর একমাত্র নির্ধারক নয়। বিশ্বাস দ্বারাও কিছু মানুষ ভাল পথে চালিত হয়। আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস তেমন মানুষদেরকে দিয়ে ভাল কাজ করায় এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে দুরে রাখে। ফলে বাস্তব জীবনে দুটো বিষয়ই সমগুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলিকে এভাবে সহজ-সরলভাবে বুঝতে হবে।

যারা 'ভাল কাজ' করবে এবং মন্দ কাজ থেকে দুরে থাকতে পারবে বলা হচ্ছে যে, তাদের অন্তর ভীতিগ্রস্ত হবে না (দ্রষ্টব্য ২.২৬২.২)। বস্তুত বিচার দিবসে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার একমাত্র কারণই হচ্ছে পার্থিব জীবনে করা 'মন্দ কাজ'। অতএব যারা জানে যে তারা কোন মন্দ কাজ করেনি তাদের ভীতির কোন কারণ থাকতে পারে না। সে কারণেই এভাবে বলা হয়েছে যে, "তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।"

বিষয়টি একজনের জ্ঞান ও জ্ঞানসৃষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথেও সম্পর্কিত। সঠিক জ্ঞান ও ভাল কাজই সে বিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাই তারা নিজেরাই ভীতিগ্রস্ত হয় না। কিংবা মন্দ কাজজনিত কোন ভয় তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করে না।

তেমন একজন বুঝতে পারে যে, বিধাতার বিচার যদি থেকেই থাকে তবে সে নিরাশ হবে না। কেননা সে মন্দ কাজ করেনি। এ বিশ্বাসের কারণে তার মনে কোন কষ্টও অনুভব হবে না। এগুলি মনোবিজ্ঞানের সূত্র বলা যেতে পারে। যা আত্মবিশ্বাস ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। যথাযথ ও যৌক্তিক জ্ঞান ভিন্ন আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। এগুলি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী।

উল্লেখ্য যে, এখানে এ বাণীটি একটি বিশেষ কারণে উদ্ধৃত হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ে সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে কিছু ভূল ধারণা ও অপব্যাখ্যার প্রবেশ ঘটেছিল। সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে এমন ধারণা বা বিশ্বাসের জন্ম দেয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তারা ইসরাইলের সন্তান এবং সম্মানিত বার্তাবাহকগণের সাথে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, অতএব স্বর্গীয় উদ্যান কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত; জগতের অপরাপরদের জন্য নয়। জ্ঞান বিবর্জিত এমন ধারণা ও বিশ্বাসই যথাযথ ধর্ম থেকে তাদের বিচ্যূতির কারণ।

আল্লাহ এ বাণীর মাধ্যমে তাদের সে ভূল ধারণাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া বা থাকা, কিংবা কোন মহান ব্যাক্তিত্বের সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্টতা এসবের দ্বারা আল্লাহর বিচারে মুক্তি মেলে না বা মিলবে না।

প্রতিটি মানুষকে কর্মে ভাল হতে হবে নিজের মঙ্গলের জন্য। বস্তুত মানুষের ভাল কর্মই তাকে উন্নীত করে। এগুলি আল্লাহর সুস্পষ্ট বার্তা এবং মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। কেউ যেন এসব সত্যের বার্তার সহজ-সরল ও যথাযথ অনুধাবন ও উপলব্ধিতে কথার মারপ্যাঁচে কোনরূপ বিকৃতি ঘটাতে না পারে সেজন্য মানুষকেই সচেতন থাকতে হবে।

➢ (আয়াত ৬৩-৬৪) ইসরাইল জাতির পূর্বের কিছু ঘটনা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে তাদের করা অঙ্গীকার (Children of Israel and Covenant) ও আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

৬৩	এবং (হে ইসরাইলের সন্তানেরা, স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং সুউচ্চ পর্বতকে তোমাদের উচ্চে তুলে ধরে বলেছিলাম, তোমাদেরকে যে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ যেন তোমরা মন্দ কাজ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার। (And (remember, O Children of Israel) when We made a covenant with you and caused the mount to tower above you, (saying): Hold fast that which We have given you, and remember that which is therein, that ye may ward off (evil).)
৬৪	তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গিয়েছ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যদি তোমাদের ওপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে। (Then, even after that, ye turned away, and if it had not been for the grace of Allah and His mercy ye had been among the losers.)

■ **২.৬৩-২.৬৪** এবং যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ... তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে : ৬৩ নং আয়াত থেকে ৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত ইসরাইল জাতির পূর্বের (ঐতিহাসিক) কিছু ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

সে সময়ের ঘটনা প্রবাহকে বাইবেলে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইসরাইলিরা মিশর ছেড়ে সিনাইতে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। সিনাইয়ে তৃতীয় দিবসের সকাল। বজ্র-বিদ্যুতসহ পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারিদিক ধোঁয়ায় নিমজ্জিত হয়। বিকট আওয়াজে চতুর্দিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সমগ্র পর্বত ভীষনভাবে কাঁপতে থাকে। সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। কেউ পালাতে চেষ্টা করে। কেউবা দুর থেকে দেখার চেষ্টা করে। গড সিনাই পর্বতের চূড়ায় নেমে আসছেন। ঘন মেঘে আচ্ছন্নতার মাঝে সেদিন কেবল মোসেস গডের সান্নিধ্যে গিয়েছিল। ইসরাইলিরা সকলে তা প্রত্যক্ষ করে।

মোসেস গডের কাছে অবস্থান করে। গড তাদের জন্য স্ব-হস্তে লিখিত দিক-নির্দেশনা সম্বলিত পাথরের ফলক প্রদান করেন (দ্রষ্টব্য ২.৪০.২)। সে

সময়ে তারা গডের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। যার মূল বক্তব্য ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এসব অঙ্গীকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা। যা সামাজিক জীবনে শান্তিকে ধরে রাখার জন্য অপরিহার্য্য। ভাল-মন্দের শাশ্বত, সার্বজনীন ও মৌলিক দিক-নির্দেশনা এগুলি।

ইসরাইল জাতি তারপরেও কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলেনি। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হয়েছেন। দয়া প্রদর্শন করেছেন। অন্যথায় তারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হত। এখানে আল্লাহ সেসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

➢ (আয়াত ৬৫-৬৬) ইসরাইল জাতির পূর্বের কিছু ঘটনা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। 'সাব্বাথ' দিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে (Children of Israel and Sabbath)। আল্লাহর সঙ্গে তাদের করা অঙ্গীকার ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

৬৫	এবং তোমরা তাদেরকে ভালভাবেই জান যারা 'সাব্বাথ' (শনিবার দিবসের বিষয়টি) ভঙ্গ করেছিল। কিরূপে আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও!' (And ye know of those of you who broke the Sabbath, how We said unto them: Be ye apes, despised and hated!)
৬৬	এবং আমি এ বিষয়টিকে তাদের নিজেদের এবং পরবর্তীদের জন্য এবং খোদাভীরুদের জন্য এক সতর্ককারী দৃষ্টান্তরূপে রেখে দিয়েছি। (And We made it an example to their own and to succeeding generations, and an admonition (caution) to the God-fearing.)

▪ **২.৬৫-২.৬৬** তোমরা তাদেরকে ভালভাবেই জান যারা 'সাব্বাথ' ভঙ্গ করেছিল ... এক সতর্ককারী দৃষ্টান্তরূপে রেখে দিয়েছি : 'সাব্বাথ' বা শনিবার দিবসটি যথাযথভাবে পালনে ইসরাইলিরা নির্দেশিত হয়েছিল। দিবসটি গডের সঙ্গে বংশ পরম্পরায় তাদের কৃত অঙ্গীকারের প্রতীকরূপে বিবেচিত ছিল।

সপ্তাহের ছয় দিন কাজ শেষে শনিবার অর্থাৎ এ একটি দিবসে কোন প্রকার কাজ-কর্ম করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

এ দিবসটি পবিত্র, উপাসনা ও বিশ্রাম গ্রহণের দিবসরূপে বিবেচিত ছিল। এটি পালনে তাদের ওপর এমন কঠোর নির্দেশনা ছিল যে, কেউ এ দিবসের নিয়ম বা মর্যাদা ক্ষুন্ন করলে এমনকি তার মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান ছিল। কিন্তু তারা সেটি ভঙ্গ করেছিল। ইহুদিরা চালাকি বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে 'সাব্বাথ' দিবসের নিয়মটি ধীরে ধীরে ভঙ্গ করতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল।

ইসরাইলিরা যেভাবে একটি একটি করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল সেগুলি তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং একই আচরণের পুনরাবৃত্তি না করতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াতের যে অংশে তাদের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ 'তোমরা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত বানর হয়ে যাও' তা মানবজাতির জন্য শিক্ষনীয় একটি উদাহরণস্বরূপ।

মানুষ যেন সূক্ষ চালাকির মাধ্যমেও আল্লাহ সৃষ্ট নিয়মের ব্যাত্যয় না করে, সে বিষয়টি এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এটি সকল মানুষের জন্যই শিক্ষনীয়। এ ঘটনায় শাস্তি প্রাপ্তরা সত্যিকার বানর ও শুকর হয়েছিল, নাকি তাদের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেটি নিশ্চিতভাবে জানা গেলে অনুসন্ধিৎসু মন তৃপ্তি পেত। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা। সূক্ষ চালাকি ও ধূর্ততা পরিহার করে চলা।

বাইবেলে বলা হয়েছে, গড ছয়দিনে তাঁর সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেন। কোরআনেও যার স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু বাইবেলে বলা হয়েছে সপ্তম দিনটিতে গড বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিশ্রাম গ্রহণের ঐ দিবসটিই 'সাব্বাথ' দিবস। শনিবার দিন। তাদেরকে প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা তথা 'দশ নির্দেশনা' বা Ten Commandments এ যা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। তারা এটি পালনে বা এ দিবসের মর্যাদা রক্ষায় গডের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

'সাব্বাথ' দিবসের মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং এ দিবসের বিধান মেনে চলা গড এর সাথে ইসরাইলিদের কৃত অঙ্গীকারের চিরকালীন এক প্রতীকস্বরূপ বলে

বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যদিও কোরআন আল্লাহর এ বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে সঠিক মনে করে না। তাই বলা হয়েছে,

"আমি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (আল-কোরআন ৫০:৩৮) (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৪৬:৩৩)

➢ (আয়াত ৬৭-৭১) ইসরাইল জাতির পূর্বের কিছু ঘটনা তথা গরু উৎসর্গীকরণের (Children of Israel and Cow Sacrifice) ঘটনাটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

৬৭	(স্মরণ কর) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছ?' মূসা বলল, 'অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।' (And when Moses said unto his people: Lo! Allah commandeth you that ye sacrifice a cow, they said: Dost thou make game of us? He answered: Allah forbid that I should be among the foolish!)
৬৮	তারা বলল, 'তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়।' মূসা বলল, 'তিনি বলেছেন, সেটি হবে এমন যা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়- মধ্য বয়সী। অতএব যা আদিষ্ট হয়েছ তা পালন কর।' (They said: Pray for us unto thy Lord that He make clear to us what (cow) she is. (Moses) answered: Lo! He saith, Verily she is a cow neither with calf nor immature; (she is) between the two conditions; so do that which ye are commanded.)
৬৯	তারা বলল, 'তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কি হবে?' মূসা বলল, 'তিনি বলেছেন যে, উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ/সোনালী রঙের গাভী- যা দর্শকদের চমৎকৃত করে।' (They said: Pray for us unto thy Lord that He make clear to us of

	what colour she is. (Moses) answered: Lo! He saith: Verily she is a yellow cow. Bright is her colour, gladdening beholders.)
৭০	তারা বলল, 'তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর যে, সেটি কিরূপ?' কেননা, (সকল) গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই এবার আমরা পথপ্রাপ্ত হব। মূসা বলল, 'তিনি বলেছেন যে, এ গাভী এমন হবে যা জমি চাষে ও পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়নি- সুস্থ্য, নিখুঁত।' (They said: Pray for us unto thy Lord that He make clear to us what (cow) she is. Lo! cows are much alike to us; and Lo! if Allah wills, we may be led aright. (Moses) answered: Lo! He saith: Verily she is a cow unyoked; she plougheth not the soil nor watereth the tilth; whole and without mark.)
৭১	তারা বলল, 'এবার তুমি যথার্থ বলেছ।' অতঃপর তারা সেটিকে উৎসর্গ করল, যদিও তারা সেটি করতে ইচ্ছুক ছিল না। (They said: Now thou bringest the truth. So they sacrificed her, though almost they did not.)

▪ **২.৬৭-২.৭১** আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন ... যদিও তারা সেটি করতে ইচ্ছুক ছিল না : তৎকালীন সময়ে মিশর, ফিলিস্তিন ও এর আশেপাশের দেশগুলিতে গরুর উপাসনা করার প্রচলন ছিল। এক আল্লাহর উপাসনা করার পূর্বে ইসরাইলিরা সে ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের অন্তরে সে নিয়মের প্রতি টান ছিল [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

অতঃপর আল্লাহর আদেশে মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে গরু কুরবানী করতে বললেন তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করছ?' কেননা গরু তাদের কাছে অত্যান্ত প্রিয়, পবিত্র, পূঁজনীয় ও দেবতা তূল্য ছিল! তারা এমন নির্দেশনা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

মূর্তী কিংবা অন্য কোন কিছুর আরাধনা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ধারণা মন থেকে তারা গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সেটি যাচাই করা ছিল এ আদেশের উদ্দেশ্য। কিন্তু তারা যখন গরু উৎসর্গ করতে নির্দেশিত হল তখন তা পরিপালনে গরিমসি করতে লাগল। এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে।

গরু উৎসর্গ করার আদেশ পেয়ে ইসরাইলিরা মুসা (আঃ) কে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগল। যেমন 'তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের হয়ে জানতে চাও যে তার রঙ কি হবে?' বলা হল 'তিনি বলেছেন যে, সেটি উজ্জল হলুদ/সোনালী বর্ণের গাভী হবে- যা দর্শকদেরকে চমৎকৃত করে।' কেননা এমন সুন্দর গরু সাধারণত তারা উপাসনার জন্য নির্বাচন করত।

যতই তারা গরু উৎসর্গীকরণের বিষয়ে গড়িমসি করতে লাগল, ততই তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর শর্ত দেয়া হল। এটি মূলত আল্লাহ ভিন্ন যে কোন প্রকার মূর্তী, প্রাণী, ছবি ইত্যাদির আরাধনা মন থেকে দুর করার বিষয়ে একটি কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ ছিল।

কেন এমন পরীক্ষা? গরু, মূর্তী কিংবা প্রতীকী কোন কিছুর পূঁজা বা আরাধনায় সমস্যা কি? কেন প্রতীকী কোন কিছুর প্রতি এমন প্রীতি মানব মন থেকে দুর করার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হবে বা হয়েছে?

বস্তুত এ সবই এক আল্লাহর সাথে কোনকিছুর শরীক করা বা তাঁর সাথে অংশীদারী আরোপ করা বা অন্যকথায় 'শিরক' এর দোষে দুষ্ট। 'শিরক' এর পাপ হচ্ছে মহাপাপ। ক্ষমার অযোগ্য পাপ। আল্লাহ সব পাপ মাফ করেন এটি ব্যাতিত। বিষয়টি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ(?) যে কারণে সমগ্র কোরআন পরকালে বিশ্বাসের পাশাপাশি এটিকে দুর করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে?

কোন ছবি, কোন প্রাণী বা তার মূর্তী এমনকি কোন মানুষকেও আল্লাহর সমপর্যায়ে পূঁজনীয়রূপে গ্রহণ করার বাস্তব জীবনেও মারাত্মক কুফল আছে। তাই এগুলি নিষিদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হযেছে। এমন কি যদি কারও অন্তরে গোপনে এমন ধারণার প্রতি বিন্দু পরিমাণ প্রীতি পরিলক্ষিত হয়, তবে সেটিও অন্তর থেকে সমূলে ঝেড়ে ফেলার কঠোর নির্দেশনা রয়েছে।

নিরাকার একমাত্র আল্লাহর সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক মনে করা প্রথমত জ্ঞানের পরিপন্থী কাজ। জ্ঞানের পরিপন্থী কোন কাজ বোধসম্পন্ন

মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এমন নির্জ্ঞানতার পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়। অনুচিত কাজ পরিত্যাজ্য। তাই 'শিরক'কে নিষেধ করা হয়েছে [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

নির্জ্ঞানতার কারণে মানুষ যখন আল্লাহকে চিনতে ভূল করে তখন সে আত্মবিশ্বাসহীন হয়। নিজের সক্ষমতার ওপর ভরসা করতে পারে না। সে প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করার জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে। অপরের দ্বারস্ত হতে শেখে। এমনিভাবে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভর একটি সৃষ্টিতে পরিণত হয়। অথচ সে যে 'অন্যের' ওপর ভরসা করতে চায় সেও আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আল্লাহর সহায়তা ভিন্ন সে নিজেও কারও উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ঘুরে-ফিরে সকলে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। মানুষকে এ ভূল থেকে দুরে রাখতেই 'শিরক'কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'শিরক' মানুষকে আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভর করে তোলে। গীতায় বলা হয়েছে,

"... যখনই কেউ কোন দেব-দেবীর ভজনা করতে ইচ্ছে করে, আমি সেখানেই তার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে দেই, যেন সে কোন নির্দিষ্ট উপাস্যতে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। তেমন বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত করে ভক্ত কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেব-দেবীদের উপাসনা করে, ...।" (গীতা ৭:২১-২৩)

যারা শিরক করে তারা বিভিন্ন প্রতীকসমুহকে সৃষ্টিকর্তার সমতূল্য গণ্য করে। অথচ তারা নিজেরাও জানে যে এগুলি তাদেরকে সৃষ্টি করেনি, বরং তারা নিজেরাই নিজ হাতে এগুলিকে সৃষ্টি করেছে। ফলে সৃষ্টিকর্তা বা ভগবানরূপে এগুলির আরাধনা করা চরম অজ্ঞতা বা মূর্খতার পরিচয় বহন করে।

জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ কখনই এমন কর্মকান্ডকে মেনে নিতে পারে না এবং প্রজন্মান্তরে এমন ভূল শিক্ষাকে বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারে না। মানুষ যদি

এমন ভূল কাজ করে যেতে থাকে তবে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন থেকে শুরু করে যে কোন ক্ষেত্রেই জ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নয়নের আর কোন যৌক্তিকতা থাকে না। মানবসমাজ একটি অজ্ঞ ও মূর্খ সৃষ্টিতে পরিণত হবে।

কোন কিছু বা কাউকে আল্লাহর অংশীদারের সমপর্যায়ে গন্য করা, মান্য করা বা তাকে সে পর্যায়ের পূঁজনীয় করে গড়ে তোলার বাস্তব ও সবচেয়ে মারাত্মক কুফল হচ্ছে এই যে, এর ছত্র-ছাঁয়ায় কিছু সুবিধাভোগী বা স্বার্থান্বেষী ধূর্ত মানুষ এদের নামে অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করে এবং সৃষ্টির অত্যাবশ্যকীয় ও প্রতিষ্ঠিত সত্য বা সূত্রকে ভেঙে ফেলে। সমাজে কুসংস্কারের প্রবেশকে সম্ভব করে তোলে। অতঃপর যেসব মন্দ কর্ম স্বয়ং বিধাতাও নিষেধ করেছেন সেগুলিকেও তারা এসব পূঁজনীয়দের নামে বা উছিলায় সূক্ষ চালে বিধিসম্মত করে নেয় এবং নিজেদের অন্যায়, অত্যাচার ও অশ্লীলতার রাজত্ব কায়েম করে। বোকা, অসহায় ও সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে তারা নিজেদের সকল রকমের স্বার্থ উদ্ধার করে।

কোরআনে তৎকালীন সময়ে সমাজে বিদ্যমান কিছু কু-সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। স্বার্থান্বেষীরা আল্লাহর অংশীদারদের নামে এসব নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছে যা কিনা আল্লাহও নিষিদ্ধ করেছেন এবং যে কোন বোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রই জানে বা বোঝে যে সেগুলি স্পষ্টতই অত্যান্ত গর্হিত কাজ ছিল। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে,

“.. তথাকথিত আল্লাহর অংশীদারেরা সন্তান হত্যাকেও তাদের দৃষ্টিতে ন্যায়সম্মত ও শোভন করে দেয়, যেন তারা তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদের ধর্ম বা বিশ্বাস সম্পর্কে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

আরও বলা হয়েছে যে তারা বলে, “এসব চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যা আছে তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য তা নিষিদ্ধ। যদি তা মৃত হয় তবে তার প্রাপক হিসেবে সবাই সমান। তিনি তাদেরকে (আল্লাহর নামে) প্রতিষ্ঠিত এসব নিয়মের যথাযথ প্রতিফল দেবেন।

তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা নির্জ্ঞানতা বশতঃ নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন, আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষনের মাধ্যমে

তারা তা নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথে পরিচালিত নয়।" (আল-কোরআন ৬:১৩৭-১৪০)

ছোট্ট অথচ ক্ষমতাশালী একটি দুষ্টচক্র আল্লাহর সাথে অংশীদারী আরোপকরণের মাধ্যমে সেই অংশীদারের নামে বা উছিলায় আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকান্ডকেও সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে বৈধতা দান করে। আবার আল্লাহর অনুমতি দেয়া বিষয়কেও নিষিদ্ধ করে দেয়। এসব অপকর্ম করে তারা নানারকম সুবিধা লুটে নেয়।

সমাজে একবার তেমন অনিয়ম নিয়মে পরিণত হয়ে গেলে তার যাঁতাকলে অসহায় মানুষকে যুগের পর যুগ নিষ্পেষিত হতে হয়। খুব সহজেই এসব যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসা যায় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিধাতা প্রেরীত কোন মহামানব সেগুলিকে দুর করতে এগিয়ে আসেন। এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়। আমাদের উপমহাদেশে 'সতীদাহ' প্রথা তেমনি একটি অত্যান্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য প্রথা। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। অথচ বিশ্বের আনাচে-কানাচে এমনি আরও কত অনিয়ম আছে! যেসব কোনভাবেই বিধাতা কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

অতএব ক্ষতির মুখে পতিত হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে ঘুরে দাড়াবার চেয়ে, জ্ঞান দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক তেমন পরিণতির কারণকে পূর্ব থেকেই মানব মন ও মস্তিষ্ক থেকে তিরোহিত করে দিতে পারাই উত্তম। অর্থাৎ রোগের প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই উত্তম।

আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই বস্তুত মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক রক্ষিত হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারলেই আত্মবিশ্বাসী হয়। কিংবা আত্মবিশ্বাসী মানুষই আল্লাহকে চেনে এভাবেও বলা যায়।

আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ নিশ্চিত জ্ঞানে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। তারা হয় দোদুল্যমান। দুর্বলচিত্ত, ভীতু ও লোভী। চিত্তের দৃঢ়তা তাদের থাকে না। ফলে সহজেই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এগুলিই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত সকল দিক-নির্দেশনার একটিই লক্ষ্য। নিজের সক্ষমতায় মানুষকে চলতে শিক্ষা দেয়া। মানুষকে সত্যের পথে বিকশিত করা, চালিত করা ও ধরে রাখা।

বস্তুত আল্লাহ যা নিষেধ করেন তা করেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। আল্লাহ যা করেন তা ভালর জন্য করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বিষয়টিকে বাস্তব জ্ঞান ও যৌক্তিকতা দিয়ে বুঝতে হবে। অতঃপর এক পর্যায়ে সেটি বিশ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। বস্তুত সঠিক জ্ঞান প্রবেশ করলে সেটি আপনাতেই বিশ্বাসের মধ্যে চলে আসে।

উল্লেখ্য যে, 'বাকারা' শব্দের অর্থ 'গরু' বা 'বাছুর'। সূরার এ অংশে উচ্চারিত 'বাকারা' শব্দটি থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৭২-৭৪) ইসরাইল জাতির পূর্বের কিছু ঘটনা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মৃত ব্যাক্তির সাক্ষ্য প্রদানের একটি নিদর্শন বা ঘটনা (Children of Israel and Portent) তুলে ধরা হয়েছে।

৭২	এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যাক্তিকে হত্যা করলে এবং তোমরা তা অস্বীকার করলে (একে অপরকে দোষারোপ করার মাধ্যমে)। তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন। (And (remember) when ye slew a man and disagreed concerning it and Allah brought forth that which ye were hiding.)
৭৩	আমি বললাম, '(উৎসর্গীকৃত গরুর) একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর।' আল্লাহ এভাবেই মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন- যেন তোমরা বুঝতে পার। (And We said: Smite him with some of it. Thus Allah bringeth the dead to life and showeth you His portents so that ye may understand.)
৭৪	এ ঘটনার পর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, পাথরের মতো কিংবা তদাপেক্ষাও কঠিন। (অথচ) পাথরের মধ্যেও এমন আছে যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমন আছে যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়তে থাকে! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবগত নন।

	(Then, even after that, your hearts were hardened and became as rocks, or worse than rocks, for hardness. For indeed there are rocks from out which rivers gush, and indeed there are rocks which split asunder so that water floweth from them. And indeed there are rocks which fall down for the fear of Allah. Allah is not unaware of what ye do.)

- **২.৭২-২.৭৪** এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যাক্তিকে হত্যা করলে ... তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবগত নন : মৃত ব্যাক্তি সম্পর্কিত এ ঘটনাটিকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছে। তবে এর সত্যাসত্য বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। অনিশ্চিত বিধায় তেমন একটি বিষয় বা ঘটনাকে এখানে তুলে ধরা হল না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর একটি নিদর্শন বিষয়ে এ ঘটনায় ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে মৃতকে জীবিত করা হয়। এখানে উৎসর্গীকৃত গরুর কোন খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয় এভাবে আঘাত করার ফলে মৃত ব্যাক্তিটি জীবিত হয়েছিল এবং তাকে যে হত্যা করেছিল সে তার নাম জানিয়ে দিয়ে আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, 'তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবগত নন।' আল্লাহ কিভাবে সব বিষয় জেনে নেন এটি তার একটি নিদর্শন মাত্র। তিনি মানুষকে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর একটি নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। অথচ আল্লাহর তেমনি অনেক উপায় আছে যা দ্বারা তিনি সব বিষয় জেনে নেন।

এ একটি নিদর্শনই বলে দেয় যে আল্লাহ সব করতে পারেন এবং তিনি সব বিষয়েই কোন না কোনভাবে অবগত। অতএব মানুষ যেন আল্লাহর অগোচরেও কোন মন্দ কাজ না করে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তবে সত্য হচ্ছে যে, যারা সত্যিই ভাল মানুষ তারা জ্ঞানতই মন্দ কাজ করে না। তবে সব ধরণের মানুষকে চালনার সুবিধার্থে আল্লাহর রয়েছে বিবিধ বিধি-বিধান।

উল্লেখ্য যে, গরুর কোন অংশ দ্বারা মৃত ব্যাক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল সেটি আবার একটি আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে এসব বিষয়ে সত্যিকার অর্থেই মানুষের যথাযথ কোন তথ্য-উপাত্ত বা জ্ঞান নেই। তাই এ বিষয়ে অধিক কথা বলার অবকাশ নেই। তবে গবেষনার বিষয়বস্তু হতে পারে এটি। সে কারণেই গরু কারও কাছে পূঁজনীয় কিনা সেটিও একটি সম্পুরক প্রশ্ন হতে পারে?

বলা হচ্ছে যে, এ ঘটনার পর তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তারা বিমূঢ় হয়ে যায়। কিছু কথা এখানে এই কাঠিন্য বুঝাবার জন্য রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'পাথরের মতো কিংবা তদাপেক্ষাও কঠিন।' আবার রূপক অর্থেই বলা হয়েছে যে, 'পাথরের মধ্যেও এমন আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এমন আছে যা বিদীর্ণ হয় অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়।'

অর্থাৎ কঠিন হৃদয়ও নরম হতে বাধ্য যদি সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তেমনি অবুঝ মানুষও বুঝে আসতে বাধ্য হবে যদি সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। অজানা বিষয়ও কখনও না কখনও জ্ঞানের মধ্যে আসবে বা সত্য প্রকাশিত হবে। তবে তার জন্য মানুষের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকতে হবে। সঠিক উপায় অবলম্বন করতে হবে।

➢ (আয়াত ৭৫-৭৭) ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয় জাতিই ইসরাইলের বংশধর। এ পর্যায়ে বিশ্বাসীদের প্রতি ইসরাইলের সন্তান বিশেষত ইহুদিদের আচরণ (Children of Israel and Their Deeds) বিষয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে।

৭৫	(হে বিশ্বাসীগন) তোমরা কি আশা কর যে তারা (ইহুদিরা) তোমাদের প্রতি আন্তরীক হবে, যখন তাদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার পর তা বুঝে-শুনেও পরিবর্তন করে? (Have ye any hope that they will be true to you when a party of them used to listen to the word of Allah, then used to change it, after they had understood it, knowingly?)
৭৬	যখন তারা বিশ্বাসীদের কাছে আসে তখন বলে: আমরা বিশ্বাস এনেছি। আবার যখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে: পালনকর্তা

	(ঐশী বাণীর মাধ্যমে) তোমাদের কাছে যা ব্যাক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বলে দিচ্ছ? তবে তো তারা এ বিষয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদের বিপক্ষে যুক্তি পেশ করবে (তোমাদেরকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার জন্য)। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না? (And when they fall in with those who believe, they say: We believe. But when they go apart one with another they say: Prate ye to them of that which Allah hath disclosed to you that they may contend with you before your Lord concerning it? Have ye then no sense?)
৭৭	তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে? (Are they then unaware that Allah knoweth that which they keep hidden and that which they proclaim?)

▪ **২.৭৫-২.৭৭** (হে বিশ্বাসীগন) তোমরা কি আশা কর যে তারা (ইহুদিরা) তোমাদের প্রতি আন্তরীক হবে ... যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে : অবতীর্ণ বাণী, নবুয়ত এসব বিষয়ে আরবদের পূর্ব ধারণা ছিল না। মুসা (আঃ) এর অনুসারী হিসেবে ইহুদিরা এসব বিষয়ে জ্ঞান রাখত। নব্য মুসলিম বা আরবের অধিবাসীরা শিক্ষিত ও জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ইহুদিদের থেকে নবুয়ত, অবতীর্ণ বাণী, ফেরেশতা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করত। তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সত্যতা বিষয়েও জানার আগ্রহ প্রকাশ করত।

নতুন নবীর আগমন ঘটবে। তার অনুসারীরা পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে যাবে। গ্রন্থের জ্ঞানসম্পন্ন ইহুদিদের নিকট থেকে মদীনাবাসী এসব কথা শ্রবন করেছে। তাই তারা নতুন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা আশা করত যে ইহুদিরাও নতুন নবীকে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু ইহুদিরা তা না করে সূক্ষভাবে নবী ও তার প্রচারিত বার্তার বিরোধীতা করত। যা নব্য মুসলিমদেরকেও আহত করত। ইহুদিরা এমনকি তাদের নিজেদের গ্রন্থের ঐশী বাণীসমূহকেও সুবিধামতো পরিবর্তন করে প্রচার করত। যেন মানুষ সংশয়ে পতিত হয়।

সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের সুবিধামতো আল্লাহর বাণীসমুহকে পরিবর্তন করে, তারা বিশ্বাসীদের প্রতি আন্তরীক হয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তি বিষয়ে সত্য বলবে এমনটি আশা করা যায় না। অথচ তাদের নিজেদের গ্রন্থেও শেষ নবীর আগমন বিষয়ে বার্তা রয়েছে যা তারা জানে। তাই এ বার্তার মাধ্যমে তাদের বিষয়ে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যেন বিশ্বাসীরা তাদের দ্বারা ভূলভাবে প্ররোচিত না হয়।

যখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে: পালনকর্তা ঐশী বাণীর মাধ্যমে তোমাদের কাছে যা ব্যাক্ত করেছেন তোমরা কি তা মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছ? অর্থাৎ একজন নবীর আগমন ঘটবে যা তাদের গ্রন্থে আছে সে সত্য কথা মুসলমান বা অন্যান্যদের কাছে না বলার জন্য বা গোপন করার জন্য তারা পরস্পরকে পরামর্শ দিত।

বস্তুত এ গোপন করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি তাদের অবিশ্বাসের চিত্রই ফুটে ওঠে। কেননা আল্লাহ সব জানেন। তারা গোপনে যেসব সলা-পরামর্শ বা মন্দ কাজ করে আল্লাহ সেসবও জানেন। তারাও জানে যে আল্লাহ তা জানেন। কিন্তু আল্লাহর বিষয়ে তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। তাই তারা জেনে-শুনেও এমন কাজ করে। মনে করে যেন তাদের গোপন সলা-পরামর্শ আল্লাহ জানতে পারবেন না।

তাদের এমন আচরণ দ্বারা তারা মনে করে যেন এ গোপন করা তাদেরকে সুরক্ষা দেবে। অথচ সত্য হচ্ছে যে আল্লাহ সব জানেন। মন্দ কাজ বিষয়ে সকল মানুষকে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। সত্যিকার বিশ্বাসী কখনই গোপনেও এমন কাজ করবে না। বস্তুত তারা পথচ্যুত হয়েছে। এখানে সে কথাটি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৭৮-৮২) সাধারণ ইহুদিদের জ্ঞান ও বিশ্বাস (Children of Israel and Their Belief) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৭৮	তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা (মিথ্যে আশা নিয়ে) শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমান করে। (Among them are unlettered folk who know the

	Scripture not except from hearsay. They but guess.)
৭৯	তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এর বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা অর্জন করে। দুর্ভোগ তাদের জন্য! যা তাদের নিজেদের হাত রচনা করেছে এবং যা তারা এর বিনিময়ে অর্জন করেছে। (Therefore woe be unto those who write the Scripture with their hands and then say, "This is from Allah," that they may purchase a small gain therewith. Woe unto them for that their hands have written, and woe unto them for that they earn thereby.)
৮০	তারা বলে: অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না সামান্য কিছু দিন ব্যাতিত। বল: তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে আল্লাহ কখনও তার অন্যথা করবেন না, না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জান না। (And they say: The Fire (of punishment) will not touch us save for a certain number of days. Say: Have ye received a covenant from Allah - truly Allah will not break His covenant - or tell ye concerning Allah that which ye know not?)
৮১	(বস্তুত সত্য হচ্ছে) যে পাপ করে তার পাপ তাকেই পরিবেষ্টন করে; তারাই অগ্নির অধিবাসী হওয়ার সত্যিকারের যোগ্য; তারা সেখানেই বসবাস করবে। (Nay, but whosoever hath done evil and his sin surroundeth him; such are rightful owners of the Fire; they will abide therein.)
৮২	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে। (And those who believe and do good works: such are rightful owners of the Garden. They will abide therein.)

▪ **২.৭৮** তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমান করে : 'তাদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক আছে' এর দ্বারা সাধারণ ইহুদিদেরকে বোঝান হয়েছে। যারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থের বিষয়ে যথাযথভাবে জানে না। গ্রন্থের কোন বিষয়টি সত্য এবং কোনটি সত্য নয় তা তারা জানে না। ভূল-শুদ্ধ যাচাই করতে পারে না।

সাধারণ ইহুদিদেরকে ধর্ম কিংবা গ্রন্থের বিষয়ে কিছু জানতে হলে জ্ঞাণী-গুণী হিসেবে পরিচিত ধর্মযাজক, চিকিৎসক, রাব্বিস বা বিচারকগণ এমনসব লোকদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করত। কিন্তু জ্ঞাণী-গুণীরূপে পরিচিত এসব লোকজন সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় বিষয়ে ভূল ব্যাখ্যা বা বার্তা দিত। তারা নিজেদের সুবিধা মতো কথা বলত। ফলে সাধারণ ইহুদিরা সত্য জানতে পারত না। তারা কল্পনা বা অনুমানের ওপর ভর করে মিথ্যে আশা নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ বা ভাল কিছু পাওয়ার আশা করত।

তৎকালীন সময়ে মন্দ কার্যকলাপ এমনিভাবে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে ওপরের বাণীসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে। তথাপি এ বক্তব্য আজকের দিনেও সকল সমাজে ও সকল ধর্মের অনুসারী তথা সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। কোরআনের বাণী তাই শাশ্বত ও সার্বজনীন।

আজও তেমন নিরক্ষর-অর্ধশিক্ষিত মানুষ সব সমাজে রয়েছে যারা নিজেরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থের ও ধর্মের মূল বিষয় ও লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না বা বোঝে না। নিজেরা সত্য-মিথ্যে যাচাই করে না বা করতে পারে না। কথিত জ্ঞানী-গুণী ও পরামর্শকদের ওপর নির্ভর করে এবং ভূলভাবে পরিচালিত হয়।

এমন মানুষেরা সত্য থেকে দুরে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। অনুমানের ওপর নির্ভর করে তারা স্বর্গে যাবার স্বপ্ন দেখে। অথচ সঠিক কাজ করে না। সঠিক কাজ কোনটি বা কি সেটিও যথাযথভাবে বোঝে না। কুসংস্কারে আচ্ছন্নতার মাঝে মন্দ ও ভূল কর্মেই লিপ্ত থাকে। তৎকালীন সময়ে এসব বাণী ইসরাইলিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এগুলি কোরআনের শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী।

▪ **২.৭৯** তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এর বিনিময়ে ক্ষুদ্র সুবিধা অর্জন করে। দুর্ভোগ তাদের জন্য! যা তাদের নিজেদের হাত রচনা করেছে এবং যা তারা এর বিনিময়ে অর্জন করেছে : ইহুদিরা তাদের নিজেদের সুবিধামতো ঐশী গ্রন্থে বাণী প্রবেশ করিয়েছে। তাদের ঐশী গ্রন্থ বাইবেল অবিকৃত নেই। তারা বাইবেলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নিজেদের মতো করে করেছে। নিজেদের সুবিধামতো সৃষ্টি করা এমন বিকৃত বাণীসমুহকেই তারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী বলে দাবী করে ও প্রচার করে।

তাদের নিজেদের হাতে সৃষ্টি করা নিয়ম-রীতিই এখন সাধারণ ইহুদিদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্যরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এভাবে তারা পার্থিব সুবিধা লাভ করে। যদি কেউ এসবকে অস্বীকার করতে চায় তবে তাকে ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারীরূপে অপবাদ দেয়া হয়। কোরআন বলছে, যারা এমন মন্দ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

এ সমস্যা আজকের পৃথিবীতেও সকল সমাজে বিদ্যমান। তাই এটি কেবল ইহুদিদের জন্যই নয় এটি একটি সার্বজনীন সতর্ক বার্তা। সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে যেন কেউই আল্লাহর বাণীর কোনরূপ পরিবর্তন করতে না পারে কিংবা তার ভূল ব্যাখ্যা না করে। বস্তুত যারাই মন্দ বা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কাজ করবে তারাই দুর্ভোগে পতিত হবে তা সে যে ধর্মেরই অন্তর্ভূক্ত হোক না কেন। এটি আল্লাহ প্রদত্ত সতর্কবার্তা।

▪ **২.৮০** তারা বলে: অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না সামান্য কিছু দিন ব্যাতিত। বল: তোমরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে আল্লাহ কখনও তার অন্যথা করবেন না, না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বল যা তোমরা জান না : সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে এমন ধারণা বধ্যমূল ছিল যে ভূল ও অন্যায় করা সত্বেও তাদের ধর্মীয় নেতারা কখনই নরকে প্রবেশ করবে না। কেননা তারা ইহুদি। যদিও কোন কারণে শাস্তি পেতেই হয় তবে সে সামান্য কিছু দিনের জন্য। অতঃপর স্বর্গই তাদের জন্য নির্ধারিত।

প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ইসরাইলিদের মধ্যে এমন ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এটি করেছে সূক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন স্বার্থান্বেষী কথিত জ্ঞানী-গুণীজনেরা যারা ধর্মগুরু, চিকিৎসক বা বিচারক ইত্যাদি নামে পরিচিত। এ বিষয়ে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত তারা এসবের সুবিধাভোগী।

বলা হচ্ছে, এসব লোকেরা কি আল্লাহর নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছে যে আল্লাহ এর অন্যথা করবেন না? অর্থাৎ তারা স্বর্গেই যাবে? তারা এমন কিছু উদ্ভাবন করে যে বিষয়ে তারা নিজেরাও জানে না। প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যে বলে। সকল সমাজেই এমন চরিত্রের কিছু লোক থাকে। আজকের দিনেও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়।

তৎকালীন সময়ে সুনির্দিষ্টভাবে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হলেও আজও এমন ভূল শিক্ষায় শিক্ষিত বা ভূল ধারণা পোষন করে তেমন মানুষ সকল সমাজে ও ধর্মাবলম্বিদের মাঝে আছে। যারা গ্রন্থের জ্ঞান রাখে এমন ভূল বার্তা বস্তুত তাদের মাধ্যমেই ছড়ায়। কোরআন তাদের তেমন ভূল ধারণাকে সারা জাহানের সকল মানুষের মধ্য থেকে এ বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাষায় দুর করে দিয়েছে। বস্তুত এমন ধারণা সত্য নয়।

▪ **২.৮১** যে পাপ করে তার পাপ তাকেই পরিবেষ্টন করে; তারাই অগ্নির অধিবাসী হওয়ার সত্যিকারের যোগ্য; তারা সেখানেই বসবাস করবে : সত্য হচেছ, যে পাপ করে তার পাপ তাকেই পরিবেষ্টন করে। পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত ভূল ধারণা মানবজাতির মধ্য থেকে দুর করার পর, কোরআন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে কারা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বস্তুত কোন নাম, কোন পদবী, কোন লেবাস, অর্থ-বিত্ত-সম্পদ কোন কিছুই কোন মানুষকে তাদের দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যারা পাপ কাজ করবে, সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ সৃষ্ট নিয়ম বা সূত্রই তাদেরকে তাদের পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। তারাই অগ্নির অধিবাসী হওয়ার সত্যিকারের যোগ্য বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সূত্র বা নিয়মের বোঝা তাদের ওপর পতিত হবেই। ফলে সূত্র অনুযায়ী তারা সেখানেই বসবাস করবে।

আল্লাহর বাণীকে নিজেদের সুবিধামতো বিকৃত বা পরিবর্তন করে দেয়া পাপের মধ্যে পরে। কেননা আল্লাহ যে নির্দেশনা দেন তা সকল মানুষের কথা

বিবেচনা করে বা মানব কল্যাণের জন্য দেন। কোন গোষ্ঠীগত সুবিধার জন্য সে নির্দেশনা নয়। কিন্তু যারা আল্লাহর যথাযথ নির্দেশনাকে বিকৃত করে বা তার ভূল ব্যাখ্যা দান করে তারা নিজেদের সুবিধা বা অনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তেমনটি করে। সেটি অন্যায়।

অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি পেতেই হবে। এটিই সূত্র, যা থেকে পরিত্রানদাতা কেবলমাত্র স্বয়ং আল্লাহ। তিনি নিজ বিবেচনায় যে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:২৮৪)। এর জন্য তাঁকে কারও কাছেই জবাবদিহি হতে হয় না (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২১:২৩)। তবে আল্লাহ যাই করেন, তিনি করেন সুবিবেচনাপ্রসূতভাবে। এটিও বুঝতে হবে ও বিশ্বাসের মধ্যে আনতে হবে।

▪ **২.৮২** যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে : ওপরে কারা শাস্তি প্রাপ্তির প্রকৃত অধিকারী সে বিষয়ে বলা হয়েছে। এর বিপরীতে বলা হচ্ছে যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ভাল কাজ করে তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।

মানুষকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী ন্যায়সম্মতভাবে ফল প্রদান করা হবে। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। কোরআন সেটি নিশ্চিতভাবে ঘোষনা করেছে। মন্দ কাজের জন্য মন্দ এবং ভাল কাজের জন্য ভাল ফলাফল। কর্মই শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাব্যতার মূল নির্ধারক।

তবে সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাসের কথাটি জোর দিয়ে বলা হয় কেননা দর্শন অনুযায়ী এটি ধরে নেয়া হয় যে, যে বা যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে অর্থাৎ আল্লাহর বিচার দিবসে বিশ্বাস করে অর্থাৎ বিশ্বাসী তারা মন্দ কাজ করতে পারে না। তাদের ভেতরে সে দিবসের ভয় কাজ করে। তাই তারা মন্দ কাজ থেকে দুরে থাকে বা মানসিকভাবে দুরে থাকতে বাধ্য হয়। অবশ্যই বিষয়টি নির্ভর করে বিশ্বাসের মাত্রার ওপর।

অপরদিকে বিশ্বাসী নাম ধারণ করা সত্বেও যদি কেউ মন্দ কাজ করে, তবে এটিও ধরে নেয়া হয় যে বিশ্বাস সত্যিকারভাবে তার বা তাদের ভেতরে প্রবেশ করে নাই বা প্রতিষ্ঠাও পায় নাই [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]।

এ বাণী তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। এটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী।

➢ (আয়াত ৮৩-৮৬) ইসরাইলের সন্তান বা ইহুদিদের অঙ্গীকার (Children of Israel and Covenant) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে কিছু ঘটনা উল্লেখ করে তাদের স্বভাব-চরিত্রের দিক তুলে ধরা হয়েছে। যে স্বভাব তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই নিয়ে যায়।

৮৩	(স্মরণ কর) যখন আমি ইসরাইলের সন্তানদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা করবে না, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলবে; উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং দরীদ্রদের প্রাপ্য (যাকাত) প্রদান করবে। তখন তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক ব্যাতিত সকলেই অনাগ্রহী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। (And (remember) when We made a covenant with the Children of Israel, (saying): Worship none save Allah (only), and be good to parents and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind; and establish worship and pay the poor-due. Then, after that, ye slid back, save a few of you, being averse (reluctant). And (remember) when We made a covenant with the Children of Israel, (saying): Worship none save Allah (only), and be good to parents and to kindred and to orphans and the needy, and speak kindly to mankind; and establish worship and pay the poor-due. Then, after that, ye slid back, save a few of you, being averse.)
৮৪	যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজেদের লোকদের দেশ

	থেকে বিতাড়িত করবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষী। (And when We made with you a covenant (saying): Shed not the blood of your people nor turn (a party of) your people out of your dwellings. Then ye ratified (Our covenant) and ye were witnesses (thereto))
৮৫	তথাপি তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ। আবার যখন তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখন বিনিময় মূল্য নিয়ে তাদের মুক্ত করেছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু বিশ্বাস কর এবং কিছু অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করেছে পার্থিব জীবনে কেবল দূর্গতি ছাড়া তারা আর কি পুরস্কার লাভ করেছে? পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। (Yet ye it is who slay each other and drive out a party of your people from their homes, supporting one another against them by sin and transgression-and if they came to you as captives ye would ransom them, whereas their expulsion was itself unlawful for you - Believe ye in part of the Scripture and disbelieve ye in part thereof? And what is the reward of those who do so save ignominy in the life of the world, and on the Day of Resurrection they will be consigned to the most grievous doom. For Allah is not unaware of what ye do.)
৮৬	এরাই হচ্ছে তারা যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে। এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং তাদের কোন সহায়তাও প্রদান করা হবে না। (Such are those who buy the life of the world at the price of the Hereafter. Their punishment will not be lightened,

	neither will they have support.)

▪ **২.৮৩** যখন আমি ... অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে আল্লাহ ব্যাতিত কারও উপাসনা করবে না ... তখন সামান্য কিছুসংখ্যক ব্যাতিত সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিলে : আল্লাহ ইসরাইলিদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। অঙ্গীকারের বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারও উপাসনা না করা, পিতামাতা, আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা এবং মানুষের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলা, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং দরীদ্রদের প্রাপ্য (যাকাত) প্রদান করা এসকল বিষয়ে তারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল।

বলা হচ্ছে যে, ভাল কাজে তাদেরকে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হলেও তাদের অধিকাংশই তা পরিপালনে অনীহা প্রদর্শন করেছে। তাদের সেই স্বভাব বর্তমানে মহানবী (সাঃ) এর আগমনকালেও একই রকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মহানবীর কাজে সততার সঙ্গে সহযোগীতায় এগিয়ে আসতেও তাদের মধ্যে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। যদিও তারা নবীদের সহযোগীতা করার অঙ্গীকার করেছিল। এটি তাদের একটি জাতিগত বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। তবে তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক আছে যারা সত্যনিষ্ঠ।

▪ **২.৮৪** যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজেদের লোকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষী : নিজেদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশনা অনুযায়ী ইহুদি জাতির পরস্পরের মধ্যে খুনোখুনী করা নিষিদ্ধ। উপরন্তু তারা নিজেদের লোকদের দেশ থেকে বিতাড়ন না করা ও পরস্পর খুনোখুনী না করার বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় বলে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে তারা নিজেরাই এর সাক্ষী।

▪ **২.৮৫.১** তথাপি তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ। আবার যখন তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখন বিনিময় মূল্য নিয়ে তাদের মুক্ত করেছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু বিশ্বাস কর এবং

কিছু অবিশ্বাস কর : তারা যদি গ্রন্থের নির্দেশনাও মেনে চলত এবং কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করত তবে তাদের নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করার কথা নয়। কিন্তু তারা নিজেদের লোকদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে। আবার মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীমুক্তিও দিয়েছে। তারা না ধর্ম নির্দেশিত পথ মেনে চলেছে, না আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছে। বিষয়গুলি তারা নিজেরাও জানে। এগুলি মনগড়া বা তাদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত কোন কথা নয়।

উল্লেখ্য যে, মদীনায় 'আউস' ও 'খাজরাজ' নামে আনসারদের দুটি গোষ্ঠী ছিল এবং বনি 'কাইনুকা', বনি 'নাজির' ও বনি 'কুরাইজা' নামে ইহুদিদের তিনটি গোত্র ছিল। বনি কাইনুকা ও বনি নাজির গোষ্ঠী খাজরাজদের সমর্থক ছিল। অন্যদিকে বনি কুরাইজা গোত্র আনসার গোষ্ঠী আউস এর সমর্থক ছিল।

আউস ও খাজরাজের মধ্যে সংঘর্ষ হলে চুক্তিবদ্ধ ইহুদিরাও যার যার পক্ষের সঙ্গে সে সংঘর্ষে যোগ দিত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি বা খুনোখুনিতে জড়িয়ে যেত। একে অন্যকে বন্দি করত, দেশ থেকে বিতাড়ন করত আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তি দিত।

উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'তথাপি তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ। আবার যখন তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তখন বিনিময় মূল্য নিয়ে তাদের মুক্ত করেছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্য অবৈধ।'

বন্দি মুক্তির বিষয়ে তাদের গ্রন্থে দিক-নির্দেশনা আছে। ফলে এ কাজটি গ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ সাপেক্ষেই হয়েছে বলে বলা যায়। সমস্যা সমাধানের এটি একটি উপায়ও বটে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তাদের গ্রন্থে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত না করার কথাও বলা আছে। অথচ স্বার্থের কারণে তারা সে নির্দেশনা ভঙ্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। অর্থাৎ তারা সুবিধা মতো গ্রন্থের কিছু অংশ মানছে, কিন্তু কিছু মানছে না। তাই বলা হয়েছে, 'তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিছু বিশ্বাস কর এবং কিছু অবিশ্বাস কর?'

▪ **২.৮৫.২** যারা এরূপ করেছে পার্থিব জীবনে কেবল দূর্গতি ছাড়া তারা আর কি পুরস্কার লাভ করেছে : যারা অবিবেচকের মতো নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে– কিছুদিন পূর্বেও তারা পৃথিবীতে ছিল না আবার এখনও নেই। মাঝখানে স্বল্প দৈর্ঘের ক্ষণস্থায়ী একটি জীবন মাত্র। প্রতিটি ব্যাক্তি ও সমষ্ঠির জন্য এবং প্রতিটি কালেই বিষয়গুলি একই রকমভাবে ঘটে চলেছে।

মানুষ কি একবারও ভেবে দেখে না যে এসব করে তারা কি অর্জন করেছে? ক'দিনের জন্য? কোথায় তারা আজ?

এমনিভাবে অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড করে কিছু লোক না তারা নিজেরা শান্তিতে থেকেছে, না চিরস্থায়ী কিছু অর্জন করেছে, না অন্যদের ভাল থাকতে দিয়েছে? ক্ষণকালীন জীবনের লোভ ও মোহ থেকে সৃষ্ট অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড এগুলি!

সমগ্র মানবজাতির জন্যই ইহুদি জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। এমনকি আজকের পৃথিবীর মানুষেরও! অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড করে মানুষ নিজেরাই নিজেদের শান্তি বিনষ্ট করছে। দূর্গতি সৃষ্টি করা ও দূর্গতি প্রাপ্তি ব্যাতিত পার্থিব জীবনে এমন এক একটি জাতি-গোষ্ঠীর প্রকৃতপক্ষে ভাল কোন অর্জন নেই।

▪ **২.৮৫.৩** পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন : পার্থিব জীবনের নানান আকর্ষন এ সবই আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন কর্ম ও আচরণে কে শ্রেষ্ঠ!

মানুষ যা করে আল্লাহ তার সবই জানেন। তার কাছে সকলের সকল কর্মকান্ডের হিসেব আছে। তিনি প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বলা হচ্ছে, পরকালে এমন মূর্খ ও অবিবেচকদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে প্রেরণ করা হবে।

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস তাই গুরুত্বপূর্ণ। পরকালে বিশ্বাস না থাকার কারণেই মানুষ পার্থিব জীবনে নিজেদেরকে ভীষনভাবে জড়িয়ে ফেলে। জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে মুক্ত হতে পারে না এবং ভূল কাজ করে। মানুষকে এমন বন্ধন থেকে মুক্ত হতে জানতে হবে।

উল্লেখ্য যে, গীতায় বস্তুত জাগতিক বন্ধন ও তা থেকে মুক্তি লাভের উপায় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। যদিও গীতার বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে ভীষনভাবে ভূল ধারণা আছে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

"কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমান করে।" (আল-কোরআন ২:৭৮)

না জেনে-বুঝে ভূলভাবে কেবল বিদ্বেষ পোষন নয়; মানুষকে গ্রন্থসমুহের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দর্শন কি বলে সেটি জানতে ও বুঝতে হবে। ওপরের উদাহরণে উদ্ধৃত বাণী কেবল ইসরাইলিদের জন্যই প্রযোজ্য নয়। এসব বাণী সার্বজনীন ও শাশ্বত! একই দোষে দুষ্ট সকলের ক্ষেত্রেই এ বাণী প্রযোজ্য তা সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। আল্লাহর বাণী জগতের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস তাই গুরুত্বপূর্ণ। পরকালে বিশ্বাস না থাকার কারণে নানাবিধ রিপুর তাড়না মানুষকে পার্থিব জীবনে ভীষনভাবে জড়িয়ে ফেলে। সঠিক জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করে দেয়। ভূল পথে চালনা করে। মানুষ জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আয়াতে উদ্ধৃত মন্দ কাজসমুহের জন্য কামনা-বাসনা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জাগতিক বন্ধনই দায়ী। যার পরিণাম পরিশেষে মন্দ ফল প্রাপ্তি। কোরআনে সে সতর্ক বার্তাই দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ এমন ভূল কাজ করা থেকে বিরত থাকে। গীতায় তাই পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে,

".. রজঃ গুণ থেকে সৃষ্ট সীমাহীন কামনা-বাসনা দ্বারা একজন এই জড় জগতে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" (গীতা ১৪:৭)

"জাগতিক প্রকৃতির আকর্ষনে বিচলিত হয়ে অজ্ঞ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জড় জগতের কর্মে নিযুক্ত করে এবং বন্ধনে আবদ্ধ হয়।" (গীতা ৩:২৯)

".. যে তার কর্মের ফল ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে ... কোন কর্মই তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না।" (গীতা ৪:৪১)

"অতএব তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কর ভগবানের তুষ্টির কথা বিবেচনা করে এবং এই প্রকারে তুমি সব সময় আসক্তি ও বন্ধন থেকে মুক্ত থাকবে।" (গীতা ৩:৯)

■ **২.৮৬.১** এরাই হচ্ছে তারা যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে : দু'দিনের দুনিয়ায় প্রকৃত কর্ম পরিত্যাগ করে যারাই অতীতে পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব মিলাতে গিয়ে খুনোখুনী করেছে আজ তারা কোথায়? তাদের সেদিনের সে কর্ম তাদেরকে কি উপহার দিয়েছে? তারা কেবল নিজেদের এবং অন্যান্যদেরও সুখ-শান্তি বিনষ্ট করেছে। এখান থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়ার আছে।

আজও যারা তেমন লোভ বা মোহ দ্বারা চালিত হয়ে মন্দ কাজ করছে তারাও একই ভূল করে চলেছে। বিষয়গুলি নিয়ে মানুষকে ভাবতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সত্য ও সঠিক পথটিকে অনুধাবন করতে বলা হয়েছে।

একজন বিশ্বাসী জানে যে, ভাল কাজ করলে পরকালে সুন্দর জীবন লাভ করবে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ পাবে। এ বিশ্বাস তাদেরকে ভাল কাজ করার ও ধৈর্য্যের সাথে মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে চলার করার শক্তি জোগায়। এ বিশ্বাস জাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে কাজ করে।

অবিশ্বাসী পরকালে বিশ্বাস করে না। পরে কি হবে না হবে তারা সেসব নিয়ে ভাবে না। তারা নগদ প্রাপ্তিটাকেই বোঝে। এ জগতেই সর্বসুখ ভোগ করতে চায়। পরকালে বিশ্বাস না থাকায় যে কোন প্রকারে এমনকি খুনোখুনী করে হলেও সবকিছু নিজের করে নিতে চায়। ফলে তারা পরকালের ভাল কিছু প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়।

তাই বলা হয়েছে যে, 'তারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে।' অর্থাৎ অবিশ্বাসী ক্ষুদ্র কিছু পেতে বা ক্রয় করতে গিয়ে বড় কিছুকে হারায়। কেননা পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের সুখ অতি নগন্য।

আজও জগতে এমন প্রকৃতির ও ভূল ধ্যান-ধারণার মানুষ আছে। যারা হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ-কর্ম করে চলেছে। এতদ্বসত্বেও কি তারা পার্থিব জীবনটাও ভালভাবে পেয়েছে কিংবা পাচ্ছে? এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা যা মানুষকে সত্যকে বুঝতে সহায়তা করে।

বস্তুত কোন দিক-নির্দেশনাই কাজ করবে না যদি না মানুষ নিজেরা বিষয়গুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, উপলব্ধি করে ও নিজ থেকে অনুসরণ করে।

■ **২.৮৬.২** এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং তাদেরকে কোন সহায়তাও প্রদান করা হবে না : পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, দু'দিনের দুনিয়ায় প্রকৃত কর্ম পরিত্যাগ করে যারাই অতীতে পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব মিলাতে গিয়ে খুনোখুনী করেছে আজ তারা কোথায়? তাদের সেদিনের সে কর্ম তাদেরকে কি উপহার দিয়েছে? তারা যেমন নিজেদের তেমনি অন্যদেরও অশান্তির কারণ হয়েছে।

যারা এভাবে ভূল কাজ করেছে একদিন তারা তাদের কর্মের ফল পাবে। এমনই আল্লাহর বিধান ও তাঁর প্রতিশ্রুতি। যদিও অবিশ্বাসী এসব বার্তায় বিশ্বাস করে না। আল্লাহ বলেন, এমন আচরণের লোকদের শাস্তি লঘু হবে না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। বলা হচ্ছে, পরকালে তারা কোন প্রকার সহায়তাও পাবে না।

পার্থিব জীবনে যারা ভূল কাজ করে তাদের জন্য এগুলি কোরআনের সতর্কবার্তা। তৎকালীন প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হলেও এগুলি আল্লাহর বাণী যা সার্বজনীন ও শাশ্বত। ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককেই এমন ভূল কর্মকান্ডের পরিণতি ভোগ করতে হবে। কোন দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে যা থেকে কেউই নিস্তার পাবে না।

➢ (আয়াত ৮৭-৯৩) ইসরাইলের সন্তান বা ইহুদি, বার্তাবাহক ও গ্রন্থ (Children of Israel, Messengers and Scripture) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে কিছু ঘটনা উল্লেখ করে তাদের অতীত কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল কার্যকলাপ তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই নিয়ে গেছে।

৮৭	অবশ্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে 'সুস্পষ্ট মোজেযা' দান করেছি এবং 'পবিত্র রূহের' মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। এটি সব সময় এমনই হয়েছে যে, যখনই (আল্লাহর দিক থেকে) তোমাদের জন্য কোন বার্তাবাহক এমন কিছু নিয়ে আগমন করেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি; তোমরা উদ্ধ্যত হয়েছ,

	কাউকে অস্বীকার করেছ এবং কাউকে হত্যা করেছ। (And verily We gave unto Moses the Scripture and We caused a train of messengers to follow after him, and We gave unto Jesus, son of Mary, clear proofs (of Allah's sovereignty), and We supported him with the Holy spirit. Is it ever so, that, when there cometh unto you a messenger (from Allah) with that which ye yourselves desire not, ye grow arrogant, and some ye disbelieve and some ye slay?)
৮৮	তারা বলে, আমাদের হৃদয় কঠোর। না, বরং তাদের অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা অল্পই বিশ্বাস করে। (And they say: Our hearts are hardened. Nay, but Allah hath cursed them for their unbelief. Little is that which they believe.)
৮৯	তাদের কাছে যা আছে (বাইবেল তথা তাওরাত ও ঈঞ্জিল) তাকে সত্যায়ন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন গ্রন্থ (আল-কোরআন) এল, যদিও পূর্বে অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে তারা এর সাহায্যেই বিজয় প্রার্থনা করত, তথাপি যখন তাদের কাছে তা এল যে বিষয়টি তারা জানত (বার্তাবাহকের আগমন বিষয়ে), তারা তা অবিশ্বাস করছে। অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (And when there cometh unto them a scripture from Allah, confirming that in their possession - though before that they were asking for a signal triumph over those who disbelieved - and when there cometh unto them that which they know (to be the truth) they disbelieve therein. The curse of Allah is on disbelievers.)
৯০	কতই না মন্দ, যার কারণে তারা তাদের আত্মাকে বিসর্জন দিয়েছে- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা তা অস্বীকার করেছে এ কারণে যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি

	ইচ্ছে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করেছে। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (Evil is that for which they sell their souls: that they should disbelieve in that which Allah hath revealed, grudging that Allah should reveal of His bounty unto whom He will of His bondmen. They have incurred anger upon anger. For disbelievers is a shameful doom.)
৯১	যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।' তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতেই বিশ্বাসী' এবং তার পরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তারা অবিশ্বাস করে। যদিও এ গ্রন্থটি (কোরআন) সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে (তাওরাত/বাইবেল)। বল (হে মোহাম্মদ): যদি তোমরা তাতেই বিশ্বাসী হও তবে কেন তোমরা ইতিপূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছ? (And when it is said unto them: Believe in that which Allah hath revealed, they say: We believe in that which was revealed unto us. And they disbelieve in that which cometh after it, though it is the truth confirming that which they possess. Say (unto them, O Muhammad): Why then slew ye the prophets of Allah aforetime, if ye are (indeed) believers?)
৯২	সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছিল। এরপরও তার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার জন্য) গো-বৎস বানিয়েছিলে। তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (And Moses came unto you with clear proofs (of Allah's Sovereignty), yet, while he was away, ye chose the calf (for worship) and ye were wrong-doers.)
৯৩	(স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উর্ধ্বে তুলে ধরে বলেছিলাম যে, শক্ত

	করে ধারণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং শোন (আমার বাণী)। তারা বলল, 'আমরা শুনেছি এবং আমরা অমান্য করছি।' অস্বীকৃতি হেতু তাদের অন্তর (উপাসনার জন্য) গো-বৎস প্রীতিতে ডুবে ছিল। বল: যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের সে বিশ্বাস যা নির্দেশ করে তা কতই না মন্দ! (And when We made with you a covenant and caused the Mount to tower above you, (saying): Hold fast by that which We have given you, and hear (Our Word), they said: We hear and we rebel. And (worship of) the calf was made to sink into their hearts because of their rejection (of the covenant). Say (unto them): Evil is that which your belief enjoineth on you, if ye are believers.)

▪ **২.৮৭** অবশ্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি .. ঈসাকে 'সুস্পষ্ট মোজেযা' দান করেছি ... তোমাদের মনঃপূত হয়নি; তোমরা উদ্ধ্যত হয়েছ, কাউকে অস্বীকার করেছ এবং কাউকে হত্যা করেছ : ইহুদি জাতির পূর্বের কার্যকলাপ এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের মাঝে পর্যায়ক্রমে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। কোরআনে এটিও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, মুসা (আঃ) কে আল্লাহ গ্রন্থ প্রদান করেছেন। ঈসা (আঃ) কে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে মোজেযা দান করেছেন। কিন্তু ইহুদিরা ন্যায়সম্মত বক্তব্য প্রদানকারীদের কখনই গ্রহণ করে নেয়নি। এটি তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। ফলে তারা বার্তাবাহকগণের সঙ্গে উদ্ধত আচরণ করেছে, কখনও তাদেরকে অস্বীকার করেছে এবং কাউকে হত্যাও করেছে।

যখন মহানবীর আগমন ঘটে তখনও তারা সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। তাদেরকে তাদের পূর্বের ভূল কাজসমুহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহানবীর আহবানে সত্যনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে একই ভূলের পুনরাবৃত্তি করতে বারণ করা হয়েছে।

▪ **২.৮৮** তারা বলে, আমাদের হৃদয় কঠোর। না, বরং তাদের অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তারা অল্পই বিশ্বাস করে : তারা বলত আমাদের হৃদয় কঠোর। অর্থাৎ নিজেদের বিশ্বাসে তারা অটল ও স্থির। কেউ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাদের বিবেচনায় ভূল পথে নিতে পারবে না। এটিকে তারা তাদের একটি সদগুণ হিসেবে বিবেচনা করত। বস্তুত এর মাধ্যমে তারা কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস আনবে না এটিই বোঝাতে চাইত।

এভাবে তারা ভূলকে আকড়ে বসে থাকত এবং নতুনকে না জানতে, না বুঝতে, না গ্রহণ করতে চাইত। অথচ তারা এমন কঠোরতা অবলম্বন না করলে বুঝে-শুনে নতুন বার্তার বিষয়সমুহের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারত। সত্য ও ভালটিকে গ্রহণ করতে পারত। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যে যাচাই করতে চায় না বিধায় তারা ভূলপথগামীই থেকে যায়। ফলে সঠিক পথে চলতে পারে না। এগুলি তাদের জাতিগত বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। তাদের এমন অবিবেচনাপ্রসূত ও অযৌক্তিক কঠোর আচরণের কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

বস্তুত তারা যেটি দাবী করে যে তারা নীতিতে অটল বা কঠোর বিষয়টি তেমন নয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণেই তাদের মধ্যে গোঁমরাহী বাসা বেঁধেছে। ফলে তারা সত্য ও সঠিক পথটিকে বুঝতেই চায় না; বারবার ভূল কাজ করে ও অবিশ্বাসীই থেকে যায়। এখানে সে কথা বলা হয়েছে।

আজকের দিনেও সকল সমাজেই তেমন মানুষের দেখা পাওয়া যায়। শাশ্বত ও সার্বজনীন কোরআনের বাণী তাই কেবল ইসরাইলিদের জন্য নয় সকলের জন্যই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য!

▪ **২.৮৯** তাদের কাছে যা আছে তাকে সত্যায়ন করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন গ্রন্থ এল, যদিও পূর্বে অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে তারা এর সাহায্যেই বিজয় প্রার্থনা করত, তথাপি যখন তাদের কাছে তা এল যে বিষয়টি তারা জানত, তারা তা অবিশ্বাস করছে। অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত : মহানবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ইহুদিরা সংঘর্ষ বা যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে আসমানী গ্রন্থ ও একজন নবী বা বার্তাবাহকের আগমনের

বিষয়টি জোর দিয়ে বলে বেড়াত। অর্থাৎ সেই নবীর আগমনের পর অবিশ্বাসীদের ওপর তাদের তথা বিশ্বাসীদের বিজয় সূচিত হবে। এটি তারা বিশ্বাস করত। কেননা তারা তাদের গ্রন্থে একজন বার্তাবাহকের আগমন বিষয়ে পূর্ব থেকে জানত। তারা একজন নবী ও গ্রন্থের আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

বলা হচ্ছে, এখন যখন তিনি এলেন অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন ঘটল এবং কোরআন অবতীর্ণ হল, যা পূর্বে তাদের ওপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল অর্থাৎ তাওরাত ও ঈঞ্জিল সেগুলিকেও সত্যায়ন করে বা স্বীকৃতি দেয়, তখন তারা তাকেই অস্বীকার করছে। এখানে সে বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ কখনই অবিবেচনা প্রসূত কাজ করেন না। হিংসাত্মক বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে কিংবা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আল্লাহ কাউকে অভিসম্পাতও করেন না। এখানে ইহুদিদের প্রতি যে অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে সেটি বলা হয়েছে তাদের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের কারণে। যার সুদুর প্রসারী ফলাফল মানবজাতির জন্য মন্দ। তাদের অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ তথা অবিশ্বাস সকলের দুর্ভোগের কারণ হতে পারে। মানব কল্যাণে রচিত বা প্রেরীত একটি ভাল উদ্যোগকে নষ্ট বা নস্যাৎ করে দিতে পারে। যা সকল মানবের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাতরূপে দেখা দিতে পারে। যার দায় তাদের ওপরও বর্তায়।

সত্য ও সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা না পেলে মানবের নিজ কর্মদোষেই মানবজীবন দুর্দশাগ্রস্ত হবে। তাই বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও যারা আল্লাহর রাসূল ও অবতীর্ণ গ্রন্থকে অবিশ্বাস করছে- বস্তুত সত্যকে অস্বীকার করছে, তাদের প্রতি অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে তাদের ভূল আচরণ ও অপরিণামদর্শীতার কারণে।

▪ **২.৯০** কতই না মন্দ, যার কারণে তারা তাদের আত্মাকে বিসর্জন দিয়েছে- আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা তা অস্বীকার করেছে এ কারণে যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করেছে। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি : ইহুদিরা মনে করে নবী বা নেতা শুধুমাত্র তাদের মধ্য থেকেই আগমন করবে। অবতীর্ণ গ্রন্থ কেবলমাত্র তারাই প্রাপ্ত হবে।

অ-ইহুদিদেরকে তারা তাদের চেয়ে নিচু পর্যায়ের মনে করে। অন্যদের প্রাপ্ত নবুয়তকে তারা স্বীকার করে না।

বস্তুত বিদ্বেষ বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থ কোরআনকে অস্বীকার করছে। যা কিনা আল্লাহ তাঁর নিজ বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে প্রেরণ করেছেন। বস্তুত তারা আল্লাহর গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপকেই অস্বীকার করছে। অথচ তারা নিজেরাও বিষয়টি জানে যে আল্লাহ যাকে খুশি তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। যেমন এক সময়ে তিনি মুসা (আঃ)-কে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাকে গ্রন্থ প্রদান করেছিলেন। তৎপূর্বে তিনি তেমন কিছুই ছিলেন না। আল্লাহর অনুগ্রহই মানুষকে উচ্চে উন্নীত করে।

হিংসা, অহমিকা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা যে আচরণকে বেছে নিয়েছে তা যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সম্মত ও সঠিক আচরণ নয়। বিদ্বেষের কারণে সঠিক পথ ও কোন ভাল উদ্যেগকে বর্জন করা যথাযথ কাজ নয়। নিজেদেরকে তারা এভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং অপরাপরদের জন্য কল্যাণের পথে বাধা হয়েও দাড়াচ্ছে।

পূর্বের আয়াতসমুহে সে কারণেই তাদের অতীতের নানান কীর্তিকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মুসা (আঃ) এর সাথে তারা কেমন আচরণ করেছে, তারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার কিভাবে ভঙ্গ করেছে ইত্যাদি। এগুলি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একইসাথে এর মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকেও তাদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের এমন আচরণের কারণে হতাশ না হতেও বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতীতেও তারা তাদের আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে। যদিও আল্লাহ এতসব সত্বেও তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। এখনও তারা মহানবীর সহায়তায় এগিয়ে না এসে আবারও আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করে চেলেছে। তাই বলা হয়েছে, ‘তারা ক্রোধের ওপর ক্রোধ অর্জন করেছে’।

যারা আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে এমন লোকদের জন্য পরকালে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। আল্লাহর ক্রোধ অর্জনের পরিণতি ভয়ানক! হাসি-আনন্দের পার্থিব জীবনে মানুষ সে ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সূরা ফাতেহায় এভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, ‘(হে আল্লাহ) আমাদেরকে সরল

পথ দেখাও; তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়- যারা তোমার ক্রোধ অর্জন করেছে এবং তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

বস্তুত যারা কোন ভাল উদ্যেগের বিরোধীতাকারী তারা তাদের আচরণের কারণেই শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে যায়। আল্লাহর রাজ্যে সবকিছুই নিয়ম ও সূত্র মেনে চলে। এখানে হিসেব কিংবা বিজ্ঞান বহির্ভূত কোন বিষয় নেই। যারা আল্লাহর বিচার দিবসকে অবিশ্বাস করবে এবং সে অবিশ্বাসের কারণে মন্দ কাজ করবে তারা শাস্তির যোগ্য হবে।

এতদ্বসত্বেও হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা সূত্রের প্রতিষ্ঠাতা সূত্রকে ভাঙ্গারও ক্ষমতা রাখেন। ক্ষমা প্রার্থনা করলে যে কাউকে তিনি নিজ বিবেচনায় ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহর বিচার অতি অতি সূক্ষ্ণ। কেন কেউ ক্ষমা পাবে আর কেনইবা কেউ শাস্তি পাবে কেউ জানে না; এমনকি বুঝতেও পারবে না। জানেন আল্লাহ। তবে কিছু জ্ঞানী মানুষ হয়তবা বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে পারে।

▪ **২.৯১-২.৯৩** যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।' তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতেই বিশ্বাসী' ... যদি তোমরা তাতেই বিশ্বাসী হও তবে কেন তোমরা ইতিপূর্বে নবীদেরকে হত্যা করেছ? .. মূসার .. অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎস বানিয়েছিলে। .. যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়ে .. বলেছিলাম যে, শক্ত করে ধারণ কর যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি .. তারা বলল, 'আমরা শুনেছি এবং আমরা অমান্য করছি।' ... যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের সে বিশ্বাস যা নির্দেশ করে তা কতই না মন্দ : ইসরাইলের সন্তানদেরকে যখন কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস করতে বলা হয় তখন তারা বলে তারা তাদের গ্রন্থেই বিশ্বাসী। অথচ তারা যে তাদের গ্রন্থেও সত্যিকারের বিশ্বাসী নয় তাদের নিজেদের কর্মকান্ডই তার প্রমাণ। তারা নিজেরাই নিজেদের নবীদেরকে হত্যা করেছে এবং তারা যে তাদের নিজেদের গ্রন্থে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী নয় তার আরও প্রমাণ এই যে, মুসা (আঃ) যখন নির্জনাবাসে ছিলেন তার অনুপস্থিতিতে তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহকে পরিত্যাগ করে গো-বৎসের উপাসনায় নিজেদেরকে ব্যাপৃত করেছে। 'তারা

তাদের গ্রন্থে বিশ্বাসী' কথাটি যে তারা সত্য বলছে না এ উদাহরণগুলি তুলে ধরে তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

তাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল আল্লাহর বাণীকে শক্ত করে ধারণ করার জন্য। তাদেরকে যে পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তার সবই ছিল সমাজের কল্যাণার্থে। কিন্তু তারা সেসবকে অস্বীকার করেছিল। তারা নিজেদেরকে বিশ্বাসী দাবী করে, অথচ তাদের কাজ ও আচরণ তার প্রমাণ বহণ করে না। কাজ ও আচরণই বিশ্বাসের নির্দেশক। ফলে তাদের কাজ প্রমাণ করে যে তারা যা বিশ্বাস করে তাদের সে বিশ্বাস মন্দ পথেই তাদেরকে পরিচালিত করে। বস্তুত তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েও তারা কিভাবে পদে পদে ভূল পথে চলেছে তাদেরকে সেসব স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যার মন্দ পরিণাম তারা ভোগ করেছে ও করে চলেছে। মোহাম্মদ (সাঃ) জগতের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে আগমন করেছেন। তারা যেন আবার ভূল না করে, ভূল পথে না চলে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারী হয়ে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে সে পথ প্রতিষ্ঠায় তার সহযোগী হয় তাদেরকে সে আহবান করা হয়েছে। সে কারণে তাদেরকে তাদের অতীতের ভূল কাজগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেসব বিষয়ে বর্তমান বা নতুন প্রজন্ম ততটা জ্ঞাত নয়। কথাগুলি তৎকালীন প্রেক্ষিত বিবেচনা করে বলা হয়েছে।

➢ (আয়াত ৯৪-৯৬) ইসরাইলের সন্তান বা ইহুদিদেরকে (Children of Israel) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাদের অন্ধ বিশ্বাস ও লোভী চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৯৪	বল (ইসরাইলীদের প্রতি): আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান যদি কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয় (যেমনটি তোমরা ভাব) এবং মানবজাতির অন্যান্যদের জন্য নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (Say (unto them): If the abode (dwelling) of the Hereafter in the providence of Allah is indeed for you alone and not for others of mankind (as ye

	pretend), then long for death (for ye must long for death) if ye are truthful.)
৯৫	কিন্তু তাদের নিজেদের হাত পূর্বে যা প্রেরণ করেছে (কৃতকর্ম/পাপকর্ম), সে কারণে কখনই তারা তা কামনা করবে না। আল্লাহ দুস্কর্মাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (But they will never long for it, because of that which their own hands have sent before them. Allah is aware of evil-doers.)
৯৬	এবং তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভীরূপে, এমনকি পৌত্তলিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে হাজার বছর আয়ু কামনা করে। কিন্তু এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোন অর্থই বহন করবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছু দেখেন। (And thou wilt find them greediest of mankind for life and (greedier) than the idolaters. (Each) one of them would like to be allowed to live a thousand years. And to live (a thousand years) would be no means remove him from the doom. Allah is Seer of what they do.)

▪ **২.৯৪** বল, আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান যদি কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই হয় এবং মানবজাতির অন্যান্যদের জন্য নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও : ইহুদিরা মনে করে তারাই শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটতম। পরকালীন সুখের বাসস্থান কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত। মানবজাতির অপরাপরদের জন্য নয়।

তাদের এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণে বলা হয়েছে যে, যদি তাই সত্য হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর। কেননা তাহলেই তোমরা তোমাদের ধারণামতে দ্রুত স্বর্গে চলে যেতে পারবে যা কিনা পার্থিব জীবনের চাইতেও সুখকর। যদি সে ধারণা সত্য হয় তবে তোমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। বস্তুত মানবজাতি জানে যে এমন ধারণা সঠিক নয়। তাই কটাক্ষ করে এমনটি বলা হয়েছে।

বস্তুত স্বর্গে যেতে হবে ভাল কর্মের মাধ্যমে। কোন জাত, গোষ্ঠী, পদবী, লেবাস, অর্থ-বিত্ত-সম্পদ এসবের ওপর ভিত্তি করে নয়। যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.৮১)।

▪ **২.৯৫** কিন্তু তাদের নিজেদের হাত পূর্বে যা প্রেরণ করেছে, সে কারণে কখনই তারা তা কামনা করবে না। আল্লাহ দুস্কর্মাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত : ওপরের বার্তার অব্যাবহিত পরের আয়াতেই আবার নিশ্চিত করে বলা হচ্ছে যে, তারা জানে যে তারা অনেক পাপকর্ম করেছে। তারা নবীদেরকে হত্যা করেছে, আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে ইত্যাদি। যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ওপরের আয়াতটি যে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে এ আয়াতের বক্তব্যই তা নিশ্চিত করে বলে দেয়। তাদের জাতিগত চরিত্র ও অতীত কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদেরই বর্তমান প্রজন্ম, অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদেরকে এসব বাণীর মাধ্যমে ধারণা দেয়া হয়েছে। তারা যেহেতু সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা একটি সময়োপযোগী ভাল উদ্যেগের বিরোধীতা করেছে, তাই তাদের সম্পর্কে সকলকে একটি ধারণা দেয়া সে সময়ের দ্বান্দ্বিক ও সাংঘর্ষিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ছিল।

তারা স্বর্গ পাওয়ার নিশ্চিত লোভ বা ধারণা থাকা সত্বেও মৃত্যু কামনা করবে না। তারা এটি জানে যে পাপ কাজ করে স্বর্গ লাভ করা যায় না। মুখে বলা বা দাবী করা সত্বেও তাদের অন্তর এ বিষয়ে নিশ্চিত নয় যে তারা স্বর্গেই যাবে। এ আচরণও তার প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ তারা মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা অন্তরে ভয় আছে, আবার পার্থিব জীবনের জন্যও প্রচন্ড টান আছে।

বস্তুত তাদের মধ্যে যারা ধূর্ত বা গ্রন্থের বিষয়ে জ্ঞানী বলে পরিচিত তারা তাদের সাধারণদের মাঝে এমনিভাবে ভূল বার্তা ছড়িয়ে রেখেছে। ভূল শিক্ষায় গড়ে তুলেছে। এগুলিও আল্লাহর সত্য বার্তার বিচ্যুতি এবং তাদের নিজেদের পথচ্যুত কর্মকান্ডের প্রমাণ বহন করে। বলা হচ্ছে, আল্লাহ দুস্কর্মাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। বস্তুত মানুষ যা করে আল্লাহ তার সবই জানেন। তিনি সকলের সঙ্গেই বিরাজ করেন। মানুষকে তার মন্দ কর্মের জন্য ফলাফল ভোগ

করতে হবে প্রচ্ছন্নে সে বার্তা দেয়া হয়েছে। তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হলেও এসব বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন! সকলকেই একই প্রকার কর্ম ও আচরণের জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

▪ **২.৯৬** এবং তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভীরূপে, এমনকি পৌত্তলিকদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকে হাজার বছর আয়ু কামনা করে। কিন্তু এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোন অর্থই বহন করবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছু দেখেন : অবিশ্বাসী পরকালকে বিশ্বাস করে না। এই জীবন পরবর্তী জীবনে তাদের প্রাপ্তির কোন আশা নেই। এ জীবনই তাদের কাছে সব। অবিশ্বাসীর কাছে এ জীবনে ভোগ-উপভোগ না করাটাই বোকামী। জগতের কোন প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেই তারা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়। তাই তারা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হেন অন্যায় ও অনৈতিক কাজও নেই যা তারা করতে পারে না। কার স্বার্থে তারা কোন কিছু ত্যাগ করবে? কেন করবে? তাদের তো পরকালে প্রতিদান প্রাপ্তির বিষয়ে বিশ্বাস নেই। আল্লাহর বিচারের ভয় নেই! এ জীবন ভোগ করায় তারা তাই অত্যাধিক লোভী।

অপরদিকে পৌত্তলিকরাও লোভী। তারা মনের বাসনা পুরণার্থে যে কোন কিছু এমনকি নিজ হাতে গড়া একটি মূর্তীকেও উপায় বা মাধ্যম ধরে তার কাছে যাঞ্চা করে। পাওয়ার আশা করে। পৌত্তলিকদের বিষয়ে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"যাদের মন বস্তুগত কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যূত, তারা ... প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে ... বিবিধ দেব-দেবতার ভজনা-উপাসনা করে। ... ... তেমন বিশ্বাসে থেকে ভক্ত দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেব-দেবীদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭:২০-২৩)

ওপরের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুমেয় যে, পৌত্তলিকরা বিবিধ দেব-দেবীর ভজনা করে কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে। এসব ভজনা-উপাসনার পেছনে

কোন লোভ কাজ করে। লোভের বা ভোগের প্রত্যাশায় আল্লাহকে ভূলে গিয়ে তারা যে কারও দ্বারস্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইহুদিরা বিশ্বাসী। তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে। অথচ বলা হচ্ছে, তাদের লোভ পৌত্তলিকদের চাইতেও অধিক।

পৌত্তলিকদের দর্শনই তাদেরকে জীবনের প্রতি লোভী হতে উৎসাহিত করে। তাই তারা এক এক দেব-দেবীর কাছে এক একটি বিষয় বা বস্তু প্রত্যাশা করে। কিন্তু ইহুদিরা এক আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও জীবন ভোগে হাজার বছর আয়ু কামনা করে। বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও তারা আল্লাহর চাইতেও পার্থিব জীবনকেই অধিক ভালবাসতে শুরু করেছে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভীরূপে, এমনকি পৌত্তলিকদের চাইতেও।'

ইহুদিরা স্বর্গেই যাবে এমন বিশ্বাস করা সত্বেও মৃত্যু কামনায় ভীত। পার্থিব সুখ ভোগের বাসনায় তারা হাজার বছর আয়ু প্রাপ্তির ইচ্ছে পোষন করে। কিন্তু তাতে লাভ কি? হাজার বছরের আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে তুষ্ট করতে পারবে না। পৃথিবীতে হাজার বছর জীবিত থাকার পরেও মৃত্যুর পরে যদি শাস্তিই পেতে হয় যা চিরদিন ভোগ করতে হবে, তবে সে হাজার বছর জীবিত থেকে লাভ কি? হাজার বছরের পরের সময়টাই হবে বর্তমান এবং বর্তমানের কষ্টটা তখন একই রকমভাবে অনুভূত হবে। তাই বলা হয়েছে যে, এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি বা কষ্ট প্রাপ্তি থেকে কোনভাবেই রক্ষা করতে পারবে না। ফলে তাদের জাগতিক অধিক প্রাপ্তি কোন অর্থই বহন করবে না।

বলা হচ্ছে, তারা যা করে আল্লাহ তার সবকিছু দেখেন। এর অর্থ হচ্ছে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। কেননা তারা যেসব মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তার সবই জানেন। প্রত্যেককেই তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। তবে তাদের সবাই একরকম নয় কোরআনে সে কথাও বলা হয়েছে। বস্তুত সব জাতি-গোষ্ঠী এমনকি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষেও ভাল-মন্দ আছে।

➢ (আয়াত ৯৭-৯৮) ইসরাইলের সন্তানদের বা ইহুদিদেরকে (Children of Israel and Angels) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তারা আল্লাহর ফেরেশতা ও বার্তাবাহকদের সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করত। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

৯৭	বল (হে মোহাম্মদ): কে জিবরাঈলের শত্রু! এজন্য যে সে-ই আল্লাহর আদেশে তোমার অন্তরে এই গ্রন্থ (কোরআন) পৌঁছে দিয়েছে, যা সত্যায়ন করে এর পূর্বে যেসব গ্রন্থ (তাওরাত, ঈঞ্জিল, যবুর) অবতীর্ণ হয়েছে তার, যা বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদের ধারক। (Say (O Muhammad, to mankind): Who is an enemy to Gabriel! For he it is who hath revealed (this Scripture) to thy heart by Allah's leave, confirming that which was (revealed) before it, and a guidance and glad tidings to believers;)
৯৮	যে ব্যাক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর বার্তাবাহক এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু (সে যেন জানে) নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সে সব অবিশ্বাসীদের শত্রু। (Who is an enemy to Allah, and His angels and His messengers, and Gabriel and Michael! Then, lo! Allah (Himself) is an enemy to the disbelievers.)

▪ **২.৯৭-২.৯৮** বল: কে জিবরাঈলের শত্রু ... নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সেসব অবিশ্বাসীদের শত্রু : ইহুদিরা কেবলমাত্র মোহাম্মদ (সাঃ) এর সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচারণ করেই ক্ষান্ত হত না। তারা মহানবী ও তার অনুসারী তথা বিশ্বাসীদেরকে নিয়েও কটাক্ষ করত। আবার তারা মহানবী (সাঃ) ও বিশ্বাসীদেরকেই শুধু কটাক্ষ করত না। তারা অবতীর্ণ বাণীর বাহক জিবরাইল (আঃ)-কে নিয়েও কটাক্ষ করত। অথচ কোরআন পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে যেমন- তাওরাত, ঈঞ্জিল ও যবুর সেগুলিকেও স্বীকৃতি দেয় এবং তারা সেসব গ্রন্থকে নিজেদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করে। বস্তুত তাদের কার্যকলাপ প্রমাণ বহন করে যে তারা যথাযথ বিশ্বাসী নয়।

ঐশী বাণীসমুহ আল্লাহর বাণী যা জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আগত। মানব অন্তর তার মাধ্যম হয়েই বাণী বা নির্দেশনাসমুহকে ধারণ করে বলেও কোরআনে ধারণা দেয়া হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর কাছে তিনিই আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

অবতীর্ণ সকল বাণীই বিশ্বাসীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও সুসংবাদের ধারক। ঐশী বাণীসমুহ অন্যায় ও মন্দ কাজ ও আচরণ করতে বারণ করত। তাই যারা মন্দ কাজ করত তারা অবতীর্ণ বাণী, নবী, ফেরেশতা এসব বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করার চেষ্টা করত এবং মানুষের সামনে এসব বিষয়গুলির গুরুত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। কেননা এ বাণীসমুহ তাদের মন্দ কাজের জন্য বাধাস্বরূপ ছিল।

আল্লাহ সতর্ক করছেন যে, যে ব্যাক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর বার্তাবাহক এবং জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতার শত্রু সে যেন জানে যে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহও সেসব অবিশ্বাসীদের শত্রু। অর্থাৎ যারা এমন মন্দ কাজ করবে তারাও অবিশ্বাসী ও সরাসরি আল্লাহর শত্রুরূপে বিবেচিত হবে এবং তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অবতীর্ণ বাণী আগমন করেছে জীবন ও জগতকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করার দিক-নির্দেশনাস্বরূপ। যারা এ পথে বাধাস্বরূপ তারা কল্যাণকে ব্যাহত করে। সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। বস্তুত এটিই অবিশ্বাসীদের মূল অপরাধ। তাই তারা শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়।

➢ (আয়াত ৯৯-১০৩) ইসরাইলের সন্তান, ঐশী বাণী এবং ফেরেশতা হারুত ও মারুত (Children of Israel, Revelation and Harut and Marut) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয় জাতিই ইয়াকুব নবী বা ইসরাইলের ধারা থেকে এসেছে।

৯৯	নিশ্চয়ই! আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করে না। (Verily We have revealed unto thee clear tokens, and only miscreants will disbelieve in them.)
১০০	কি আশ্চর্য্য! যখনই তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সত্য হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (Is it ever so that when they make a covenant a party of them set it aside? The truth is, most of them believe not.)

১০১	যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল আগমন করল- যে তাদের কাছে যা রয়েছে (তাওরাত/বাইবেল) সে গ্রন্থের সত্যায়নকারী, তখন গ্রন্থধারীদেরই একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল- যেন তারা জানেই না। (And when there cometh unto them a messenger from Allah, confirming that which they possess, a party of those who have received the Scripture fling the Scripture of Allah behind their backs as if they knew not,)
১০২	এবং তারা সোলায়মানের বিপক্ষে শয়তানরা মিথ্যেভাবে যা বলে বেড়াত তা অনুসরণ করত। সোলায়মান অবিশ্বাস করেনি বরং শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল, মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। (অবশ্য) তারা উভয়ে (ফেরেশতাগণ) এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে আমরা কেবল পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি অবিশ্বাসী হয়ো না (আল্লাহ প্রদর্শিত পথে)। তারা তাদের নিকট থেকে এমন যাদুবিদ্যা শিক্ষা লাভ করত যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ ব্যাতিত তারা তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার করে না তারা তাই শিক্ষা লাভ করে। তারা ভাল করেই জানত যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিসর্জন দিত তা কতই না মন্দ যদি তারা জানত! (And follow that which the devils falsely related against the kingdom of Solomon. Solomon disbelieved not; but the devils disbelieved, teaching mankind magic and that which was revealed to the two angels in Babel, Harut and Marut. Nor did they (the two angels) teach it to anyone till they had said: We are only a temptation, therefore disbelieve not (in the guidance of Allah). And from these

	two (angles) people learn that by which they cause division between man and wife; but they injure thereby no-one save by Allah's leave. And they learn that which harmeth them and profiteth them not. And surely they do know that he who trafficketh therein will have no (happy) portion in the Hereafter; and surely evil is the price for which they sell their souls, if they but knew.)
১০৩	যদি তারা (সঠিক পথে) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলত, তবে আল্লাহর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান পেত যদি তারা জানত! (And if they had believed and kept from evil, a recompense from Allah would be better, if they only knew.)

▪ **২.৯৯-২.১০১** আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি ... গ্রন্থধারীদেরই একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল- যেন তারা জানেই না : কোরআনে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ মুসা (আঃ) কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন (২:৮৭)। ফলে এ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসা (আঃ) এর পরে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্বাসীরা অবশ্যই এগুলিকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যুগে যুগে আল্লাহ নবী-রাসূলদের ওপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন।

গ্রন্থধারীরা অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয় জাতিই নবুয়ত, গ্রন্থ, অবতীর্ণ বাণী ইত্যাদি বিষয় বা শব্দগুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত। কেননা তাদের নবী মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এর ওপরও আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআন তাদের নবীদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের সত্যতাকে স্বীকার করে। অথচ এই গ্রন্থধারীরাই কোরআনের অবতীর্ণতাকে স্বীকার করতে চায় না।

কোরআনের প্রসঙ্গ এলে তারা এমন ভাব প্রদর্শন করে যেন গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া বিষয়ে তারা কিছুই জানে না, বা এ বিষয়ে তাদের আদৌ কোন ধারণাই নেই। যে ভাবটি কেবল আরবের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হতে

পারে। কেননা নবুয়ত, অবতীর্ণ গ্রন্থ, ফেরেশতা এসব বিষয়ে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল না।

গ্রন্থধারীরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত তাদের নিজেদের অঙ্গীকারের বিষয় সম্পর্কেও অবগত। কিন্তু সব সময় দেখা গেছে যে তারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্বেও তাদের একদল সেটি মন থেকে গ্রহণ করে নেয়নি [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। গ্রন্থের নির্দেশনাকে তারা পশ্চাতে ফেলে রেখেছে। এটি প্রমাণ করে যে তারা সত্যিকার বিশ্বাসী নয়।

ইহুদিদের একটা অংশ গ্রন্থ প্রাপ্তি বিষয়ে সব সময় সন্দেহ পোষন করেছে। তারা গ্রন্থের নির্দেশনাকে যথাযথভাবে পালন করে নাই। গ্রন্থের দিক-নির্দেশনাকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে। নিজেদেরকে বিশ্বাসী দাবী করলেও তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী নয়। কোরআন অবতীর্ণ হলে তারা কোরআনকেও আল্লাহর বাণীরূপে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করছে না। যেন এ বিষয়ে তাদের আদৌ কোন ধারণাই নেই এমন ভাব প্রদর্শন করছে। এখানে তাদের আচরণ বা স্বভাবের সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.১০২-২.১০৩** তারা সোলায়মানের বিপক্ষে শয়তানরা মিথ্যেভাবে যা বলে বেড়াত তা অনুসরণ করত ... যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করত ... তবে উত্তম প্রতিদান পেত : ইসরাইলিরা তাদের নিজেদের ভূল কর্মকান্ডের ফলে শৌর্য্য-বীর্য্য সব হারিয়ে যখন অধঃপতিত হয়েছে, তখন তারা যাদুবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পরে এবং প্রচার করে যে সোলায়মান এমন বিদ্যার সাহায্যে রাজ্য থেকে শুরু করে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করেছে এবং তারাও মানুষকে সেসব বিদ্যা শিক্ষা দিত। এভাবে তারা সঠিক পথ ছেড়ে উপার্জনের সহজ ও বিকল্প উপায় অবলম্বন করে। অথচ তারা যদি আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলত তবে তারা উত্তম ফল পেত এবং এ ধরনের বাজে কাজে মনোনিবেশ করত না সে অর্থে এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে।

এ বাণীর একটি অংশে বলা হয়েছে যে, 'যে কেউ যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই।' এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও দিক-নির্দেশনা। এটি সমাজ থেকে কু-সংস্কার দুরীকরণের সহায়ক বাণী। কিন্তু মন্দ লোকেরা মূল বক্তব্যকে গোপন করে যাদুবিদ্যার বিষয়টিকেই বরং সাধারণ

মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। তাই কোরআন অধ্যায়ন করে নিজেদেরকেই সত্য কথাগুলি জানতে হবে যেন কেউ ভূল পথে চালিত করতে না পারে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানকালে চিত্ত বিনোদনের জন্য আমরা চিত্তাকর্ষক যেসব ম্যাজিক দেখে থাকি যাকে বাংলায় 'যাদু' নামেও অভিহিত করা হয়, সেগুলিকে এ বিষয়টির সাথে মিলিয়ে ফেলা সঠিক হবে না। কোন একটি বিষয় দোষে দুষ্ট হবে কিনা সেটি নির্ভর করে কর্মের নিয়তের ওপর। চিত্ত বিনোদনের জন্য করা কোন কাজ ও কোন একটি মিথ্যে বা ভূল বিষয়কে সমাজে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে অন্যায় সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করা এক বিষয় নয়। বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

➢ (আয়াত ১০৪) মহানবী (সাঃ)-কে কটাক্ষ করার জন্য ইহুদিরা (Children of Israel and Do-Don't) নানাবিবিধ কৌশল অবলম্বন করত। বিশ্বাসীদেরকে তেমনটি করতে বারণ করা হয়েছে।

১০৪	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা (রাসূলের প্রতি) 'রায়িনা' বল না 'উনযুরণা' বল এবং তোমরা শ্রোতা হও। অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (O ye who believe, say not (unto the Prophet): "Listen to us" but say "Look upon us," and be ye listeners. For disbelievers is a painful doom.)

▪ **২.১০৪** 'রায়িনা' বল না 'উনযুরণা' বল ... অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি : ইহুদিরা রাসূলকে উপহাস করার জন্য কিছু দ্ব্যার্থবোধক শব্দ ব্যাবহার করার মাধ্যমে রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষনের অপচেষ্টা করত। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে।

যেমন 'উনযুরণা' অর্থাৎ 'দয়া করে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন' বিশ্বাসীদেরকে এভাবে রাসূলকে সম্বোধন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে 'রায়ি-না' শব্দটি দ্ব্যার্থবোধক বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে- 'দয়া করে লক্ষ্য করুন'; কিন্তু একটু ভিন্ন বা বিকৃত উচ্চারণে এটি অন্যান্য অর্থও প্রকাশ করে। যেমন- 'শোন, তুমি কি

শুনতে পাও না?' আবার আরবীতে এর অর্থ 'দাম্ভিক ও মূর্খ ব্যাক্তি'। আবার দৈনন্দিন সাধারণ আলোচনায় এর এমনও অর্থ আছে যে, 'যদি তুমি আমাদের কথা শোন, তবেই আমরা তোমার কথা শুনব'।

দুষ্টরা রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষনকালে উষ্চারণে তারতম্য করত এবং শব্দগুলির অপব্যাবহার করার মধ্য দিয়ে রাসূল ও বিশ্বাসীদেরকেও কটাক্ষ করার চেষ্টা করত। তাই দ্ব্যার্থবোধক অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দ পরিহার করতে বিশ্বাসীদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কেননা বিশ্বাসীরা তেমন ভূল করলে ইহুদিরা উৎসাহ পাবে এবং এর মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করার মতো উপাদানও খুঁজে পাবে।

যারা রাসূলকে কটাক্ষ করে তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। এখানে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বক্তব্য মন দিয়ে শ্রবণ করতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষন করার প্রয়োজন নেই। আয়াতের শেষাংশে সে বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে 'তোমরা শ্রোতা হও।' অর্থাৎ রাসূলের বক্তব্য বা বাণী শোন ও এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা কর।

এটি মানবজাতিকে এ শিক্ষাই দেয় যে কেউই কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলা উচিত নয়। এগুলি বর্জনীয়। কোনআনের বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন।

➢ (আয়াত ১০৫) গ্রন্থের অবতীর্ণতার (Children of Israel and Revelation) বিষয়টি একান্তই আল্লাহর ইচ্ছে সম্পর্কিত বিষয়। তিনি যে কারও ওপরে তাঁর বাণী অবতীর্ণ করতে পারেন। এখানে কারও কোন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

১০৫	গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের (ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের) মধ্যে যারা অবিশ্বাসী এবং যারা পৌত্তলিক তাদের মনঃপুত নয় যে, পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমার (রাসূলের) প্রতি কোনরূপ কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি তাকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের জন্য মনোনীত করেন।

	আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী। (Neither those who disbelieve among the people of the Scripture nor the idolaters love that there should be sent down unto you any good thing from your Lord. But Allah chooseth for His mercy whom He will, and Allah is of Infinite Bounty.)

- **২.১০৫** গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ... মনঃপুত নয় যে .. তোমার প্রতি কোনরূপ কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যাকে খুশি ... মনোনীত করেন। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী : ইহুদি-খ্রীষ্টান এমনকি পৌত্তলিকদেরও এটি পছন্দনীয় ছিল না যে, আল্লাহর দিক থেকে রাসূলের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। বিশেষত গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, নবুয়ত বা ঐশী বাণী বা কোন প্রকার কল্যাণ কেবল তাদের প্রতিই বর্ষিত হবে। কিন্তু এখানে তাদের সে ভূল ধারণাকে দুর করে দেয়া হযেছে।

বস্তুত আল্লাহ কোন বিবেচনায় কাকে কল্যাণ বা তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন এটি একান্তই আল্লাহর ইচ্ছে তথা বিবেচনাপ্রসূত বিষয়। তাঁর বিবেচনা অতি সূক্ষ্ম। এটি কারও ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। এটি জাত-বংশ, ধনী-দরীদ্র কোন কিছুকেই বিবেচনা করে না। তবে কর্ম ও আচরণ গুরুত্বপূর্ণ।

বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ অসীম অনুগ্রহের অধিকারী। সব দিক বিবেচনায় তিনি যার প্রতি ইচ্ছে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। যেমন গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় ও পৌত্তলিকদের মনঃপুত না হওয়া সত্বেও আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাঁর বার্তা প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ যাকে খুশি তাকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের জন্য মনোনীত করেন এখানে সে বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে। এটি কারও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বা চাওয়া না-চাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তাঁর বিবেচনা কেবল তিনিই জানেন। যেমন তিনি মুসা নবীকেও বেছে নিয়েছিলেন এবং সে কারণেই নিপীড়িত ইসরাইলের সন্তানেরা মানব সমাজে এত মর্যাদা লাভ করেছে।

➢ (আয়াত ১০৬-১০৭) অবতীর্ণ বাণী রহিতকরণ (Children of Israel and Revelation) তথা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১০৬	আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম? (Such of our revelation as We abrogate or cause to be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things?)
১০৭	তুমি কি জান না যে, তিনিই আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের আর কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। (Knowest thou not that it is Allah unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and ye have not, beside Allah, any friend or helper?)

■ **২.১০৬-২.১০৭** আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে .. তার স্থানে .. উত্তম .. বাণী নিয়ে আসি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ ... সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী : কোরআন বলছে পূর্বের গ্রন্থসমূহ আল্লাহ প্রেরিত। আবার কোরআনও আল্লাহ প্রেরীত। একই আল্লাহ কিরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বার্তা প্রেরণ করেন? ইহুদিদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তিনি সকল মানুষকে পরিপূর্ণ করে সৃষ্টি করতেন। তাদের সকলকে একবারেই স্বর্গে সুখী অবস্থায় রেখে দিতেন। এমনকি পার্থিব জীবন নামক এত আয়োজনেরও প্রয়োজন হত না বা ছিল না। কিন্তু এ জগতে মানুষকে তিনি কোন এক পরীক্ষায় ফেলেছেন। আবার অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে চলেছেন। মানুষের মস্তিষ্ক জ্ঞান ধারণ করে চলেছে।

প্রথম মানবকে আল্লাহ কম্পিউটার বা মোবাইল দেননি। কিন্তু তিনি চাইলে সেটিও সম্ভব ছিল। এমনিভাবে যখন যার পরিবেশ যেমন এবং সক্ষমতা যেমন সে বিবেচনায় তিনি যুগোপযোগী করে সবকিছু দিয়ে থাকেন। এমনকি দিক-নির্দেশনাও সে বিবেচনায় দিয়ে থাকেন। এমনই আল্লাহর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া।

স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে তিনি তার নির্দেশনায় পরিবর্তন আনেন। এটি করেন মানুষের চিন্তা-ধারার অগ্রগতি সাপেক্ষে। মানুষের সুবিধার্থে। একটি

সহজ উদাহরণে বিষয়টি পরিস্কার হবে। আদম (আঃ) এর যুগে ভাই-বোনে বিয়ে বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা অবৈধ করা হয়। এমনিভাবে সময়ের সাথে প্রয়োজন-সম্ভাব্যতা সব বিবেচনা সাপেক্ষে আল্লাহ মানব কল্যাণ ও মানুষেরই সুবিধার জন্য পথ সহজ করে দেন তার নির্দেশনাকে যুগোপযোগী করে। এখান থেকে এটি বোঝা যায় যে, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় মানুষকেও প্রয়োজনে অনেক নিয়ম পরিবর্তন করে নিতে হয় এবং হবে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা দিয়ে যান।

একই আল্লাহ মানুষকে তার পরিবেশ ও তাদের উপযুক্ততা বিবেচনায় সময়োপযোগী নির্দেশনা দেন। বিষয়গুলি সমালোচকেরাও জানে বা বোঝে। কিন্তু তারা উপহাস করার মনোবৃত্তি থেকে এসব কথা বলে। যেহেতু তারা বুঝে-শুনে এসব কথা বলে, ফলে তাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। কেননা তারা যে কোনভাবেই বিরোধীতা করবে।

বস্তুত এতটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট যে আল্লাহ সব করতে পারেন। তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। যদিও তিনি কোন সত্যের কারণেই কোন কিছু করেন। অযৌক্তিকভাবে আল্লাহ কিছুই করেন না। সকল সূত্র আল্লাহরই সৃষ্টি করা। মানুষ সব জানতে বা বুঝতে পারে না।

এক সময়ের মানবীয় উপযুক্ততা ও প্রয়োজন বিবেচনায় তিনি যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় তিনি তা রহিত করতে পারেন বা করেন। তবে একই সাথে তিনি সমপর্যায়ের অথবা তদাপেক্ষা উত্তম বাণী বা সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আল্লাহর যেমন সে সক্ষমতা আছে, আবার এর দ্বারা তাঁর সব করার ক্ষমতা ও অধিকার আছে এটিও বোঝায়। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে কারও কাছেই জবাবদিহি হতে হয় না।

▪ **২.১০৭** আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের আর কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই : আল্লাহই মানুষের একমাত্র ও প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাই তিনি মানুষের মঙ্গলার্থেই মানুষকে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এমনকি সেসব বিষয়েও যেসব বিষয়ে মানুষের কোন ধারণাই নেই। আল্লাহ

ব্যাতিত মানুষের আর কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। গীতায়েও বলা হয়েছে যে, "আমিই লক্ষ্য, আমিই পরিপালক, আমিই প্রভূ, সাক্ষী আমি, আবাস ও আশ্রয়ও আমি এবং আমিই সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।" (গীতা ৯:১৮)

আল্লাহ যে মানুষের একমাত্র ও প্রকৃত বন্ধু ও সাহায্যকারী মানুষ সেটি বুঝবে কি করে? মানুষ তো আল্লাহকেই চেনে না, জানেও না!

আল্লাহকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে পারার অনেক রকমের উপায় আছে। এটিও একটি উপায় যে, মানুষ যখন তার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদে পতিত হয় তখন আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে।

যখন কেউই পাশে থাকে না, মানুষ একা নিঃসঙ্গ হয়ে যায় তখন যিনি তাকে সাহায্য করে এগিয়ে নিয়ে যান, যিনি তাকে পথ দেখান, যিনি তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সার্বক্ষণিক বিরাজ করেন, যার সাথে মানুষটি একাকী কথা বলে, 'সেই তিনি'। বস্তুত 'নিজে'। এ বিষয়ে এর অধিক আলোচনা না করাই উত্তম। আল্লাহই প্রকৃত বন্ধু, সর্বশেষ ভরসাস্থল- তিনি ব্যাতিত মানুষের আর কোন বা সত্যিকারের সাহায্যকারী নেই।

আল্লাহ ব্যাতিত মানুষের আর কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। বিষয়টি যেমন এককভাবে বোঝার আছে, তেমনি সামষ্ঠিকভাবেও বোঝার আছে।

বস্তুত মানুষ সাধারণ চোখে দেখে বা বুঝে থাকে যে মানুষই মানুষকে সাহায্য করছে। কিন্তু আল্লাহর বিষয়টি বা এ বাণীর মর্ম অর্থটি এত সাধারণভাবে বুঝলে হবে না। আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি যেমন ক্ষুদ্র আঙ্গিকে দেখার আছে, তেমনি বুঝতে হবে সমগ্রের আলোকেও।

একজন বিপদগ্রস্ত ব্যাক্তি যখন সবদিক থেকে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে কিংবা সব মানুষ যখন তাকে পরিত্যাগ বা অসহযোগীতা করে, তখন সে মনে মনে যার সাথে কথা বলে সে কে? আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ তার পাশে থাকে না। বস্তুত সে নিজে। যদি সে সঠিক পথপ্রাপ্ত বা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হয় তবে সে পরাজয় মেনে নেয় না। ঘুরে দাড়াবার চেষ্টা করে। আবার হাল ধরে। পেছনে তার শক্তি সেই অন্তরে 'একজন'। বস্তুত সে নিজে। আবার বলি অন্তরে চেতনাসম্পন্ন যিনি- 'তিনি'! এ জ্ঞান মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে। ব্যাক্তিক পর্যায়ে এভাবে আল্লাহ সর্বশেষ সহায়তাকারী।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে সামষ্ঠিক পর্যায়েও বিষয়টি ব্যাক্তিক পর্যায়েরই অনুরূপ। সেখানেও সর্বশেষে আল্লাহই সহায়তাকারী। মানুষের সৃষ্টি, তার বেঁচে থাকা, তার কর্মঠ হয়ে গড়ে ওঠা এসবের পেছনে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ আমাদের চারপাশে বিরাজমান। এসবের সাহায্যেই আমরা একে অন্যকে সহায়তা দিতে সক্ষম হয়ে উঠি। প্রকৃতি, পরিবেশ তথা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগীতা ভিন্ন মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত অর্থে আল্লাহই মানবজাতির একমাত্র সহায়তাকারী ও বন্ধু।

এ জ্ঞানটি মানুষের ভেতরে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জ্ঞান মানুষকে 'শিরক' এর পাপ থেকে মুক্ত হতে শেখায়। এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ না কোন মূর্তীর কাছে, না কোন মহামানবের কাছে যাঞ্চা করে। তারা আল্লাহমুখীন হয় [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। আত্মবিশ্বাসী হয়। নিজের ওপর তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করে। এভাবে ভাবতে বা বুঝতে শেখা আল্লাহকে বুঝতেও সহায়তা করে।

➢ (আয়াত ১০৮-১১৩) ইসরাইলের সন্তানদের তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে বিশ্বাসীদেরকে (Children of Israel and Believer) কিছু বিষয়ে পরামর্শ, উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১০৮	তোমরাও (মুসলমানগন) কি তোমাদের রাসূলকে তেমনিভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেমনিভাবে পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? যে কেউ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (Or would ye question your messenger as Moses was questioned aforetime? He who chooseth disbelief instead of faith, verily he hath gone astray from a plain road.)
১০৯	তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস স্থাপনের পরেও ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে চায়। আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

	(Many of the people of the Scripture long to make you disbelievers after your belief, through envy on their own account, after the truth hath become manifest unto them. Forgive and be indulgent (toward them) until Allah give command. Lo! Allah is Able to do all things.)
১১০	উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর এবং যে ভাল কাজটি তুমি তোমার জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে সেটি আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (Establish worship, and pay the poor-due; and whatever of good ye send before (you) for your souls, ye will find it with Allah. Lo! Allah is Seer of what ye do.)
১১১	তারা বলে কেউই স্বর্গে প্রবেশ করবে না যদি না সে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়। এটি তাদের নিজেদের মনের বাসনা। বল: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর। (And they say: None entereth paradise unless he be a Jew or a Christian. These are their own desires. Say: Bring your proof (of what ye state) if ye are truthful.)
১১২	যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (Nay, but whosoever surrendereth his purpose to Allah while doing good, his reward is with his Lord; and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. Nay, but whosoever surrendereth his purpose to Allah while doing good, his reward is with his Lord; and there shall no fear come upon them neither shall they grieve.)
১১৩	ইহুদিরা বলে, (ধর্মের বিষয়ে) খ্রীষ্টানরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ করে না এবং খ্রীষ্টানরা বলে, ইহুদিরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ

	করে না, অথচ তারা সকলে (একই) অবতীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করে। এমনকি যাদের গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান নেই (আরবের পৌত্তলিকরা) তারাও এমনিভাবে উক্তি করে। তারা কোথায় মতবিরোধ করছে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন। (And the Jews say the Christians follow nothing (true), and the Christians say the Jews follow nothing (true); yet both are readers of the Scripture. Even thus speak those who know not. Allah will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differ.)

▪ **২.১০৮.১** তোমরাও কি তোমাদের রাসূলকে তেমনিভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেমনিভাবে পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : ইহুদিরা নব্য মুসলমান বা বিশ্বাসীদেরকে নানান বিষয়ে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে সেসব বিষয়ে জানতে চাইত। মুসলমানরা আবার রাসূলের কাছে সে সব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইত। এভাবে তারা মুসলমানদেরকে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজে ব্যাস্ত রেখে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার চেষ্টা করত।

বলা হচ্ছে যে, অতীতে তারা মূসা (আঃ)-কেও এমনিভাবে জ্বালাতন করেছিল। বিষয়টি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, ‘তোমরা মুসলমানগনও কি তোমাদের রাসূলকে তেমনিভাবে প্রশ্ন করতে চাও যেমনিভাবে পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল?’ বিশ্বাসীদেরকে তাদের ফাঁদে পা দিতে বারণ করা হয়েছে। ভাল কাজকে বাধাগ্রস্ত করে এমন বিষয় এড়িয়ে চলা উত্তম।

এটিও মনে রাখতে হবে যে, অতিরিক্ত প্রশ্ন করার ফলে কর্মের নির্দেশনায় জটিলতা প্রবেশ করে এবং সহজ কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.১০৮.২** যে কেউ বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় : এ বাণীর মর্মার্থ অনেক ব্যাপক। এখানে বলা হয়েছে, ‘বিশ্বাসের পরিবর্তে’। প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিশ্বাস, কিসে বিশ্বাস? সত্যি বলতে, বিশ্বাসজনিত আলোচ্য বিষয় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে

আলোচনার সুবিধার্থে দু'টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিষয় দু'টি হচ্ছে, প্রথমত: আল্লাহ এবং দ্বিতীয়ত: পরকাল।

আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ করেন না। ফলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে সে ভাল পথে চলবে। ভাল পথটিই সরল পথ। যে তা বিশ্বাস করবে না এটিও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সে নিদেনপক্ষে অন্তরে হলেও মন্দ কাজে যেতে কোন বাধা অনুভব করবে না। ফলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে বা তার ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটতেই পারে বা ঘটার সম্ভাবনা বেশী।

একইভাবে পরকালের ধারণাও মানুষের ওপর এমনিভাবে প্রভাব রাখে। পরকালে মানুষকে তার কর্মের জন্য বিচারের মুখোমুখী হতে হবে। যে সেটিতে বিশ্বাস রাখবে না তারও বিচ্যুতির সম্ভাবনা বেশী। ফলে যে বা যারা কোরআনের বার্তায় বা দিক-নির্দেশনায় বিশ্বাস করবে না তাদের সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

দর্শনের প্রতিটি বিষয় একটির সাথে অপরটি কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা। একটির দ্বারা অপরটি প্রভাবিত বা কার্যকরী হয়। বিশ্বাসের সকল শর্ত একটির সাথে অপরটি এমনিভাবে সম্পর্কিত। যে আল্লাহতে বিশ্বাস করবে না সে পরকালেও বিশ্বাস করতে পারবে না। ফলে উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। তাই যে বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করবে- ধরে নেয়া যায় সরল পথ থেকে সে বিচ্যুত হতে মানসিকভাবেও কোন প্রকার বাধা অনুভব করবে না।

এখানে বারবারই সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এটি এজন্য যে, অবিশ্বাসী হলেও নিজ জ্ঞানের কারণে কেউ সরল পথ বিচ্যুত নাও হতে পারে। কেননা জ্ঞানই তাকে মুখে স্বীকার না করলেও কিংবা বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করতে না পারলেও অবচেতনে হলেও এক রকম বিশ্বাসী করে রাখে। আবার মুখে বা পরিচিতিতে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও কেউ সরল পথ থেকে নির্জ্ঞানতার কারণে বিচ্যুত হতে পারে।

তবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পরিচালনার সুবিধার্থে কোন একটি বিষয়কে সঠিক সূত্র ধরে নিয়েই নির্দেশনা দিতে হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেইস বা ঘটনাকে বিবেচনা করে সমগ্রের জন্য নির্দেশনা জারি করা সম্ভব নয়। তাই কোরআন যখন পথ প্রদর্শন করে তখন একটি নিয়মকে অনুসরণ করে সে নির্দেশনা

দেয়। যদিও সর্বত্রই কিছু ব্যাতিক্রম থাকে এবং সেসবের বিবেচনা আল্লাহর হাতে। অতএব কেউ যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ করে অবিশ্বাসকে গ্রহণ করে তবে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এটি ধরে নেয়া যেতেই পারে। পাঠক, এটি একটি সাধারণ আলোচনা মাত্র [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২:৬]।

আয়াতের এ অংশটি পূর্বের বক্তব্যটির সাথে সম্পর্কিত। ওপরে বিশ্বাসীদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যেন তারা রাসূলকে ইহুদিদের মতো অযাচিত প্রশ্ন না করে, যেভাবে তারা মুসা (আঃ) কে জ্বালাতন করেছিল।

বস্তুত এসব প্রশ্নের উত্তর তাদের নিজেদেরও জানা ছিল। তারা বিশ্বাসীদের সাথে এসব করে আনন্দ নিত। আবার তাদেরকে ক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত করার চেষ্টা করত। সত্য জেনে-বুঝে যে সত্যকে নিয়ে এমন আচরণ করে বস্তুত সে বিরোধী। বিশ্বাসীর বিরোধী অবিশ্বাসীতেই পরিণত হয়। আর উপরের সূত্র অনুযায়ী যে অবিশ্বাসীতে পরিণত হয় সে সহজেই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সে অর্থেই এভাবে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়েছে।

আবার বিশ্বাসীদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা তেমন কাজ না করে। তাহলে তারাও অবিশ্বাসীতে পরিণত হবে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তাই এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

▪ **২.১০৯.১** তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশ্বাস স্থাপনের পরেও ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে চায় : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় হচ্ছে ইহুদি ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বে ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা বিশ্বাস স্থাপনের পরেও মনে মনে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষন করে। তারা বিশ্বাসী বা মুসলমানদের জন্য অমঙ্গল কামনা করে। বস্তুত অথচ অন্তরের বিদ্বেষভাবই অনাচারের জন্ম দেয়। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়গুলি তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। হিংসা বা ঈর্ষার বিষয়টিই তাদের কাছে বড়। তারা বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে চায়। তাই তারা মুসলমান বা বিশ্বাসীদেরকে অযাচিত প্রশ্ন করে উত্তেজিত বা ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে।

▪ **২.১০৯.২** আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান : যারা কটাক্ষ বা উপহাস

করে কিংবা অমঙ্গল কামনা করে বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিষয়ে ধৈর্য্যধারণ করতে বলা হয়েছে। কেননা তাদের মতো আচরণ বা প্রতি-উত্তর করতে গেলে তা বিশ্বাসীদেরকে তাদের মতো নীচু পর্যায়ে নামিয়ে আনবে এবং তাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করবে। উপরন্তু বিশ্বাসীদের ওপর অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব পালনে ব্যঘাত ঘটাবে। তাই এমন নির্দেশনা।

ভাল কিছু করতে গেলে নানামুখী বাধা-বিপত্তির মুখোমুখী হতে হয়। অনেকের কটাক্ষ ও বিরক্তিকর আচরণও সহ্য করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় এসব ছোটখাটো বিষয়ে জড়িয়ে গেলে যে ভিশন-মিশন নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলে তা ব্যাহত হয় বা ব্যার্থ হওয়ারও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাই সে সময়টায় পরবর্তী ভাল বা যথোপযুক্ত সময় আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষমান সময়টিতে অপ্রয়োজনীয় বা যেসব বিষয় এড়িয়ে চলা সম্ভব বা যা এড়িয়ে চলা খুব ক্ষতিকর কিছু নয়, বরং উপকারের সম্ভাবনাই বেশী সেসব ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণ করতে হয়।

ধৈর্য্য ধারনেরই অপর একটি নাম বা উপায় হচ্ছে বিষয়গুলিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা বা উপেক্ষা করা। অর্থাৎ যথাযথ সময় না আসা পর্যন্ত কোন ব্যাবস্থা না নেয়া। বস্তুত উপযুক্ত সময় ব্যাতিত কোন ব্যাবস্থা নেয়া যায় না বা নেয়া ঠিকও নয়। তাই বিশ্বাসীদেরকে ইহুদিদের যন্ত্রনাদায়ক আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে ও উপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

'আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত' বলতে কি বুঝায়? এটি হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক চলমানতার সাথে সত্য ও ন্যায়ের পথে যে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটি। এটি বুঝে চলা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সমর্পনের সামিল। ততক্ষণ মানুষকে তার লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয় সব পরিস্থিতিতেই। এগুলিই আল্লাহর শিক্ষা ও পথ-নির্দেশনা সব মানুষের জন্য। যদিও তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি এগুলি শাশ্বত ও সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা। সর্বকালে সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মানুষের মধ্যে সকলেই নির্দেশিত উত্তম পথ অনুসরণ করে চলে না। তাই কিছু মানুষ ভূল করে। আর সে ভূলের মাশুল নিজেকে, পরিবারকে এমনকি সমাজকেও দিতে হয়। অপরাপরদেরকে দিতে হয় ভূলকে প্রতিহত বা বাধা

প্রদান না করার জন্য। এমনই আল্লাহর সূত্র ও পরিচালন প্রক্রিয়া। তিনি মানুষের একজনকে দিয়ে অপরজনকে প্রতিহত করেন এবং যথাসময়ে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

আল্লাহর নির্দেশ আসার বিষয়টিকে আবার মহানবীর উপস্থিতিকালীন সময়ে ও তাঁর অনুপস্থিতিকালীন সময়ে ভিন্নভাবে দেখতে ও বুঝতে হবে। কেননা মহানবীর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে অনেক বিষয়ে সরাসরি নির্দেশনা এসেছে। অতএব তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোন ব্যাবস্থা না নিতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশজনিত বিষয়গুলির ওপর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন, সহীহ হাদিস এবং কিয়াস ও ইজমার ওপর নির্ভর করতে হয়। তদুপরি স্থান-কাল-পাত্রকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই শেষোক্ত বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়, কিংবা যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না যদিও এ বিষয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বলা হচ্ছে, আল্লাহ সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু করতে পারেন। এ বিষয়টি বিশ্লেষণের চেয়েও বিশ্বাসের মধ্যে আনা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বস্তুত সম্পূর্ণ দর্শন দাড়িয়ে আছে।

▪ **২.১১০.১** উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর, গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান কর : ইতিপূর্বে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় তথা ইহুদিদের বিষয়ে বলা হয়েছে (২:১০৮)। মুসলমানদেরকে তাদের মতো আচরণ করতে বারণ করা হয়েছে এবং ধৈর্য্যধারণ করতে বলা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যায় করতে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন কারও প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে উত্তেজিত হয় এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না, তখন ধৈর্য্যধারণ করাও কঠিন হয়ে পরে এবং অনেকের পক্ষে সেটি করা সম্ভবও হয় না।

সকলেই জানে ধৈর্য্য ধারণ করা একটি মহৎ গুণ এবং এর শেষ পরিণাম ভাল। এমন ক্ষেত্রে উপাসনা একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উপাসনা বা আল্লাহর একান্ত ধ্যানমগ্ন হওয়া মানুষকে বিপদাপদে বা যে কোন সংকটাপন্ন সময়ে ধৈর্য্যধারণ করতে সক্ষম করে তোলে। তবে এটি তার পক্ষেই করা সম্ভব

যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও ভালবাসে। বস্তুত সে এমনভাবে আল্লাহতে মগ্ন হয় ও তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে যে অপরপর মন্দ বিষয় সে ভূলে থাকতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

মুসলমানদেরকে মন্দ বিষয়ে মনোনিবেশ না করে ভাল কাজ করতে বলা হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে উপাসনা ভাল কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে কাজ করে। উপাসনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে যে কোন প্রকার দুঃশ্চিন্তা ও বাজে কাজ থেকে মানুষ নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

বস্তুত মানুষ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে কেবল অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, উন্নয়ন ও চিত্তের বিনোদনের জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন নাই। সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য এগুলি নয় বা হতে পারে না। তাহলে লক্ষ্য কি?

মানুষকে জীবন ও জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ সন্ধান করতে হবে। বস্তুত বিবিধ ধর্ম ও দর্শন থেকে মানুষ জানে কিছু আপাত লক্ষ্য। সেটি হচ্ছে পরকালীন প্রাপ্তি। গীতায় বলা হয়েছে,

"মানুষকে সেই স্থানের খোঁজ করতে হবে যে, সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় চলে যাওয়ার পর সে আর ফিরে আসে না এবং সেই পরমাত্মায় সমর্পন করতে হবে, যার থেকে সবকিছুর শুরু এবং আদি থেকে যার মাঝে সকলের বসবাস।" (গীতা ১৫:৩)

যিনি জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন তাঁর পর্যায়ে মানুষ ভাবতে পারে না। ফলে মানুষ জানে না বা তার পক্ষে জানা ও বোঝা সম্ভব নয় যে, কেন এ জীবন ও জগত সৃষ্টি করা হয়েছে অন্তত যতক্ষণ না বিধাতা নিজে সে জ্ঞান মানুষকে দান করেন। তবে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর সৃষ্টির নিকট থেকে কৃতজ্ঞতাবোধটি প্রত্যাশা করবেন এটিই স্বাভাবিক। সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে স্মরণ করবে এটিই স্বাভাবিক। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে উপাসনা। অতএব কেউ যদি সব ছেড়ে স্বেচ্ছায় এই একটি কাজই করে তবে সে সঠিক পথেই আছে। সে তার লক্ষ্যের সাথে একাকার; সে তাতেই বিলীন; তাতেই তার আনন্দ। তেমন মানুষ মন্দ কাজ থেকেও বিরত থাকে।

উপাসনা ছাড়াও বাস্তব জীবনে মানুষের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। এসবের অন্যতম হল মানুষের জন্য মানুষের এগিয়ে আসা। মানবতার কাজ করা। যা আল্লাহ সৃষ্ট জগতকে সুশৃংখলভাবে ধরে রাখার ক্ষেত্রেও সহায়ক। সেটি হচ্ছে মানুষকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। ভাল কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দান করা ও যাকাত (Pay Due) প্রদান করা। পার্থিব জীবনে এর গুরুত্ব দেহে অক্সিজেন ও রক্ত প্রবাহের মতো। বৃহৎ অর্থে এ সব বিষয়গুলিই উপাসনার অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

মুসলিমদেরকে এমনতর ভাল কাজে মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। মন্দ লোকের আলোচনা-সমালোচনায় মনোনিবেশ না করতে বলা হয়েছে। বিষয়গুলির সাথে পরবর্তী জীবনের ভাল ফলাফলের সম্পর্ককে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্বাসী এ পথেই চলবে। উপাসনা বা যাকাত প্রদান বিষয়ে এগুলি হল কিছু সাধারণ কথা।

এখানে এ বাণী যেসব আলোচনা বা আয়াতের পরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এ বক্তব্যের এখানে কিছু সুনির্দিষ্টতাও আছে। যেমন- বিশ্বাসীদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে ছোটখাটো বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা না ঘামাতে। যা না পার্থিব জীবনে কোন উত্তম ফল এনে দেবে, না পরকালে। তার চেয়ে উপাসনায় মনোযোগ দেয়া উত্তম এবং মানব কল্যাণে যাকাত প্রদানের বিষয়ে জোর দিতে অর্থাৎ ভাল কাজ করতে বলা হয়েছে যা আল্লাহ আদেশ করেছেন।

ওপরোক্ত দিক-নির্দেশনাটি যেমন বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশবার্তা ঠিক তেমনি গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কেও একইভাবে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, মন্দ কাজে সময় ব্যায় না করে এমন কিছু ভাল কাজে সে সময়টাকে ব্যাবহার করা উচিত, যা যেমন ইহকালে তেমনিভাবে পরকালেও তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ এ উপদেশ সকলের জন্য। এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী।

▪ **২.১১০.২** এবং যে ভাল কাজটি তুমি তোমার জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে সেটি আল্লাহর কাছে পাবে : এটিও একটি দর্শন। যা কোরআনে বা কোন ঐশী বাণীতে আল্লাহ এভাবে মানব সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ না করলে হয়তবা মানুষের ধারণাতেও বিষয়টি আসত না।

আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করতে, যাকাত প্রদান করতে। এগুলি সবই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। ভাল কাজের জন্য আছে উত্তম প্রতিদান এবং মন্দ কাজের জন্য আছে আনুপাতিক শাস্তি। এমনই আল্লাহর বিধান বা সূত্র। এখানে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসীদেরকে যেমন হতাশ না হতে উৎসাহিত করে, তেমনি ভাল কাজ সম্পাদনকারীদেরকে আশাবাদীও করে। যেন তারা এমনটি মনে না করে যে তাদের ভাল কাজ বিফলে যেতে পারে। তাহলে মানুষ ভাল কাজে উৎসাহিত হবে না। এটি একটি আশাবাদী জীবন দর্শন।

বাস্তব জীবনেও অধিকাংশ বা সাধারণ মানুষ ভাল কিছু পাওয়ার আশায়ই ভাল কাজ করে। এগুলি মানুষের জন্যও সত্য সূত্র। দর্শন যদি মানুষকে উদ্দীপ্তই করতে না পারে তবে সেটি কোন উপকারী দর্শনই নয়।

এটিও একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। ফলে বিষয়টি যেমন বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য তেমনি গ্রন্থপ্রাপ্ত ও সকল মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। বস্তুত জগতের সকল মানুষের জন্যই এটি একটি প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য বার্তা। মানুষ যে ভাল কাজটি পূর্বে করবে সেটির জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান পাবে।

অতএব বিশ্বাসীদের উচিত গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের করা মন্দ আচরণ সত্বেও ধৈর্য্যধারণ করা। এর উত্তম প্রতিদান তারা আল্লাহর দিক থেকে পাবে। অপরদিকে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়েরও উচিত বিশ্বাসীদের সাথে মন্দ আচরণ না করা। সে ভাল কাজের প্রতিদানও তারা পাবে।

▪ **২.১১০.৩** তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন (Allah is Seer of what ye do) : এ বাণীও একটি দর্শনের ভিত্তি তৈরী করে [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। কোরআনে বা কোন ঐশী বাণীর মাধ্যমে বিধাতা তথা আল্লাহ যদি এমনিভাবে বিষয়গুলি মানব সম্প্রদায়ের মাঝে উপস্থাপন না করতেন, তবে মানুষের ধারণাতেও হয়তবা বিষয়গুলি এভাবে আনা সম্ভব হত না।

মানুষ যেন মনে না করে যে তাদের ভাল কাজ বিফলে যাবে। আবার এমনও মনে না করে যে তারা মন্দ কাজ করে পারিত্রান পেয়ে যাবে। কেননা বলা হচ্ছে আল্লাহ সব দেখেন। অর্থাৎ মানুষের ভাল-মন্দ সব কাজ তিনি দেখেন। বিচার দিবসে তিনি প্রতিদান দেবেন।

একটি পরিপূর্ণ দর্শনের প্রতিটি বিষয় পরস্পর এমনিভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- আল্লাহ দেখেন, মানবের সকল কর্মের হিসেব সংরক্ষিত আছে ইত্যাদি। অতঃপর একটি বিচার দিবস আছে। সেদিন সকলেই তার ভাল-মন্দ কর্মের যথাযথ প্রতিফল পাবে।

কোরআনের সামগ্রীক দর্শন বিষয়গুলিকে এমনি করে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছে। এ দর্শনের প্রতিটি বিষয়, বিধি-বিধান পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে পারস্পরিক কার্যকরণের সূত্রে গাঁথা। প্রতিটি পৃথক ধারণাই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় বা যেতে অনুপ্রাণীত করে। আর সত্যিকারভাবেই অন্তর থেকে যে এ বাণী বিশ্বাস করবে সে বাধ্য হবে ভাল পথে চলতে। যা তাকে পরকালে উত্তম প্রতিদান দেবে।

যে সময়ে এ বার্তা মানব সমাজে এসেছে সে সময়ে অন্ধভাবে এ বাণী বিশ্বাস করা ছাড়া কোন গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু বর্তমানে মানুষের জন্য বিষয়গুলি বোঝা সহজ হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। তথাপি এটিও বুঝতে হবে যে সবই সম্পন্ন হয় আল্লাহর অনুমোদন সাপেক্ষ্যে।

মানুষ এখন যৌক্তিক কারণেই এসব বার্তায় বিশ্বাস রাখে। কেননা মানুষ বর্তমানে আল্লাহর সৃষ্টির অনেক নিদর্শনই দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

“সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।” (আল-কোরআন ২১:৩৭)

▪ **২.১১১** তারা বলে কেউই স্বর্গে প্রবেশ করবে না যদি না সে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়। এটি তাদের নিজেদের মনের বাসনা। বল: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর : ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই মুসলমানদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করার চেষ্টা করত। তাই তারা নানান ধরণের কথা বলে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভীতকে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করত। মুসলমানদেরকে তাদের এসব কথায় বিচলিত হতে বারণ করা হয়েছে। বস্তুত এগুলি হচ্ছে একান্তই তাদের নিজেদের মনের বাসনা। যেন তারা ছাড়া আর কেউই স্বর্গে যেতে না পারে।

বস্তুত কারও অযাচিত এমন মনোবাসনা দ্বারা তাদের নিচু মনোবৃত্তিই প্রকাশ পায়। সবকিছু নিজে একা পেতে চায়। যেন অন্য কেউ না পায়। বলা হচ্ছে, এগুলি তাদের নিজেদের মন গড়া কথা।

যদি তাদের কথা সত্যি হয় তবে তাদেরকে তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করতে বলা হয়েছে। বস্তুত তারা কখনই তা উপস্থিত করতে পারবে না। কেননা তারা নিজেরাও জানে যে তারা সত্য বলছে না। মানুষ স্বর্গ অথবা নরকে যাবে তাদের ভাল অথবা মন্দ কর্মের কারণে। অন্য কিছুই নয়।

যারা নিজেদের জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে সত্যকে বুঝতে পারে না এবং এসব কথা বিশ্বাস করে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে এমন ধারণার চৌহদ্দির মধ্যে বেঁধে ফেলে। এটিও একটি কর্মফল। মুর্খতা বা বোকামির ফল। যে ধারণায় তারা বংশপরম্পরায় চিরদিনের জন্য আটকা পরে যাবে এবং সহসাই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই আল্লাহ বোকা, নির্বোধ, মূর্খ বা উদাসীনদেরকে পছন্দ করেন না। কথাগুলি কোরআন-গীতা সর্বত্রই বলা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী বা ঐশী গ্রন্থের গুরুত্বই এখানে যে, কোরআন মানুষের সামনে চরম সত্য কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। সত্যকে যথাযথভাবে জানা এবং মুখরোচক মিথ্যে কথার জালে আটকে না পরার বিষয়টি বোধসম্পন্ন মানুষদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তাই যথাযথ শিক্ষা বা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত না এমন অজ্ঞ ও উদাসীন মানুষদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। কেননা তারা হবে ভূল পথগামী। বলা হচ্ছে,

"... যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, তারা যা অর্জন করেছে তার ফলস্বরূপ তাদের আবাস হবে অগ্নি।" (আল-কোরআন ১০:৭-৮)

"অভিশপ্ত হোক মিথ্যে অনুমানকারীরা, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যারা একেবারেই উদাসীন!" (আল-কোরআন ৫১:১০-১১)

"বোকা ও বুদ্ধিহীনদের কাছে আমি নিজেকে কখনই প্রকাশ করি না। তাদের জন্য আমি আমার শাশ্বত সৃষ্টিশীল শক্তি মায়াযোগ দ্বারা আবৃত থাকি" (গীতা ৭:২৫)

▪ **২.১১২** যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন

ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে : পূর্বের আয়াতে যা বলা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, সত্য হচ্ছে বাধা-ধরা কোন বিধান বা কোন ধর্মও নয়, যে কেউ আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করবে ও ভাল কাজ করবে সেই পুরস্কৃত হবে। এটিই প্রকৃত ধর্ম। তবে বাধা-ধরা বিধান বা ধর্মীয় নিয়ম-রীতিরও প্রয়োজন আছে। একেও একেবারে উপেক্ষা করা যাবে না। এগুলিই মানুষকে ধীরে ধীরে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সে পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। বেশীর ভাগ মানুষের জন্যই বাধা-ধরা বিধি-বিধান বা ধর্মীয় নিয়ম-রীতির প্রয়োজন আছে। সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষায়েও এসবের ভূমিকা আছে। পাশাপাশি কিছু মানুষকে সত্যটিও জানতে ও বুঝতে হবে। অন্যদিকে সমর্পন কিভাবে করতে হবে সেটিও জানতে ও বুঝতে হবে। জ্ঞান ও উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ ভিন্ন বিষয়গুলি বোঝা সকলের জন্য সহজও না।

উল্লেখ্য যে, নিয়মবদ্ধ বা প্রচলিত বিবিধ ধর্মের আগমনের পূর্বেও এ জগতে ভাল-মন্দ মানুষ বিদ্যমান ছিল। তারাও বিচার দিবসে তাদের পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। তখনও যারা ভাল কাজ করেছে তারাও পুরস্কৃত হবে। তারা ইহুদিও ছিল না, খ্রীষ্টানও ছিল না। নানান নাম নিয়ে নানান ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। বস্তুত সকল ভাল মানুষেরাই ছিল আল্লাহর প্রতি সমর্পিত [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩] [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]।

যে বা যারাই নিজেকে বা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন করবে তারা ভাল কাজ ব্যাতিত মন্দ কাজ করবে না বা করতে পারবে না। আল্লাহর প্রতি সমর্পনই হচ্ছে মানব ধর্মের মূল কথা। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

"হে বিশ্বাসীগণ! ... মৃত্যুবরণ কর না নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন না করে।" (আল-কোরআন ৩:১০২)

"নানরূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।" (গীতা ১৮:৬৬)

উল্লেখ্য যে, সমর্পন বিষয়টি যিনি বোঝেন তার কাছে হয়তবা বিষয়টি সহজবোধ্য হতে পারে। কিন্তু অনেকের কাছে সমর্পন কি, কেন, কার কাছে, কিভাবে করতে হবে বিষয়গুলি সহজ বোধ হবে না বা জটিল মনে হতে পারে। তবে সমর্পনই হচ্ছে মূল মানবধর্ম যা সকলের জন্য প্রযোজ্য। এটিকেই ইসলাম ধর্ম বলা হয়। সে অর্থেই ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম যা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেউ বলে সনাতন বা চিরন্তন ধর্ম। বস্তুত সকল মানুষের ধর্ম এক।

যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালন ও প্রলয়কর্তা ইসলাম সেই আল্লাহর কাছে মানুষকে সমর্পিত হতে বলে। সমর্পন হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় সমর্পন। আল্লাহতে সমর্পনেই শান্তি। সমর্পিত আত্মাই কৃতজ্ঞচিত্ত আত্মা। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছেকে মানুষ জানবে কি করে? মানুষ তো আল্লাহকেই চেনে না, জানে না!

আল্লাহর ইচ্ছেকে জানা ও বোঝার জন্য প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে বুঝতে হবে। এগুলির কিছুই আল্লাহর ইশারা ও তাঁর প্রভাবের বাইরে নয়। আর আল্লাহর মূল নির্দেশনা তো কোরআন থেকে শুরু করে পবিত্র ও সহজ-সরল মানুষের অন্তর, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে সর্বত্র প্রকাশিত!

আল্লাহর মূল নির্দেশনা হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা তা সে যে কোন লেবাসের আদলেই হোক না কেন। তবে প্রত্যেকের জন্য একটি প্রমিত লেবাস থাকাও ভাল। ফলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন লেবাস বা নিয়ম-বিধির মধ্যে বসবাস করে। কিন্তু সেগুলি যদি মূল কাজ পরিহার করে কেবল লেবাসের ওপরই অধিক গুরুত্ব দেয় তবে সে লেবাস, নিয়ম-বিধি-বিধান অর্থহীন। তেমন ক্ষেত্রে লেবাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যেতেই পারে। কেননা লেবাসের কারণে ধর্ম কিংবা দর্শন নয় বরং দর্শনের কারণে লেবাস। যেমন সংবিধানের প্রয়োজনে মানুষ নয় বরং মানুষের প্রয়োজনে সংবিধান। জীবন, জগত ও মানুষের প্রয়োজনগুলি মিটতে হবে বিধানের মাধ্যমে।

আল্লাহর মূল নির্দেশনা হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা। একমাত্র এটিই হচ্ছে ন্যায়সম্মত, ভারসাম্যপূর্ণ শাশ্বত ও সার্বজনীন সত্যের পথ ও ধারণা। এ একটিমাত্র পথ বা ধারণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

কোরআনের দর্শন সমগ্র মানবজাতিকে একীভূত করতে পারে এবং সত্যিকার অর্থে অবদান রাখতে পারে।

যারা আল্লাহতে সমর্পিত, যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে, যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর দিক থেকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।

আয়াতের শেষাংশে বলা হচ্ছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি সমর্পিত ও ভাল কাজ করে এমন মানুষদের অন্তরে কোন ভীতির সঞ্চার হবে না, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনোকষ্টে (দ্রষ্টব্য ২.২৬২.২)।

বিষয়গুলি আল্লাহ সৃষ্ট সূত্র মেনে চলে। কেননা বোধসম্পন্ন এমন মানুষদের নিজেদের অন্তরের বিচার ব্যাবস্থাও তাদেরকে সে সত্য জানান দেয়। তারা পরিণতি বুঝতে পারে। বস্তুত আল্লাহ সবার সাথে আছেন। তিনি সব জানেন, দেখেন। সে কারণেই মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ভাল কর্ম সম্পাদনকারীদের অন্তর তাই কোনরূপ ভয়ে ভীত হয় না এবং তারা অন্তরে কষ্টও অনুভব করে না। এক অর্থে এটিও আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কারের অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়।

▪ **২.১১৩** ইহুদিরা বলে, খ্রীষ্টানরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ করে না এবং খ্রীষ্টানরা বলে, ইহুদিরা সঠিক কোন কিছুই অনুসরণ করে না, অথচ তারা সকলে অবতীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করে। এমনকি যাদের গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান নেই তারাও এমনিভাবে উক্তি করে। তারা কোথায় মতবিরোধ করছে পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন : যারা তথাকথিত ধর্ম, নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়েছে। এমন ধরণের মানুষেরা ধর্ম নিয়ে একে অন্যকে হেয় বা ছোট প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে এবং নিজেদেরকে বড় বা সঠিক প্রতীয়মান করারও চেষ্টা করে। নিজেরটা ব্যাতিত আর সবাই ভূল পথে আছে এমন বলার চেষ্টা করে। বিশেষত ইহুদি-খ্রীষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে এটি বলা হয়েছে। অথচ তারা উভয়েই একই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করে! এমনকি যাদের গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান নেই যেমন আরবের পৌত্তলিকরা তারাও এমনিভাবে উক্তি করে।

বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য পৃথক পৃথক কোন ধর্ম নেই। সকল মানুষের জন্য ধর্ম একই। আর সেটি হচ্ছে বিধাতার প্রতি সমর্পন। আর এটিই

ইসলাম। সনাতন বা চিরন্তন সত্য ধর্ম। যার অবধারিত প্রাপ্তি শান্তি। ফলে যারা ধর্ম নিয়ে শিশুসুলভ বাড়াবাড়ি আচরণ করে তারা কোথায় মতবিরোধ করছে পুনরুত্থান দিবসে মহান আল্লাহ সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন বলে কোরআনে সেটি মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যেন মানুষ নিজেদের মধ্যে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয় বা হানাহানি না করে সে বিষয়েও এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! ধর্মের বিষয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি কর না ...।" (আল-কোরআন ৪:১৭১)

"প্রত্যেক জাতি/সম্প্রদায়ের জন্যই আমি উপাসনার নিয়ম-কানুন/বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিবাদ না করে। তুমি তাদেরকে তোমার পালনকর্তার দিকে আহবান কর। নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) সরল পথেই আছ। যদি তারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করে তবে বল: তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ ভালভাবে জ্ঞাত। তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।" (আল-কোরআন ২২:৬৭-৬৯)

তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় এসব বাণী ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এগুলি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। সকলের জন্য শিক্ষনীয় ও সতর্কবার্তা। সর্বকালে সকলের জন্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচ্য! ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় উত্থাপন করে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

➢ (আয়াত ১১৪-১১৫) ইসরাইলের সন্তান ও অবিশ্বাসীদেরকে (Children of Israel and Disbeliever) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যারা মুসলমানদেরকে উপাসনালয়ে প্রবেশে বাধা দিত। বস্তুত আল্লাহ (Allah) তো সর্বত্র বিদ্যমান।

১১৪	তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে উপাসনালয়সমূহে প্রবেশে বাধা দেয় এবং সেগুলির বিনাশ সাধনে চেষ্টা করে? এদের পক্ষেই বরং ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে উপাসনালয়ে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (And who doth greater wrong than he

	who forbiddeth the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein, and striveth for their ruin. As for such, it was never meant that they should enter them except in fear. Theirs in the world is ignominy (humiliation) and theirs in the Hereafter is an awful doom.)
১১৫	পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (Unto Allah belong the East and the West, and whithersoever ye turn, there is Allah's Countenance (face). Lo! Allah is All-Embracing, All-Knowing.)

▪ **২.১১৪** তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে .. উপাসনালয়সমূহে প্রবেশে বাধা দেয় ... তাদের জন্য .. কঠিন শাস্তি রয়েছে : ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অবিশ্বাসীদের অনেকে আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রবেশে মুসলিমদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করত। তারা হজ্ব-ওমরাহ পালনেও বাধা দিত। অথচ এটি আল্লাহর ঘর এবং এখানে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। যারা এমন কাজ করেছে এ বাণী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর ঘরে প্রবেশে ও সেখানে তাঁর স্মরণ ও উপাসনায় বাধা দেয়া অত্যান্ত গর্হিত একটি কাজ। যারা এমন কাজ করেছে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা সেখানে মূর্তী স্থাপন করেছে। এক আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করে মূর্তী পূঁজা করছে। নগ্ন হয়ে তাওয়াফ করেছে। বস্তুত তারা সত্য ও সঠিক ধর্মের বিনাশ সাধন করে চলেছে। আবার যারা সঠিক পথ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরকে বাধা প্রদানও যথাযথ ধর্মের বিনাশ সাধনের আরও একটি ধাপ।

বলা হচ্ছে যে বিশ্বাসীদের নয়, বরং তাদের যে অন্যায় কার্যকলাপ তাতে তাদেরই সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রবেশ করা যথাযথ ছিল না। তারা এ ঘরের অমর্যাদা করেছে। এর পবিত্রতাকে নষ্ট করেছে। এ ঘরের রক্ষনাবেক্ষন এমন লোকদের হাতে থাকা উচিত নয়। এর দেখ-ভালের অধিকার তাদেরই বেশী যারা এর পবিত্রতাকে রক্ষা করার চেষ্টায় রত, যারা আল্লাহর পথে

সংগ্রাম করে চলেছে, যারা আল্লাহর মহাত্বকে মহিমান্বিত করেছে এবং যারা যথাযথ ধর্ম প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

যারা আল্লাহর পথে সহযোগী নয় মূলত পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকা তাদের জন্য কোন অর্থই বহন করে না। যদিও আল্লাহর পথ কি সেটিও যথাযথভাবে বুঝতে হবে। এটি অত্যান্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে।

যারা ভাল কাজে বাধা দেয় তারা সেটি করে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। কিন্তু যারা অন্যায় করে বস্তুত তাদেরই ভীত হওয়ার কথা। কেননা তারা অন্যায়কারী। এ বাণীর মাধ্যমে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থানকারীদের অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলাকেও উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সেটিই মানুষের জন্য করণীয়।

সময় এলে এদেরই বরং এখানে এভাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ হতে হবে। এটি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি। আর সঠিক পথে ফিরে না এলে পরকালের শাস্তি তো আছেই।

এ বাণীর একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত মর্ম কথাও আছে। যারা অন্যায় করে তাদের সে অন্যায় আচরণ পার্থিব জীবনেও মানুষের কাছে অন্যায়রূপে প্রতীয়মান হয়। ফলে পার্থিব জীবনেও তারা লাঞ্ছিত হয়। কেননা মানবীয় পার্থিব জীবনকে আল্লাহ এমন সত্য বা সূত্রেই সৃষ্টি করেছেন যে যথোপযুক্ত সময়ে মানুষ পার্থিব জীবনেও অন্যায়কারীকে ছেড়ে দেয় না। ফলে যে অন্যায় করবে সৃষ্টির সূত্রের কারণেই পার্থিব জীবনেও সে লাঞ্ছিত হবে। অতঃপর পরকালে অন্যায়কারীদের জন্য আল্লাহর দিক থেকেও শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে; সেটিও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বাণী বিশ্বাসীদের মনবলকেও দৃঢ়তা দান করেছে।

▪ **২.১১৫.১** পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান : পূর্বের আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে পরে এ আয়াতে এটিও বলা হয়েছে যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তিনি কেবল একটি নির্দিষ্ট দিকেই অবস্থান করেন না। ফলে আল্লাহর ঘর কা'বায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হলেও যে কোন স্থানে আল্লাহকে স্মরণ করায় কোন সমস্যা নেই। যে কেউ অন্তর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে তার স্মরণ বিফলে যাবে না। তিনি

সবজান্তা। কে তাঁকে অন্তর থেকে ডাকে তিনি সে বিষয়ে অনবহিত নন। অতএব সঠিক স্মরণকারীর এ কারণে মনোকষ্টের কোন কারণ নেই।

এখানে এ বাণীর আরও তাৎপর্য আছে। এটি বড় ধরনের কোন সংঘর্ষ আপাত এড়িয়ে চলাকে নির্দেশ করে। তথাপিও যারা অন্যায়ভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে পালনে কাউকে বাধা দেয় অবশ্যই তারা দোষী পর্যায়ভূক্ত এবং অপরাধের কারণে তারা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য হবে।

আল্লাহর উপস্থিতির জন্য কোন নির্দিষ্ট দিক নেই সত্য, তবে বিশাল জনগোষ্ঠির শৃংখলা, একতাবদ্ধতা, ভ্রাতিত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কিছু নিয়মকে বেছে নিতে হয়। তাই কেবলা গুরুত্ব বহন করে। এর প্রতীকী ও মনস্তাত্তিক গুরুত্বও আছে। আর সে নিয়মটি মুসলিমদের জন্য আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যে স্থান থেকেই তুমি উপাসনার জন্য আস না কেন (হে মোহাম্মদ), তোমার মুখ ফেরাও উপাসনার পবিত্রতম স্থানের (মসজিদ আল-হারামের) দিকে। এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সত্য।" (আল-কোরআন ২:১৪৯)

উল্লেখ্য যে, পরকালের সুখ-দুঃখ, পুরস্কার প্রাপ্তি কিংবা শাস্তি ইত্যাদির সাথে বিবিধ নিয়ম পরিপালনের যতটা না সম্পর্ক আছে, তার চেয়েও বেশী সম্পর্ক আছে ভাল-মন্দ কর্মের সাথে। তাই বলে কোন নিয়মকে উপেক্ষাও করা যাবে না। প্রতিষ্ঠিত কোন ভাল নিয়মকে রক্ষা না করাও যথাযথ কাজ নয়। কেননা সেটি নিয়মের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির সূত্রপাত করে। জগতে অশান্তির কারণ হতে পারে। অতএব সব বিষয়কে বিবেচনায় রেখেই বিশ্বাসীদেরকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে হবে।

▪ **২.১১৫.২** নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ (Allah is All-Embracing, All-Knowing) : যিনি সর্বব্যাপী তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন। অতএব তিনি সর্বজ্ঞ [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। তাই বলা হয়েছে, "তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

এভাবে প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে আমরা যা দেখি বা শুনি প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহই দেখেন ও শোনেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে আছেন। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ...।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

গীতায় বলা হয়েছে, "... প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমেশ্বর উপস্থিত ...।" (গীতা ১৮:৬১)

তিনি প্রত্যেকের ভেতরে আছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ে তাঁর পরশ আছে। অতএব ব্যাক্তি যা জানে তিনি তার সবই জানেন। বলা হচ্ছে,

"তুমি কি দেখনি, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সবই জানেন। তিন ব্যাক্তির মধ্যে এমন কোন পরামর্শ হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ না থাকেন, না পাঁচ জনে তিনি ষষ্ঠ নন কিংবা এর চেয়ে কম বা বেশী হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে আছেন; পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫৮:৭)

গীতায় বলা হয়েছে, "ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু জানি।" (গীতা ৭:২৬)

আরও বলা হচ্ছে, "আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা তোমাদেরই মতো।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

বলা হচ্ছে, "সর্বত্র তার হাত ও পা, তার চক্ষু ও বদন পরিব্যপ্ত এবং সে সবকিছু শোনে। এই প্রকারে পরমাত্মা বিদ্যমান।" (গীতা ১৩:১৪)

কেবল মানুষ নয়, সকল প্রাণের মধ্য দিয়ে তিনি জগতের আনাচে-কানাচে সর্বত্র বিরাজমান; সর্বব্যাপী। জীব যা দেখে ও শোনে তিনি তার সবই দেখেন ও শোনেন। তাই তিনি সর্বজ্ঞ।

উদ্ধৃত বিষয়টিকে তাঁর সর্বত্র বিরাজমানতার একটি উপায় হিসেবে ভাবা যেতে পারে। তবে তাঁর কর্মযজ্ঞের বিশালতা ও কৌশল সম্পর্কে মানুষের প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ ও যথাযথ কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহ সর্বব্যাপী। কোরআনে তা বলা হয়েছে। যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী তারা সেটি তর্কাতীতভাবে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাঁর এ সর্বব্যাপীতার ধরণটি কেমন সে বিষয়ে মানুষের সঠিক বা পরিপূর্ণ কোন ধারণা নেই। কোরআন শুধুমাত্র সিদ্ধান্তটুকু জানিয়েছে। কিন্তু ধরণ বা প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারীত জানায়নি। গীতায় বলা হয়েছে,

"আমার অপ্রকাশিত রূপে আমার দ্বারা সমগ্র মহাবিশ্ব পরিবেষ্টিত। ... সকল জীব ও জড় আমার মাঝে স্থিত বলে জানবে।" (গীতা ৯:৪-৬)

আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ। এখানে সে বিষয়ে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র।

➢ (আয়াত ১১৬-১১৭) এ পর্যায়ে ইসরাইলের সন্তান বিশেষত খ্রীষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক (Children of Israel and Partner of Allah) করে। যেটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি গর্হিত কাজ হিসেবে দেখা হয়।

১১৬	তারা (খ্রীষ্টানরা) বলে: আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব থেকে পবিত্র! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। (And they say: Allah hath taken unto Himself a son. Be He glorified! Nay, but whatsoever is in the heavens and the earth is His. All are subservient unto Him.)
১১৭	তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা! যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন, কেবল বলেন: হও! এবং হয়ে যায়। (The Originator of the heavens and the earth! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.)

▪ **২.১১৬.১** তারা বলে: আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব থেকে পবিত্র : ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর অনুসারী, তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কেই তারা আল্লাহর সন্তানরূপে গন্য করে। ইসলামের দর্শন অনুযায়ী এটি 'শিরক'।

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। এটি কঠিন অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ যা ক্ষমার অযোগ্য।

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জেসাস বা ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে এমন ধারণা পোষন করার মূল কারণ হচ্ছে তাঁর জন্মের অলৌকিকতা। কেননা তিনি পিতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছেন। অথচ তাঁর মাতা ছিলেন সতী-সাধ্বী একজন।

তাদের এমন বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনে সে ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। ঈসা (আঃ) এর বিষয়ে কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

"সে (মরিয়ম তনয়, জেসাস বা ঈসা) তো এক বান্দা বৈ আর কিছুই নয়, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে করেছি ইসরাইলের সন্তানদের জন্য আদর্শস্বরূপ।" (আল কোরআন ৪৩:৫৯)

ধারণায়ও যিনি এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা; যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁকে মানুষ বা মানুষের মতো মনে করার কোন কারণ নেই। তেমনভাবে তুলনা করা শোভনীয়ও নয়। আল্লাহ সম্পর্কে কেউই সঠিকভাবে কিছু জানে না। মানুষের মতো তাঁর সন্তান গ্রহণ করারও প্রয়োজন নেই। এগুলি হচ্ছে যথাযথভাবে কোন কিছু না জেনে কথা বলা। তাই জ্ঞান পরিপন্থী কাজ।

আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান বা ধারণার অভাবেই কিছু মানুষ এমনভাবে বলে থাকে। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-ধারাসম্পন্ন মানুষ আছে এবং এমনটি থাকবে। কারও বিশ্বাস ও চিন্তাকে মুহর্তেই সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা কঠিন। এগুলির সাথে যুগের পর যুগ ধারণা লালন-পালনের সম্পর্ক আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্মৃতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির সম্পর্ক আছে। ফলে এসব ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তী চলে না। তবে সঠিক জ্ঞানে ফিরে আসার জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম, প্রচার-প্রচারণা ও নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতেই হবে। অন্যথায় মানুষের আর পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি? সত্যের জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করাই মূল কাজ। বলা হচ্ছে,

"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গী নেই, যখন তিনিই যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সব বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত।" (আল কোরআন ৬:১০১)

কোরআনের দর্শন আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধরণের কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কোরআন মতে আল্লাহর কোন 'সঙ্গী' নেই এবং তাঁর সেটি প্রয়োজনও নেই। উল্লেখ্য যে, এখানে স্ত্রী কিংবা পুংলিঙ্গ বিবেচনা করে 'সঙ্গী' শব্দটি ব্যাবহার করা হয়নি। বস্তুত আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা নেই। অতএব আল্লাহর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বাচক কোন শব্দ ব্যাবহারেরও প্রয়োজনীয়তা নেই। কিছু শব্দ মানুষের বোঝার সুবিধার্থে ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। এটিও তেমন।

■ **২.১১৬.২** তিনি তো এসব থেকে পবিত্র! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন : আল্লাহর বিশালত্ব ও মহাত্ব সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। সকলেই তাঁর নির্দেশ পালন করে বা করতে বাধ্য। কেউই তাঁর সমপর্যায়ের নয়। ফলে তাঁর সঙ্গী, তাঁর সন্তান বা তাঁর সমপর্যায়ের কেউ আছে এভাবে ভাববার প্রয়োজন নেই। তিনি এসব থেকে পবিত্র। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

■ **২.১১৭** তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা! যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন কেবল বলেন: হও! এবং হয়ে যায় : আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তাঁর বিশালত্ব ও মহাত্ব বোঝাতে গিয়ে বলা হচ্ছে যে, যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন কেবল বলেন: হও! এবং তা হয়ে যায়। এমন একজনের সঙ্গে কারও বা কোন কিছুর তুলনা হয় না।

যারা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর সন্তানরূপে মনে করে তাদের এমনটি মনে করার বড় কারণ হচ্ছে তাঁর জন্মের অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিকতা। যে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত না। কেননা সবাই এটি অবহিত যে তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ মানবীয় জ্ঞানে সেটি সম্ভব নয়। তাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা! যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন, কেবল বলেন: হও! এবং হয়ে যায়।' সেভাবেই ঈসা (আঃ) হয়েছেন। এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে,

"নিঃসন্দেহে! ঈসাহর দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতোই। তিনি তাকে ধূলো থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন, 'হও!' এবং সে হয়ে গেল।" (আল-কোরআন ৩:৫৯)

আল্লাহ সব পারেন। তিনি চাইলে শূন্য থেকেও সৃষ্টি করেন। যেমন করেছেন আদমকে। অতঃপর যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সঠিক জ্ঞানে ও বিশ্বাসে ফিরে আসার জন্য আহবান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কিত এ বাণী যে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে এটি বিশ্বাস করা তো দুরের কথা কল্পনার মধ্যেও আনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন কোরআন যে সত্য তার নিদর্শন তিনি মানুষকে প্রদর্শন করবেন। বলা হচ্ছে,

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে এটিই (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) সত্য।" (আল-কোরআন ৪১:৫৩)

বর্তমানে মানুষও তেমন টেকনোলজি ব্যাবহার করে চলেছে। যেমন 'গুগল কমান্ড' তাই করে। এটি একটি নমুনা বা খুব ক্ষুদ্র একটি নিদর্শন মাত্র। চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে এসব বাণীর সত্যতা ও সম্ভাব্যতা বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। বর্তমানে টেষ্টটিউবেও শিশু জন্ম নিচ্ছে। আল্লাহর কিছু নিদর্শন এগুলি। অথচ তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের কতটুকুই বা আমরা ধারণা করতে পারি?

➢ (আয়াত ১১৮-১১৯) ইসরাইলের সন্তানদের তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদের (Children of Israel and Their Deeds) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাদের কার্যকলাপের কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বাসীরা যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে বুঝতে পারে এবং এসব বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করে। তারা তাদের মন্দ কর্ম ও আচরণের ফল ভোগ করবে।

১১৮	যাদের সঠিক জ্ঞান নেই তারা বলে: আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। আমি অবতীর্ণ বাণী

	স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা নিশ্চিত (বিশ্বাসী)। (And those who have no knowledge say: Why doth not Allah speak unto us, or some sign come unto us? Even thus, as they now speak, spake those (who were) before them. Their hearts are all alike. We have made clear the revelations for people who are sure.)
১১৯	(হে মোহাম্মদ) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্য (বার্তা/ধর্ম) সহ সুসংবাদদাতা এবং একজন সতর্ককারীরূপে। নরকবাসীদের সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না। (Lo! We have sent thee (O Muhammad) with the truth, a bringer of glad tidings and a warner. And thou wilt not be asked about the owners of hell-fire.)

▪ **২.১১৮** যাদের সঠিক জ্ঞান নেই তারা বলে: আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? ... আমি অবতীর্ণ বাণী স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্য যারা নিশ্চিত (বিশ্বাসী) : 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন? অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন?' যারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে তারা এভাবে কথা বলে মূলত অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাবের কারণে।

আল্লাহ কে বা কি মানুষ তার কিছুই জানে না। আল্লাহকে ধরে নেয়া হয়েছে সমগ্র মহাজগতের সৃষ্টিকর্তারূপে। স্বাভাবতই তাঁর বিশালত্ব ধারণাতীত, মানব জ্ঞানে যেমন ধারণাতীত এ মহাজগত। এখানে মানুষ আমরা এক অতি ক্ষুদ্র আনুবীক্ষনিক জীব। আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে বোঝা বা তাঁকে দেখা কি মানুষের বর্তমান দৃষ্টিশক্তি দ্বারা আদৌ সম্ভব? তার গর্জনসম শব্দ মানুষের কর্ণ কুহরে কি সহনীয় হবে যদি না তিনি তা মানুষের জন্য উপযোগী করে দেন? অর্থাৎ অনুমোদন দেন। বিষয়গুলি ভাববার আছে। যেমন গীতায় তাঁর দর্শন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

"যা তুমি দেখতে চাও- এ দেহে তুমি তার সবই মূহুর্তে দেখতে পাবে। এই বৈশ্বিক রূপ তোমাকে তাই দেখাবে, যা তুমি দেখতে চাও এবং ভবিষ্যতেও যা

তুমি প্রত্যাশা কর। এখানে সবকিছু পরিপূর্ণরূপে আছে। তবে তুমি তোমার বর্তমান চক্ষু দ্বারা আমাকে বা আমার বিশ্বরূপ দেখতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করছি, যা দ্বারা তুমি আমার অচিন্তনীয় গুপ্ত ঐশ্বর্য্য দেখতে পাবে।" (গীতা ১১:৭-৮)

মুসা (আঃ) যখন আল্লাহকে দেখতে চেয়ে বললেন, "হে আমার প্রভূ! আমাকে দর্শন দাও যেন আমি তোমাকে দেখি। তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি সেটি স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন সেটি বিধ্বস্ত হল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।" (আল-কোরআন ৭:১৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা ও তাঁর সাথে কথা বলা ধারণার অতীত বিষয়। যদি না তিনি তার অনুমোদন দেন। তাঁর বিশালত্বের ধারণা দিতে গিয়ে কোরআন ও গীতায় বলা হয়েছে,

"তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘূর্ণায়মান কিংবা ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে।" (আল-কোরআন ৩৯:৬৭)

"জেনে রাখ যে- আমার কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সহায়তা দিয়ে যাই।" (গীতা ১০:৪২)

মানব জ্ঞান বর্তমানেও সাধারণভাবে যতটুকু ভাবতে পারে সেভাবে ভাবলেও তো এগুলি অকল্পনীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবিশ্বাসীরা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন?' আল্লাহ বলেন,

"কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত অথবা কোন পর্দার অন্তরাল অথবা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে।" (আল-কোরআন ৪২:৫১)

আল্লাহ কেবলমাত্র মুসা (আঃ) এর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন। কোরআনে সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি চাইলে সব করতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।" (আল-কোরআন ৪:১৬৪)

কেউ কেউ বলে আমাদের কাছে আল্লাহর দিক থেকে কোন নিদর্শন আসে না কেন? আল্লাহ বলেন,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন বা শিক্ষনীয় ঘটনা, যা মানুষ পাশ কেটে চলে যায় ফিরেও তাকায় না!" (আল-কোরআন ১২:১০৫)

আরও বলেন, "পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।" (আল-কোরআন ১৭:৫৯)

সত্য হচ্ছে, নিদর্শন থাকা সত্বেও মানুষ যদি নিজে উদাসীন হয় তবে সে কিছুই দেখতে পাবে না।

পূর্বের নবী-রাসূলদের যুগেও কিছু মানুষ এমনিভাবে প্রশ্ন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা বিশ্বাসী নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"... এরা মূসার কাছে বহুবার এর চেয়েও বড় কিছু চেয়েছিল। তারা বলেছিল, আমাদেরকে সরাসরি আল্লাহকে দেখিয়ে দাও।" (আল-কোরআন ৪:১৫৩)

আল্লাহকে মনে মনে তারা সমপর্যায়ের কোন কিছু কল্পনা করে। বস্তুত এদের চিন্তা-ধারা একই প্রকৃতির। এ বার্তার মাধ্যমে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে এমন চিন্তা-ভাবনাসম্পন্ন মানুষদের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেছেন। যেন তারা বিষয়গুলি বুঝতে পারে এবং অজ্ঞদের কথায় ভগ্ন-হৃদয় না হয়। যারা এভাবে উক্তি করে তাদের কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে তেমনটি বলে থাকে। কেউ বলে দাম্ভিকতা থেকে। কেউ উপহাসের ছলে বলে।

এ ধরণের মানুষেরা একটি দর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জানে না বা বোঝে না, কিংবা জানতে চায়না বা বুঝতেও চায় না। এরা সচেতন প্রকৃতির মানুষ নয়। এরা এমন ধরণের মানুষ যারা গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়ে

চলে। এরা মন্দের মধ্যেও মন্দ দেখতে পায় না। তাই সমাজ সংস্কার, চিন্তা জগতের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না। যেমন আছে সেভাবেই জীবন পার করে দিতে অভ্যস্ত। কেবল আরও পেতে চায়, আরও ভোগ করতে চায়। জীবন ও জগত নিয়ে এদের কোন গঠনমূলক ও সূদুর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা নেই বা থাকে না। তাই এরা এমন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কথা বলে, আচরণ করে। সব যুগেই এ ধরণের কিছু মানুষ থাকে।

বিশ্বাসীদেরকে এমন মানুষদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা ভূল-পথগামীদের মতো আচরণ না করে এবং তাদের এমন ধরণের উক্তিতে বিচলিতও না হয়। ভূল-পথগামীরা তাদের মন্দ আচরণের পরিণাম ভোগ করবে প্রচ্ছন্নে এখানে সে বার্তাও আছে।

▪ **২.১১৯** আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ সুসংবাদদাতা এবং একজন সতর্ককারীরূপে। নরকবাসীদের সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে না : আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) কে একজন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন। রাসূলের দায়িত্ব সু-সংবাদ ও সতর্কবার্তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়া। সু-সংবাদ হচ্ছে এই যে, যে ভাল পথে চলবে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে পরকালীন জীবনে সে সুখী হবে। সতর্কবার্তা হচ্ছে, যে মন্দ পথে চলবে পরকালীন জীবনে সে অসুখী হবে। যে সুখী হবে সে স্বর্গীয় জীবন লাভ করবে। অপরদিকে যে অসুখী হবে সে নরক যন্ত্রনা ভোগ করবে।

মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আল্লাহ একটি সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। সত্য ধর্ম কি? খুব অল্প কথায় বলা যায় সত্য ধর্ম হচ্ছে- সহজ-সরল পথে চলা, আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা, ভাল কাজ করা, মন্দ পথ পরিহার করে চলা। ন্যায়ের পথে চলা। সত্য হচ্ছে সঠিক সূত্র। অতএব জীবনকে সঠিক সূত্রে পরিচালনা করা।

সঠিক সূত্রে নিজে চলতে পারলেই পরিণাম মঙ্গলজনক। প্রাপ্তি হচ্ছে পুরস্কার। এটিই সত্য বা সূত্র। এমনই হচ্ছে মানুষের যথাযথ ধর্ম। এটিই শান্তির পথ। তাই বলা হয় ধর্মই ব্যাক্তিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি এনে দিতে পারে। ষয়গুলিতে যে মনযোগের সাথে কর্ণপাত করবে ও মেনে চলবে সে ভাল ফল পাবে।

ধর্মীয় যেসব বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হয় তার সবই এ শান্তির সম্ভাবনাকে সামনে রেখে করা হয়। কিন্তু যদি সে শান্তিই অর্জিত না হয় তবে সকল আরাধনা, আচার-অনুষ্ঠানের পরিপালন অর্থহীন- ব্যার্থ। এটিই ধর্মচ্যুতি।

সু-সংবাদ ও সতর্কবার্তা মানুষের মাঝে প্রচার করা, মানুষকে সঠিক পথ দেখান ও অতঃপর অনুপ্রাণীত করার পর রাসূলের আর কি করণীয় থাকতে পারে? কেননা মানুষের নিজেকেই নিজের ভাল পথে চালাতে হবে, কিংবা মন্দ পথ থেকে নিজেরই নিজেকে বিরত রাখতে হবে। প্রতিটি ব্যাক্তি তার নিজের ভাল-মন্দ কর্মের জন্য নিজেই দায়ী।

তাই বলা হয়েছে রাসূল তার বার্তা পৌঁছে দেয়ার পর ভূল পথগামীদের বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। তিনি তাঁর অংশের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর প্রতিটি ব্যাক্তিকে কিংবা দলগত প্রচেষ্টায় মানুষকে নিজের বা নিজেদেরকে ভাল পথে চলতে সচেষ্ট হতে হবে। নিজেদের দায় মানুষকে নিজেদেরই বহন করতে হবে। এমনই আল্লাহর নিয়ম। কোরআনে বহুবার বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে যে, প্রত্যেককেই তার নিজ দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। যা এ বাণীর মাধ্যমে রাসূল ও মানবজাতিকে এভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'নরকবাসীদের সম্পর্কে তুমি (মোহাম্মদ) জিজ্ঞাসিত হবে না।'

কেউ যদি উপদেশ মেনে চলে সে ভাল ফল পাবে। কেউ যদি উপদেশ বা দিক-নির্দেশনা উপেক্ষা করে এবং ফলস্বরূপ নরকের জীবন লাভ করে, তবে তার জন্য রাসূলের কোন দায় নেই। আল্লাহ এটি তাঁকে ও সকল মানুষকেও জানিয়ে দিয়েছেন।

এ নিয়ম বা রীতিটিও সার্বজনীন ও শাশ্বত। যা স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় একই নিয়মে মানুষও তাদের পার্থিব জীবনের নানাবিধ পরিচালন প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করে থাকে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে দিক-নির্দেশনা দেন।

অতএব বার্তা পাওয়ার পরও ইসরাইলের সন্তানেরা যদি নিজেরাই নিজেদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখে, তবে তাদের বিষয়ে রাসূলের করণীয় নেই। তাদের হিসেব আল্লাহর কাছে। মন্দ কাজের পরিণাম নরক। সে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে যেন তারা সুপথে ফিরে আসে।

➢ (আয়াত ১২০-১২১) ইসরাইলের সন্তান তথা ইহুদি-খ্রীষ্টানদের বিষয়ে বলা হয়েছে (Children of Israel and Their Deeds)। তারা চায় মহানবী (সাঃ) তাদের পথ অনুসরণ করুক। তাহলে তারা তাঁকে গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। উপরন্তু বলেন যারা এ গ্রন্থ যথাযথভাবে পাঠ করবে তারা সত্যকে বুঝতে পারবে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতএব সত্যকে বুঝতে হলে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। যথাযথভাবে বিশ্লেষনও করতে জানতে হবে।

১২০	যে পর্যন্ত না তুমি (হে মোহাম্মদ) তাদের ধর্মের অনুসরণ কর, সে পর্যন্ত না ইহুদিরা না খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। বল: আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। যে জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছেছে, তার পরেও যদি তুমি তাদের ইচ্ছের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি না পাবে কোন রক্ষাকারী, না পাবে কোন সাহায্যকারী। (And the Jews will not be pleased with thee, nor will the Christians, till thou follow their creed. Say: Lo! the guidance of Allah (Himself) is Guidance. And if thou shouldst follow their desires after the knowledge which hath come unto thee, then wouldst thou have from Allah no protecting friend nor helper.)
১২১	আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে (যথার্থ অনুধাবন করে), তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (Those unto whom We have given the Scripture, who read it with the right reading, those believe in it. And whoso disbelieveth in it, those are they who are the losers.)

▪ **২.১২০.১** যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ কর, সে পর্যন্ত না ইহুদিরা না খ্রীষ্টানরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট : ইসরাইলের সন্তানেরা চায় মোহাম্মদ (সাঃ) তাদের পথ বা ধর্মের অনুসরণ করুক। তাহলে তারা তাঁর ওপর

সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু আল্লাহ যাকে একবার সত্যের জ্ঞান দান করেন তার পক্ষে কখনই সে সত্যকে পরিত্যাগ করে কোন মিথ্যে বা ভূল ধারণাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বস্তুত জ্ঞানের কারণেই সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে না। এটিও কারও প্রতি আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন সে সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। চিত্তের এমন দৃঢ়তা জ্ঞানের কারণেই ঘটে। আর এভাবেই অনুগ্রহ প্রাপ্তদের মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে ও সত্য প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে।

সত্য হচ্ছে, কোরআনের পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় নেই। নানাভাবে এগুলি বিকৃত হয়েছে এবং মূল ধারণা থেকে এসবের বিচ্যুতি ঘটেছে। এসব বিকৃতির জন্য ধর্মীয় বোদ্ধাগণ যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী ক্ষমতাশালী স্বার্থান্বেষী মহলও। তারা তাদের সুবিধামতো অনেক বিষয় এসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে। ফলে এসব ধর্ম বর্তমানে তার প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইসরাইলের সন্তানদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করা ভীষনভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয়েই আল্লাহর সঙ্গে সন্তানজনিত অংশীদারিত্ব আরোপ করে। এ প্রসঙ্গে তাই কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে,

“ইহুদীরা বলে, ‘ইজরা আল্লাহর পুত্র’ এবং খ্রীষ্টানরা বলে, ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র।’ এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। তারা ‘পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী’দের মতো কথা বলে। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ। কিভাবে তারা সত্যচ্যূত হল! তারা আল্লাহ ব্যাতিত পন্ডিত ও বৈরাগী এবং মসীহ বা মরিয়মের পুত্রকেও তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা কেবল এক উপাস্যের উপাসনার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। অংশীদাররূপে তারা যা সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র। (আল-কোরআন ৯:৩০-৩১)

উল্লেখ্য যে, সোলায়মানের মৃত্যুর পরে ব্যবিলনের দ্বারা যখন জেরুজালেম ও পবিত্র উপাসনালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ইসরাইলিরা তাদের পবিত্র গ্রন্থ, বিধি-বিধান ও তাদের জাতীয় ভাষা হিব্রুসহ মূল্যবান বহুকিছু হারিয়ে ফেলে।

উজায়ের বা ইজরা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের সময়কালে পুনরায় তাওরাত লিপিবদ্ধ করে এবং বিধি-বিধানসমুহ পুনরুদ্ধার করে। তাই কিছু ইহুদি তাকে গডের সন্তানের মতো গন্য করে। আবার খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্ররূপে গণ্য করে। উদ্ধৃত বাণী সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে। এগুলি তাদের ধর্মের মূল চেতনার পরিপন্থী ও বিকৃতির উদাহরণ।

ওপরোক্ত আয়াতে 'পূর্ববর্তী অবিশ্বাসী' কথাটি দ্বারা মিশরীয়, গ্রীক, রোমান বা পারস্যের অধিবাসী যারা নানান কল্প-কাহিনীমূলক দেব-দেবতা সৃষ্টি করত যাদের দ্বারা এরা প্রভাবিত হয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

অতএব বর্তমানে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টানদের ধর্মের পথ অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরোপ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে যা গর্হিত অপরাধ। এটি 'শিরক' এর পাপ হিসেবে গণ্য হয় যা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ সব পাপ মাফ করলেও এ একটি পাপ মাফ করেন না।

এমতাবস্থায় মহানবীর পক্ষে তাদের পথ অনুসরণ করা কখনই সম্ভব নয়। তিনি সত্য ও সঠিক পথটিকে বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি সত্যের দ্রষ্টা। এমন ধারণার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করাই বরং ইসলামের দর্শনের মৌলভিত্তি। মূল থেকে সরে গিয়ে দর্শন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেক্ষেত্রে কোন চেতনা কাজ করবে না। সত্যের জ্ঞানের কারণেই মহানবীর পক্ষে তাদের ধর্ম মেনে নেয়া কোনভাবেই সম্ভব না।

সত্যের জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহর অপার আশীর্বাদ স্বরূপ। যে আশীর্বাদ সকলেই লাভ করতে পারে না। সত্যের জ্ঞান চিত্তকে দৃঢ়তা দান করে। যেখান থেকে সরে আশা সম্ভব হয় না। আল্লাহ সকলকে সে জ্ঞান দান করেন না। তিনি জানেন কাকে তাঁর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করবেন।

এ বাণী আবার প্রচ্ছন্নে এটিও বুঝতে সহায়তা করে যে তারাও তোমার ধর্ম গ্রহণ করবে না। তোমার পক্ষেও তাদের ধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফলে যার যার ধর্ম তার তার। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বিচার করার মালিক আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানের দ্বারাও জগতে অনেক নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। বলা যায় অনেক সত্য উন্মোচিত হয়েছে। বুঝতে হবে যে সেসবও কারও না কারও প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহেরই ফসল। কিন্তু দেখা

গেছে যে সত্যের সেসব প্রাপ্তিও চিরকালই কিছু মানুষের বিরোধীতার মুখে পরেছে। মহানবী (সাঃ) যে সত্যের বাণী নিয়ে আগমন করেছেন যেমন- আল্লাহর কোন অংশীদার নেই, কিছু মানুষ তারও বিরোধীতা করবে এটিও অস্বাভাবিক নয়। এগুলিও সমাজবিজ্ঞানের অংশ।

▪ **২.১২০.২** বল: আল্লাহর প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ (The guidance of Allah is Guidance) : যারা চায় মোহাম্মদ (সাঃ) তাদের ধর্মের পথ অনুসরণ করুক আল্লাহ বলেন তাদেরকে বল যে, আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক ও উত্তম পথ এবং কোরআন সে পথই প্রদর্শন করে।

সত্যি বলতে, আল্লাহ যখন কারও প্রতি অনুগ্রহ বর্ষন করেন তখন তিনি তাকে সত্যের দ্রষ্টা করে দেন। তার জ্ঞান তাকে অত্যান্ত পরিস্কার, স্বচ্ছ ও সহজবোধ্যভাবে চলার যথাযথ পথটি প্রদর্শন করে। মস্তিষ্ক কোনরূপ জটিলতা ছাড়াই সরল পথটিকে দেখতে পায়। সে সরল পথই হচ্ছে চলার সঠিক পথ। এমনই আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করেন সে সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। সে পথে তাকে এগিয়ে চলতে হয়। চিত্তের এমন দৃঢ়তা সত্যকে বুঝতে পারার কারণেই ঘটে।

'শিরক' একটি অন্যায় ও মহাপাপ। আল্লাহ যাকে এ জ্ঞান দান করেছেন এবং যিনি সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি কখনই সে পথে পা বাড়াবেন না। এর বহুবিধ কুফল এ গ্রন্থেই প্রযোজ্য স্থানগুলিতে আলোচিত হয়েছে এবং আরও হবে। আল্লাহ এ পথ থেকে মানুষকে দুরে থাকতে বলেছেন। আল্লাহ প্রদর্শিত এ পথই সঠিক পথ। কোরআন সে পথই প্রদর্শন করে।

উপরন্তু কোরআন সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে। অশ্লিলতা পরিত্যাগ করতে বলে। সরল পথে চলতে বলে। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করার কথা বলে। এসবের প্রতিটি আবার বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। যা প্রতিটি প্রযোজ্য স্থানে আলোচনা করা হচ্ছে এবং হবে।

যারা যথাযথ জ্ঞানে কোরআনের বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করবে, তারা দেখবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোরআন সঠিক ও ন্যায়সম্মত পথটিকে বেছে নিয়েছে। জগতের সকল মানুষও যদি কোনদিন দুর্নীতিগ্রস্ত ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে ন্যায়ের স্বপক্ষে কোরআনই সেদিন মানুষকে সত্য ও সঠিক পথে

ফিরে আসার জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করবে। এটি এমন এক গ্রন্থ! যে গ্রন্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে এক অবিশ্বাস্য প্রেরণা সৃষ্টিকারী পথ-নির্দেশনা! যে পথ স্বয়ং আল্লাহ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ প্রদর্শিত পথই অশ্লীলতা বিবর্জিত ও ন্যায়সম্মত সঠিক পথ।

তবে এটিও সঠিক যে, বর্তমানে যেভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সে কারণেও অনেকে একে সঠিক বলে মেনে নিতে ইচ্ছুক নয়। তবে সঠিক বিচার-বিশ্লেষণই পারে এ বার্তার যথার্থতাকে তুলে ধরতে। এ গ্রন্থে সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

- **২.১২০.৩** যে জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছেছে, তার পরেও যদি তুমি তাদের ইচ্ছের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি না পাবে কোন রক্ষাকারী, না পাবে কোন সাহায্যকারী : আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ও ন্যায় পথের যে জ্ঞান মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট পৌঁছেছে তা ভূল পথগামীদের অন্যায় ও অন্যায্য কর্মের বাধাস্বরূপ। ফলে সুবিধাভোগী চরিত্রের লোকেরা স্বাভাবতই তাকে তার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে, নয়ত নিজেদের দিকে লোভনীয়ভাবে টানতে চেষ্টা করবে।

আল্লাহর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ জ্ঞান আকারে যাদের কাছে পৌঁছে তাদের চিত্ত দৃঢ় থাকে। তারা জ্ঞানের কারণে তাদের পথ থেকে সরে যায় না বা যেতে পারে না। কিন্তু লোভ কিংবা কোন দুর্বলতাও মানুষের মধ্যে কাজ করে এটিও সত্য।

যারাই নতুন কিংবা সত্যের কোন ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তাদের সে ধারণা বরাবরই স্বার্থান্বেষীদের বিরোধীতার মুখে পরেছে। সত্যের ধারণার পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ খুব কমই থাকে। তা সত্বেও সবসময় সত্যই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেক ক্ষমতাধর মানুষদের বিরোধীতা সত্বেও সত্যের ধারক দু-একজনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ জগতে সফল হওয়ার অনেক নজির রয়েছে, যা কিনা অলৌকিক বিষয়ের মতো। ইতিহাস থেকে আজ আমরা সেসব বিষয় জানতে পারি।

মানুষ এভাবেই ধরে নেয় যে, আল্লাহর সহায়তা তাদের কাজকে সফল হতে সহায়তা করেছে। যদিও প্রত্যেক ঘটনার সফলতার পেছনে যথাযথ কারণ

থাকে, তথাপি সব কারণের পেছনে আরও কারণ থাকে। সেখানেই আল্লাহর সহায়তার বিদ্যমানতার বিষয়টি সম্পর্কিত। অর্থাৎ আল্লাহর সম্পৃক্ততার বিষয়টি বুঝতে হলে সর্বক্ষেত্রেই গভীরের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবেশ করতে হবে।

সত্যের ধারক কেউ কখনও যদি সত্য পরিত্যাগ করে ভূল পথগামীদের সঙ্গে আপোষ করে, তবে যে আল্লাহর সহায়তার কারণে সে তার জ্ঞান, ধৈর্য্য ও প্রেরণা লাভ করেছে সে আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহ কে, কিভাবে সহায়তা ফিরিয়ে নেবেন সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। পক্ষ ত্যাগ করলে সহায়তাকারীর সহায়তা পাওয়া যাবে না এটি সাধারণ নিয়ম। সে নিয়মের কথা বলা হচ্ছে।

জগতের সামগ্রীক প্রক্রিয়া আল্লাহর হাতে। তাঁর সহায়তা মানুষ সরাসরি দেখতে পায় না বিধায় বুঝতে পারে না। তিনি সামগ্রীক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে যাকে ইচ্ছে তাকে সহায়তা করেন। জগতে নতুনের আবির্ভাব ও প্রচন্ড বিরোধীতা সত্বেও নতুনের প্রতিষ্ঠা লাভ করা তারই সাক্ষ্য-প্রমান বহন করে।

সত্যের জ্ঞানের ধারক যদি কোন প্রলোভনে পতিত হয় বা পক্ষ ত্যাগ করে, তবে যাদের প্ররোচনা বা প্রলোভনে জ্ঞানের ধারক ভূল-পথগামী হবে, তারাও যখন দেখবে যে আল্লাহর আশীর্বাদ তার ওপর থেকে উঠে গেছে তখন তারাও সরে পরবে। এটাই জগতের রীতি। এগুলি সত্য।

তাই সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, যে জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছেছে তার পরেও যদি তুমি তাদের অর্থাৎ ভূল-পথগামীদের ইচ্ছের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি না পাবে কোন রক্ষাকারী না পাবে কোন সাহায্যকারী। তখন কোন পক্ষের সহায়তাই আর পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় আল্লাহর শাস্তি বা ধ্বংস অনিবার্য।

অন্যায়কারীরা প্রকৃতি তথা আল্লাহ প্রতির্ষ্ঠিত এ সূত্রের আশ্রয় নিয়েই সত্যকে রোধ করার চেষ্টা করে। তারা এসব জানে। যদিও খুব বেশী সফল হয় না। কেননা সত্য প্রতির্ষ্ঠিত হবেই। আল্লাহই সত্য।

তাই সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারীর জন্য তার নিজের জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই বা থাকে না, কিংবা পরিত্যাগ করে

গড্ডালিকায় গা ভাসালে তাকে তার পরিণাম ভোগ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়।

আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে সহায়তা প্রাপ্তি সত্বেও যারা তাদের কাজ ও লক্ষ্য থেকে সরে যাবে, আল্লাহর নিকট থেকেও তখন তাদের প্রতি প্রদত্ত সহায়তা সরে যাবে এখানে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ একাই সকলের এমনকি এ বিশ্বজগতের রক্ষাকারী। মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই যতটুকু তার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে তা ব্যাতিত অন্যথা করার। গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়গুলি মানুষ নিজেও বুঝতে পারবে।

তাই যথার্থই বলা হয়েছে যে, যে জ্ঞান তোমার কাছে পৌঁছেছে তার পরেও যদি তুমি তাদের অর্থাৎ ভূল পথগামীদের ইচ্ছের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি না পাবে কোন রক্ষাকারী না পাবে কোন সাহায্যকারী। অতএব ইহুদি-খ্রীষ্টানদের ভূল পথ অনুসরণ করা মোহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য যথাযথ নয়।

■ **২.১২১.১** আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে তারাই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সঠিক পথ। কোরআন আল্লাহ প্রদর্শিত পথকেই মানব সমাজে তুলে ধরে।

কোরআনে যেমন উঠে এসেছে জীবন ও জগত সম্পর্কিত সত্য ও ন্যায়ের দর্শন; তেমনি তৎকালীন সময়ে আল্লাহর বাণীর প্রচার ও প্রসারকালে যেসব ঘটনার মুখোমুখী হতে হয়েছে তার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা সিদ্ধান্তসমূহও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উদ্ধৃত প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষিতেই কোরআন মানবজাতিকে বাস্তব ও ন্যায়সম্মত পথ প্রদর্শন করেছে। সত্যের পথে চলতে শিখিয়েছে। যারা মনযোগের সাথে কোরআন অধ্যায়ন করবে তারা এর দর্শনের দিক ও বিবিধ ঘটনার প্রেক্ষিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারবে। অবশ্যই তাদের অন্তর তাতে সম্মতিও জ্ঞাপন করবে এবং কোরআনের বার্তায় জ্ঞানের কারণেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। উপরন্তু সকল ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা ও বাস্তবতাকে বিবেচনা করে ন্যায়ের স্বপক্ষে কোরআনের দৃঢ় অবস্থান ও বক্তব্য

পাঠ করে অভিভূত হবে! তাই বলা হয়েছে যে, যারা সঠিকভাবে গ্রন্থ পাঠ করে অর্থাৎ এর সঠিক বিশ্লেষণোত্তর যথাযথ অর্থ অনুধাবন করে তারাই এ গ্রন্থের বার্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তারাই সাচ্চা বিশ্বাসী।

যারা সঠিকভাবে কোরআনের অর্থ বিশ্লেষণ করতে ও বুঝতে ব্যার্থ হবে কেবল তারাই এর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তারা নিজেরা গ্রন্থের কিছুই জানে না, উপরন্তু না জানা মানুষের নানান বক্তব্যে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে,

“কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা শোনা কথাটুকু ছাড়া গ্রন্থের কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমান করে।” (আল-কোরআন ২:৭৮)

এসব বাণী সার্বজনীন ও শাশ্বত। আবার কিছু মানুষ কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে না বুঝেও বিশ্বাস করবে। এমন মানুষও সমাজে প্রয়োজন আছে। তবে বোধসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা তেমন মানুষদের যথাযথভাবে পরিচালিত হতে হবে।

কোরআন এমন এক গ্রন্থ যা বোধ ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের নিজেদেরকেই পরিশ্রম করে পাঠ করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে ও বুঝতে হবে। কোরআনের পুনঃ পুনঃ অধ্যায়ন এক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞানে প্রবেশের পথে সহায়ক হতে পারে। সে কারণেই এর নাম ‘কোরআন’। যার অর্থ ‘পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য’।

কি কারণে একটি নির্দেশনা কোরআনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত ও যৌক্তিকতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। সেটি বুঝতে হলে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। যারা এর মর্মার্থ আবিস্কার করতে পারবে তারা অবশ্যই এর বার্তায় বিশ্বাস আনবে। এ লেখায় সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে ন্যায়ের প্রতি তার একটি সহজাত আকর্ষন আছে। বেশীর ভাগ মানুষের চরিত্র সেটিই প্রদর্শন করে। তবে কেউ ন্যায়-অন্যায়কে বুঝতে ভূল করে। আর যারা এর বিপরীত আচরণ করে তারা সেটি করতে পারে বাস্তবে কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। কিংবা কেউ তেমনটি করে অজ্ঞতা বা মূর্খতার কারণে। আবার কেউ ন্যায়ের বিপরীতে আচরণ করে দাম্ভিকতার কারণে। কেউ আবার স্বার্থের কারণে। এ

সবই অজ্ঞতার কারণে ঘটে। তবে উচ্চ পর্যায়ে জগত পরিচালনাকারীদের মধ্যে সে সংখ্যাটি কম। তা না হলে জগত এত সুন্দর সিস্টেমেটিকভাবে চলতে পারত না।

যথাযথ পরিচর্যা ভূল পথগামীদেরকেও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের পাশাপাশি সমাজের মানুষের মূখ্য কাজ বা করণীয় হচ্ছে সর্বত্র বিশেষত সামাজিক ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। কোরআন যেসব বিষয়ে কথা বলে যেমন,

- বিধাতায় সমর্পনের কথা বলে যা প্রশান্তির কারণ
- ইহকালের সমস্যাসমুহের ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানের কথা বলে
- সামাজিক বিশৃংখলা দুর করে শান্তি স্থাপনের কথা বলে
- পরকালের কথা বলে, অর্থাৎ কর্মের হিসেব তথা জবাবদিহিতা বা একটি বিচার দিবসের কথা বলে, যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে
- মানুষকে ভাল পথে চলতে বলে ও উদ্বুদ্ধ করে
- মন্দ ও অশ্লিল কাজ বর্জন ও পারিত্যাগ করতে বলে
- সম্পদের ন্যায্যতার কথা বলে
- আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে বলে
- প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়কে বিবেচনা করতে বলে
- স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা দেয় ইত্যাদি।

যে গ্রন্থ সর্বক্ষেত্রে সত্য, ন্যায় ও ভাল পথটিকে প্রদর্শন করে সেখানে তার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে না পারার ব্যার্থতার দায় মানব সমাজের সকল মানুষের নিজেদের ওপর বর্তায়। সকল মানুষ বলা হল এ কারণে যে, মানুষের মধ্যে একদল আছে যারা প্রদর্শিত পথকে উপেক্ষা করে হলেও নিজেদের সকল প্রকার এমনকি অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করার তৎপরতায় ব্যাস্ত থাকে এবং আরেক দল আছে যারা সব দেখে-শুনে, জেনে-বুঝেও নিরব ও নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে। ফলে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ও সঠিক বার্তা জানার পরেও ন্যায় বিচার থেকে শুরু করে সমাজের সকল প্রকার বৈষম্যমূলক অবস্থার জন্য সকল মানুষের দায় আছে।

যারা সত্যের পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সদা তৎপর এরাই যথাযথ পথে আছে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারা তাদের কর্ম প্রচেষ্টার ভাল ফল পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। যারা যথাযথরূপে সত্য বার্তাটি বুঝে নিতে পারবে তারা অবশ্যই কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। কেননা এখানে কোন প্রকার ভূল বা মন্দ নির্দেশনা নেই। যা আছে তার সবই মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণসূচক দিক-নির্দেশনা। ফলে এমন বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন না করার কোন কারণ নেই। কেবল যথাযথভাবে এর বার্তা বুঝতে না পারাই একমাত্র কারণ। তাই যথাযথভাবেই বলা হয়েছে যে, যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তা সঠিকভাবে পাঠ করে অর্থাৎ যথাযথ অর্থ অনুধাবন করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

▪ **২.১২১.২** আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত : বলা হচ্ছে, যারা কোরআনের বার্তা অবিশ্বাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। কেন এভাবে বলা হল?

সকল বিচার-বিশ্লেষণ শেষে কোরআন নিজেই দাবী করছে যে, এটি সঠিক পথ প্রদর্শন করে। যে সঠিক পথে থাকবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু যে সঠিক পথে থাকবে না সে ভূল পথে চলবে, অন্যায় করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটিই স্বাভাবিক বা প্রকৃতির নিয়ম। কোরআন সত্য ও ন্যায় পথকে উৎসাহিত করে।

অতএব কোরআনের বার্তা যদি সঠিক হয় তবে যৌক্তিক ভিত্তিতেই এটি বলা যেতেই পারে যে, এ বার্তা যে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওপরের দাবীটি কোরআনের নিজের দাবী। প্রত্যেকেই তার নিজেকে ভাল ও সঠিক দাবী করবে এটিই স্বাভাবিক। তাই ওপরের দাবীর যথার্থতা নিশ্চিত হতে হলে কোরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। আর সেটি করতে হলে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। বুঝতে হবে যে কোরআন প্রদর্শিত দর্শন ও বিবিধ ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআনের গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত ক্ষেত্র বিশেষে সঠিক হয়েছে কিনা। যদি সেটি একজন বিশ্লেষকের কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়, তবে যারা প্রদর্শিত এ পথকে অস্বীকার করবে, ধরে নেয়া যেতে পারে যে তারা ভূল

পথে আছে। যে ভূল পথে চলবে তার পথ তাকে ভূল ফলাফল দেবে। ভূলের প্রকৃতিগত অবধারিত ফলাফল হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। অতএব সে আলোকে ওপরের বাণীতে যথার্থই বলা হয়েছে যে যারা এ বার্তায় অবিশ্বাস করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যারা এ নিয়ম বা সূত্র বুঝতে পারবে এবং কোরআনের বার্তার সঠিকতা অনুধাবন করতে পারবে তারা কোরআনের নির্দেশনা মেনে চলবে। কিন্তু যারা এর অন্যথা করবে তারা জগত পরিচালিত হবার যথাযথ সূত্র, তথা প্রাকৃতিক নিয়ম বা অন্যকথায় কোরআনের নির্দেশনাচ্যূত হবে। ভূল করবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বস্তুত কোরআন প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণকে নিরুৎসাহিত করে। সেটি সমর্পনের বিপরীত আচরণ। প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণ ব্যাক্তিক, সামষ্ঠিক, সামাজিক, বৈশ্বিক সকল ক্ষেত্রে অশান্তি বয়ে আনে। কোরআনের বার্তায় অবিশ্বাসীরা প্রকৃতির সূত্রের বিরুদ্ধ আচরণ করে। ফলে তারা যেমন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি তাদের ভূল কর্মকান্ডের কারণে অপরাপররাও প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিধাতার সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধান মানুষকে তার কর্মের কারণে ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে নিয়ে যায়।

এতদ্বসত্বেও যারা কোরআনের বার্তায় বিশ্বাসী তারা জানে যে মন্দ কাজের জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ বার্তাও বিশ্বাসীদেরকে ভাল পথে চালিত করে। জগতের অধিকাংশ মানুষই এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। ফলে এ বার্তায় যারা অবিশ্বাস করে তারা যে কোন বিচারেই অপরাপর মানুষ, তথা গোটা জগত সংসারকেই তাদের কাজ ও আচরণ দ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে নিয়ে যায়। তাই যথাযথভাবেই বলা হয়েছে যে, ‘যারা তা অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কোরআন প্রদর্শিত সঠিক পথ অস্বীকার করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত’।

কোরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে কিনা ওপরের বক্তব্যগুলির সত্যতাই কেবল সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। আর সেটি করতে হলে কোরআন প্রদর্শিত পথ ও গৃহীত পদক্ষেপ ক্ষেত্র বিশেষে যথাযথ কিনা সেটি বুঝতে হবে। সেটি বুঝতে হলে কোরআন অধ্যায়ন করতে হবে। তাই পূর্বে এভাবে বলা হয়েছে যে, যারা সঠিকভাবে গ্রন্থ পাঠ করে বা যথাযথ অর্থ অনুধাবন করে তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

➢ (আয়াত ১২২-১২৩) আয়াত নং ৪০ থেকে ১২১ পর্যন্ত ইসরাইল জাতির নানাবিধ ঘটনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের কৃতকর্ম, স্বভাব, নবীদের প্রতি করা তাদের আচরণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে তারা ভূল ও মন্দ কর্মের কারণে ফল ভোগ করেছে সেসব তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে; যেন তারা ভূলের পুনরাবৃত্তি না করে; সুপথে ফিরে আসে এবং বর্তমানে আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন সে কাজে তাঁকে সহযোগীতা করে।

এছাড়াও বিশ্বাসীদেরকে এর মাধ্যমে তাদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের কর্মকান্ড ও আচরণে হতাশ না হয়ে নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে এ আলোচনাগুলি প্রয়োজনীয় ছিল। বিশেষত মহানবী (সাঃ) এর মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে। যেখানে ইহুদিদের বসবাস ছিল।

আয়াত ১২১ পর্যন্ত তাদের বিষয়ে বিস্তারীত আলোচনা শেষে এ পর্যায়ে তাদেরকে (Children of Israel and The Day) সুপথে ফিরে আসার জন্য আহবান করা হয়েছে।

১২২	হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা যা আমি তোমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছি এবং কি প্রকারে আমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি। (O Children of Israel! Remember My favour wherewith I favoured you and how I preferred you to (all) creatures.)
১২৩	নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন থেকে যেদিন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না, কারও কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না। (And guard (yourselves) against a day when no soul will in aught avail another, nor will compensation be accepted from it, nor will intercession be of use to it; nor will they be helped.)

■ **২.১২২-২.১২৩** হে ইসরাইলের সন্তানেরা! স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা ... নিজেদের রক্ষা কর সেই দিন থেকে যেদিন ... কোন সাহায্যও প্রদান করা হবে না : আয়াত নং ৪০ থেকে ১২১ পর্যন্ত ইসরাইল জাতির প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা এবং তাদের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য অংশটুকু এই সমগ্র আলোচনার উপসংহারের মতো বলা যেতে পরে।

ইসরাইলের সন্তানদেরকে ইতিপূর্বে তাদের প্রতি করা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ জাতিকে আল্লাহ ফেরাউনের অত্যাচার ও নৃশংশতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ফেরাউন ও তার দলবল ইসরাইলিদের ভীষনভাবে অত্যাচার করত। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রেখে দিত। নৃশংশতার চরম পর্যায় এগুলি। আল্লাহ তাদেরকে সেসব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।

মিশরের ফেরাউনের হাত থেকে উদ্ধার করে কানান যাত্রাকালে সাগর পাড়ি দিতে আল্লাহ তাদেরকে সহায়তা করেছেন। মরুর বুকে প্রচন্ড উত্তাপে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। তাদেরকে মেঘের ছাঁয়া দান করেছেন। তাদের সুরক্ষার ব্যাবস্থা করেছেন। চলতে পথে তিনি তাদের জন্য খাদ্য ও পানির ব্যাবস্থা করেছেন। তাদেরকে ভূ-খন্ড দান করেছেন। তাদের মধ্য থেকে নবী বা নেতা সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে গ্রন্থ বা চলার পথের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বলা যায়, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাদেরকে এমনিভাবে বেছে নিয়ে সমগ্র মানবজাতির ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

আল্লাহ তাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। মুসা (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে মানবজাতির মাঝে আল্লাহর বাণী প্রচারের গুরু দায়িত্ব অর্পন করেন এবং তারা নিজেরাও সে পথ অনুসরণ করে চলবে সে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন। কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উপরন্তু অধঃপতিত হয়েছে। বিষয়সমূহ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে,

“(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছেন তাদের ওপর এ দায়িত্ব প্রদান করে বলেন যে, ‘তোমরা এ বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে, গোপন করবে না।’ কিন্তু তারা সে নির্দেশ পেছনে ফেলে রেখে তার বিনিময়ে

ক্ষুদ্র সুবিধা ক্রয় করে। নিশ্চয়ই! তারা যা অর্জন করে তা অত্যান্ত মন্দ। যারা আনন্দিত তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য এবং যে কাজ তারা পরিপালন করে নাই তার জন্য প্রশংসীত হতেও ভালবাসে- ভেব না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদে আছে। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩:১৮৭-১৮৮)

তাওরাতের সঠিক শিক্ষা ইসরাইলের সন্তানদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য মোসেস বা মূসা (আঃ) তাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পন করে যায়। কিন্তু তারা পথচ্যুত হয়।

ইসরাইলের সন্তানদের পথচ্যুতির কারণে মহান আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর সে দায়িত্ব অর্পন করেন। সে কারণে কোরআন অবতীর্ণ করেন। তাদেরকে বর্তমানে এ পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সে কারণেই সঠিক পথ অনুসরণ করে নিজেদেরকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় ভূল করতে বারণ করা হয়েছে। যেভাবে অতীতে তারা ভূল কর্ম করে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। সে কারণে তাদের ঘটনাসমুহ আলোচনা করা হয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যথায় তাদের ভূল কর্ম তাদেরকে আল্লাহর বিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আয়াতে সে সতর্কবার্তাও দেয়া হয়েছে।

বিচার দিবসে কোন নাম কিংবা বংশের পরিচয়েও কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে বিচার করবেন না। তিনি বিচার করবেন সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় কর্মের ভিত্তিতে তা সে যেই হোক না কেন। জগতের সকল মানুষই তাঁর কাছে সমান। সকলেই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই ভাল জানেন প্রকৃতই কার আত্মা তাঁর প্রতি সমর্পিত এবং কে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

'সেইদিন' বলতে এখানে শেষ বিচারের দিবসকে বুঝান হয়েছে। যে বিচার দিবসের কথা কোরআনের প্রারম্ভিক সূরা ফাতেহা-তে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিচার দিবস সম্পর্কেও এখানে কিছু ধারণা দেয়া হয়েছে। সে দিনটি হবে একটি কঠিন দিন। সেদিন কেউই কারও সামান্য কোন উপকার করতে পারবে না। কারও কোন সুপারিশও সেদিন গ্রহণ করা হবে না। কারও নিকট থেকে

কোন প্রকার ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করা হবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও কাউকে প্রদান করা হবে না। সেদিন একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকবে মহান আল্লাহর।

বিচার দিবসে মানুষ পার্থিব জীবনে যেমন কর্ম করেছে তার অনুরূপ ফল পাবে। যারা ভূল কাজ করেছে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ।

কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি দিক-নির্দেশনা। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আয়াতের কথাগুলি ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআনের বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন। আল্লাহ এককে দিয়ে অপরকে শিক্ষা দেন। সত্য ও সঠিক বার্তা মানব সমাজে পৌঁছে দেয়া সকল বোধসম্পন্ন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

‘কি প্রকারে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছি!’ এ কথার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। বোঝার সুবিধার জন্য কথাগুলি তুলে ধরছি।

সাধারণত সামাজিক কোন গবেষনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এলাকায় কিছু সংখ্যক মানুষকে বেছে নিয়ে কোন একটি গবেষনা কর্ম পরিচালনা করা হয়। অতঃপর সে আলোকে সমগ্রের ওপর ধারণা নেয়া হয় ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঠিক তেমনি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আল্লাহ একটি জাতিকে বেছে নিয়েছেন। সেটি ইসরাইল জাতি।

ইসরাইল জাতিকে বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর কোন না কোন নির্ণায়ক রয়েছে। সামাজিক গবেষনার ক্ষেত্রে স্থান থেকে শুরু করে বিবিধ বিষয়ে কিছু নির্ণায়ক বা নির্দেশককে বিবেচনায় নিয়ে যেমন কোন একটি স্থান বা দলকে গবেষনার জন্য বেছে নেয়া হয়, অর্থাৎ কোথায়-কিভাবে, কাদের ওপর গবেষনা পরিচালনা করা হবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়, নিশ্চয়ই ঠিক তেমন কোন বিবেচনা সাপেক্ষেই আল্লাহ ইসরাইল জাতিকে বেছে নিয়েছেন। যেমন হতে পারে সমগ্র ভূ-খন্ডের মধ্যস্থলে অবস্থান করার কারণে। আরও নির্ণায়ক থাকতে পারে। তবে এখানে সে আলোচনায় যাব না।

বস্তুত ইসরাইল জাতির ভাল-মন্দের বিষয়টি কেবল তাদের জন্যই নয়, সত্যি বলতে ভাল-মন্দ নানান বিষয় জগতের বহু প্রান্তে বহু জাতির মধ্যেই আছে; কিন্তু তাদের কেমন কর্ম, কেমন আচরণ তাদের উত্থানের পেছনে কাজ করেছে এবং কেমন কর্ম তাদেরকে পুনরায় অধঃপতিত করেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য সেটিই শিক্ষনীয়। সেখান থেকে সকলকে শিক্ষা নিতে

আহবান করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশের অমান্যতা ও ন্যায়-বিচ্যুত কর্মকান্ডই তাদের অধঃপতনের কারণ।

সত্য ও সঠিক পথের প্রতি একই ধরনের আচরণের জন্য সকলকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর নির্দেশনা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা। যদি কেউ ভূল-পথগামী হয় তবে কোন নামের ছত্রছাঁয়ায় নয় কিংবা কোন লেবাস বা আরও কোন কিছুই কাউকে আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এখানে সে বার্তা দেয়া হয়েছে।

আয়াত নং ৪০ থেকে ১২৩ পর্যন্ত ইসরাইল জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নুহ (আঃ) এর পরে আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) কে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেন। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সমর্পন। সমর্পনই হচ্ছে শান্তির পথ। ইব্রাহীম (আঃ) এর পর এ কাজের দায়িত্ব বর্তায় ইসরাইল জাতির ওপর। সে কারণেই তাদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে বলে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, সৃষ্টির সকলের উর্ধ্বে তোমাদেরকে স্থান দিয়েছি। আরও বলা হয়েছে,

“আমি জেনে-বুঝেই (সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যেই) তাদেরকে (ইসরাইলের সন্তানদেরকে) সৃষ্টির সকল সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলাম” (আল-কোরআন ৪৪:৩২)

অর্পিত দায়িত্ব তারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। আয়াত ৪০ থেকে শুরু করে ১২৩ নং আয়াত পর্যন্ত ইসরাইল জাতির আচার-আচরণ, বিবিধ কর্মকান্ডের মূল বিষয়সমুহ ও তাদের বিচ্যুতির বিষয়গুলি সংক্ষেপে হলেও তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে সে একই দায়িত্ব মহান আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অর্পন করেছেন। বলা হচ্ছে,

“আমি ইসরাইলের সন্তানদের অবতীর্ণ গ্রন্থ (তাওরাত), নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) ও নবুওয়ত (নেতৃত্ব) দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম;

আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে পথ চলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা (বিধি-বিধান)। কিন্তু জ্ঞান লাভের পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি

করে। নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।

এখন আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) আমার নির্দেশনার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না।

আল্লাহর বিপক্ষে তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। ভূল পথগামীরা একে অপরের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ বন্ধু তাদের যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে।

(জেনে রেখ) এটি (কোরআন) মানব সম্প্রদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত, দিক নির্দেশনা ও অনুগ্রহ তাদের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।" (আল-কোরআন ৪৫:১৬-২০)

অতএব আলোচ্য আয়াতের বাণী কেবল ইসরাইল জাতির জন্যই নয়, বর্তমানে আল্লাহ যাদেরকে বেছে নিয়েছেন তাদের জন্যও এক সতর্ক বার্তা। অতএব কারও দ্বারাই ভূলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

কোরআন বুঝে পড়তে পারলে এর যৌক্তিকতার বিষয়গুলি মানুষ বুঝতে পারবে। যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারলে জগতের সকল মানুষই এর বার্তায় আস্থা ও বিশ্বাস আনবে এবং সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথে চলবে।

➢ (আয়াত ১২৪) ইব্রাহীম (আঃ) কে মানবজাতির নেতা মনোনীতকরণ ও নেতৃত্ব (Abraham and Leadership) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১২৪	(স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীমকে (ইসরাইলের পিতামহকে) তার পালনকর্তা নির্দেশ প্রদান করলেন পরীক্ষা করার জন্য এবং সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন: আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা হিসেবে নিয়োজিত করেছি। ইব্রাহীম বলল: এবং আমার বংশধর থেকেও (কি নেতা হবে)? তিনি বললেন: আমার অঙ্গীকার পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবে না। (And (remember) when his Lord tried Abraham with (His) commands, and he fulfilled them, He said: Lo! I have appointed thee a leader for mankind. (Abraham) said:

	And of my offspring (will there be leaders)? He said: My covenant includeth not wrong-doers.)

▪ **২.১২৪.১** যখন ইব্রাহীমকে তার পালনকর্তা নির্দেশ প্রদান করলেন .. এবং সে তা পূর্ণ করল : ইব্রাহীম (আঃ) যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তাকে সত্য জেনে নিজ বিশ্বাসে তিনি সর্বদা অটল ছিলেন। পুরো জীবনটাই তিনি সংগ্রাম করেছেন তাঁর দর্শন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। তিনি নমরুদের অত্যাচার সহ্য করেছেন। সে তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেয়েছিল। তিনি সেসব অত্যাচার মোকাবেলা করেছেন। দেশত্যাগ করেছেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের সহায়-সম্পদ সব ত্যাগ করেছেন। এ সবই তিনি করেছেন তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠা বা বিশ্বাস তথা আল্লাহর কারণে। আল্লাহর একত্বের প্রচারে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

আল্লাহ যখন নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা আমার গৃহকে পরিচ্ছন্ন কর তাদের জন্য যারা তাওয়াফকারী, যারা সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়, উপাসনাকালে নত ও সেজদায় পতিত হয় (২:১২৫)।' তিনি সে নির্দেশ পালন করেন। তিনিই প্রথম আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ নির্মান করেন এবং হজ্ব পালনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহ তাঁকে নানামুখী কষ্টে নিপতিত করেছেন যার দ্বারা তিনি তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। ইব্রাহীম (আঃ) সকল কিছু ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন এবং নিজ আদর্শ ও দর্শন প্রতিষ্ঠায় অটল থেকেছেন। যে জ্ঞান তাঁর মাঝে প্রবেশ করেছে তিনি সেটিকে সত্য বলে জেনেছেন এবং মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি আল্লাহর সকল নির্দেশনা পালন করেছেন।

▪ **২.১২৪.২** তিনি বললেন: আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা হিসেবে নিয়োজিত করেছি : আল্লাহর একত্বের ধারণা বা জ্ঞানের কারণে এবং মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধীতার কারণে ইব্রাহীম (আঃ) কঠিন জীবনের মুখোমুখী হন। কিন্তু মস্তিষ্কে যখন কোন জ্ঞান যৌক্তিক ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, মানুষ তখন সে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠায় অন্য সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরিত্যাগ করে। বিষয়টি সমজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত সকলের পক্ষে হয়তবা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠায় জীবনের অনেক সাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করেন। এমনকি তৎকালীন শাসক নমরুদ তাঁকে অগ্নীতে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ রক্ষা করেন। তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়। ইরাক ছেড়ে মিশর অতঃপর কানানে চলে যান। আল্লাহর কারণে জীবনের সকল কিছু উৎসর্গীকরণের পরও তার সবচেয়ে প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গীকরণের নির্দেশ প্রাপ্ত হন তথা স্বপ্নের মাধ্যমে আদিষ্ট হন। ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কারণে সেটিও বিসর্জন দেয়ার মানসিকতা প্রদর্শন করেন। আল্লাহ এভাবে তাঁকে নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিশ্বস্তরূপে পান। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মানবসমাজে তাঁকে সন্মানীত করেন। তাঁকে মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে আসীন করেন। এখানে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

▪ **২.১২৪.৩** ইব্রাহীম বলল: এবং আমার বংশধর থেকেও (কি নেতা হবে)? তিনি বললেন: আমার অঙ্গীকার পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করবে না : ইব্রাহীম (আঃ) এর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতির নেতা নিয়োজিত করেন। আয়াতে সেটি নিশ্চিতভাবে জানান হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) বিষয়টি জানার পর তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেও নেতৃত্ব লাভের প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন।

আল্লাহর অতি প্রিয় হওয়া সত্বেও ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন, আল্লাহ তাঁকে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা কোনটিই প্রদান করেননি। কেবল বলেন পথভ্রষ্টরা এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

আয়াতের এ অংশ থেকে বোঝা যায় যে, নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টি আদৌ কেবল কারও প্রিয়পাত্র হওয়া কিংবা উত্তরাধিকার হওয়ার কারণেই হতে পারে না এবং সেটি আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিতও নয়। এক্ষেত্রে স্বজন-প্রীতি গ্রহণীয় নয়। যারা পথভ্রষ্ট বা ভূল পথগামী তারা নেতৃত্ব পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তারা নেতা হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

নেতৃত্ব একটি অত্যান্ত গুরু দায়িত্ব। এর জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। অযোগ্য নেতৃত্ব মানুষ, সমাজ ও জগতকে ভূল পথে পরিচালনা করতে পারে। এমনকি জগত ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

নেতা হতে হলে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে হবে। কেবল বংশ কিংবা উত্তরাধিকার বিবেচনায় অযোগ্য কারও হাতে নেতৃত্ব যেতে পারে না বা যাওয়া উচিত নয়। উপযুক্ত গুণসম্পন্ন যে কারও মধ্য থেকে নেতা হতে পারে। নেতৃত্ব বিষয়ে তেমনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনা। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছে তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন।" (ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ২:৯০)

নেতৃত্বের বিষয়ে এটি স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, পথভ্রষ্টরা এটি পাবে না বা পাওয়া উচিত নয় বা তারা পাওয়ার যোগ্য নয়; কিংবা যারা সে সুযোগ তাদেরকে করে দেবে তারা তার মন্দ কর্মের দায়ও বহন করবে। তবে তাদেরকে সুযোগ দেয়া যেতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে, নেতৃত্বের যে ক্ষমতা আমি তাদেরকে প্রদান করি তা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তাদেরকে কেবলমাত্র এ কারণেই নেতৃত্ব প্রদান করি, যেন তারা পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩:১৭৮)

এখান থেকে নেতৃত্বের বিষয়ে আল্লাহর দিক-নির্দেশনার কিছু ধারণা পাওয়া যায়। সুযোগ প্রাপ্তরা যদি সঠিক পথে চলতে বা চালাতে ব্যার্থ হয়, তবে সেটি তাদের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করার জন্য প্রদত্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। নেতৃত্বের জন্য গর্ব করাও অপরাধ। ষড়যন্ত্র করে নেতৃত্বে যাওয়াও অপরাধ। এটি হতে হবে প্রকৃতই আল্লাহ প্রদত্ত। অর্থাৎ সামগ্রীক পরিবেশ বিবেচনায় এ ক্ষমতা যার কাছে আপনা থেকে যেতে চায় সেটিই আল্লাহ প্রদত্ত বলে বিবেচিত। 'সামগ্রীক পরিবেশ বিবেচনায় এ ক্ষমতা যার কাছে আপনা থেকে যেতে চায়' এটি আল্লাহর প্রতি সমর্পনের জ্ঞান থেকে উৎসারিত। কিন্তু কেবলমাত্র এতটুকু কথার অর্থ ও প্রক্রিয়াও অনেক ব্যাপক।

মানুষকেই বিচার-বিবেচনা করে পথ ঠিক করে নিতে হবে যে, কিভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় উল্লেখিত সমর্পনের ধারণাটি বাস্তবায়িত হতে পারে। গনতন্ত্র একটি পথ বটে। তবে বাস্তবে সূক্ষ্ম কারচুপি হলে সেটিও গ্রহণযোগ্য নয়। বলপূর্বক রায় ছিনিয়ে নিলে বাতিল বলে গণ্য হবে। শেষের কথাগুলি গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের ধারণার সার্বজনীনতাকে বিবেচনায় নিয়ে বলা হল।

একটা সময় ছিল যখন রাজার ছেলে রাজা হত। এর যেমন সুবিধার দিক আছে, তেমনি দীর্ঘমেয়াদে বা যোগ্য উত্তরসূরী না মিললে এর মন্দ দিকও আছে। এর বিপরীতে গনতন্ত্র নিয়ে চিৎকার করা হয়। তারও সুবিধা-অসুবিধা আছে। সর্বত্রই সুবিধা-অসুবিধা আছে। তবে এখানে সেসব নিয়ে কথা বলতে চাইছি না। এখানে সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছের একটি প্রতিফলন বিষয়ে বলতে চাইছি যেটি হবে সর্বজন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য।

'এবং আমার বংশধর থেকেও?' এ কথার মধ্য দিয়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর মনের ইচ্ছের একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ তিনিও তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেন। সত্যি বলতে বর্তমান সময়ে গনতন্ত্রের মধ্যেও তেমনটি হতে দেখা যায়। এক অর্থে ঘুরে-ফিরে আধুনিক গনতন্ত্রও রাজতন্ত্রের মতোই। সবাই নিজের পছন্দের কাউকে বা উত্তরাধিকারকে পরবর্তীতে দেখার শেষ চেষ্টাটি করে যায়। বরং রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে সবারই জানা আছে যে রাজার ছেলে রাজা হবে ফলে এ ব্যাবস্থাটি সত্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু গনতন্ত্রে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে সে একই কাজ করতে গিয়ে অনেক নোংরামীর আশ্রয় নিতে হয়। যা কিনা ভয়াবহ! তবে এ আয়াতে নেতৃত্বের বিষয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে মৌলিক কিছু বিষয়ে যথার্থ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

নেতৃত্ব প্রদানের বিষয়টি কেবল প্রিয়পাত্র বা উত্তরাধিকার হবার কারণেই হতে পারে না এবং সেটি আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিতও নয়। এক্ষেত্রে স্বজন-প্রীতি গ্রহণীয় নয়। যারা পথভ্রষ্ট বা ভূল পথগামী তারা এর যোগ্য বিবেচিত হবে না, অন্তত আল্লাহর পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী। নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্যতার বিষয়টি নির্ভর করবে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনের কারণে। তেমন গুণসম্পন্ন যে কেউ নেতৃত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। পথভ্রষ্টরা এটি পাবে না বা পাওয়া উচিত নয়; কিংবা যারা সে সুযোগ তাদেরকে করে দেবে তারা তাদের মন্দ কর্মের দায়ও বহন করবে। তবে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

এ আয়াতে নেতৃত্বের বিষয়টি একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে ইসরাইলিদের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ কিভাবে তাদের অনুগ্রহ করেছেন! তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করে মানবজাতির মধ্যে সন্মানের আসনে আসীন করেছেন। নবুয়ত তথা নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা মুসা (আঃ)

এর মাধ্যমে তাদেরকে প্রদান করেছেন। তাদের কার্যকলাপের ভাল-মন্দ দিক তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে অর্থাৎ তৎকালীন সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় যেভাবে তারা অধঃপতিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে তারা নেতৃত্বের আসনে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে। অপরদিকে হযরত ইসমাইলের অপরাপর উত্তরসূরী পৌত্তলিকরাও পথচ্যূত হয়ে নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে। বিষয়গুলি এখানে এভাবে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সে কারণে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিষয়টি ইব্রাহীম (আঃ) যিনি কিনা ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম সকল ধর্মের অনুসারীদের পিতা বা পূর্ব-পুরুষ তাঁর উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আব্রাহামিক ধর্মের অনুসারী সকলের কাছে ইব্রাহীম (আঃ) একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিত্ব। গ্রহণযোগ্য একজনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সকলের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। যারা অধঃপতিত হয়েছে তারা নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকতে পারে না প্রচ্ছন্নে সে বার্তাটি তুলে ধরা হয়েছে।

নেতৃত্ব প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতসমুহের সাথে এ বাণীর একটি সূক্ষ যোগসূত্র আছে। সেজন্য পরবর্তী আয়াতসমুহ মনযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে বিষয়গুলিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, কেন সূরা বাকারায় প্রথমে ইসরাইলিদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। অতঃপর ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে।

➢ (আয়াত ১২৫-১২৬) মানবজাতির সম্মিলন ও কেবলার (Abraham and Qiblah) উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং আল্লাহর কাছে ইব্রাহীম (আঃ) এর করা প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১২৫	যখন আমি কা’বা গৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম এই বলে যে: ইব্রাহীম যেখানে দাঁড়িয়েছে তোমরা সে স্থানকে উপাসনার স্থান নির্বাচন কর এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে (ইব্রাহীমের জেষ্ঠ পুত্রকে) দায়িত্ব প্রদান করলাম এই বলে যে: তোমরা আমার গৃহকে পরিচ্ছন্ন কর তাদের জন্য যারা তাওয়াফকারী, যারা

	সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়, উপাসনাকালে নত ও সেজদায় পতিত হয়। (And when We made the House (at Mecca) a resort for mankind and sanctuary (place of safety), (saying): Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray). And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying): Purify My house for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and prostrate themselves (in worship).)
১২৬	যখন ইব্রাহীম প্রার্থনা করল: হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানের তুমি নিরাপত্তা বিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আহার্য্য প্রদান কর। আল্লাহ বললেন: যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করব কিছুকালের জন্য। অতঃপর আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগে বাধ্য করব- পথ পরিক্রমার এক দুর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি। (And when Abraham prayed: My Lord! Make this a region of security and bestow upon its people fruits, such of them as believe in Allah and the Last Day, He answered: As for him who disbelieveth, I shall leave him in contentment for a while, then I shall compel him to the doom of Fire - a hapless journey's end!)

▪ **২.১২৫.১** যখন আমি কা'বা গৃহকে ... উপাসনার স্থান নির্বাচন কর : এখানে মানবজাতির উপাসনার জন্য একটি সম্মিলন স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) হচ্ছেন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সকল জাতির পূর্ব-পুরুষ। তিনি সকলের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিত্ব। তিনিই কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহর উপাসনার জন্য তিনি সর্বপ্রথম সেখানে দাড়িয়েছেন। অতএব তাঁর প্রতিষ্ঠিত উপাসনার স্থানটিই মানবজাতির সকলের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার জন্য যথোপযুক্ত।

মানুষ একা বা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস কিংবা বেঁচে থাকতে পারে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের একটি সম্মিলনের প্রয়োজন আছে। তার জন্য একটি

যথোপোযুক্ত স্থান বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি স্থানও প্রয়োজন আছে। এখানে সুনির্দিষ্টভাবে 'উপাসনা' শব্দটি ব্যাবহার করা হলেও এটি বুঝতে হবে যে, মানবজাতির নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনা, তার সমাধানের পথের সন্ধান করা, ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা ইত্যাদি সকল বিষয়ই বস্তুত উপাসনারই পর্যায়ভূক্ত। তথাপি আল্লাহর উপাসনা বা এবাদত করা এমন একটি উপলক্ষ্য যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত কর্ম আবর্তিত হয়। যাকে কেন্দ্র করে সকলে একটি স্থানে একত্রিত হয় ও পারস্পরিক প্রয়োজনীয় পরামর্শ সম্পন্ন করে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মুসলিমরা একটি স্থলে সমবেত হয়। পরস্পরের সাথে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরিক সমস্যা ও সমাধান নিয়েও আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি করে ক্ষুদ্র পরিসরে। শুক্রবারে জুমার দিনে একটু বড় পরিসরে এলাকা জুড়ে মানুষ একত্রিত হয়। বছরে একত্রিত হয় কা'বা শরিফে। এ যেমন উপাসনার জন্য তেমনি নিজেদের প্রয়োজনীয় আলোচনা-পরামর্শের জন্যও এমন সম্মিলন প্রয়োজন হয়। এগুলি আল্লাহর দিক-নির্দেশনা যা মানব-সমাজ ও জগত পরিচালনার জন্য সহায়ক। আর এ সকল কাজই উপাসনার পর্যায়ভূক্ত যা কিনা সৃষ্টির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয়। মানসিক প্রশান্তির জন্যও প্রয়োজনীয়। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা।

বাস্তবতা হচ্ছে নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নানান কারণে মানুষের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। যেমন এক ইসরাইল জাতি সোলায়মান পরবর্তীতে বিভক্ত হয়ে যায়। তারা উপাসনা বা সম্মিলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও উপাসনালয় স্থাপন করে। মানুষের মধ্যে এই বিভক্তির প্রবণতা রোধে আল্লাহ নিজেই এখানে ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন। সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ইব্রাহীম (আঃ) যে স্থানে উপাসনার জন্য দাড়িয়েছেন সে স্থানকে তিনি উপাসনার স্থান নির্বাচন করার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

▪ **২.১২৫.২** এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব প্রদান করলাম এই বলে যে: তোমরা আমার গৃহকে পরিচ্ছন্ন কর তাদের জন্য যারা তাওয়াফকারী, যারা সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়, উপাসনাকালে নত ও সেজদায় পতিত হয় : ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর একত্বের ধারণায় দৃঢ়চিত্ত থেকে সারাজীবন নিষ্ঠার

সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক আল্লাহর ধারণার পূর্বে অধিকাংশ মানুষই ছিল মূর্তী পূঁজারী।

আল্লাহর নির্দেশনায় তিনি কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠা করেন। জেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে ঘরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কাজ করেন। একই সাথে নির্জ্ঞানতার কালিমা ও অপরিচ্ছন্নতাকে দুরে ঠেলে এক আল্লাহর জ্ঞান দ্বারা সকলের মনকে পরিচ্ছন্ন করার কাজও শুরু করেন।

তারই উত্তরসূরীরা বর্তমানে কা'বা ঘরে মূর্তী স্থাপন করেছে। অথচ ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধী। মূর্তীর পূঁজারীরা আবার নিজেদেরকে ইব্রাহিম (আঃ) ও হযরত ইসমাইলের পরবর্তী প্রজন্ম ও অনুসারী বলেও দাবী করে। এমন পরিচয়ে তারা গর্ববোধ করে। নিজেদেরকে সন্মানীত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করে! অথচ তারা ইব্রাহিম (আঃ) এর ধর্ম বা পথ থেকেই বিচ্যুত হয়েছে।

পথভ্রষ্টরা ইব্রাহিম (আঃ) উত্তরসূরীরূপে নিজেদেরকে কা'বা গৃহের রক্ষনাবেক্ষনের দাবীদার বলেও মনে করে। ইব্রাহীম (আঃ) এর উদাহরণ তুলে ধরে তারা যে তাঁর দর্শন বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে সেটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর সঠিক নির্দেশনা কি সেটিও তাদেরকে এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.১২৬** যখন ইব্রাহীম প্রার্থনা করল: হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানের তুমি নিরাপত্তা বিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আহার্য্য প্রদান কর। আল্লাহ বললেন, যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করব কিছুকালের জন্য। অতঃপর আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগে বাধ্য করব– পথ পরিক্রমার এক দুর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি : ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ শেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। মরুময় এ স্থানটিতে বিশ্বাসীদের জন্য নিরাপত্তা বিধান ও আহার্য্য প্রদানের বিষয় তিনি তাঁর প্রার্থনায় তুলে ধরেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি তাঁর প্রার্থনায় সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা বিধান ও আহার্য্য প্রদানের বিষয় উল্লেখ করেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকেও সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

উল্লেখ্য যে, ইব্রাহীম (আঃ) নেতৃত্বের বিষয়ে আল্লাহর কাছে একবার প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারদের মধ্য থেকে নেতা নির্ধারণ করা হবে কিনা সে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন যে তাঁর উত্তরাধিকার হওয়া সত্বেও কোন ভূল-পথগামীদের জন্য সেটি প্রযোজ্য হবে না। ফলে এবার তিনি কেবল বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা বিধান ও আহার্য্যের জন্য প্রার্থনা করেন। অবিশ্বাসী বা ভূল-পথগামীদের প্রসঙ্গ প্রার্থনায় তুলে ধরেননি।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। নেতৃত্ব ও আহার্য্য প্রদানের বিষয়টি এক নয়। বিষয়টি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তারা সকলেই আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। তারা সকলেই নিরাপত্তা ও আহার্য্য প্রাপ্তির অধিকার রাখে। এ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটি সকলের প্রাপ্য অধিকার। এমনকি সকল প্রকার সুযোগও সকলের প্রাপ্য। সে কারণে আলো, বাতাস, পানি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহর নিকট থেকে সমানভাবে পেয়ে থাকে। চাইলেই তিনি অবিশ্বাসীদের জন্য তা বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেটা করেন না। মানবজাতির জন্য এখানে শিক্ষনীয় আছে। অতঃপর ভাল-মন্দের হিসেব আল্লাহর হাতে।

নেতৃত্বের বিষয়টি কিন্তু একটু ভিন্ন। নেতৃত্ব সকলে পেতে পারে না বা নেতৃত্ব সকলের হাতে তুলে দিতে নেই। নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অপরিহার্য্য। কেননা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মন্দ বা অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব গেলে তা ধ্বংসের কারণ হতে পারে। মানুষের জন্য এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

এ দিক-নির্দেশনা থেকে এটিও অনুধাবন করা যায় যে, যারা ভূল পথে চলে পার্থিব জীবনে সব সময়েই তাদের সুযোগ আছে সুপথে ফিরে আসার। তবে পরিশেষে সকলকেই আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। তিনি সকলের বিচার করবেন। যারা সত্যিকার ভূল পথগামী তারা শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। ফলে সুযোগ পাওয়া সত্বেও তাদের পার্থিব জীবনের অর্জন বস্তুত বিফলেই যাবে। এমনই দর্শনের সারকথা।

➢ (আয়াত ১২৭-১২৯) কা'বা ঘর নির্মাণ ও আল্লাহর কাছে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা প্রসঙ্গে (Abraham and His Prayer) বলা হয়েছে।

১২৭	এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈল যখন কা’বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল, ইব্রাহীম প্রার্থনা করল: হে পালনকর্তা! আমাদের পালনকৃত দায়িত্ব গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই! তুমি কেবল তুমিই শ্রবণকারী, সর্বদ্রষ্টা। (And when Abraham and Ishmael were raising the foundations of the House, (Abraham prayed): Our Lord! Accept from us (this duty). Lo! Thou, only Thou, art the Hearer, the Knower.)
১২৮	হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার প্রতি অনুগত থাকতে আমাদের অনুগ্রহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি কর এবং আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবল তুমিই ক্ষমা প্রদর্শনকারী, দয়ালু। (Our Lord! And make us submissive unto Thee and of our seed a nation submissive unto Thee, and show us our ways of worship, and relent toward us. Lo! Thou, only Thou, art the Relenting, the Merciful.)
১২৯	হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন বার্তাবাহককে জাগরিত কর, যে তাদের কাছে তোমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে দীক্ষা দেবে এবং তাদেরকে বিকশিত হতে সহায়তা করবে। তুমি কেবল তুমিই পরাক্রমশালী, জ্ঞানী। (Our Lord! And raise up in their midst a messenger from among them who shall recite unto them Thy revelations, and shall instruct them in the Scripture and in wisdom and shall make them grow. Lo! Thou, only Thou, art the Mighty, Wise.)

▪ **২.১২৭** এবং ... ইব্রাহীম প্রার্থনা করল: হে পালনকর্তা! আমাদের পালনকৃত দায়িত্ব গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই! তুমি কেবল তুমিই শ্রবণকারী, সর্বদ্রষ্টা : ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা’বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি তাদের পালনকৃত দায়িত্ব আল্লাহ যেন সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করে নেন তার জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রজন্মের জন্য একটি দিক নির্দেশনাও রেখে দেন। সকল কাজের ক্ষেত্রেই আল্লাহর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি গুরুত্ববহ। গ্রহণযোগ্য কাজ, কর্মে সফলতার স্বাদ দেয়। পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলে। কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে দেয়। কর্মস্পৃহা ভিন্ন কাজ করা দুরুহ।

আল্লাহ বিরাজ করেন প্রত্যেকের ভেতরে। কর্মের কারণে যখন অন্তর তৃপ্ত ও তুষ্ট হয় এটি একটি মানসিক প্রশান্তি এনে দেয়। মনোজগতে এর গুরুত্বপূর্ণ ও সুদুরপ্রসারী প্রভাব থাকে যা পরবর্তী কাজগুলিকেও বেগবান করে। লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

মানুষ যখন ভালভাবে কাজ সম্পন্ন করে তখন প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে। বিরান মরুর বুকে ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল এর শ্রমলব্ধ কাজ কে দর্শন করবে? কে তাদের সে ভাল কাজের প্রশংসা করবে যাতে তাদের অন্তর তৃপ্ত হয়? কার দ্বারা তাদের কৃতকর্ম গৃহীত হবে?

এমন ভাবনা একটি সর্বশেষ পর্যায়কে বুঝতে সহায়তা করে। অর্থাৎ যখন কোথাও কেউ নেই তখন ‘একজন’ থাকেন। তিনি আল্লাহ। এটি সর্বশেষ ঠিকানা। যারা বোঝে তারা তাই সব কিছুতেই কেবল আল্লাহর গ্রহণযোগ্যতাকে কামনা করে। তারা আল্লাহর কাছে তাদের সকল ভাল কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রার্থনা করে। ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাই আল্লাহর কাছে তাঁর কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং মানবজাতির জন্য একটি দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন।

আল্লাহ ভিন্ন প্রার্থনা মঞ্জুর করার দ্বিতীয় আর কোন বিকল্প নেই। বস্তুত আল্লাহ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ বিরাজ করেন প্রত্যেকটি নিজের সঙ্গে। বোধসম্পন্নরা তাই কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই অন্তর থেকে প্রার্থনা করে। কোন কিছু অর্জনে যা নিজেকেই শক্তি দেয়। নিজের প্রচেষ্টাকেই বেগবান করে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তী আয়াত দু’টির বক্তব্যের যৌক্তিকতাকে তুলে ধরার জন্য এ আয়াতটি একটি সূচনাস্বরূপ বলা যেতে পারে। ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনার বক্তব্যের মধ্য দিয়েই সে বিষয়গুলির যৌক্তিকতাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরা হয়েছে। মহিমান্বিত কোরআন এমনিভাবে পূর্বাপর সকল বিষয়সমুহকে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে তুলে ধরে দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছে।

■ **২.১২৮.১** হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার প্রতি অনুগত থাকতে আমাদের অনুগ্রহ কর (Our Lord! And make us submissive unto Thee) : সত্য হচ্ছে, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতিত আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকতেও মানুষ সক্ষম নয়। আল্লাহর অনুগ্রহই তাঁর প্রতি অনুগত থাকতে মানুষকে সক্ষম করে তোলে। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর এ অনুগ্রহ কি? আল্লাহ কাকে অনুগ্রহ করবেন?

আল্লাহর এ অনুগ্রহ হচ্ছে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। যে কোন প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে একটি বোধসম্পন্ন নম্র আচরণ ভেতরে অনুমোদন করে দেয়া। আল্লাহ তাদের প্রতিই অনুগ্রহ করেন যারা নিজেদেরকে তাঁর প্রতি সমর্পন করে। তারা হয় বিনয়ী। আচরণে সভ্য। মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। বিনয়ী মানুষ এ সবগুলো গুণেই গুণান্বিত!

এসব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে মানুষকে মানুষের মতো মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যই ধর্ম। সেজন্যই ধর্মে এতসব নিয়ম-বিধি, রীতি-নীতির প্রয়োজনীয়তা। নিয়মের যথাযথ পরিপালন মানুষকে সে পথে অর্থাৎ ভাল পথে নিয়ে যাবে তেমনটি ধরে নেয়া হয়। কিন্তু দর্শনের ওপর সত্যিকার বিশ্বাস ভিন্ন প্রথমত: মানুষ নিয়ম পালন করবে না ফলে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত: মানুষ নিয়ম পালন করেও সেসব গুণ অর্জন করতে পারবে না; তাই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াতে উদ্ধৃত প্রার্থনাটিও একজনের বিনয়ী আচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রই জানে ও বোঝে যে, ভেতরে আল্লাহর সহায়তা ভিন্ন সে আল্লাহর প্রতিও অনুগত হতে ও থাকতে পারবে না। আল্লাহর ক্ষমা, দয়া, আশীর্বাদ ও সহায়তা ভিন্ন মানুষ বড়ই অসহায়। আল্লাহ যদি কাউকে বিপথে চালনা করেন বা পথভ্রষ্ট করেন কিংবা উদ্ভ্রান্ত করে দেন, চিত্তকে চঞ্চল করে দেন তবে সে কখনই পথ খুঁজে পাবে না। ভেতরেই আল্লাহ। বস্তুত মানুষ 'নিজে' (Self)। নিজের সাথে প্রাণের উৎসের একটি সংযোগ রয়েছে।

আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকতে সত্যের এ জ্ঞানের পাশাপাশি নিজের প্রচেষ্টা, আন্তরীকতা ও উদ্যোগও থাকতে হবে। ধর্মীয় নানাবিধ নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান অসহায় মানুষকে এসব গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। তাই প্রয়োজনীয়।

সত্য হচ্ছে, নিরাপদে চলাচলের জন্য বন্য পশুকে যেমন পোষ মানিয়ে চালাতে হয় তেমনি নিজেকেও। বিধি অনুসরণ করে চললে সেটি সহজ ও সম্ভব হয়।

ইব্রাহীম (আঃ) কেবল তাঁর নিজের জন্যই এ প্রার্থনা করেননি। তিনি তার প্রজন্ম এবং মানবজাতির নেতা হিসেবে সকলের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য এ প্রার্থনা করেছেন। তিনি যেমন নিজে প্রার্থনা করেছেন, তেমনি পরবর্তীদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

▪ **২.১২৮.২** আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত জাতি সৃষ্টি কর (And of our seed a nation submissive unto Thee) : ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম সকল সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বীদের পূর্ব-পুরুষ ও মানবজাতির নেতা। তিনি যখন এ প্রার্থনা করেন তখন না ইহুদি জাতির সৃষ্টি হয়েছে, না খ্রীষ্টান, না পৃথক নামে মুসলিম জাতি। কিন্তু আমরা পরবর্তীতে দেখেছি যে তার ধারা থেকেই ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম সকল জাতির সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই আল্লাহর মহাত্বকে তুলে ধরেছে। কিন্তু পূর্বের গ্রন্থপ্রাপ্তদের ধর্মে বিকৃতি প্রবেশের কারণে এবং যথাযথ পথ অনুসরণ থেকে তাদের বিচ্যূতির কারণে মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছে।

ইব্রাহীম (আঃ) যখন এ প্রার্থনা করেন তখন তাঁর বড় সন্তান হযরত ইসমাঈল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর বংশের ধারা থেকেই মোহাম্মদ (সাঃ) ও মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছে। তাই মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে এ প্রার্থনা মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করেই করা হয়েছে। যদিও সত্যিকার অর্থে সকলেই মুসলিম অর্থাৎ এক আল্লাহতে সমর্পিত। কিছু ভূল-ভ্রান্তি সকলের মধ্যেই থাকে।

বাইবেল অনুসারে গড ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলেন যে, ইসমাঈলের বংশধর থেকেও আমি এক মহান জাতির সৃষ্টি করব কেননা সেও তোমার পুত্র। অতঃপর আমরা দেখতে পাই যে ইসমাঈল (আঃ) এর ধারা থেকে মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছে।

বাইবেলে বিষয়টি এভাবে উঠে এসেছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম স্ত্রী সারাহ ছিল বন্ধ্যা। কিন্তু সারাহর গর্ভজাত সন্তান আইজ্যাকের জন্মের পর, সারাহ দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা বা হাগারকে ও তার সন্তান তথা ইব্রাহীম (আঃ)

এর বড় সন্তান ইসমাইলকে মেনে নিতে পারছিল না। যে স্ত্রী ছিল তার পরিচারিকা। সারাহ তার সন্তানের সাথে হাজেরার সন্তানের উত্তরাধিকারের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। বিষয়টি গুরুতর পর্যায়ে চলে যায় [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইতে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]।

পরিস্থিতি যখন নাজুক পর্যায়ে চলে যায় তখন ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজেরাকে নিয়ে বীরসেবায় চলে যান। সে সময় আল্লাহ তাঁকে বলেন যে, যেহেতু ইসমাঈল তোমার সন্তান, তাই তার বংশধর থেকেও আমি এক মহান জাতি সৃষ্টি করব। এটি ছিল ইব্রাহীম (আঃ) এর তখনকার মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ প্রদত্ত এক শান্তনার বাণী।

ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম সকল জাতি ইব্রাহীম (আঃ) এর ধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই আল্লাহর মহাত্বকে তুলে ধরেছে। কিন্তু পূর্বের গ্রন্থপ্রাপ্তদের ধর্মে বিকৃতির প্রবেশ ও তাদের পথচ্যুত হওয়ার কারণে মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছে এবং কোরআনে 'একটি অনুগত জাতি' বলতে 'মুসলিম সম্প্রদায়' এর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

কোরআন যৌক্তিকভাবে পূর্বতন ধর্মসমুহের অনুসারীদের বিচ্যূতি ও 'আল্লাহর প্রতি অনুগত মুসলিম জাতি' সৃষ্টির বিষয়টিকে একটি ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে মানবসমাজে তুলে ধরেছে এবং সেটিও তুলে ধরেছে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যিনি আব্রাহামিক সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

লক্ষ্য অর্জনে কোরআন বাস্তবিক অর্থেই সকল দিক থেকে একটি যৌক্তিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে বিষয়সমুহকে মানবসমাজে তুলে ধরেছে।

▪ **২.১২৮.৩** আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর (And show us our ways of worship) : আজকের দিনে মুসলমানরা যেভাবে নামাজ বা সালাত আদায় করে কিংবা ইহুদি-খ্রীষ্টানরা যেভাবে উপাসনা করে, ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ে এভাবে সব প্রতিষ্ঠা পায়নি [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। তিনি আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করেন। দিশাহারা মানুষকে দিশা দানের জন্য আবেদন করেন। ধীরে সবকিছু আজকের পর্যায়ে উপনিত হয়েছে।

এটি একটি বড় প্রশ্ন যে, মানুষ কাকে উপাসনা করবে, কি উপাসনা করবে, কিভাবে উপাসনা করবে? বিষয়টিকে আজকের দিনের প্রেক্ষিতে ভাবলে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে না।

এ প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকায় মানুষ যুগে যুগে মনগড়া অনেক কিছুর উপাসনা করেছে। বটগাছ থেকে শুরু করে বাইসন পর্যন্ত। কখনও নগ্ন হয়ে মূর্তীর সম্মুখে নৃত্য করেছে। কিন্তু মানুষ তৃপ্ত হতে পারেনি। মানুষ নিশ্চিতভাবে জানত না যে সে কি উপাসনা করবে, কাকে উপাসনা করবে, কতজনকে উপাসনা করবে, কিভাবে উপাসনা করবে? যুগে যুগে দেশে দেশে এসব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে। ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করলেও মানব মনের এমন আকুতির চিত্রটি ফুটে ওঠে। যেমন গীতায় অর্জুন শ্রী কৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়েছেন,

“হে ভগবান! কিরূপে আমি তোমাতে ধ্যানগ্রস্থ হব? কোন কোন বিবিধ প্রকারের আকৃতিতে আমি তোমার প্রতি মনোনিবেশ করব?” (গীতা ১০:১৭)

ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনাতেও একই আকুতি ব্যাক্ত হয়েছে। বলা হচ্ছে, ‘আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর।’

বস্তুত মানুষ যে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী উপলব্ধি করে সে বিষয়েই সে দিক-নির্দেশনা কামনা করে। তেমন উপলব্ধিবোধ থেকেই ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য আল্লাহর উপাসনা করার একটি যথাযথ উপায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন।

আয়াতে উদ্ধৃত প্রার্থনার গ্রহণযোগ্যতা ও মঞ্জুরতার বিষয়টি তাৎক্ষণিক জানা বা বোঝা সম্ভব ছিল না। কোন প্রার্থনার ক্ষেত্রেই সাধারণত সেটি সম্ভব হয় না কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া। কিন্তু বিশ্বাসীকে এটি যা দেয় সেটি হচ্ছে তৃপ্তি-আনন্দ। ভেতরে আশার সঞ্চার করে। আশা চলতে সাহায্য করে। পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করে।

প্রার্থনার সুদুরপ্রসারী ফলাফল আছে। পূর্বসূরীদের করা প্রার্থনা পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও প্রভাব ফেলে। প্রার্থনার বিষয়বস্তু প্রজন্মের জন্য একটি দিক-নির্দেশনা হয়েও কাজ করে। ফলে প্রার্থিত বিষয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সকলেই সে প্রার্থনা করে যেতে থাকে। এক থেকে শত, শত থেকে হাজার, লক্ষ

ও কোটি অন্তরে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। চাওয়াটি সমাজের সকলের চাওয়ায় পরিণত হয়। প্রর্থনা এভাবে কোটি প্রাণকে জাগিয়ে তোলে বা উজ্জীবিত করতে সফল হয়।

সব কিছুই কোন না কোন সূত্র ধরে কাজ করে। অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করে। কিছুই আজগুবিভাবে ঘটে না। অতঃপর প্রজন্মের মধ্য থেকেই একসময় চিন্তাশীল মানুষ জেগে ওঠে। পূর্বসূরীদের করা প্রার্থনা প্রজন্মের মধ্য দিয়ে এভাবে বাস্তবরূপ লাভ করে। এভাবে নতুন পথ প্রতিষ্ঠা পায় (দ্রষ্টব্য ১.৪.১)।

মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর করা প্রার্থনা কবুল করেছেন। উপাসনা তথা নামাজ বা সালাত আদায়ের একটি যথাযথ নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মুসলিম তথা মানবসমাজে সালাতের বর্তমান রীতির প্রচলন হয়েছে। বিভ্রান্তির পথ থেকে মানুষকে আল্লাহ একটি যথাযথ পথ প্রদর্শন করেছেন।

আব্রাহামিক ধর্মের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিত্ব হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)। এ বিষয়ে তাঁর প্রার্থনার উদাহরণ তুলে ধরে সালাতের বর্তমান নিয়ম প্রবর্তনের একটি যৌক্তিক ভিত্তি তুলে ধরা হয়েছে, যেন সেটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এভাবেই যৌক্তিকভাবে বিষয়গুলি কোরআনে উঠে এসেছে।

▪ **২.১২৮.৪** আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর। নিশ্চয়ই! তুমি, কেবল তুমিই ক্ষমা প্রদর্শনকারী, দয়ালু (And relent toward us. Lo! Thou, only Thou, art the Relenting, the Merciful) : ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে কাজ করেছেন। কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। কর্মে কিংবা আল্লাহর স্মরণে অজান্তেও মানুষের ভূল-ত্রুটি হতে পারে। তাই ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করা বিনয়ী আচরণেরও একটি উদাহরণ। আল্লাহ বিনয়ীদের পছন্দ করেন।

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর এ প্রার্থনার মাধ্যমে যেমন নিজে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, তেমনি গোটা মানবজাতিকেও বিনয়ী হওয়ার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

তারাই ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা আল্লাহকে তথা আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থাকে বিশ্বাস করে ও ভয় করে। এ একটি নির্দেশকের পেছনে অনেক বড় জ্ঞান ও

বিচার-বিশ্লেষন কাজ করে। ক্ষমা প্রার্থনা খুব সহজ অর্থে কেবল মুখে উচ্চারিত ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। সকল বিচার-বিশ্লেষন সমাপ্ত করে উপসংহারে পৌঁছেই মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করার পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে মানুষের মধ্যে এ বিনয়ভাব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মানবজ্ঞান প্রস্তুতিমূলক অনেকগুলো কাজ সমাপ্ত করে আসে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেই মানুষ এমন গুণ বা মহৎ স্বভাব অর্জন করে।

ক্ষমা প্রার্থনা মানুষের ভবিষ্যৎ ত্রুটি-বিচ্যূতির সম্ভাবনাকেও হ্রাস করে। কেননা কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিজ্ঞতাই মানুষকে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায়। এটি মানুষকে কাজে-কর্মে সর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে উৎসাহ জোগায়। এতে ভূলের পুনরাবৃত্তি রোধ পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

মানুষ জেনে-বুঝেও ভূল করে। ভূলের পরিণাম হচ্ছে ভূল ফলাফল। যার পরিণাম মন্দ। ভূলের জন্য তাই প্রতিনিয়তই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় কোন দোষ নেই। বরং ক্ষমা প্রার্থনা ভূল থেকে পরিত্রানের পথ উন্মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটি মানসিক তৃপ্তি দান করে। যা পরবর্তী কর্মে মনের ঋণাত্মক যন্ত্রনাগুলিকে দুর করে মনকে প্রফুল্ল হতে সহায়তা করে এবং কাজে ধনাত্মক প্রভাব রাখে।

এক কথায় বিশ্বাসী যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আশার আলো দেখতে পায়। সে ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখে। এটি তাকে পরবর্তী কাজে শক্তি যোগায়। সে জানে যে একমাত্র আল্লাহই ক্ষমা মঞ্জুরকারী, দয়ালু। বিশ্বাসী এটিও জানে যে যদি সে ক্ষমা নাও পায়, তবুও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতেও তার এক ধরনের তৃপ্তি আছে। যাদের মানসিকতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বস্তুত তারা ক্ষমা পাওয়ারই যোগ্য। পার্থিব জীবনে এটি তাকে তৃপ্তি দেয়। অন্তরকে প্রশান্ত রাখে। এটি এক পর্যায়ে অভ্যাসেও পরিণত হয়। যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করে যেতে থাকে। বরং ক্ষমা প্রার্থনা না করলে এক ধরণের অস্বস্তি বোধ হয়। আর এ প্রার্থনায় কোন ক্ষতি বা ত্রুটি নেই। বরং ক্ষমা পাবার সম্ভাবনা আছে। ভেতরে ভূলের পুনরাবৃত্তি রোধের শক্তি সঞ্চারিত হয়। চেতনা সমৃদ্ধ হয়।

মানুষ ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কখন কোন ভূল করছে নিজেও বিষয়গুলি সবসময় বুঝে উঠতে পারে না। তাই সব সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করা উত্তম। ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর দরবারে নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং মানবজাতিকে সে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

▪ **২.১২৯.১** হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন বার্তাবাহককে জাগরিত কর (Our Lord! And raise up in their midst a messenger from among them) : ইব্রাহীম (আঃ) যখন এ প্রার্থনা করেন তখন অনেক বার্তাবাহকেরই আগমন ঘটেনি। পরবর্তীতে অনেক বড় বড় নবী-রাসূলগণের আবির্ভাব হয়েছে। সকলেই তাঁর ধারা থেকে এসেছে। ইয়াকুব নবী বা ইসরাইলের বংশ থেকে মুসা (আঃ), দাউদ (আঃ), ঈসা (আঃ) ও আরও অনেক বার্তাবাহক আবির্ভূত হয়েছেন।

ইব্রাহীম (আঃ) যখন এ প্রার্থনা করেন তখন কোরআন অনুসারে তাঁর সাথে হযরত ইসমাঈল উপস্থিত ছিলেন। ইসমাঈল এর বংশের ধারা থেকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব ঘটেছে। যিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর দিক থেকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আবির্ভূত হন।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের যত যোগসূত্র ও মানবসমাজ বিশেষত আব্রাহামিক ধর্মাবলম্বী অপরাপর সম্প্রদায়ের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির যত যৌক্তিকতা এ প্রার্থনা তার অন্যতম একটি। কোরআন প্রতিটি বিষয় এমনিভাবে একটি প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে।

▪ **২.১২৯.২** যে তাদের কাছে তোমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে দীক্ষা দেবে এবং তাদেরকে বিকশিত হতে সহায়তা করবে। তুমি কেবল তুমিই পরাক্রমশালী, জ্ঞানী : ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন বার্তাবাহককে জাগরিত কর'। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন (দ্রষ্টব্য ২:১৫১)। মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন তাঁরই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে। কোরআন ধারাবাহিক ও যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে এভাবে বিষয়গুলি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরেছে।

মোহাম্মদ (সাঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পশ্চাৎপদ এক জনপদে আবির্ভূত হন। এমন এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হন যখন সমাজ প্রতিনিয়ত ভীষনভাবে

সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাব অনুভব করেছে এবং দুরবস্থা থেকে একজন পরিত্রানদাতার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছে।

তিনি মানুষের মাঝে দিক-নির্দেশনাস্বরূপ আল্লাহর বাণী পাঠ করেছেন। এর প্রচার ও প্রসারে কাজ করেছেন। চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। কুসংস্কার ও ভূল ধারণার যাঁতাকল ও শৃংখল থেকে মানুষকে উদ্ধার করে মুক্ত করেছেন। সমাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহান আল্লাহর দরবারে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিত্ব ইব্রাহীম (আঃ) এর করা প্রার্থনা ও তার প্রেক্ষিতে বার্তাবাহকরূপে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন, আল্লাহর প্রতি অনুগত মুসলিম জাতির সৃষ্টি, দিক-নির্দেশনামূলক ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তি ও তার পাঠ যা মানবসমাজকে বিকশিত করেছে- এ সব বিষয়গুলিই বিশেষত তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর গ্রহণযোগ্যতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে কাজ করেছে। যা ইব্রাহীম (আঃ) এর করা প্রার্থনার উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে যৌক্তিকভাবে কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে- যিনি ছিলেন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মসলমান সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিত্ব।

➢ (আয়াত ১৩০-১৩৪) ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর ধর্মমত বা চলার পথ (Abraham and Religion) সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে পথ মানবজাতির সকলের জন্য অনুসরণীয়।

১৩০	কে ইব্রাহীমের ধর্ম (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যাতিত যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে? অবশ্যই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই! পরকালেও সে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (And who forsaketh the religion of Abraham save him who befooleth himself? Verily We chose him in the world, and lo! in the Hereafter he is among the righteous.)
১৩১	যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: সমর্পন কর! সে বলল: আমি বিশ্বসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে সমর্পন করলাম। (When his Lord said unto him: Surrender! he said: I have surrendered

	to the Lord of the Worlds.)
১৩২	ইব্রাহীম তার সন্তানদের একই নির্দেশনা দিয়েছিল এবং ইয়াকুবও (জ্যাকব বা ইসরাইলও) বলেছিল: হে আমার পুত্রগন! নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের জন্য এক (সত্য) ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ হিসেবে (আল্লাহর নিকট) নিজেকে সমর্পন না করে মৃত্যুবরণ কর না। (The same did Abraham enjoin upon his sons, and also Jacob, (saying): O my sons! Lo! Allah hath chosen for you the (true) religion; therefore die not save as men who have surrendered (unto Him).)
১৩৩	তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে তার পুত্রদের বলে: আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? তারা বলল: আমরা তোমার উপাস্যের উপাসনা করব, যে উপাস্য তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের; তিনি এক এবং তার প্রতি আমরা নিজেদের সমর্পন করলাম। (Or were ye present when death came to Jacob, when he said unto his sons: What will ye worship after me? They said: We shall worship thy God, the God of thy fathers, Abraham and Ishmael and Isaac, One God, and unto Him we have surrendered.)
১৩৪	তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না। (Those are a people who have passed away. Theirs is that which they earned, and yours is that which ye earn. And ye will not be asked of what they used to do.)

▪ **২.১৩০.১** কে ইব্রাহীমের ধর্ম (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যাতিত যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে : আয়াত থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে,

যে ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে না আল্লাহ নিজেই তাকে বোকা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ইব্রাহীমের ধর্মটি কি? সেটি বোঝার পূর্বে মনের মধ্যে কতগুলি চিন্তার উদ্রেক হতে হবে। যা বিষয়টিকে বুঝতে সহায়তা করবে। আমরা যেসব ধর্ম অবলম্বন করি যেমন ইহুদি ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, মুসলিম ধর্ম এসব ধর্ম কি ইব্রাহীম (আঃ) এর কালে বা পূর্বে বিদ্যমান ছিল? যেসব নিয়ম-বিধি-রীতি এ সকল ধর্মে বর্তমানে পালন করা হয় তিনি কি সেসব পালন করেছেন? তাহলে তিনি আল্লাহর এত প্রিয়পাত্র হলেন কিভাবে যেসবগুলি পালন না করলে নাকি স্বর্গেই যাওয়া যাবে না?

তৎপূর্বে প্রচলিত ধারণার একটি ভূল সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের সময়কাল থেকে সধারণ মানুষ এমনকি মুসলিমরাও ইসলামের অবির্ভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়। বস্তুত ইসলাম এভাবে হঠাৎ আসেনি।

আল্লাহ যখন মানব সৃষ্টি করেছেন তখনই তার জন্য চলার পথ হিসেবে ইসলামকে তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং সে পথের দিক-নির্দেশনা মানব অন্তরে অন্তর্গ্রথিতও করে দিয়েছেন। যা আছে ‘লওহে মাহফুজে’। কিন্তু ইসলাম কি প্রকৃত অর্থে মানুষ সেটি না বোঝার কারণে মনে করে থাকে যে, এটি বুঝি কেবল ‘প্রচলিত ধারণার’ মুসলমানদের ধর্ম। ‘প্রচলিত ধারণার’ শব্দটি ব্যাবহার করা হল এ কারণে যে, সত্যিকার অর্থে জগতের সকল মানুষের ধর্মই ইসলাম তথা চিরন্তান বা সনাতন সত্য ধর্ম এবং সে অর্থে সকলেই মুসলিম। এটিই একমাত্র মানব ধর্ম। তাই ইসলাম কি সর্বপ্রথম সেটি যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

যদি মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের পরে ইসলাম ধর্ম এসে থাকবে তবে এ কথাটি বলা হত না যে, ‘কে ইব্রাহীমের ধর্ম (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’ অর্থাৎ তাঁর ধর্মও ছিল ইসলাম এবং তিনিও মুসলিম ছিলেন। অথচ তখন তো মোহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব হয়নি!

নুহ (আঃ) ছিলেন আরও পূর্বের এবং আদম (আঃ) প্রথম মানব। তাদের ধর্ম বা চলার পথও ছিল ইসলাম। তারাও ছিলেন মুসলিম। বস্তুত আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্মই হচ্ছে ‘ইসলাম’। কিন্তু ইসলাম ধর্মটি আসলে কি?

ধর্মের মধ্যে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যূতি ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল সর্বশেষ নবী হিসেবে মোহাম্মদ (সাঃ) কেবল সেসবের সংস্কার করে গেছেন। ত্রুটি-বিচ্যূতি সংশোধন করে যথাযথভাবে ইসলামকে বুঝতে সহায়তা করে গেছেন। কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে সত্যের পথে ধাবিত করার উপায় প্রদর্শন করেছেন।

কোরআনের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মই প্রকৃত আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। তিনি ইহুদি ছিলেন না, তিনি খ্রীষ্টান ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুসলিম। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের বিশ্বাসই তোমাদের জন্য নির্ধারিত। পূর্বেও তিনি তোমাদেরকে মুসলমান নামেই অভিহিত করেছেন এবং এই গ্রন্থেও" (আল-কোরআন ২২:৭৮)

▪ **২.১৩০.২** অবশ্যই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং নিশ্চয়ই! পরকালেও সে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত হবে : বর্তমান সময়ে মুসলমানরা যেভাবে নানাবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর যুগে হুবহু সেভাবে পালন করেন নাই। ইহুদি, খ্রীষ্টান, ইসলাম নাম নিয়ে ধর্মগুলি তাঁর অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর সময়ে ধর্মের মধ্যে আজকের মতো এত রীতি-বিধি ছিল না যা পালন না করলে স্বর্গে যাওয়া যাবে না বলে ধারণা দেয়া হয়। অথচ এসব রীতি-বিধি পালন না করেও তারা ছিলেন মনোনীত। আল্লাহর প্রিয়ভাজন। আল্লাহর কাছে সৎকর্মপরায়নরূপে বিবেচিত। অতএব বুঝতে হবে যে সত্যিকার ধর্ম বা চলার পথটি কি যে পথে চললে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া সম্ভব?

ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সেই সত্যিকার ধর্মের অনুসারী যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। তাই তিনি তাঁকে মনোনীত করেছেন। তিনি ছিলেন সৎকর্মপরায়ন এবং প্রতিশ্রুতি এই যে পরকালেও তিনি সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত হবেন।

▪ **২.১৩১** যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, সমর্পন কর! সে বলল, আমি বিশ্বসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে সমর্পন করলাম : কে ইব্রাহীমের ধর্ম (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যাতিত যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে? ধর্মের বিষয়ে সত্যিকার জ্ঞানের অভাবের কারণে মানুষ এমন আচরণ

করে। অর্থাৎ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ভূলভাবে ধর্ম পালন করে। সত্যিকার ধর্মের পথটি তবে কি?

আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, "যখন তাকে (ইব্রাহীমকে) তার পালনকর্তা বললেন: সমর্পন কর! সে বলল: আমি বিশ্বসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে সমর্পন করলাম।"

সত্যিকার ধর্মের পথ হচ্ছে 'সমর্পন'। মানবজাতির একটিই ধর্ম। সেটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তায় সমর্পন। বিধাতায় সমর্পন। আল্লাহতে সমর্পন [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩] [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। সে অর্থেই সকল মানুষের ধর্ম এক। এটিই ইসলাম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সরল পথ, শান্তির পথ, সনাতন বা চিরন্তন সত্যের পথ। যারা এ পথ অনুসরণ করে তারাই 'মুসলিম' নামে পরিচিত। আল্লাহ সকল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে যত মহাপুরুষ প্রেরণ করেছেন সকলকে এই একই নির্দেশনা দিয়েছেন। নিচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল ধর্ম হিসেবে যা সমর্পনের গুরুত্বকে বুঝতে পাঠককে সহায়তা করবে। বলা হচ্ছে,

"নিঃসন্দেহে! আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

"নানরূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।" (গীতা ১৮:৬৬)

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

বহু মানুষ রয়েছে যারা আচার-অনুষ্ঠান মুসলিমদের মতো পালন করে না, অথচ তারা আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পন করে। সমর্পন বিষয়টি কোন সুনির্দিষ্ট আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তবে আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর আল্লাহ এ নির্দেশই বারবার প্রেরণ করেছেন। পূর্বেও করেছেন। তখন আজকের মতো করে মানুষ ইসলাম ধর্ম পালন করে নাই। বাধা-ধরা নিয়মের পালনই কেবল স্বর্গে যাবার একমাত্র টিকেট নয়, কিংবা নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় নয়; কিংবা আল্লাহর

সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথও নয়। তবে এসবেরও গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন যে কেউ নিজেকে বিধাতার কাছে সমর্পন করতে পারে। সত্যি বলতে এর জন্য বাধা-ধরা কোন নিয়ম-বিধি বা ছক প্রয়োজন হয় না। নিজ জ্ঞানে চলতে জানতে হয়। তবে অধিক সংখ্যক এবং নানান গুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধানেরও প্রয়োজন আছে। তাই এত এত নামের ধর্ম আবির্ভূত হয়েছে এবং প্রতিটিই এক একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ নয়। প্রতিযোগীতা থাকতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"... প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই আমি বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তিনি তোমাদের সকলকে এক সম্প্রদায়ভূক্ত করে দিতেন। কিন্তু তোমরা বর্তমানে যেমন আছ তেমন করা হয়েছে, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। অতএব একে অন্যের সঙ্গে ভাল কাজে প্রতিযোগীতা কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন কোথায় তোমরা মতবিরোধ করতে।" (আল-কোরআন ৫:৪৮)

বস্তুত মানবের ধর্ম একটিই এবং সেটি হচ্ছে বিধাতায় 'সমর্পন'। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কিভাবে বিধাতায় বা আল্লাহতে সমর্পিত হতে হবে সেটি বোঝা। বিষয়টি সকলের জন্য একেবারে সহজবোধ্যও নয়।

আল্লাহতে সমর্পন হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছে ও পথ-নির্দেশনার প্রতি সমর্পন। সমর্পন কি, কিভাবে সমর্পিত হতে হবে বিষয়গুলি নিয়ে প্রযোজ্য স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

সমর্পনই হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রদর্শিত চলার পথ, ধর্ম বা দ্বীন। যা জগতের সকল মানুষের চলার একমাত্র পথ হিসেবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তাঁকে এরই নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহতে সমর্পিত ছিলেন। সে কারণেই তিনি আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়েছেন। পরকালেও আল্লাহর কাছে তাঁর ভাল অবস্থান নির্ধারিত আছে, কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ সেটি জানিয়ে দিয়েছেন।

তারাই সৎকর্মপরায়ন যারা যথাযথভাবে আল্লাহতে নিজেকে সমর্পন করতে জানে ও করে। এর মাধ্যমে সকলকে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে বা যারাই আল্লাহর প্রতি যথযথভাবে নিজেকে সমর্পন করতে পারবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

সে কারণেই বলা হয়েছে যে, যে বা যারা ইব্রাহীমের ধর্ম অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন না করে ধর্ম পালন করছে বলে মনে করছে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করছে। সে আজও ধর্ম বিষয়টিকেই বুঝতে শেখেনি।

উল্লেখ্য যে, কেবল কতগুলি নিয়মের হুবহু পরিপালনই ধর্ম নয় [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। সেগুলিকে ধর্মের গ্রামার বা ব্যাকরণ বলা যেতে পারে। ব্যাকরণ মেনে চলতে পারলে ভাল। তবে তেমন ক্ষেত্রে অনেক সময় ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনে আন্তরীকতার ঘাটতি থাকে। শুদ্ধভাবে ব্যাকরণ পরিপালন করে পুরস্কার প্রাপ্তির দিকে মনযোগ বেশী থাকে। নিজের প্রাপ্তি বা স্বার্থের দিকেই লক্ষ্যটা বেশী থাকে। জাগতিক জীবনে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য অর্জন হল কিনা সে ভাবনা কম থাকে।

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কিছু নিয়ম বা ব্যাকরণ থাকে। অথচ ব্যাকরণ না জেনেও কাজ করা সম্ভব। স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে কাজই করুক না কেন সৃষ্টির সূত্র অনুযায়ী সে কাজের ব্যাকরণ আপনাতেই তার ভেতরে অন্তর্গ্রথিত থাকে। যেমন গ্রামার না জেনেও শিশু কথা বলতে পারে। ভাষার ব্যাবহার করতে পারে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান বা ব্যাকরণ আছে। সব মানুষ সব বিষয়ের ব্যাকরণ জানে না বা জানার প্রয়োজনও হয় না। তবুও মানুষ সব কাজ করতে পারে এবং আন্তরীকতার সাথেই করতে পারে। সে সূত্রেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

উচ্চতর ও বিশেষায়িত জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন আছে। আবার নবীশদের জন্যও প্রয়োজন আছে। ফলে এটিও থাকতে হবে। এর গুরুত্বকেও অবজ্ঞা করা যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে মানুষকে 'সৎকর্মপরায়ন' হতে হবে। আল্লাহতে সমর্পিত মানুষ অবধারিতভাবেই সৎকর্মপরায়ন হয়ে থাকে বা হতে পারে। তাই 'সমর্পন' এর গুরুত্ব এত অধিক। সমর্পনকে আল্লাহ সকল মানুষের জন্য 'একমাত্র ধর্ম'

হিসেবে মনোনীত করেছেন। এটিই 'ইসলাম'। চিরন্তন বা সনাতন ধর্মের পথ। সত্যের পথ। 'শান্তির পথ'। আর এ পথের অনুসারীরাই 'মুসলিম'। এটিই ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্ম যা আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, "যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: সমর্পন কর! সে বলল: আমি বিশ্বসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে সমর্পন করলাম।"

আল্লাহতে সমর্পন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যারা ধর্ম পালন করছে বলে মনে করছে বলা হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে বোকা প্রতিপন্ন করছে।

উল্লেখ্য যে, যাদেরকে প্রচলিত ধর্ম পালন করতে দেখি না তাদের মধ্যেও সমর্পিত মানুষ আছে। আবার যারা প্রচলিত ধর্ম পালন করছে তাদের মধ্যেও অনেকেই প্রকৃত অর্থে আল্লাহতে সমর্পিত নয়। অনেকে বিষয়গুলি যথাযথভাবে বোঝেও না। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যতিত কেউই তা স্মরণ করে না।" (আল-কোরআন ২:২৬৯)

■ **২.১৩২-২.১৩৩** ইব্রাহীম তার সন্তানদের একই নির্দেশনা দিয়েছিল এবং ইয়াকুবও বলেছিল: হে আমার পুত্রগন! নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের জন্য এক ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে সমর্পন না করে মৃত্যুবরণ কর না। তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে তার পুত্রদের বলে: আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? তারা বলল: আমরা তোমার উপাস্যের উপাসনা করব, যে উপাস্য তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের; তিনি এক এবং তার প্রতি আমরা নিজেদের সমর্পন করলাম : ইব্রাহীম (আঃ) তার সন্তানদেরকে এক আল্লাহর প্রতি সমর্পনের পথ বলে দিয়ে গেছেন। জ্যাকব বা ইয়াকুব নবী তথা ইসরাইলও তার সন্তানদেরকে একই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এসব কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলে ছিলেন আল্লাহতে সমর্পিত। আল্লাহতে সমর্পন বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। এটিই একমাত্র 'সত্য ধর্ম' যা মানুষের জন্য আল্লাহ মনোনীত করেছেন। কোরআনে তাই গুরুত্বের

সঙ্গে বলা হয়েছে যে, "একজন মানুষ হিসেবে (আল্লাহর নিকট) নিজেকে সমর্পন না করে মৃত্যুবরণ কর না।"

আল্লাহতে সমর্পন করার জন্য কোন বিশেষ ধর্মের ছত্রছাঁয়ায় থাকার প্রয়োজন হয় না [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩] [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। আবার যে কোন ধর্মের ছত্রছাঁয়ায় থেকেও আল্লাহতে সমর্পন করা সম্ভব। এমনকি বোধসম্পন্ন মানুষ কোন ধর্মের ছত্রছাঁয়ায় না থেকেও আল্লাহতে সমর্পিত হতে পারেন। জগতে তেমন মানুষও রয়েছে অসংখ্য। তারা সৎকর্মপরায়ন, সরল পথে অধিষ্ঠিত ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী এবং মন্দ কর্ম থেকে বিরত।

এতদ্বসত্বেও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন নামের ধর্মসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্ম সম্পর্কে বোধসম্পন্ন মানুষের সত্যিকার উপলব্ধিবোধ ও সাধারণ মানুষের উপলব্ধিবোধ এক নয় এটিও বুঝতে হবে। আবার যারা মানুষ পরিচালনা করে বা রাজনীতি করে তাদের সঠিক উপলব্ধিবোধ থাকা সত্বেও রাজনীতির কারণে তাদেরকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এগুলিও বাস্তবতা এবং বাস্তবতাকে কোনভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। বাস্তবই সত্য। এর সাথে প্রত্যেকের যথাযথ স্থানে টিকে থাকার প্রশ্ন জড়িত। জীবন, জীবিকা, মর্যাদা নানান বিষয় জড়িত। গীতায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশনা রয়েছে। বলা হচ্ছে,

"অজ্ঞদের কাজ/বোধ নিচু পর্যায়ের হলেও জ্ঞানসম্পন্নদের তাদেরকে বিচলিত বা বিব্রত করা উচিত নয়।" (গীতা ৩:২৯)

"কেবলমাত্র সর্ব-সাধারনকে শিক্ষাদানের জন্য হলেও তুমি তোমার জন্য নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা উচিত। কোন মহান ব্যাক্তির দ্বারা যে কোন কাজই সম্পন্ন হোক না কেন, সাধারণ মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং উদাহরণমূলক কাজের মাধ্যমে সে যে মান নির্ধারণ করে, সারা পৃথিবী তা অনুসরণ করে। এই ত্রিভূবনে আমার জন্য নির্ধারিত কোন কাজ নেই। না আমার কোন কিছুর চাহিদা আছে, না আমার কোন কিছু অর্জনের প্রয়োজন আছে, তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি কাজে সম্পৃক্ত না থাকি, নিশ্চিতভাবেই সকল মানুষ আমার পথ অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম থেকে

নিজেকে সরিয়ে নেই, তাহলে বিশ্বসমুহ ধ্বংসে পতিত হবে, সকলের সর্বনাশ হবে।” (গীতা ৩:২০-২৪)

ওপরে উদ্ধৃত গীতার শেষের কথাগুলি কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে, “প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত।” (আল-কোরআন ৫৫:২৯)

ইব্রাহীম (আঃ), ইসরাইল বা ইয়াকুব নবী, ইসমাইল, আইজ্যাক বা ইসহাক নবী প্রমুখ নবীগণ যখন আল্লাহতে সমর্পন করেছেন তখন ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম নামের এতসব ধর্মের আবির্ভাবও হয়নি। অথচ তারা আল্লাহতে সমর্পিত ও সৎকর্মপরায়ন ছিলেন। সকল মানবের এটিই ‘প্রকৃত ধর্ম’। এটিই ‘ইসলাম’। তাই ‘মানুষের ধর্ম এক ধর্ম’। ‘আল্লাহতে সমর্পন’। গীতায়েও ভগবানে সমর্পনের কথা বলা হয়েছে অত্যাধিক গুরুত্বের সঙ্গে। বস্তুত আল্লাহ সকল সমাজে একই মূল বার্তা প্রেরণ করেছেন।

আয়াতে ইয়াকুব নবী বা ইসরাইলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা কোরআনে ইসরাইলিদের নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। কোরআন অবতীর্ণকালীন সময়ের ইতিহাসের সাথে ইসরাইলিদের একটি সম্পর্ক আছে এবং ইসরাইলীরা সরাসরি ইয়াকুব নবীর পরবর্তী প্রজন্ম।

মৃত্যুকালে ইয়াকুব তাঁর সন্তানদেরকে যা বলে গিয়েছিলেন বাইবেলেও সে বিষয়ে বলা হয়েছে। কোরআনেও বলা হয়েছে। তিনিও তাঁর সন্তানদেরকে অর্থাৎ ইসরাইলি বা ইহুদিদেরকে আল্লাহর প্রতি সমর্পনের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। কিন্তু ইসরাইলের সন্তানেরা সে পথ থেকে বিচ্যূত হয়েছে। যদিও কোরআনে বলা হয়েছে তাদের সকলেই একরকম নয় (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৩:১১৩)। এটিও বুঝতে হবে যে, পৃথিবীর সব জাতিতেই বিভিন্ন রকমের ভাল-মন্দ মানুষ আছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইলীরা বিভাজিত হয়েছে। এ সময় তাদের একদল মূর্তী পূঁজারও প্রচলন করেছে। যার পেছনে রাজনৈতিক কারণ ছিল [লেখকের ‘বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল’ বইতে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]। তারা আল্লাহর সাথে সন্তানজনিত বিষয়ে অংশীদারিত্ব আরোপ করেছে। অথচ তারা এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য কঠোরভাবে আদিষ্ট ছিল এবং আল্লাহর কোন অংশীদার নেই সে বিশ্বাসে

বিশ্বাসী ছিল। তাদের বিষয়ে কোরআনে বিস্তারীত আলোচনা করার পর বিষয়টি এখানে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.১৩৪** তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না : 'তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর' অর্থাৎ পূর্বপুরুষ তথা অন্যরা কি করেছে বা কি ভাল বা কি মন্দ কর্ম করেছে সেটি দ্বারা কারও ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। তাতে গর্ব করার কিংবা অনুতাপ করার বা হতাশ হবারও কিছু নেই। তাদের প্রাপ্য ভাল কাজের ফলাফল অপর কারও হবে না। আবার তাদের করা মন্দ কাজের পরিণামও তাদেরকেই বহন করতে হবে অপর কাউকে বহন করতে হবে না। এখানে সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাও।

প্রত্যেকেই তার নিজের ভাল বা মন্দ কাজের জন্য দায়ী। একের কারণে অপরে কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না। ফলে বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ যে পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন, নিজ জ্ঞানে নিজেদের মঙ্গলের জন্য সেটির অনুসরণ করা সকলের জন্যই শ্রেয় ও মঙ্গলজনক। অন্যথায় ভূল করলে সে ভূলের দায় নিজেদেরকেই বহন করতে হবে। এ বিষয়ে বিশেষত ইসরাইলের সন্তানদেরকে বিচার-বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সময়ের সাথে সাথে পূর্বেকার অনেক নিয়ম বর্তমান সময়ে গ্রহনীয় থাকে না। আবার বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী যে পথ প্রদর্শিত হয় মানুষের জন্য সেটিই পালনীয় হতে হয়। ভূল করলে কেউই কারও বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেককেই তার নিজের কর্মের দায়ভার নিজেকে নিতে হবে। তাই সকলকে, বিশেষত এখানে ইসরাইলের সন্তানদেরকে বিচার-বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে কাজ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অতীতে তাদের ভূল কাজসমুহ যা কোরআনে উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে, তেমনি একই ভূলের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একইরকম আচরণ না করে, ভূল কর্ম পরিত্যাগ করে মোহাম্মদ (সাঃ) যে সত্যের পথ কোরআনের মাধ্যমে মানবসমাজে নিয়ে আগমন করেছেন সে পথ অনুসরণে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায় এ বাণী ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। সকল সময়ে সকল মানুষের জন্য এ বাণী বিবেচ্য ও প্রযোজ্য। আল্লাহতে সমর্পনই প্রকৃত ধর্ম।

➢ (আয়াত ১৩৫-১৪১) ইসরাইলের সন্তান বা গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদি-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মের প্রকৃত পথ (Children of Israel, Belief and Religion) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৩৫	তারা (গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়) বলে: তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হও, তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে। বল (হে মোহাম্মদ): কখনই নয় বরং আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা সমুন্নত এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। (And they say: Be Jews or Christians, then ye will be rightly guided. Say (unto them, O Muhammad): Nay, but (we follow) the religion of Abraham, the upright, and he was not of the idolaters.)
১৩৬	বল: আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং তদীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমুহের ওপর এবং যা মূসা ও ঈসা গ্রহণ করেছে এবং অপরাপর সকল নবীগণ গ্রহণ করেছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না এবং আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পন করি। (Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed unto us and that which was revealed unto Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and unto Him we have surrendered.)
১৩৭	এবং তারা যদি তেমনিভাবে বিশ্বাস করে যেমনিভাবে তোমরা বিশ্বাস

	কর, তবে তারা সঠিক পথে আছে। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা অনমনীয় এবং তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, সবজান্তা। (And if they believe in the like of that which ye believe, then are they rightly guided. But if they turn away, then are they in schism, and Allah will suffice thee (for defence) against them. He is the Hearer, the Knower.)
১৩৮	আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই উপাসনাকারী। ((We take our) colour from Allah, and who is better than Allah at colouring. We are His worshippers.)
১৩৯	বল: তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিবাদ কর, যখন তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা? আমাদের জন্য আমাদের কাজ, তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (Say (unto the People of the Scripture): Dispute ye with us concerning Allah when He is our Lord and your Lord? Ours are our works and yours your works. We look to Him alone.)
১৪০	তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং তদীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল? বল: এ বিষয়ে তোমরা ভাল জান না আল্লাহ? তার চাইতে অধিক অন্যায়কারী আর কে হতে পারে যে সাক্ষ্য-প্রমাণকে গোপন করে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছে? তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। (Or say ye that Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes were Jews or Christians? Say: Do ye know best, or doth Allah? And who is more unjust than he who hideth a testimony which he hath received from Allah? Allah is not unaware of what

	ye do.)
১৪১	তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। তাদের জন্য তা যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য তা যা তোমরা অর্জন কর। তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না। (Those are a people who have passed away; theirs is that which they earned and yours that which ye earn. And ye will not be asked of what they used to do.)

▪ **২.১৩৫.১** তারা বলে: তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হও, তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা মুসলমানদেরকে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হতে বলে। তারা বলে তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে। তাদের এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ বাণী অবতীর্ণ হয়। ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসরণই কি তবে সঠিক পথ?

ইহুদি কিংবা খ্রীষ্টান ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও বহু মানুষ পৃথিবীতে সৎভাবে জীবন-যাপন করেছে। সৎ পথে চলেছে। ইহুদি-খ্রীষ্টান নামে আজ যারা পরিচিত তারা ছিল তাদেরও পূর্ব-পুরুষ। তবে কি তারা সঠিক পথে ছিলেন না? ধর্মের কাজই তো মানুষকে সৎ পথে পরিচালনা করা।

ইব্রাহীম (আঃ) কি সঠিক পথ অবলম্বনকারী ছিলেন না? তিনি কি আল্লাহর প্রিয়পাত্র ছিলেন না? কিংবা নুহ (আঃ) অথবা হযরত আদম (আঃ)? তারা কি ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিলেন? সে সময় তো এসব নামধারী ধর্মেরই আবির্ভাব হয়নি। অতএব তাদের এমন বিচার-বিবেচনা ও বক্তব্য যথাযথ নয় পরের বাণীতে সেটি তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.১৩৫.২** বল (হে মোহাম্মদ): কখনই নয় বরং আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা সমুন্নত এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ওপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে বলতে বলছেন যে, ‘কখনই নয়’। অর্থাৎ তাদের এ বক্তব্য সত্য ও সঠিক নয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রচলিত একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে সেটি সঠিক নয়। হতে হবে একজন যথাযথ ও সমুন্নত মানুষ। যেমন ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)।

ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদিও ছিলেন না, খ্রীষ্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমুন্নত মানুষ। আত্মবিশ্বাসী। তিনি নিজেকে বুঝতে শিখেছেন। আল্লাহকে চিনেছেন। সত্য উপলব্ধি করেছেন। তাই এক আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে নত হননি। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করেছেন।

আল্লাহ হচ্ছেন সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। অতএব তিনি সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে সমর্পিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর পথে সমর্পিত ছিলেন।

এখানে আরও বলতে বলা হচ্ছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) পৌত্তলিকদেরও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। অথচ তাদের নিজেদের ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও ইহুদি ও খ্রীষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীরাই এ দোষে দুষ্ট হয়েছে।

পৌত্তলিকতার সমস্যা হচ্ছে এটি আসে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, অজ্ঞতা এবং বিশ্বাসহীনতা বা আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষ যখন কোন সঠিক সিদ্ধান্তে বা একটি যথাযথ উপসংহারে উপনীত হতে পারে না তখন তার ভেতরে দোদুল্যমানতা কাজ করে। বিশ্বাসহীনতা কাজ করে। অর্থাৎ কোন বিশ্বাসেই সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসী নয়। মানসিক এমন অবস্থায় সে আত্মবিশ্বাসী হতে পারে না।

বিশ্বাসহীনতা আসে সঠিক পথ খুঁজে না পাবার কারণে। নিজেকে চিনতে না পারার কারণে। আর জ্ঞানের চর্চার অভাবের কারণেই মানুষ নিজেকে কিংবা আল্লাহকেও খুঁজে পেতে ব্যার্থ হয় [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। আত্মবিশ্বাসের অভাব আসে নিজের ওপর তথা আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে না পারার কারণে। আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে না পারার কারণই হচ্ছে বিশ্বাসহীনতা বা অবিশ্বাস। জ্ঞানের অভাবের কারণে তারা দৃঢ়চিত্ত নয়। অবিশ্বাস মানুষকে জীবম্মৃত করে রাখে। তখন তারা শক্তি বা ক্ষমতার উৎস হিসেবে এর-ওর দ্বারস্ত হয়। তেমন দুর্বল চিত্তের ফলাফলই হচ্ছে পৌত্তলিকতার কারণ। এটি একটি মানসিক রোগ।

মুসলমানদেরকে যারা তাদের বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করার আহবান করেছে তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন তাদেরকে বলে দাও যে, ‘আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা সমুন্নত এবং সে পৌত্তলিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।’ যদি তারা সত্যিকারভাবেই বোধসম্পন্ন হয়, তবে এ উত্তর থেকে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর বা অনুসারী

বলে দাবী করা সত্বেও প্রকৃতপক্ষে তারা তাঁর পথেও নেই। তারা যে ভূল পথে আছে সেটি তারা বুঝতে পারবে।

ইব্রাহীম (আঃ) কখনই মূর্তীর পূঁজারী ছিলেন না। আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুর অংশীদারিত্ব আরোপ করেন নাই এবং তিনি এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। পৌত্তলিকতার বিপক্ষে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অথচ গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও যেমন আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারীত্ব আরোপ করে, তেমনি কেউ কেউ মূর্তীরও আরাধনা করে (দ্রষ্টব্য ২.৪.১, ২.১২০.১)। মুসলমানরা এ থেকে মুক্ত।

▪ **২.১৩৬.১** বল: আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহতে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমুহের ওপর এবং যা মূসা ও ঈসা গ্রহণ করেছে এবং অপরাপর সকল নবীগণ গ্রহণ করেছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে তৎসমুদয়ের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না : এ আয়াত বিশ্বাসীদেরকে দিক নির্দেশনা দেয় যে, আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপনের পর সকল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস রাখাও বিশ্বাসীদের কর্তব্য। সকল বার্তা আল্লাহর দিক থেকে এসেছে এবং সকলে একই সত্যের বার্তা নিয়ে এসেছেন। তারা সকলেই সমর্পনের পথই প্রদর্শন করে গেছেন। বিশ্বাসীরা তাই কোন নবীকেই কিংবা তাদের কারও দেখান পথকেই অস্বীকার করে না। যদিও পরবর্তীতে তাদের অনেক অনুসারীরা বিভ্রান্ত হয়েছে। প্রকৃত ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

ভূল-পথগামীরা কেবলমাত্র নিজেদেরকেই সঠিক মনে করে। তারা সত্য অনুধাবন করে না। তাদের মধ্যে থাকে অহংকারবোধ, সংকীর্ণ দলীয় বা গোষ্ঠীগত ভাবনা এবং জ্ঞান ও বোধের অভাব আছে।

বিভিন্ন সময়ে বা যুগে একই আল্লাহর বাণী বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে বা অন্যকথায় যুগোপযোগী করে অবতীর্ণ ও উপস্থাপিত হয়েছে; বা বলা যায় সত্যের উপস্থাপন সমসাময়িক সময়ে মানুষের ধারণ বা বুঝের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ এবং ধর্ম ও ধর্মের লক্ষ্য এক বিষয় এবং বিভিন্ন ধর্মের নামে পালিত নিয়ম-বিধি ও রীতি আরেক বিষয়

[ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। আল্লাহ, ধর্ম ও ধর্মের লক্ষ্য সর্বত্র এক। কিন্তু নিয়ম-বিধি ও রীতিতে স্থান-কাল-পাত্রভেদে পার্থক্য আছে। আল্লাহকেও বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ এক। এমন পার্থক্য আল্লাহর কোন কিছুরই না কোন পরিবর্তন না কোন ক্ষতি করে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মানুষ নিজেই বিভ্রান্ত হয়।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে কোরআনে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং মূসা ও ঈসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আরও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমুহ ও অপরাপর সকল নবীগণ যা গ্রহণ করেছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে তৎসমুদয়ের ওপর বিশ্বাসীরা বিশ্বাসী। অপরাপর জাতি-গোষ্ঠী কারা? অপরাপর নবীগণ কারা? কোরআনে তার উল্লেখ নাই। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

"আমি তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা তোমার কাছে বিবৃত করিনি।" (আল-কোরআন ৪০:৭৮)

পৃথিবীতে আরও যেসব ধর্ম রয়েছে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিবর্গ যারা আরবের বাইরে অবস্থান করেছে এবং যারা কেবল ইব্রাহীম (আঃ) এর ধারার নয় তেমনও বার্তাবাহক রয়েছেন। বলাই হচ্ছে যে, 'আমি তোমার পূর্বে অনেক বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি' আবার বলা হয়েছে 'এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সমুহের ওপর'। অতএব আল্লাহর বাণী সর্বত্রই বিভিন্ন বার্তাবাহকগনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে আগমন করেছে এবং সর্বত্র এক আল্লাহর কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ একই বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পূর্বে আমি যেসব বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, দয়াময় ব্যাতিত আমি কি কখনও কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম উপাসনার জন্য?" (আল-কোরআন ৪৩:৪৫)

সমগ্র পৃথিবীতে আজও যেসব মহামানবকে আমরা আল্লাহর বার্তাবাহকরূপে জানিনা বা স্বীকৃতি দেই না সেসব বিষয় নিয়ে সম্ভবত ভাববার অবকাশ আছে।

পূর্বে প্রদর্শিত পথ ধরে বর্তমানের পথ এগিয়ে চলে। যখন যেটি আসে সময়োপযোগী হয়ে আসে। বর্তমান কাজের ওপর পূর্বের কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থাকে। পূর্বতনদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না বা করতে নেই।

সমাজে পূর্বসূরীদের অনেক অনুসারী থাকে। তাদেরকে গ্রহণ করে নেয়া হলে বা তাদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হলে বর্তমানের কাজও সহজ হয়ে যায় অনেকাংশে। পূর্বের অনুসারীদের সহযোগীতা প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। অপ্রয়োজনীয় বৈরীতার অবসান ঘটে। নতুন ধারণার বিতর্কিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

কোরআন এমনিভাবে সকল ভাল কাজের স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণার মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটির সংস্কার সাধন করার চেষ্টা করেছে। নতুন ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। পরিবর্তনকে সমাজ ও মানব মস্তিষ্কে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মতভাবে প্রবেশ করিয়েছে। কোরআনের দিক-নির্দেশনা বিশ্বাসীদেরকে ভূল আচরণ করা থেকে বিরত রেখেছে। পন্থা হিসেবে এগুলি উত্তম পন্থা এবং মানবজাতির জন্য শিক্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। তাই তো কোরআনকে দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ বলা হয়েছে।

পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহে যা কিছু বলা হয়েছে কোরআন সেসবের রেষ টেনে নিজ দর্শনকে উপস্থাপন করেছে। কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সেটি সংশোধন করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত দিক নির্দেশনার একটি ধারাবাহিকতা আছে। একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটি পরিপূর্ণ নয়।

আদম-হাওয়ার ঘটনা, মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াবলী যেগুলি কোরআনে উদ্ধৃত হয়েছে তার সবই এসেছে বাইবেল থেকে। কোরআন পূর্বের গ্রন্থসমুহের ধারণা বা বিবৃতিসমুহকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোরআন পূর্বের গ্রন্থসমুহের কেবল সেসব বিষয়গুলিকে গ্রহণ করেছে বা স্বীকৃতি দিয়েছে যেগুলি বিকৃত হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকেও তা বিশ্বাস করতে নির্দেশনা দিয়েছে। এ আয়াতে সে দিক-নির্দেশনাই উঠে এসেছে। কোরআন যা নির্দেশ করেছে বিশ্বাসীরা তাই বিশ্বাস করে।

■ **২.১৩৬.২** এবং আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের সমর্পন করি (And unto Him we have surrendered) : সেই সত্যিকার মুসলিম বা ধার্মিক যে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পেরেছে। কিন্তু সেটি করতে হলে সমর্পনের জ্ঞান ভেতরে প্রবেশ করতে হবে এবং সেটিকে চালনা করার মতো দক্ষতা থাকতে ও দেখাতে হবে [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]।

সমর্পনের জ্ঞান সত্যের ওপর ভিত্তি করে চলে। কেননা আল্লাহই সত্য। সত্য ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। তাই ন্যায়ের পথ ধরে চলে। কেননা ন্যায্যতাই ভারসাম্য বজায় রাখে। বিশ্বাসীরা তাই আল্লাহতে সমর্পন করে। আল্লাহতে সমর্পনেই শান্তি। কোরআনের এ ঘোষনা বিশ্বাসীদের পথ চলার পাথেয়স্বরুপ এবং ভূল পথে গমনে বাধাস্বরুপ।

■ **২.১৩৭.১** এবং তারা যদি তেমনিভাবে বিশ্বাস করে যেমনিভাবে তোমরা বিশ্বাস কর, তবে তারা সঠিক পথে আছে : এ আলোচনার সূত্রপাত এখান থেকে, 'তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হও তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে।' উত্তরে একজন মুসলিমের পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে পথের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, একজন মুসলিম সকল নবী-রাসূলদের বিশ্বাস করে, কেননা তারা সকলে একই আল্লাহর বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং একই পথ প্রদর্শন করে গেছেন এবং একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পন করে।

অতঃপর যদি ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান কিংবা অপরাপররাও সকল নবী-রাসূলদের বিশ্বাস করে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপরও বিশ্বাস রাখে, যিনি সত্যের বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন এবং নিজেদেরকে তারা আল্লাহর প্রতি সমর্পন করে তবে তারা সঠিক পথেই আছে।

দুটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এক: গোষ্ঠীগত চিন্তা বা পূর্বপুরুষের চিন্তাকে আকড়ে ধরে না থেকে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং দুই: সমর্পন। সেক্ষেত্রে ইহুদি-খ্রীষ্টান কিংবা অন্য যে কোন ধর্মের আচার অনুষ্ঠানই মানুষ পালন করুক না কেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহর কাছে সমর্পনই ধর্মের মূল বার্তা; একমাত্র যেখানে সকল মানুষ সমর্পন করলে অযাচিতভাবে নিয়মের যাঁতাকলে মানুষকে আর পরতে হয় না বা হবে না। এটিই শন্তির পথ। এটিই সহজ-সরল পথ।

উল্লেখ্য যে, অতীব জরুরী বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পালনকৃত কোন নিয়মের কঠোরতা এবং শান্তিপূর্ণ বা স্থিতিশীল অবস্থায় পালনকৃত সে একই নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত একই রকম কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় না। তেমনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ শিক্ষিত সমাজের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম ও স্বল্প শিক্ষিত সমাজের জন্য প্রযোজ্য নিয়মও একরকম হয় নয়। আবার প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনকালীন সময়ের নিয়ম ও তার পূর্বাবস্থার নিয়মও একরকম নয়। তেমনি একটি দর্শনের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বজায় রাখা নিয়মের কঠোরতায় পরবর্তী সময়ে শৈথিল্য বা নমনীয়তা দেখা দিতেই পারে।

ধর্মীয় বিধি-বিধান একটা সময়ে কঠোরভাবে পালন করতে হয়েছে। সৃষ্টিকালীন সময়ের বেদনা সব সময় অধিক হয়ে থাকে। তথাপি শৃংখলার স্বার্থে কখনও কখনও আদর্শ বা নিয়মের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করতে হয়।

অন্তর যার আল্লাহতে সমর্পিত তা সে যে ধর্মের মানুষই হোক না কেন সে সঠিক পথেই আছে। বিধাতায় সমর্পনই সঠিক ধর্ম। এ ধরণের মানুষ ধর্মীয় বিধি-বিধান ও রীতি বা নিয়মের আতিশয্য বা কঠোরতায় অধিক গুরুত্ব না দিলেও সঠিক পথপ্রাপ্ত। বোধসম্পন্ন এমন মানুষ সত্যের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং সে পথ ধরে চলে। তারা অবিবেচক নন এবং অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হন না। বিষয়গুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। তাই বলা হয়েছে,

“বল: হে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! ‘সত্য’ ব্যাতিত কেবল ‘ধর্মের প্রতি’ই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না ...।” (আল-কোরআন ৫:৭৭)

উল্লেখিত আয়াতটি শাশ্বত ও সার্বজনীন। গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও এটি সকলের জন্যই সর্বসময়ে প্রযোজ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। এখানে কেবল ‘ধর্মের প্রতি’ বলতে ধর্মীয় বিবিধ বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে বোঝান হয়েছে। এগুলি ধর্মের মূখ্য বিষয় নয়। মূখ্য বিষয় হচ্ছে ‘সত্য’। ‘সত্য’কে সমুন্নত রাখার জন্যই ধর্মীয় বিধি-বিধান বা প্রতিষ্ঠিত সূত্রসমুহের প্রয়োজনীয়তা।

তাই যে বা যারাই বিশ্বাসীদের মতো সত্যের পথে বা আল্লাহতে সমর্পনের পথে থাকবে তারা সঠিক পথেই আছে বলে বলা হয়েছে। এর ব্যাতিক্রম হলে

বিভ্রান্তিতে আছে বলে বুঝতে হবে। তাই ধর্মের বিষয়ে অর্থাৎ নানান নিয়মের বেড়াজাল নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বারণ করা হয়েছে। সঠিক পথ অবলম্বনকারী বা সমর্পিত মানুষকে তার কাজ ও আচরণ দেখে চেনা যাবে।

■ **২.১৩৭.২** কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা অনমনীয় এবং তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, সবজান্তা : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে আল্লাহতে সমর্পনের পথে আসতে আহবান করা হয়েছে। যদি তারা সে পথ অবলম্বন করে তবে তারা সঠিক পথেই আছে। এমন মানুষেরা মানুষের ক্ষতি করে না। তারা হয় সৎকর্মপরায়ন। তারা ভাল কাজে বাধা দেয় না। কিংবা মন্দ সমালোচনাও করে না। এগুলিই সরল পথ।

আবার মুসলিমরা যেমনিভাবে সকল নবী-রাসূলদের বিশ্বাস করে, ইহুদি-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং অপরাপররাও যদি সকল নবী-রাসূলদের বিশ্বাস করে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপরও বিশ্বাস রাখে, যিনি সত্যের বার্তা নিয়ে আগমন করেছেন এবং নিজেদেরকে তারা আল্লাহর প্রতি সমর্পন করে তবে তারা সঠিক পথেই আছে বলে মনে করতে হবে।

বলা হচ্ছে যদি তারা আল্লাহতে সমর্পনের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা সরল পথ বা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। তারা অনমনীয় এবং জাগতিক নানান দোষে দুষ্ট। এমন মানুষেরা যে কোন প্রকার মন্দ কাজ ও পরিকল্পনা করতে পারে।

মহানবীর বিপক্ষে কোন প্রকার মন্দ পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র করা হলে বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ যথাসময়ে ব্যাবস্থা নেবেন। আল্লাহ শ্রবণকারী, সবজান্তা [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। তিনি সব জানেন। তাই বলা হয়েছে, তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে তিনিই যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন বা দেবেন।

এসব বাণী বিশ্বাসীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। তাদেরকে সাহস জুগিয়েছে। তৎকালীন বিরোধীতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যা ছিল প্রয়োজনীয়।

■ **২.১৩৮.১** আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে : আল্লাহর কি কোন রং আছে? বস্তুত

শাব্দিক অর্থে সব কিছুর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলে সঠিকভাবে কোরআনের অর্থ বোঝা সম্ভব হবে না।

এটি রূপক অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে। একটি পবিত্র স্নান করার মধ্য দিয়ে সকল পাপ ধুয়ে-মুছে পাপহীন হয়ে, একটি ভিন্ন পবিত্র রূপ বা রং ধারণ করার প্রচলন ছিল ইহুদি 'জুডাইজম' ও খ্রীষ্টানদের 'ব্যাপ্টিইজম' এর মধ্যে। এক সময় এগুলি এমন সামাজিক নিয়ম-রীতিতে পরিণত হয়ে যায় যা থেকে উত্তরণ কঠিন হয়ে পড়ে। সত্য ও ন্যায় পথে চলার বা সহজ-সরল পথে চলার চর্চা পরিহার করে সমাজে নানান নিয়মের বোঝা একটির পর একটি এভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়। সমাজে এসব নিয়মের পরিপালনকে কেন্দ্র করে ভাল-মন্দ, সামাজিক মান-মর্যাদা ইত্যাদির মান নির্ধারণ করা শুরু হয়। এগুলি বিশেষত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দুর্বলচিত্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। তারা সঠিকভাবে ধর্মকে বুঝতে পারে না। ভূল পথে চালিত হয়। এসবকে কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থকে হাসিল করে। সমাজের মানুষ যুগের পর যুগ ধরে এসব নিয়মের যাঁতাকলে এমনভাবে বাধা পরে যায় যে এগুলি থেকে আর বের হয়ে আসতে পারে না।

বস্তুত আত্মার মুক্তির জন্য এসব নিয়মের আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এসবের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি পরিপালনের ওপর নির্ভর করে ভাল-মন্দ কিছুই নির্ধারণ হয় না। কোরআন সে বার্তা দেয়। তাই কোরআন সত্য বার্তা আনয়নকারী। মানুষকে সত্যের পথে চলতে হবে। ন্যায়ের পথে চলতে হবে। যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেছেন। কোরআনের যথাযথ অধ্যায়নের মাধ্যমে বিষয়গুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, সহজ-সরল পথে চলা, আল্লাহর প্রতি সমর্পনের পথে চলার রূপকেই এখানে 'আল্লাহর রং' ধারণ করা নামে অভিহিত করা হয়েছে। যে রংটি হচ্ছে 'স্বচ্ছ' ও কলুষতা মুক্ত। 'জুডাইজম' বা 'ব্যাপ্টিইজম' এর রং ধারণ করার বিপরীতে বিশ্বাসীদের জন্য কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

■ **২.১৩৮.২** আমরা তাঁরই উপাসনাকারী (We are His worshippers) : সত্যিকার বিশ্বাসীরা কেবলমাত্র আল্লাহরই উপাসনাকারী। এখানে আল্লাহর উপাসনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উদ্ধৃত করার বিশেষ কারণ আছে।

একটা সময়ে ধর্মের মধ্যে নানা প্রকারের বিধি-রীতি পরিপালনের প্রচলন শুরু হয়। যার অনেক কিছুই আল্লাহ নির্দেশিত নয়। সাধারণ মানুষ সেসবকেই ধর্মের মূল বিষয়রূপে বিবেচনা করতে শুরু করে। স্বর্গ পাওয়ার মিথ্যে আশায় কঠোরভাবে এসব নিয়ম পরিপালনে অধিকতর যত্নশীল হয়। এমনকি মূল বিষয় আল্লাহর উপাসনাকেও ভূলে যেতে বসে।

ভূলভাবে প্রতিষ্ঠা করা এসব বিবিধ নিয়ম-রীতির পরিপালনকেই ধর্মপালন ও প্রকৃত আরাধনা মনে করা হয়। এখানে সে বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, গুরুত্বহীন এসব বিষয় নয় বরং জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ ও সত্যিকার বিশ্বাসীরা কেবলমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করে। তারা তাতেই গুরুত্ব দেয় এবং এতেই যত্নশীল।

আল্লাহকে ভূলে এসব নিয়ম-বিধি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কিছু বাস্তব কারণও আছে। অন্যতম কারণ হচ্ছে আয়-উপার্জনের বিষয়টি। চতুর লোকেরা ধর্মের মধ্যে নানাবিধ জটিল নিয়ম প্রবর্তন করে। বিষয়গুলিকে অতি উচ্চ মাত্রায় তুলে ধরে। যত্নের সাথে সেসবকে লালন-পালন করে। কিছুলোক এসব কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। তারা এভাবে অর্থ উপার্জন করে। বিষয়গুলি এক পর্যায়ে 'শিরক' এর মতো প্রতিষ্ঠা পায়।

সুবিধাভোগীরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসব বিষয়কে প্রবেশ করিয়ে দেয়। দুর্বলচিত্ত মানুষ ও ধর্মের বিষয়ে যাদের সত্যিকারের জ্ঞান নেই, যারা অন্যের দেখান পথে ধর্মীয় বিষয়গুলিতে নির্ভর করে তারা এ পথে পা দেয়। এদের সংখ্যা বেশী। ফলে সাধারণভাবে এদের পালিত নিয়ম-রীতিকেই ধর্ম মনে করা হয়। কিন্তু সত্যিকার বোধসম্পন্ন বিশ্বাসীরা এসবে নয়, বরং তারা আল্লাহকেই উপাসনা করে। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বর্গ সুখভোগ, উচ্চ বংশে জন্মলাভ, ক্ষমতা লাভ বেদের ইত্যাকার অলংকৃত ও চমৎকৃত কথায় অনেক বেশী আসক্ত। ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও ঐশ্বর্য্যশীল জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা মনে করে যে, এর চেয়ে

আর বেশী কিছু নাই– এগুলিকেই তারা জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করে। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও বস্তুগত ঐশ্বর্য্যের প্রতি খুব বেশী আসক্ত এবং যারা এসবের কারণে বিভ্রান্ত, ভগবানের প্রতি ভক্তিতে তাদের একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা আসে না।” (গীতা ২:৪২-৪৪)

▪ **২.১৩৯.১** বল: তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিবাদ কর, যখন তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা : বস্তুত সকলেই একজনকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা মনে করে। কিন্তু সে একজনকেই এক একজন এক এক নামে ডাকে। আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড ইত্যাদি।

আল্লাহকে পাওয়াই যেমন বিশ্বাসীদের লক্ষ্য তেমনি অপরাপরদেরও লক্ষ্য। সকলেই আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বরকে পাওয়ার বাসনা রাখে। অথচ তাঁর বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কেউই কিছু জানে না। আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করা তাই এক অর্থে অজ্ঞতা বা মূর্খতা। তাই বলা হয়েছে যে, “তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে বিবাদ কর, যখন তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা?”

আল্লাহকে নিয়ে বিবাদ করার বিষয়টি আবার জ্ঞানপ্রসূত হয়ে যায় তখন, যখন কেউ স্বার্থের কারণে তেমনটি করে। কেননা তখন আল্লাহকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করে। যা গর্হিত কাজরূপে বিবেচিত।

▪ **২.১৩৯.২** আমাদের জন্য আমাদের কাজ, তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ (Ours are our works and yours your works) : বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে আল্লাহকে সন্ধান করে চলেছে। সকলেই নিজের পথটিকে সঠিক বলে দাবী করে। ফলে যে যা করছে বা করতে চাচ্ছে তাকে তার মতো করতে দেয়া ভাল। কেননা অজানা কোন বিষয় নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বিবাদ করা এক প্রকার অজ্ঞতা বা মূর্খতা।

তাই বলা হয়েছে, ‘আমাদের জন্য আমাদের কাজ, তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ’। যার যার কর্মের জন্য প্রত্যেকে নিজেই দায়ী থাকবে। এতদ্বসত্ত্বেও সঠিক বার্তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। তাই নিজ নিজ দর্শনের প্রচার-প্রচারণা করার অধিকার সকলেরই আছে। নিজ নিজ ধর্ম

পালনেরও অধিকার সকলের আছে; তবে বিবাদ নয়। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা।

ইসলামের আবির্ভাবকালে পরিবেশ এমনও ছিল যে বিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের মতো করে উপাসনাও পালন করতে পারত না। অবিশ্বাসীরা বাধা দিত। ইসলামের বাণী প্রচার করতে গিয়েও বিশ্বাসীদেরকে নানামুখী বাধা ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

আল্লাহর রাজ্যে প্রতির্ষ্ঠিত যথাযথ নিয়মের বিষয়টি তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও এবং তোমরা তোমাদের কাজ কর। আমরা আল্লাহর বাণী প্রচার করি। গ্রহণ-বর্জনের বিবেচনার ভার মানুষের নিজেদের এবং ভূল-ভ্রান্তি বিচারের ভার আল্লাহর। অতএব বিবাদ-বিসম্বাদ নয়।

ভাল কাজ করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিবাদ পরিহার করে চলার দিক-নির্দেশনাও এগুলি। যা কিনা মানুষকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত করে দিতে পারে। অতএব যথা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিহার করে চলতে হবে। এগুলি সার্বজনীন ও শাশ্বত দিক-নির্দেশনা।

যদিও এখানে তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইহুদি-খ্রীষ্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে, তথাপি এ বাণী একই প্রকারের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য একটি দিক-নির্দেশনা।

প্রত্যেককেই তার নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো চলতে দেয়া বা কাজ করতে দেয়া উত্তম, যদি না তা নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিকর ও সাংঘর্ষিক হয়। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ অবশ্যই পরিহার্য্য। তবে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। গ্রহণ করা না করা প্রত্যেকের নিজের বা সমাজের মানুষের নিজেদের বিবেচনার বিষয়। এটি সকলের জন্যই মঙ্গলকর ও চলার উত্তম পথ। এক্ষেত্রে কোরআন মানবজাতিকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদর্শন করেছে।

■ **২.১৩৯.৩** আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ (We look to Him alone) : বিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রতিই একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করে। অন্য কিছুতে নয়। না মূর্তীতে, না আল্লাহকে পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র কোন আচার-অনুষ্ঠানে। এখানে সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। বিষয়টি এখানে এভাবে কেবল

প্রকাশ করা হয়েছে তাই নয়। এটি দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে একটি যথাযথ দিক-নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসীরা জানতে ও বুঝতে পেরেছে যে, অন্য কিছুতে নয় বরং আল্লাহতেই মনোনিবেশ করতে হবে। যারা অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করে আল্লাহর বিষয়ে তাদের একনিষ্ঠতা থাকে না বা আসে না। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বর্গ সুখভোগ, উচ্চ বংশে জন্মলাভ, ক্ষমতা লাভ বেদের ইত্যাকার অলংকৃত ও চমৎকৃত কথায় অনেক বেশী আসক্ত। ... যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও বস্তুগত ঐশ্বর্য্যের প্রতি খুব বেশী আসক্ত এবং যারা এসবের কারণে বিভ্রান্ত (কেবল তারাই বিবিধ দেব-দেবী বা প্রতীকী মূর্তীর উপাসনা করে), ভগবানের প্রতি ভক্তিতে তাদের একাগ্রতা বা একনির্ষ্ঠতা আসে না।" (গীতা ২:৪২-৪৪)

■ **২.১৪০.১** তোমরা কি বল যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল? বল: এ বিষয়ে তোমরা ভাল জান না আল্লাহ : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ধারণা যে সকল নবী-রাসূলগনই ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল। বিশেষত তাদের জ্ঞাণী-গুণীজন, ধর্মীয় বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাদানকারীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে এরকম ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মনে করে যে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টানরাই কেবল সঠিক পথে আছে। তাদের পালনকৃত নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান অবশ্য পালনীয়। অন্যথায় মুক্তি নেই।

সত্য হচ্ছে, ইহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্ম এবং তাদের প্রচলিত ধর্মীয় নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান আয়াতে যেসব নবীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের আগমনের অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে পূর্বসূরীরা কি তবে ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল? বলা হচ্ছে যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (জ্যাকব বা ইসরাইল) এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান ছিল না। এসব ধর্ম তাদের অনেক পরে উদ্ভব হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, 'এ বিষয়ে তোমরা ভাল জান না আল্লাহ?' অর্থাৎ সঠিক ধর্ম কোনটি সেটি তোমরা ভাল জান না আল্লাহ ভাল জানেন। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বিষয়টি মানবসমাজে স্বচ্ছভাবে তুলে ধরেছেন। সমর্পনই হচ্ছে সত্যিকার ধর্ম বা চলার সঠিক রাস্তা।

বস্তুত ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান কিংবা অপরাপর বিবিধ নামের ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষ বিদ্যমান ছিল এবং তাদের অনেকেই সৎকর্মপরায়ন ও আল্লাহর সুদৃষ্টিতে ছিল। ইহুদি-খ্রীষ্টান কিংবা অপর যে কোন নামের ধর্মের অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি সত্যের বিচারে অতি গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব প্রচলিত ধারা বা নির্দিষ্ট ধর্মের ছকে পালনকৃত বিধি-বিধানই কেবল মুক্তির একমাত্র পথ নয়। মানুষকে সৎকর্মপরায়ন হতে হবে।

বলা হচ্ছে, "কে ইব্রাহীমের ধর্ম (দ্বীন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে ব্যাতিত যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে? .. যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন: 'সমর্পন' কর! সে বলল: আমি বিশ্বসমুহের প্রতিপালকের নিকট নিজেকে 'সমর্পন' করলাম। .. ইব্রাহীম তার সন্তানদের একই নির্দেশনা দিয়েছিল এবং ইয়াকুবও (জ্যাকব বা ইসরাইলও) বলেছিল: হে আমার পুত্রগন! নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের জন্য এক (সত্য) ধর্মকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে (আল্লাহতে) 'সমর্পন' না করে মৃত্যুবরণ কর না।" (আল-কোরআন ২:১৩০-১৩২)

ইব্রাহীমের (আঃ) এর ধর্মটি কি? সমর্পনই হচ্ছে ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীন বা চলার পথের ধারা। অত্যান্ত গুরুত্বের সঙ্গে পূর্বের আয়াতসমুহে এ বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে এ বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হতে বলা হয়েছে। বিশ্বাসীদের জন্য এ পথই নির্ধারণ করা হয়েছে। কোরআন সে বার্তা স্পষ্টভাবে মানবসমাজে তুলে ধরেছে। তাই বলা হয়েছে, 'আমরা অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা সমুন্নত।'

জগতের সকল মানুষের জন্য নির্ধারিত একমাত্র ধর্ম হচ্ছে আল্লাহতে সমর্পন (Surrender)। এটিই সকল মানুষের জন্য মনোনীত একমাত্র সঠিক ধর্ম। এ পথকেই ইসলামের পথ বলা হয়। এটিই শান্তির পথ। চিরন্তন সত্য ধর্ম। বস্তুত মানুষের ধর্ম একটাই। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম এক জাতি (মানবজাতি)/এক ধর্ম (ইসলাম/সমর্পন) ... কিন্তু মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। অতএব তাদেরকে

তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছুকালের জন্য।” (আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৪)

▪ **২.১৪০.২** তার চাইতে অধিক অন্যায়কারী আর কে হতে পারে যে সাক্ষ্য-প্রমাণকে গোপন করে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছে : সাধারণ মানুষের মাঝে যারা ভূল বার্তা ছড়ায়, যারা ভূলভাবে ধর্মীয় বিষয়সমুহের ব্যাখ্যাদান করে এবং ভূল পথে মানুষকে চালিত করে এমন মন্দ কাজের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। দেখা যায় মানুষ যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি পেরিয়ে গেলেও এমন ভূলের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। সমাজে কোন অযাচিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে মানুষ সে ভূলের আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। এগুলি দুর করা সহজ কাজ নয়।

সহজ-সরল ধর্মের মধ্যে যারা নিয়মের এমন বেড়াজাল সৃষ্টি করে তাদের চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে হতে পারে? এমন মানুষদের অনেকেই সত্যটি যে জানে না এমন নয়। তারা জানে যে নিয়মের এ আতিশয্যই প্রকৃত ধর্ম নয়। তারা জেনে-বুঝেও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এমন কাজ করে। অর্থাৎ তারা সত্য গোপন করে।

ইসরাইলের সন্তান তথা ইহুদিদের মধ্যে যারা জ্ঞানী-গুনী হিসেবে পরিচিত তারা নিজেরাও জানে যে জুডাইজম, খ্রীশ্চিয়ানিটি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ধর্মীয় রিতি-নীতির নামে যা আবির্ভূত হয়েছে, সেগুলি তাদের সন্মানিত নবীগণের তিরোধানের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছে। তথাপি তারা তাদের সাধারণ মানুষদের এমন ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে সত্য ও মুক্তির একমাত্র পথ যেন তাদের পালিত ও প্রদর্শিত রীতি-নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অথচ এসব রীতি-নীতি তাদের নবীগণের অনেক পরে তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছে।

ইসহাক নবী, ইয়াকুব নবী এমনকি ইব্রাহীম (আঃ) কেউই ইহুদি, খ্রীষ্টান এমন কোন ধারার মধ্যে ছিল না। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ন। কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে সমর্পিত এবং তারা শিরক করত না। তাদের নিজেদের গ্রন্থেও এসব সত্য বার্তা আছে যা আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তারা সেগুলি জানে। কিন্তু

তারা সেসব সত্য বা সাক্ষ্য গোপন করে। ওপরে তাই বলা হয়েছে এরা ভূল পথগামী, অন্যায়কারী।

সকল ধর্মেই ধর্মের বাণী নিয়ে আজও কিছু মানুষ নানান সমাজে এমন কাজ করে চলেছে। যদিও তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কোরআনের এ বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন। তেমন প্রকৃতির সকল মানুষদের জন্যই এ বাণী প্রযোজ্য তা সে যে ধর্মেই অবস্থান করুক না কেন।

▪ **২.১৪০.৩** তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন (Allah is not unaware of what ye do) : এর অর্থ হচ্ছে, যারা অন্যায় বা ভূল কাজ করবে, সাক্ষ্য-প্রমাণ গোপন তথা সত্যকে ধামাচাপা দেবে বা দেয়ার চেষ্টা করবে তারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে। কেননা আল্লাহ সব দেখেন, শোনেন ও জানেন। সকলকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে [দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]।

▪ **২.১৪১** তারা ছিল এক সম্প্রদায় যারা গত হয়ে গেছে। ... তারা কি করত সে বিষয়ে তোমরা কখনই জিজ্ঞাসিত হবে না : দ্রষ্টব্য ২.১৩৪।

➢ (আয়াত ১৪২-১৫২) এ পর্যায়ে কেবলা (Qiblah) পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি মানবজাতির ওপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব বা নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রতি একটি ইংগিতবহরূপেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

১৪২	যারা অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা বলবে: কি বিষয় বিশ্বাসীদেরকে ফিরিয়ে নিল তাদের সেই কেবলা থেকে (মসজিদ আল-আকসা/বাইতুল মুকাদ্দাস, জেরুজালেম) যা তারা পূর্বে অনুসরণ করত? বল: পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (The foolish of the people will say: What hath turned them from the qiblah which they formerly observed? Say: Unto Allah belong the East and the West. He guideth whom He will unto a straight path.)

১৪৩	এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি, যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ ও বার্তাবাহক সাক্ষীস্বরূপ হয় তোমাদের জন্য এবং আমি এজন্যই কেবলা পুনঃ নির্ধারণ করেছিলাম যা তোমরা পূর্বে অনুসরণ করতে, যেন আমি জানতে পারি কে বার্তাবাহককে অনুসরণ করছে এবং কে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সত্যি বলতে এটি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা, তাদের ব্যাতিত যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এটি আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে নিরর্থক করে দেবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত স্নেহশীল, করুণাময়। (Thus We have appointed you a middle nation, that ye may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you. And We appointed the qiblah which ye formerly observed only that We might know him who followeth the messenger, from him who turneth on his heels. In truth it was a hard (test) save for those whom Allah guided. But it was not Allah's purpose that your faith should be in vain, for Allah is Full of Pity, Merciful towards mankind.)
১৪৪	নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে (দিক নির্দেশনার প্রত্যাশায়) উর্ধ্বপানে তাকাতে দেখি। অতএব অবশ্যই এবার আমি তোমাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যেটি তোমার কাছে অধিক প্রিয়। অতএব তুমি উপাসনার পবিত্রতম স্থানের দিকে (কা'বা, মক্কা অভিমুখে) মুখ ফেরাও এবং (হে মুসলিম সম্প্রদায়) তোমরা যেখানেই থাক না কেন (যখন তোমরা উপাসনায় রত হও) এদিকেই মুখ ফেরাও। যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে (আহলে-কিতাব) তারা অবশ্যই জানে যে এটি পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) ও সত্য। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। (We have seen the turning of thy face to heaven (for guidance, O Muhammad). And now verily We shall make thee turn (in prayer) toward a qiblah

	which is dear to thee. So turn thy face toward the Inviolable Place of Worship, and ye (O Muslims), wheresoever ye may be, turn your faces (when ye pray) toward it. Lo! Those who have received the Scripture know that (this revelation) is the Truth from their Lord. And Allah is not unaware of what they do.)
১৪৫	যদি তুমি গ্রন্থপ্রাপ্ত (ইহুদি ও খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়ের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন কর, তবুও তারা তোমার কেবলা অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও। তারাও একে অন্যের কেবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয়ই! তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (And even if thou broughtest unto those who have received the Scripture all kinds of portents, they would not follow thy qiblah, nor canst thou be a follower of their qiblah; nor are some of them followers of the qiblah of others. And if thou shouldst follow their desires after the knowledge which hath come unto thee, then surely wert thou of the evil-doers.)
১৪৬	যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা তাকে (নতুন কেবলাকে) তেমনিভাবে চেনে-জানে, যেমনিভাবে চেনে-জানে তাদের সন্তানদেরকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। (Those unto whom We gave the Scripture recognise (this revelation) as they recognise their sons. But lo! a party of them knowingly conceal the truth.)
১৪৭	সত্য তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে প্রেরীত (হে মোহাম্মদ)। অতএব তুমি (এ বিষয়ে) সন্দিহান হয়ো না। (It is the Truth from thy Lord (O Muhammad), so be not thou of those who waver.)

১৪৮	প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে (উপাসনার জন্য)। অতএব একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর ভাল কাজে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (And each one hath a goal toward which he turneth; so vie with one another in good works. Wheresoever ye may be, Allah will bring you all together. Lo! Allah is Able to do all things.)
১৪৯	যে স্থান থেকেই তুমি উপাসনার জন্য আস না কেন, তোমার মুখ ফেরাও উপাসনার পবিত্রতম স্থানের (মসজিদুল হারামের) দিকে। এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সত্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নন। (And whencesoever thou comest forth (for prayer, O Muhammad) turn thy face toward the Inviolable Place of Worship. Lo! it is the Truth from thy Lord. Allah is not unaware of what ye do.)
১৫০	তোমরা উপাসনার জন্য যেখান থেকেই আস না কেন মুখ ফেরাও মসজিদুল হারামের দিকে এবং তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন এদিকেই মুখ ফেরাও, যেন এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ না থাকে, তাদের ব্যাতিত যারা অন্যায় করে- তাদের ভয় কর না, ভয় কর আমাকে! যেন আমি তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই, ফলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার, (Whencesoever thou comest forth turn thy face toward the Inviolable Place of Worship; and wheresoever ye may be (O Muslims) turn your faces toward it (when ye pray) so that men may have no argument against you, save such of them as do injustice - Fear them not, but fear Me! - and so that I may complete My grace upon you, and that ye may be guided.)
১৫১	যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন বার্তাবাহক

	প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে এবং তোমাদের বিকাশ এবং শিক্ষা দান করে অবতীর্ণ গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে এবং শিক্ষা দেয় এমন সব বিষয়ে যা তোমরা জানতে না। (Even as We have sent unto you a messenger from among you, who reciteth unto you Our revelations and causeth you to grow, and teacheth you the Scripture and wisdom, and teacheth you that which ye knew not.)
১৫২	অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর না। (Therefore remember Me, I will remember you. Give thanks to Me, and reject not Me.)

▪ **২.১৪২.১** যারা অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা বলবে: কি বিষয় বিশ্বাসীদেরকে ফিরিয়ে নিল তাদের সেই কেবলা থেকে যা তারা পূর্বে অনুসরণ করত : মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পরেও মহানবী (সাঃ) প্রায় ১৬-১৭ মাস উপাসনাকালীন সময়ে মসজিদ আল-আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস যা জেরুজালেমে অবস্থিত, সেদিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। যেটি ছিল ইহুদিদের কেবলা। ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দিকে এটি মুসলমানদেরও কেবলা ছিল এবং এতে মদীনার ইহুদিরাও সন্তুষ্ট ছিল।

পরবর্তীতে মহানবী (সাঃ) উপাসনাকালীন সময়ে কা'বার দিকে মুখ ফেরাবার জন্য নির্দেশনা পান। এতে বিশেষত ইহুদিরা এ সিদ্ধান্তের বিরূপ সমালোচনা শুরু করে। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "যারা অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা বলবে: কি বিষয় বিশ্বাসীদের ফিরিয়ে নিল তাদের সেই কেবলা থেকে যা তারা পূর্বে অনুসরণ করত?"

আল্লাহ যখন কোন নির্দেশনা দেন তখন সে নির্দেশনা প্রদানের পেছনে কোন কারণ নিহিত থাকে। কিন্তু যারা সেটি অনুধাবনে সক্ষম নয় তারা না বুঝে তার বিরূপ সমালোচনা করে। কেবলা পরিবর্তনের পেছনেও কারণ নিহিত ছিল যা অনেকের কাছেই বোধগম্য ছিল না। এখানে সে কথা ব্যাক্ত করা হয়েছে।

■ **২.১৪২.২** বল: পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর (Say: Unto Allah belong the East and the West) : কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। তৎকালীন সময়ে এমনকি আজও এমন বিষয় হালকাভাবে নেয়ার মতো নয়। কেননা এর সাথে মানুষের অন্তরের দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, ভক্তি-ভালবাসা, দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ততা, পুর্ব-পুরুষের স্মৃতি ও পদাংক অনুসরণের মতো আবেগীয় বিষয়সমুহ জড়িত থাকে।

কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি কেবলার অনুসারীদের আবেগকে ভীষনভাবে এবং নেতিবাচকভাবে নাড়া দেয়ার মতো একটি বিষয় ছিল। এটি বিশৃংখলা সৃষ্টিরও একটি কারণ হয়ে দাড়াবার মতো বিষয় ছিল। এমনকি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিভিন্নজন নিজেদের মতামত ব্যাক্ত করতে চাইতে পারে। আবার বিষয়টি বিরুদ্ধবাদী বা ষড়যন্ত্রকারীদের বিরূপ কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। নতুন দর্শনে মানুষকে আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার ক্ষেত্রে কেবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।

এ বিষয়ে যেন মানুষের মনে কোন প্রকার ভূল বোঝার বা বোঝাবার অবকাশ না থাকে তাই সত্য প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি এমন নয় যে আল্লাহ কেবলমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র কেবলার দিকেই অবস্থান করেন এবং সে কারণে সেদিকেই মুখ ফেরাতে হবে বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ বিরাজ করেন সর্বত্র (দ্রষ্টব্য ২.১১৫.১)। যেদিকেই মুখ ফেরান হবে সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। এটিই সত্য।

কেবলমাত্র আবেগ দিয়ে নয়, কঠিন হলেও মানুষকে বাস্তব সত্যকে জানতে, বুঝতে ও মানতে হবে। ফলে উপাসনাকালে কোনদিকে মুখ করা হল সেটি আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং এর সাথে ধর্মের বা মানব জীবনের লাভ-ক্ষতি কিংবা স্বর্গ-নরক প্রাপ্তিরও কোন সম্পর্ক নেই। মানব জীবনের ভাল-মন্দ বা লাভ-ক্ষতি বস্তুত কর্মের সাথে সম্পর্কিত।

তবে শৃংখলার প্রয়োজনে কিছু নিয়মেরও প্রয়োজন আছে এটিও সত্য। তাই একটি কেবলারও প্রয়োজন আছে। সে কারণে প্রত্যেকেই একটি কেবলা অনুসরণ করে। যেমন বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে' (২:১৪৮)। সেটি যে কোন দিকেই হতে পারে।

একেক সম্প্রদায়ের কেবলা একেক দিকে হওয়া সত্ত্বেও সৎ কর্মপরায়ন ব্যাক্তির আল্লাহকে পেতে কোন সমস্যা হয় না। কেবলা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের মধ্যে শৃংখলা তৈরীতে ভূমিকা রাখে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। সকলকে একই নিয়মে আবদ্ধ করে। তাদেরকে একতাবদ্ধ রাখতে ভূমিকা রাখে এবং এগুলি সবই মানসিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

কেবলা কোন দিকে হবে সেটি কে নির্ধারণ করবে? কোন মানুষের দ্বারা কেবলা নির্ধারণ করা হলে সেটি বিতর্কের সৃষ্টি করবে। এ বিষয়ে যেন কোন প্রকার বিতর্কের সৃষ্টি না হয় তাই সে নির্দেশনা এসেছে আল্লাহর দিক থেকে। এটিই কোন একটি বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সবচাইতে উত্তম নিয়ম বা মাধ্যম এবং এখানেও তার ব্যাত্যয় হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য কোন নিয়ম এবং সত্য এক বিষয় নয়। সমাজে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য অনেক নিয়ম আছে বা থাকে যা ভূল। তবুও কিছু মানুষ ভক্তি সহকারে সেগুলি পালন করে এবং সেগুলিকেই সত্য বলে জানে ও আবেগ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু সত্য হচ্ছে ভিন্ন বিষয়! সত্যকে বুঝতে হলে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যেটি সাধারণ সকল মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহ যেমনটি নির্দেশ করেন সেটিই পালনীয়। তিনি সব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

কেবলা পরিবর্তনের কারণে ধর্মের কিংবা মানব জীবনের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়নি। এটিই সত্য। সত্য বার্তাটি এখানে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, 'পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর'।

কোরআন মানুষের মনে বদ্ধ হয়ে থাকা কোন অতি ভক্তি বা অতি ভালবাসাজনিত কোন বিষয়কে প্রয়োজনে ছিন্ন বা উৎসর্গ করতেও এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছে। প্রয়োজন সাপেক্ষে সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আবেগী বিষয়ের ভিত্তিমূলে কখনও কুঠারাঘাত করতে হয় এবং মানুষকে সে সাহস দেখাতে হয় বা সে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হয় বা নিতে বিচলিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়, এটি মানুষকে সে শিক্ষাও দেয়। যেমন ইসারইল জাতিকে মুসা (আঃ) গরু কুরবানী দিতে বলেছিলেন (দ্রষ্টব্য ২:৬৭-৭১)।

মানুষ যদি এসব পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে না পারে তবে মূর্তী পূঁজা কিংবা কোন মহামানবকে আল্লাহসম বা আল্লাহর পুত্রসম গণ্য করাকে মন থেকে কিভাবে দুর করতে পারবে? সেটিও করতে পারবে না।

অনেক ভূল ধারণার অবসানকল্পে কোরআন মানুষকে তাই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছে। যেসব ভূল ধারণা মানুষের মন থেকে দুর করা সহজসাধ্য ছিল না। কেবল কেবলাজনিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজে বিরাজমান নানান কুসংস্কার ও অনেক ভূল ধারণা ও বিশ্বাসও মানুষের মধ্যে বাসা বেধে ছিল যেগুলি দুর করা কষ্টসাধ্য ছিল। এমনকি আজও মানবসমাজ নানান আবেগীয় কুসংস্কার থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি। কোরআন সকল ক্ষেত্রেই সত্যকে তুলে ধরে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়ে এসেছে।

কিছু যুগান্তকারী ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ মানুষের ভূল ধারণাকে ভাঙ্গতে বিরাট ভূমিকা রাখে। যারা কেবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিরুপ সমালোচনা করে তাদের যুক্তি ও ধারণা যে ভূল এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। অতএব তাঁকে সেজদা করার জন্য প্রকৃতই কোন নির্দিষ্ট দিকের প্রয়োজন নেই। এটিই সত্য।

অধিক মানুষের ব্যাবস্থাপনা ও শৃংখলার প্রয়োজনে একটি নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটিও বাস্তবতা। তবে এর সাথে ধর্মের বা ভাল-মন্দ প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়টিও বুঝতে হবে। তৎকালীন সম্ভাব্য বিশৃংখল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দিক-নির্দেশনামূলক এ বাণীর অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

▪ **২.১৪২.৩** তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন (He guideth whom He will unto a straight path) : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশনার বিষয়টি ছিল অত্যান্ত স্পর্শকাতর বিষয়। অতএব স্বাভাবতই দেখা যেতে পারে যে নির্দেশনাটি কেউ মেনে চলছে, আবার কেউ মন থেকে মেনে নিতে পারছে না, কিংবা কেউ একেবারেই উপেক্ষা করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে সঠিক পথে চলবে এবং কে সে নির্দেশনা মেনে চলতে পারবে না?

বলা হচ্ছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক-সরল পথে পরিচালনা করেন। অতএব আল্লাহ যদি কাউকে সরল পথে পরিচালিত করতে চান তবে সেই আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলবে। এ কথার অন্তর্নিহিতে এটিও বোঝা যায় যে আল্লাহ না চাইলে কেউই সরল পথে চলতে পারবে না। ভূল পথে চলবে।

মানুষের চালক হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহই মানুষকে সৎ পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেন আবার ভূল পথে চলতেও প্ররোচিত করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহই যদি মানুষকে সঠিক এবং ভূল পথেও চালনা করেন তবে মানুষের দোষ কোথায়? কর্মের কারণে মানুষ দোষী হবে কেন?

'আল্লাহর ইচ্ছে' বিষয়টি বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ যদি কোন কিছু চান বা ইচ্ছে করেন তবে অন্তরে তাঁর অনুকূল অনুগ্রহ নেমে আসে। মানুষ সহজেই সে পথ ধরে চলতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যদি না চান তবে ভেতরে গোমরাহীর ভাব আসে। তখন মানুষ চলতে পারে না। নিজেই নিজের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। অতএব সঠিক-সরল পথে চলতে হলেও ভেতরে আল্লাহর অনুকুল ইচ্ছে ও অনুগ্রহ লাগবে। ভেতরে সে ইচ্ছে জাগ্রত হতে হবে। ভেতর থেকে জাগ্রত হওয়া মানুষের এ ইচ্ছের সাথেই 'আল্লাহর ইচ্ছে'র বিষয়টি সম্পর্কিত [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ১.৫, ২.২১২.২, ২.২১৩.২, ২.২৪৭.৩, ২.২৫৩.৩, ২.২৬১.২, ২.২৮৪.৩, ২.২৮৬.২]।

সাধারণভাবে বিষয়টিকে আমরা 'নিজের ইচ্ছে' এভাবে বুঝে থাকি! কিন্তু আল্লাহই হচ্ছেন জীবনের উৎস! আল্লাহ ভিন্ন মানুষের কোন অস্তিত্ব নেই। পরমের সাথে মানুষের একটি সংযোগ আছে। ফলে যা কিছু নিজের তার সবই বস্তুত আল্লাহর! ইচ্ছেটিও আল্লাহর। চলার শক্তির উৎস তিনি। যে যে পথে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সে পথে চলতে সহায়তা করেন। বুঝতে হবে যে, মানুষ ইচ্ছে করলেও তিনি সর্বশেষ অনুমোদন দাতা। তার অনুমোদন ভিন্ন চলা সম্ভব নয়। তাই বলা হয় যে, তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন, যাকে ইচ্ছে ভূল পথে চালনা করেন।

বস্তুত আল্লাহ মানুষকে জানেন। তার অতীত কর্ম জানেন। ভবিষ্যতে সে কোনদিকে চলেছে সেটিও তিনি জানেন। বর্তমানেও তার অভিপ্রায় কি তিনি তাও জানেন। তিনি মানুষের অন্তরের অতি গোপন ভাবনাকেও জানেন। তার নিয়ত জানেন। মানুষ নিজে তার সম্পর্কে যা জানে আল্লাহ তার সবই জানেন।

বস্তুত ভেতরে তিনিই বিরাজ করে। তাই বলা হয়েছে, তোমরা যা শোন প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে (দ্রষ্টব্য ১০:৩১)?

আল্লাহ মানুষের কর্ম, আচরণ, নিয়ত সবকিছু জানেন বিধায় যার জন্য যেটি প্রযোজ্য তার ভেতরে তেমন ইচ্ছে জাগ্রত করে দেন। তিনি কারও জন্য সরল পথে চলার ইচ্ছে জাগ্রত করে দিতে পারেন, আবার গোমরাহী সৃষ্টি করে দিয়ে তার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারেন। যাকে তিনি ভূল পথে চালনা করেন তার কোন রক্ষাকর্তা নেই।

মন্দ বা ভূলপথগামী ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সঠিক পথে ফিরে এলে তাকে তিনি সঠিক-সরল পথেই নিয়ে যান। মানুষের নিজ ইচ্ছে বা নিয়তটি তাই অত্যান্ত অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষ ভাল নিয়ত করে যদি মন্দও করে ফেলে তবে সেটিও ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়।

মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিচার-বিবেচনা করার সক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মানুষকে তার সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। এটিই পরীক্ষা। সিদ্ধান্ত নিজের। সে কারণেই কর্মের দায় নিজের। মন্দ ইচ্ছে জাগ্রত হলেও বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে মানুষের সঠিক পথে চলার পথ উন্মুক্ত।

বস্তুত মানুষ নিজেই নিজেকে যে পথে চালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সে পথে গমন করে। মানুষের নিজের গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পছন্দের পথে আল্লাহই মানুষকে চালনা করে নিয়ে যান। কথাগুলি একটু জটিল মনে হতে পারে। তবে পুনঃ পুনঃ পাঠে বিষয়গুলি স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেবে [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ১.৫]।

মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সে কিভাবে তার জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তিনি তা দেখেন। ফলে মানুষ নিজে যখন ভাল পথে চলে না বা চলতে চায় না কিংবা বলা যায় যে, মানুষ নিজে যখন কোন মন্দ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বা পথে চলতে চায় তিনি তখন তাকে সে পথে যেতে দেন। তিনি ইচ্ছে করলে বাধা দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। সেটিও তিনি মানুষের ভালর জন্য করেন। বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য করেন। সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য করেন। মানুষকে একটা গন্ডির মধ্যে পুরো স্বাধীনতা দেয়া আছে। এখানেই পরীক্ষা বিষয়টির যথার্থতা।

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থা, কি পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে, ভাল নাকি মন্দ, পরিবর্তনের বার্তাবাহককে গ্রহণ করা যাবে নাকি যাবে না- মানুষকে সকল বিষয় বিচার-বিবেচনা করে চলতে হবে। যারা তা করবে না বা করতে পারবে না তারা উদাসীনতা কিংবা অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট হবে। এদেরকে আল্লাহ একভাবে পরিচালনা করেন। যারা বিচার-বিবেচনা করে সঠিক পথ বেছে নেয় তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়। তারা হয় বিশ্বাসী। তাদেরকে তিনি সরল পথে চালনা করেন। অতএব মানুষের কর্ম ও কর্ম প্রচেষ্টাই নির্ধারণ করে দেয় যে আল্লাহ কাকে কোন পথে চালনা করবেন।

পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে যারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে আগ্রহী হয় না বা পরিবর্তনের প্রয়োজনে আরও যেসব কাজ করা প্রয়োজন তা করতে ইচ্ছে প্রকাশ করে না তারা ভূল করে। ভূল-পথগামী গোমরাহী করে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যূত হয়। মানুষ তার কর্মের কারণেই সরল পথপ্রাপ্ত কিংবা ভূল পথগামী হয়। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। যে যেমন হয় আল্লাহ তাকে সে পথে চলতেই সহায়তা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান। অর্থাৎ যে সরল পথ বেছে নেয় তিনি তাকে সে পথে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ভূল-পথগামীকেও তার পথে। তাই বলা হয় 'তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন'। কেননা মানুষ জানে না যে ভেতরে কে কি ইচ্ছে পোষন করে।

সরল পথ হচ্ছে, যথাযথ বা সঠিক পথ। সত্যের পথ। ন্যায়ের পথ। কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ চেনা সম্ভব নয়। অতএব সরল পথে চলতে হলে জ্ঞানও লাগবে।

কেবলা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞান বলে যে নতুন নির্ধারিত কেবলাই কেবলা হওয়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। কেননা এটিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ঘর, ইব্রাহীম (আঃ) যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। বিষয়টি সত্য, ন্যায়সম্মত ও যৌক্তিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি যথা জ্ঞানপ্রসূত। মহানবী (সাঃ)-ও সে জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করেই আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন। এটিই আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় সমর্পন। আল্লাহর নির্দেশনায় সমর্পনই সরল পথ।

অপরদিকে যারা রাসূলকে সত্যিকারভাবে ভালবাসে এবং যারা তাঁর সত্যিকার অনুসারী তারা অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করবে এবং তাঁর নির্দেশনা মেনে চলবে। অনুসারীদের জন্য সেটিই সমর্পন।

ভেতর থেকে আল্লাহ যাদের জন্য এ পথে চলার ইচ্ছে জাগ্রত করে দেবেন বস্তুত তারাই এ পথে চলতে পারবে। কিন্তু যাদের ভেতরে গোমরাহীভাব আছে তিনি তাদের ভেতরে সেটিই জাগ্রত করে দেবেন। তারা সরল পথে চলতে পারবে না বা তাদের সে পথে চলার ইচ্ছে জাগ্রত হবে না। তিনি প্রত্যেককে জানেন। সেভাবেই তিনি সকলকে চালনা করেন। তাই বলা হয়, 'তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন'। কেননা সাধারণভাবে মানুষ জানে না যে ভেতরে কে কি ইচ্ছে পোষন করে।

এতদ্বসত্ত্বেও যারা বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা কাজ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা গোমরাহী পরিত্যাগ করে সরল পথে চলতে পারবে। অতএব মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ ইচ্ছে জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কর্মের দায় নিজের ওপর বর্তায়।

কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় অনেকের ভেতরে সেটি গোমরাহীর সৃষ্টি করে থাকতে পারে। এটিও স্বাভাবিক। যার কারণসমূহ ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তেমন মানুষ বিষয়টির সমালোচনা করার প্রয়াস পাবে। এমনকি ভূল বা বিপরীত পথেও মানুষকে চালনা করার চেষ্টা করবে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করবেন সে সরল পথেই চলবে। তিনি সকলকে জানেন।

আল্লাহ যখন যেমনটি নির্দেশ করেন তখন সেটিই করনীয় বা পালনীয়। তিনি যা নির্দেশ করেন তা ন্যায়সম্মত, যথাযথ ও সত্যের পথ। সব বিষয় তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বর্তমানে সে পথ অনুসরণই উত্তম পথ। সময়ের সবচাইতে উত্তম পথই সরল পথ। যারা ভূল পথগামী তারা তাদের বিচার-বিবেচনাহীন কর্মের কারণে সঠিক পথ খুঁজে পেতে ব্যার্থ হয়।

এভাবেই আল্লাহ যে পরিবর্তনের নির্দেশনা দিয়েছেন বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে তার যথার্থতা বুঝতে পেরে যারা তা মেনে চলে তাদেরকে তিনি পথ প্রদর্শন

করেন। তারাই সরল পথে পরিচালিত। তাই বলা হয়েছে, "তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

▪ **২.১৪৩.১** এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি (Thus We have appointed you a middle nation) : আল্লাহ বলছেন, বিশ্বাসী সম্প্রদায় তথা মুসলিম জাতিকে তিনি একটি মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দাড়িপাল্লার নির্দেশক যেমন মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থান করলে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা পায় ও দুইদিকে ভারসাম্য রক্ষিত হয়; তেমনি মধ্যপন্থী কেউ যখন সত্য ও ন্যায়ের পথকে ধারণ করে রাখে তখন সমাজেও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি আসে।

সকল মানুষের ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ আল্লাহতে সমর্পন। কিন্তু ইহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি ইসলামের মূল চেতনা বা দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ধর্ম বা দর্শনে তারা ভূল-ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়েছে। তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তাই এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। দর্শনের সঠিকতা বজায় রাখবে। সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে কাজ করবে।

এ বাণীর মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ যেমন মর্যাদাবান করেছেন, তেমনি তাদের ওপর গুরু দায়িত্বও অর্পন করেছেন। যেমন- একসময় তিনি ইসরাইল জাতির ওপর এমন দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, যেন আল্লাহর বাণী ইসরাইলের সন্তানদের মাঝে এবং মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু তারা তাদের কার্যকলাপের কারণে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমুহে বিষয়গুলি তাই তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে সে দায়িত্ব আল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ন্যাস্ত করেছেন।

কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রতীকস্বরূপ বিবেচনা করা হয়। কেননা এ পরিবর্তনের মাধ্যমে জেরুজালেমে অবস্থিত ইসরাইলি তথা ইহুদি জাতির কেবলা অনুসরণের পরিবর্তে মানবজাতিকে মক্কা অভিমুখে মুখ ফেরাবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে তাদের এ অবস্থান নিজেদের কর্ম, যোগ্যতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা দিয়েই বিশ্ব সমাজে ধরে রাখতে হবে। তাই বলা হয়েছে,

“তোমরাই (মুসলমানরাই) হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনবে। গ্রন্থপ্রাপ্তগণ যদি বিশ্বাস স্থাপন করত তবে তাদের জন্য মঙ্গলকর হত।” (আল-কোরআন ৩:১১০)

ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশের ধারার তিনটি ধর্মের অনুসারী হচ্ছে ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম জাতি। ইহুদি ও খ্রীষ্টান জাতি ধর্মের মূল দর্শন ও চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ সর্বশেষ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সকলের মুক্তির জন্য একটি মধ্য পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই এ দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভ্রান্তি থেকে সরে আসা যথাযথ বলে বিবেচিত।

▪ **২.১৪৩.২** যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ ও বার্তাবাহক সাক্ষীস্বরূপ হয় তোমাদের জন্য : শেষ বিচার দিবসে সকল মানুষকে আল্লাহর সম্মুখে একত্রিত করা হবে। সেদিন তাদেরকে সাক্ষ্য দিতে হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে হবে যে, বার্তাবাহক মানবসমাজে আল্লাহ প্রদত্ত বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং যথাযথভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

অপরদিকে যারা সে বার্তা শ্রবন করে বিশ্বাসী হয়েছে তারাও সে বার্তা মানবসমাজে পৌঁছে দিয়েছে। তারাও তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে বার্তাবাহককেও সে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে হবে। এখানে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

‘আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি’ এ বক্তব্যের সাথে ‘যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ ও বার্তাবাহক সাক্ষীস্বরূপ হয় তোমাদের জন্য’ এ বক্তব্যের একটি যোগসূত্র আছে।

বার্তাবাহক সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে আল্লাহ প্রদত্ত বার্তা মানুষের মাঝে প্রচার করেছেন, যেন মানুষ এ অবস্থাটি ধরে রাখে। যারা সে বার্তা শ্রবন করেছে ও বিশ্বাস করেছে তাদের ওপরও দায়িত্ব বর্তেছে সে বার্তা সমাজের

প্রতিটি মানুষের কেবল কর্ণে নয় হৃদয়ে পৌঁছে দেয়া। তারা সে দায়িত্ব যথাযথতার সাথে পালন করেছে তাদেরকেও সে সাক্ষ্য দিতে হবে।

এ সবই করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে ন্যায় ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা ও শান্তি বজায় রাখা। অন্যথায় এতসব করার কোন মূল্য নেই। আল্লাহর সকল কাজের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। তিনি অনর্থক কিছু করেন না। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সাথেই বস্তুত পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে। এভাবেই এ দর্শন প্রতিষ্ঠিত। দর্শনের কার্যকারণ সম্পর্ক ও যৌক্তিকতার জ্ঞান যার ভেতরে প্রবেশ করবে সে এর মহাত্ব দর্শনে অভিভূত হবে এবং এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে যথার্থ বলে বিবেচনা করতেও সক্ষম হবে। কেননা এটিই উত্তম পথ। এটি সমাজে এমন এক নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে যে নিয়মের পথ ধরে চললে শান্তি আসবেই।

পৃথিবীতে মানুষ কেবল আনন্দ-ফুর্তি করতেই আসেনি, যদিও তাতে নিষেধ নেই যদি না তা অশ্লীল বা অপরাধের পর্যায়ে হয়ে থাকে। তবে এর পাশাপাশি মানুষের কিছু দায়-দায়িত্বও আছে। কোথাও অন্যায় হয়ে থাকলে সে বিষয়ে সত্যের পক্ষে দাড়ান মানব সমাজের এক ভীষন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যথায় পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে।

যে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা মহান আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে মানব সমাজে অবতীর্ণ করেছেন, মুসলিম জাতির জন্য এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক মহান দায়িত্ব যার জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে।

জাতি হিসেবে মুসলিম জাতির আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ও ন্যায়ের বার্তা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে। যে দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তেছে এবং যে দায়িত্ব তারা সাদরে গ্রহণ করেছে, যার কারণে তারা বিশ্ব সমাজে মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে, দায়িত্বরত অবস্থায় পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় ভুলুন্ঠিত হলে তাদের দায়ভার আছে।

সামাজিক বা কোন কারণে বিশ্বশান্তি বিনষ্ট হলে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়া একজন মুসলিমের তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। আর এ ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়গুলিতেই তাদেরকে সাক্ষী হতে হবে। যথাযথ ব্যাবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের সাক্ষ্য দিতে

হবে। নেতৃত্ব পরিবর্তন কোন সহজ বিষয় নয়। এর সাথে অনেক গুরু দায়িত্ব পালনের সম্পর্ক আছে।